মুক্তির সন্ধানে-
ভারত
শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগল

মুক্তির সন্ধানে ভারত

বা

ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা সম্বলিত

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সূচীপত্র

কংগ্রেস পূর্ব্ব-যুগ

কংগ্রেস যুগ

চিত্রসূচী

কংগ্রেস-পূর্ব্ব যুগ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

"মুক্তির সন্ধানে ভারত" দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হ'ল। বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে পুস্তকখানি নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু প্রথমে কাগজ এবং পরে ছাপাখানা সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় প্রকাশে অসম্ভব রকম বিলম্ব হ'ল। অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব হেতু আশা করি পাঠক-পাঠিকা ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। প্রথম সংস্করণে পুস্তকখানিতে কিছু কিছু ভুল ছিল, এ সংস্করণে তা সংশোধন করা হয়েছে। এরূপ প্রামাণিক পুস্তকে ছাপাখানার গোলমাল সত্ত্বেও যাতে বেশী ভ্রম না থাকে তার প্রতি যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখা হয়েছে। গত পাঁচ বৎসর ভীষণ সঙ্কটের মধ্যে কেটে গেছে। ইউরোপ এবং এসিয়া উভয় রণাঙ্গণেই মহাসমর শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু তার জের কতকাল ধরে টানা হবে কে জানে? এই সময়ে ভারতবর্ষ নানাভাবে পীড়িত হয়েছে। বহিঃশত্রু ঘরের দুয়ারে এসে হানা দেওয়ায় লোকের মনে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। বহিঃশত্রু তাড়াবার জন্য, আর দেশমধ্যে ঢুকে পড়লে তাকে নানাবিধ ক্লেশে জর্জ্জরিত করবার জন্য যে-সব পন্থা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তাতেও লোকে এই সময়ের মধ্যে এতটুকুও সোয়াস্তি পায় নি। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ফল; প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক আত্মাহুতি দেওয়ার ফলে আমরা যারা বেঁচে আছি একে কাটিয়ে উঠ্‌তে পেরেছি। পরোক্ষ ফল দৈনন্দিন জীবনের অভূতপূর্ব্ব ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব ক্লেশ ও লাঞ্ছনা। জীবনধারণের উপযোগী জিনিষপত্র সংগ্রহে এত হায়রানি আর কোন কালে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। মন্বন্তরের ফলে দেশের সমাজ-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হয়েছে, শিক্ষা স্বাস্থ্য সবই পঙ্গু হয়েছে। এসব বিষয় পুস্তকে সন্নিবেশিত হলেও

এখানে তার বিশেষ করে পুনরায় উল্লেখ করছি। দেশের রাষ্ট্রশক্তি দেশবাসীর হস্তে না এলে এ অবস্থার প্রতিকার অসম্ভব জানি, কিন্তু তারও কোন লক্ষণ এখনও পর্য্যন্ত দেখা যায় নি। তবে রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সঙ্কটে' যে মানুষের জয়গান গেয়েছেন আমরা তারই প্রত্যাশায় আছি।

গত পাঁচ বৎসর ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে যে-সব ঘটনা ঘটেছে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে তার যে ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছে, একটি নূতন অধ্যায়ে সেই সব সন্নিবেশিত করতে চেষ্টা করেছি। এ সংস্করণে নূতন ছবিও সংযোজিত হয়েছে। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র কর্ত্তৃপক্ষ এবারেও কয়েকখানি ব্লক দিয়ে এবং প্রবাসী প্রেস অধিকাংশ চিত্র ছেপে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। পুস্তকখানি যে বাংলা-ভাষী বিদগ্ধ সমাজে আদৃত হয়েছে সেজন্য নিজেকে ধন্য মনে করি।

কলিকাতা
মহালয়া, ১৩৫২

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নিবেদন

'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হ'ল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮০০ খৃঃ অব্দ) ভারতবাসী প্রথম ঘনিষ্ঠ ভাবে ইংরেজের সংস্পর্শে আসে। এই সময়েই ভারতবর্ষে রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের সূচনা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ঠিক্ সতর বছর পরে কল্‌কাতায় প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় (১৮১৭, ২০শে জানুয়ারী)। ইংরেজী ও বাঙালী-মনীষা এখানে এক সূত্রে গ্রথিত হ'ল। ইংরেজী শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস—এক কথায় ইংরেজ-জীবনের সঙ্গে বঙ্গ-সন্তানগণ সুষ্ঠুরূপে পরিচিত হবার প্রথম সুযোগ পেল এই হিন্দু কলেজে। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদল প্রথম খানিকটা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করলেও নবজীবন বা রেনেসাঁর পতাকাবাহী সৈনিকরূপে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ভারতভূমে কর্ম্মতৎপর ছিলেন। ইংরেজের সংস্কৃতি প্রধানতঃ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তার অনুকারী ভারত-সন্তানগণও এই রাজনীতিকেই সর্ব্ব উন্নতির মূল উৎস বলে বরণ করে নিয়েছেন। দীর্ঘ পঁচাশী বছর যাবৎ ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালী যে একনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক সাধনা করে, তার একদিক মাত্র প্রথমে কংগ্রেসে রূপ পেল। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ললিতকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তখন নূতন জীবন-স্পন্দন অনুভূত হয়। রাজা রামমোহন রায় থেকে সার্ সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ পর্য্যন্ত সকল মনীষীই এতে বিশেষ সহায়তা করেন। রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রেরণাও এ সবের মূলে কম রস জোগায় নি। প্রথম ভাগে আমি এই কথাই বল্‌তে চেষ্টা করেছি।

পুস্তকখানির দ্বিতীয় অংশকে 'কংগ্রেস-যুগ' [illegible] দিয়েছি। কংগ্রেস মুখ্যতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় অধিবেশনে দাদাভাই নৌরজী এ কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও পরে এ উদ্দেশ্যের উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু বন্যা ও প্লাবন কোন বিশেষ ভূমি বা প্রাঙ্গণ প্লাবিত করে না, দিগ্ দিগন্তকে প্লাবিত ও সিক্ত করে তোলে। কংগ্রেস রাজনীতিও জীবনের ও কর্ম্মের সকল ক্ষেত্রে, ব্যক্তিবিশেষ বা নেতাবিশেষের বিপরীত নির্দ্দেশ সত্ত্বেও, ব্যাপ্তিলাভ করেছে ও শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে। কাজেই কংগ্রেসের ইতিহাসকে কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের ইতিহাস বল্‌লে ভুলই হবে। কংগ্রেস ভারতের নব-জাগরণেরই প্রতীক। কংগ্রেসের এই সর্ব্বব্যাপক সমাজ-সেবার আদর্শে ভারতবর্ষে অন্যান্য বহু সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ও প্রকারান্তরে কংগ্রেসেরই ব্যাপক আদর্শ, কখনও জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে, প্রচার করছে। এ দিক দিয়ে ভারত ক্ষেত্রে সকল প্রতিষ্ঠানেরই সমান সার্থকতা। এখনও ভারতের নব-জাগরণ বা রেনেসাঁ পরিপূর্ত্তি লাভ করে নি। রাণী এলিজাবেথের আমলে ইংরেজ-সমাজ যে নব-প্রেরণা লাভ করে তা কর্ম্মে রূপায়িত হতে তিন শ' বছর কেটে যায়। সুতরাং ভারত-বাসীরও হতাশ হবার কারণ নেই। বর্ত্তমান যুগে তা দ্রুতই সংসাধিত হতে পারে।

কিন্তু 'দ্রুত' কথাটির সঙ্গে এমন একটি বিষয় মনে উদিত হয় যেজন্য আজ স্বস্তি লাভ করা খুবই কঠিন। বিজ্ঞান সকলকেই দ্রুত কাম্য লাভে সহায়তা করে। কিন্তু বর্ত্তমানে এ আসল উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে যে প্রলয়কাণ্ড সুরু করে দিয়েছে, তাতে মনুষ্যমাত্রই আজ চিন্তাকুল। কত কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরের হাজার হাজার বছরের

চেষ্টা ও সাধনার ফল এক একটা বোমা বিস্ফোরণেই ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের পরম স্নিগ্ধ সৃষ্টি কার্য্যের পরিবর্ত্তে প্রলয় তাণ্ডব সুরু হলে মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বের মূলেই আঘাত করা হয়। ভারতের নব-জাগরণের গতিও সুতরাং পদে পদে ব্যাহত হওয়া নিশ্চিত। এ সময়ে যা কিছুই মানুষের মনে আশা-উদ্দীপনার উদ্রেক করবে তা-ই সাদরে বরণীয়। আমরা যেন আত্ম-রক্ষায় সর্ব্বাগ্রে উদ্বুদ্ধ হই।

এ পুস্তকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনা ও ভাবধারা সন্নিবিষ্ট করতে চেষ্টা করেছি। পুস্তকখানি বহুদিনের পরিশ্রমের ফল। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ বা নব-জাগরণ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছি। তার খানিকটা পুস্তকের প্রথম অংশে প্রদত্ত হয়েছে। পুস্তক রচনায় আমাকে বহু বই থেকে সাহায্য নিতে হয়েছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকায় তার অধিকাংশের উল্লেখ করেছি। এখানে তিনখানি বইয়ের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—তিন খণ্ড, 'বাংলা সাময়িক পত্র' ও 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' অপরিহার্য্য। কংগ্রেস-যুগের 'লিটারেচার' বা 'সাহিত্য' প্রচুর—এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহু হিতৈষী বন্ধু ও প্রতিষ্ঠান আমাকে পুস্তকাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকে আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। পুস্তক-রচনাকালে তাঁরা আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। কয়েক-খানি ব্লকের জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণরিভিয়ু', শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট আমি

বিশেষ কৃতজ্ঞ। ভারত ফটো টাইপ ষ্টুডিও, লক্ষ্মীবিলাস প্রেস ও প্রবাসী প্রেস থেকে ছবিগুলি ছাপানো। তাঁদেরও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরমশ্রদ্ধাভাজন আচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি বাহুল্য বলে মনে করি।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন, ১৩৪৭

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভূমিকা

শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহার 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্র খ্যাতনামা সাহিত্যিক। কাব্য ও উপন্যাস প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের হাটে সামান্য যে কয়জন সাহিত্যিক অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল প্রবন্ধের বেসাতি করেন যোগেশচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। সুতরাং বাঙালী পাঠক সমাজে তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন ভূমিকার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন।

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' ভারতবর্ষের বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসের একটী কাঠামো মাত্র। জাতির জীবনে একশত বৎসর কিছুই না একথা ঠিক, কিন্তু প্রগতির পথে অবিরাম চলিতে হইলে মাঝে মাঝে এমনি ভাবে আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী পথ স্থির করা প্রয়োজন। এই হিসাবে এ ধরণের পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট। বিগত একশত বৎসরে শিক্ষায়, সাহিত্যে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, ধর্ম্মে, লোকাচারে এক কথায় জাতির সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতে যে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই যে পরিবর্ত্তন ইহারও একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারা আছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সুতরাং বাংলাদেশের যাঁহারা বর্ত্তমান নাগরিক এবং যাঁহারা হইবেন ভবিষ্যৎ নাগরিক তাঁহাদের পক্ষে এই পরিবর্ত্তনের মূলতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। যোগেশচন্দ্র এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া আমার এই ধারণাই জন্মিয়াছে।

যে একশত বৎসরের ইতিহাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা ভারতের নব জাগরণ বা রেনেসাঁর ইতিহাস। এই রেনেসাঁর মূল

উপাদান প্রতীচ্যের অবদান এবং ইংরেজী শিক্ষাই ইহার বাহন। সুতরাং আমাদের সমস্ত অগ্রগতি যদি আজ প্রতীচ্যপন্থী হইয়াই থাকে তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মোগল রাজত্বের গৌরবময় যুগে আমরা অনেকাংশেই আপন আপন গণ্ডী ছাড়াইয়া বাহিরে আসিয়া দৃশ্যতঃ অনেক মুসলমানী আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। বর্ত্তমান নব-জাগরণের পূর্ব্বে মোগল বাদশাহ আকবরের রাজত্বেও ভারতবর্ষে আর একটী নব-জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কতখানি বিপুল এবং ব্যাপকভাবে দেশের মাটিতে শিকড় গাড়িয়াছিল তাহা আজ নিশ্চিত করিয়া বলিবার উপায় নাই, কেননা সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া অপক্ষপাত ঐতিহাসিক তাহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ রাখেন নাই। এ সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই সমসাময়িক কাগজপত্রের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে সময় রাজা বা দেশের শাসনকর্ত্তার জীবনীই ছিল দেশের ইতিহাস। ইহাতে অবশ্য সাধারণভাবে দেশের তৎকালীন ইতিহাসের সব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ ভাবধারার গতি প্রগতি ইহা হইতে পরিপূর্ণ ভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, কোন একজন রাজা বা শাসনকর্ত্তার জীবন ইতিহাস যেমন মূল্যবান্, কোন একটি ভাবধারার প্রসারের অপক্ষপাত বিবরণও ঠিক ততখানিই মূল্যবান্।

আমাদের দেশে 'রাষ্ট্র-বিজ্ঞান' এখনও পূরাপূরি বিজ্ঞান হিসাবে আলোচিত হয় না—এখনও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। কিন্তু ব্যাপক-ভাবে দেখিতে গেলে সমাজ, ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সব কিছুর সমন্বয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান গঠিত। কোন একটি বিশেষ সময়ের রাষ্ট্রীয় তথ্য আলোচনা করিতে হইলে এইগুলি বাদ দিয়া যদি শুধু রাজনৈতিক বিষয় সমূহেরই অবতারণা করা হয় তবে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হইল বলা চলে

না। কারণ জীবনের সকল প্রচেষ্টার উপরই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যোগেশচন্দ্র এই কথা বিস্মৃত হন নাই দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। এইখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, ভারতের মুক্তি সাধনার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইহা নহে। ইহা ভারতীয় নব-জাগরণের বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাসের পথ-নির্দ্দেশক মাত্র। এই নব-জাগরণের যুগ এখনও অতীত হইয়া যায় নাই, এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্নতর সমাজে এই নব-জাগরণের পূর্ণতম বিকাশ দেখা যায় নাই। তবে সকল সমাজেই এই ভাবধারার একটা সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। যে সব সমাজ ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহারা একটা যুগসন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আর যে সব সমাজ সবে মাত্র এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহারাও সমাজ মনে একটা গুরুতর আলোড়নের ফলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ সময়ে সমগ্রভাবে এই রেনেসাঁ বা নব-জাগরণের একটা সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত বিবরণ সময়োপ-যোগী সন্দেহ নাই।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গণে বাঙালী যে পাপ করিয়াছিল তাহারই পরোক্ষ অবদান এই রেনেসাঁ। বাঙালী রামমোহন ইহার প্রবর্ত্তক ও হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দ ইহার পতাকাবাহী। যখন এই যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হইবে তখন দেখা যাইবে বর্ত্তমান ভারত গঠনে ইঁহাদের সত্যকারের দান কতখানি।

আমি এখন অশীতিবর্ষে পদার্পণ করিয়াছি। 'যোগেশচন্দ্র যে সময়ের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই আমার চোখের উপর ঘটিয়াছে এবং এই সময়ের অনেক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিবারও আমার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। এইজন্য আমি স্বভাবতঃই যথেষ্ট কৌতূহল ও আনন্দের সহিত পুস্তকখানি

পাঠ করিয়াছি। সর্ব্বজনগ্রাহ্য সরলভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি বাংলা দেশের পাঠক সমাজে আদৃত হইবে এ বিশ্বাস আমার আছে। বাঙালী পাঠক-সমাজ উপন্যাসপ্রিয় এ কথা অনেককেই বলিতে শুনিয়াছি। হয়ত ইহার মধ্যে কতকটা সত্যও নিহিত আছে। কিন্তু চিন্তাশীল মৌলিক আলোচনা বাংলা দেশে অচল এ ধারণা আমি পোষণ করি না। সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর একটা সহজাত আকর্ষণ আছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায়—ইহা নব-জাগরণের ফল। ইংলণ্ডের রেনেসাঁর ইতিহাস পড়িলে দেখা যায় যে, ইংরেজ জনসাধারণ এই সময়ে অতিমাত্রায় সাহিত্যপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে একজন সাধারণ কসাইও পশুহত্যা করিবার সময় একটা নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক বক্তৃতা দিয়া তবে হত্যা কার্য্যে হাত দিত। বাংলায় অবশ্য সে অবস্থা এখনও হয় নাই, সাহিত্য-চর্চ্চা আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এই প্রদেশেও সাহিত্যরসিক এমন অনেক আছেন—যাঁহাদের নিকট 'মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নব-জাগরণের ইতিবৃত্ত' যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

সায়ান্স কলেজ, কলিকাতা
২৪শে ভাদ্র, ১৩৪৭

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

পিতৃদেবের চরণে

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

মুক্তির সন্ধানে ভারত

সূচনা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন, কোন জাতির ইতিহাসে পঞ্চাশ কি একশ' বছর একরূপ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। অনন্ত কালের প্রবাহে এ একটি বিন্দু মাত্র। ভারতবাসীর জাতীয় ইতিহাসে এ কথাটা যেমন প্রযুজ্য এমনটি আর কোন জাতি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য নয়। হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা জীবনতরী বেয়ে চলেছে অবিরত। কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, শ্রাবণের অবিরাম বারিবর্ষণ, শরতের সুমধুর আলোক-ছটা, বা বসন্তের মৃদুমন্দ হাওয়া— হিন্দুস্থান কতকাল ধরে যে এসবের সম্মুখীন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তার জীবনেও বছরের ষড়ঋতুর মত এক এক অবস্থার উদয় হয়েছে, এক অবস্থা বিলুপ্ত হয়ে নূতন অবস্থা দেখা দিয়েছে। তাই তার দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ নশ্বর ঐহিক বিষয়ের মধ্যে আত্মবিলোপ না করে পরম রস পরমার্থ তত্ত্বের মধ্যে নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করেছে। এর ভিতরে নৈরাশ্যবাদ স্থান পায় নি, আশা ও আনন্দ এসবের মূল উপজীব্য ও লক্ষ্য। ভারত-কাহিনীর এই হ'ল মূল কথা।

ভারতবর্ষের গত একশ' বা ততোধিক কালের ইতিহাস অনন্ত কাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে বড় রকমের ভুল করা হবে। পশ্চিমের দেশগুলির কাজ পরিচালিত হচ্ছে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। পূর্ব্ব

দেশগুলি এত কাল ধর্ম্মকে কেন্দ্র করেই নিজ নিজ কাজ নির্ব্বাহ করেছে। তবে এখন পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে রাজনীতির চর্চ্চা পাশ্চাত্যের আদর্শেই সুরু করে দিয়েছে তারা। একেও কিন্তু তারা ধর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করে নিয়েছে। রাজনীতি আজ জীবনের সকল কর্ম্মে সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত,—নিছক রাষ্ট্র সম্পর্কেই এ সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। ধর্ম্ম ও রাজনীতি একারণ সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতবাসীর কাছে। এদেশে আধুনিক কালে সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি চর্চ্চা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম নিয়েই প্রথম খুব বিচার-বিতর্ক সুরু হয়। এতে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা-ও পশ্চিমের অনুকরণে। এই নব পদ্ধতিই ক্রমে রাজনীতি চর্চ্চায় অনুক্রামিত হয়েছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষ হয়েছে বহু জাতির মিলন ক্ষেত্র। আর্য্য-পূর্ব্ব যুগে ভারতবর্ষে একটি উৎকৃষ্ট ধরণের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। মোহেন-জো-দড়ো ও হরাপ্পার আবিষ্কৃত নিদর্শন থেকে এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর্য্য ও আর্য্য-পূর্ব্ব সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সভ্যতার সৃষ্টি—তা-ই পরবর্ত্তী কালে আর্য্যসভ্যতা নামে অভিহিত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে শক, হূন, তাতার, আসীরিয় ও যবন (গ্রীক) সভ্যতা। এরা একে একে আর্য্যত্বে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে ধন্য হ'ল। যারা এসবের ধারক, সেই জাতিগুলিও ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে গিয়ে হিন্দু বলে পরিচিত হ'ল। রাজপুতানার রাজপুতগণ দেশী-বিদেশী রণপ্রিয় জাতিদের মিশ্রণে সৃষ্ট, কারো কারো কাছে শুন্‌তে কটু হলেও একথার মধ্যে সত্য অনেকখানি রয়েছে। এর পরে এল মহম্মদীয় সভ্যতা ও ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে পৌঁছবার পূর্ব্বেই এ প্রকৃষ্ট আকার ধারণ করেছিল। হিন্দুরা তখন দুর্ব্বল, আত্মরক্ষার চেষ্টায় ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। এ সময় ইস্‌লামের আবির্ভাব ভারতীয় সংহতিকে প্রবলভাবে ধাক্কা দিলে। কিন্তু যে-সব মুসলমান

সম্প্রদায় এখানে রাজ্য বিস্তার করেছিল, স্বদেশে তাদের সমাজ তখনও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল না। কাজেই ভারতবর্ষে এসে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে অনায়াসেই তারা সক্ষম হ'ল। ধর্ম্মে স্বতন্ত্র হলেও মুসলমানেরা হিন্দুর মত ভারতবর্ষের অধিবাসী হ'ল, উভয়ের স্বার্থ একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়ল। ক্রমে বহু ক্ষেত্রে ধর্ম্মের চেয়ে সমাজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন কর্‌লে। ইংরেজকে যারা এদেশের কর্ত্তৃত্ব দিয়ে দেয় তাদের ভিতরে হিন্দু মুসলমান দুই-ই ছিল। সামাজিক বোধই এ কর্ম্মে তখন তাদের উদ্‌বুদ্ধ করে। ইংরেজের স্বদেশে কিন্তু বিশিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্র-বিধি গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার বহু পূর্ব্বে। এই বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি তাদের সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেছে। তবু, ভারতবর্ষের জলমাটি প্রবাসী ইংরেজদের ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করতে যদি-বা কতকটা প্রথমে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান এসে অবিলম্বে এর পথে বিঘ্ন জন্মাল। বিজ্ঞান জানিয়ে দিলে, এদেশের অর্থ এখানে বসেই ভোগ করায় কোন সার্থকতা নেই, বাষ্পীয় পোতে স্বল্প সময়ে স্বদেশে পৌছে স্ব-সমাজে তা ব্যয় করলে চতুর্বর্গ ফল লাভের সম্ভাবনা। তাই ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সমাজ হতে আলাদাই রয়ে গেছে। ভারতবর্ষ শাসন ও শোষণে এই জাতিগত বৈষম্য ক্রমে প্রকট হয়ে পড়ল।

পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা করতে আরম্ভ করে। কিন্তু তারা যে এদেশে একটি রাজ্য বিস্তার করতে পারবে এ বোধ ঐ সময় থেকেই তাদের মনে বদ্ধমূল হয়। তাদের পরবর্ত্তী কার্য্যগুলি এই বোধ দ্বারাই পরিচালিত। ব্যবসা করতে এসে রাজ্যলাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যে কিন্তু এ-ই ঘটেছিল। কোম্পানীর সুনির্দ্দিষ্ট শাসন বিধি নেই, নিয়ম-কানুন নেই, উপরওয়ালা মালিক—সে-ও সাত সমুদ্র তের নদীর পারে।

কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের তখন একচ্ছত্র আধিপত্য, আর এদের নেতৃপদে সমাসীন লর্ড ক্লাইভ। লবণ, তামাক প্রভৃতি বাংলার প্রধান ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারী সে। ওদিকে শাসনভার হাতে নিয়ে খাজনা আদায় কর্‌তে মাত্রাজ্ঞানও হারিয়ে ফেল্‌লে। বাঙালী হয়ে পড়ল অর্থের কাঙাল। এর ফলে হ'ল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। আনন্দমঠের গোড়ায় এই মন্বন্তরের চিত্র দেওয়া হয়েছে। এক কোটি বাঙ্গালী দুর্ভিক্ষে মারা গেল! বাংলা দেশের লোক সংখ্যা তখন মাত্র তিন কোটি। খাজনা আদায় কিন্তু বন্ধ হয়নি। ইংরেজী ১৭৬৮ সাল থেকে ১৭৭২ সাল পর্য্যন্ত সমানে আদায় কার্য্য চলেছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস তখন গবর্ণর। তিনি এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বিলাতে লিখলেন যে, যারা এখনও জীবিত আছে তাদের নিকট থেকে জোরপূর্ব্বক কর আদায় করে অঙ্কের পরিমাণ সমান রাখা হয়েছে! এ হ'ল ১৭৭২ সালের কথা। ক্লাইভ ইতিপূর্ব্বে বিলাতে গিয়ে যখন বসবাস আরম্ভ করেছেন তখন তিনি কোটি কোটি টাকার মালিক! বিলাতে তাঁর দুর্নাম হয়েছিল খুব। তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হয়। মোকদ্দমায় তাঁকে এই বলে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল যে, গর্হিত উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করলেও রাষ্ট্রের তিনি যথেষ্ট উপকার করেছেন! তিনি কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না, আত্মহত্যা করে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ও অজস্র অর্থ বিলাতে নীত হয়েছিল। তিনিও প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। নানা অপকর্ম্মের জন্য বিলাতে তাঁরও বিচার হয়। ভারতবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে এডমাণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে হাউস অফ লর্ডসের সমক্ষে যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বিলাতে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। সাত বছর ধরে বিচার চল্‌বার পর হেষ্টিংস

মুক্তিলাভ করেন। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ স্বয়ং ছিলেন হেষ্টিংসের পক্ষে। বিচার আরম্ভে একশ' ষাট জন লর্ড উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সাত বছর পরে ১৭৯৫ সালে রায় দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র উনত্রিশ জন লর্ড! এদের অধিকাংশের মতে হেষ্টিংস নিরপরাধ সাব্যস্ত হন। হেষ্টিংস কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা পরিচালনার ফলে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

১৮০৭ সালে হিসাব করে দেখা যায়, এদেশ থেকে পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বছরে এক হাজার পঁচাশী কোটি টাকা বিলাতে চলে গিয়েছে! তখন ভারতবর্ষের অতি সামান্য অংশই ইংরেজের অধীন ছিল। ভারতের অর্থে ইংরেজ ধনী হচ্ছে, আর সাধারণ ভারতবাসী ক্রমশঃ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা প্রতীকারের কোন উপায় ছিল না। বিলাতের জনসাধারণ কোম্পানীর দুষ্কার্য্যের বিরোধী ছিল বটে, কিন্তু কুড়ি বছর অন্তর অন্তর সনন্দ দানের কালেই তাদের প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে এসব বিষয় আলোচনার অবকাশ পেত। তখন নানারূপ আলোচনা চল্‌ত, বাদ-বিতণ্ডা হত, কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নিরস্ত করবার বিশেষ কোন পন্থাই আবিষ্কৃত হয় নি। এদেশেও যে-সব ইংরেজ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করত তাদের চোখে কোম্পানীর অপকর্ম্মগুলি বিসদৃশ ঠেক্‌ত। তাদের সংখ্যা খুবই কম। তারা কেউ কেউ সংবাদপত্র পরিচালনা করত ও কোম্পানীর যথেচ্ছ কার্য্যের সমালোচনায় রত থাকত। কর্ত্তৃপক্ষ আইন বিধিবদ্ধ করে তাদের স্বাধীন মত প্রকাশের পথ বন্ধ করে দেয়। তারা নিজেরা এরূপে নিরঙ্কুশ হয়ে রইল। এদেশীয়দের ভিতরে শিক্ষা-বিস্তারেও কোম্পানী উদ্যোগী হয় নি। বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ ও কলকতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন সব পণ্ডিত ও মৌলবী সৃষ্টি করা, যারা ইংরেজকে নিজেদের আইন বুঝিয়ে দিতে

পারবে। ইংরেজী শিক্ষাদানে কর্ত্তৃপক্ষ মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করত না। তারা হয়ত ভাবত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হলে তাদের যথেচ্ছ শাসন অচল হয়ে যাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও বিলাতে যখন এই বিশ্বাস ছিল যে, জনসাধারণ শিক্ষালাভ করলে রাজদ্রোহী হয়ে উঠবে তখন কোম্পানীর লোকেরা যে ওরূপ মনে করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তখন ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী ইউরোপকে মথিত করে তুলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার লাভ করলে ভারতবাসীরাও ঐসব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে—এ আশঙ্কাও হয়ত তাদের মনে ছিল। যাহোক্, ১৮১৩ সালে নূতন করে সনন্দ প্রাপ্তির সময় বিলাতের কর্ত্তারা স্থির করলেন—প্রতি বছর কোম্পানীকে ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি না ইংরেজী—কিরূপ শিক্ষার জন্য এই টাকা ব্যয় করা হবে তার কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম করে দেওয়া হ'ল না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮২৩ সালের পূর্ব্বে এ অনুযায়ী কাজও কিছু করা হয় নি। এই সাল থেকে প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হতে থাকে। কোম্পানীর সদিচ্ছা কিরূপ ছিল, এ থেকেই তা বেশ বোঝা যায়।

দেশের শিল্প বাণিজ্য কোম্পানী প্রায় একচেটিয়া করে ফেলেছে। বস্ত্র-শিল্পের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হ'ল একটি কারণে। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা টাকা দাদন দিয়ে তাঁতীদের দ্বারা কাপড় বোনাত। তাদের চাহিদা যত বাড়তে লাগল তাঁতীদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও তত বেড়ে চল্‌ল। প্রবাদ আছে, তাঁতীরা এতই উৎপীড়িত হয়েছিল যে, নিজেরাই নিজেদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেল্‌লে! ওদিকে ইংলণ্ডের বাজারে বাংলার বস্ত্রের আমদানী বেড়ে গেল। বাংলার ঢাকাই মস্‌লিন আজ গল্পের বস্তু। তখন কিন্তু মস্‌লিন দেখে ইউরোপবাসীরা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে যেত।

বিলাতে এসময় নূতন ধরণের চরখা ও তাঁত আবিষ্কৃত হয় ও বস্ত্র-শিল্পের যাদুমন্ত্রও সে-দেশবাসী শিখ্‌তে থাকে। ধনিকগণ সরকারের অনুমতি নিয়ে বস্ত্র-শিল্প চালু করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু ভারত থেকে আমদানী করা কাপড়ের তুলনায় এ যে খুবই নিকৃষ্ট। কি দামে কি সৌষ্ঠবে কোন দিক দিয়েই প্রতিযোগিতায় এর টিকে ওঠা ভার। তখন বিলাতের কর্ত্তারা ভারতীয় বস্ত্রের উপর অত্যুচ্চ হারে শুল্ক বসালেন। এই শুল্ক ক্রমে এত চড়ে গেল যে, প্রতিখণ্ড কাপড়ের দাম নীট মূল্যের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ তিন গুণ পর্য্যন্ত হয়েছিল! এরূপ গর্হিত উপায়ে ভারতের বস্ত্র-শিল্পের টুঁটি চেপে মারা হয় তখন। ১৮৩০ সালে একজন দুঃখ করে সংবাদপত্রে লিখলেন, ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলার বস্ত্র-শিল্পের এমন দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়েছে যে, বাংলায় প্রচুর পরিমাণ বিলাতি বস্ত্র আমদানী হতে সুরু হয়েছে! তাদেরই স্বদেশবাসীর চেষ্টায় এই উন্নতিশীল বস্ত্র ব্যবসায়টি যখন মাটি হবার উপক্রম হ'ল তখন কোম্পানীর লোকেরা কিন্তু বসে রইল না, তারা এদেশ থেকে প্রচুর তূলা বিলাতে রপ্তানি করতে লাগল। নীল চাষও তখন তারা ব্যাপকভাবে আরম্ভ করলে এখানে। প্রসিদ্ধ পাদ্রী উইলিয়ম কেরী স্ত্রীপুত্রসহ এদেশে এসে মালদহের অন্তর্গত মদ্‌নাবতীর নীলকুঠিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে চাক্‌রী নিয়েছিলেন। শ্রীরামপুর ছাপাখানার জন্ম এই মদ্‌নাবতীতে।

উইলিয়ম কেরীর কথা থেকে আর একটি বিষয় এখানে এসে পড়ল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে যে প্রভুত্ব স্থাপন করেছে তার কোন ভাগীদার সে যেমন সহ্য করতে পারত না, তেমনি এদেশীয় লোকদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিতে কেউ কোন রকম ব্যত্যয় ঘটাবার চেষ্টা করে এও সে চাইত না। কারণ কোম্পানীর স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা ছিল এরূপ কার্য্যে জনসাধারণ তাদের উপর বিরূপ হয়ে

পড়বে। তাদের ক্ষমতা তখনও এতটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি যে, তারা নির্বিচারে এরূপ করতে দিতে পারে। ইংরেজী শিক্ষাদানে কোম্পানীর বিমুখতার মূলেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণ ছাড়া এরূপ পরোক্ষ সামাজিক কারণও যে না ছিল এমন নয়। কোম্পানী সে যুগে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস, পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করলে তাদের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ভীষণ ক্ষতি হবে। কিন্তু পাদ্রীরা নাচার। নানা ছল করে তারা এদেশে আস্ত। কোম্পানী টের পেলেই কিন্তু জাহাজে করে তাদের স্বদেশে চালান করে দিত। উইলিয়ম কেরী খুব কৌশল করে দিনেমার জাহাজে স্ত্রীপুত্রসহ কলকাতায় এসে পৌঁছেন ১৭৯৩ সালে! নানারূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরে তিনি শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন এর দু'বছর পরে। কল্‌কাতার গীর্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ দেবার অনুমতিও তাঁকে নিতে হয়েছিল সরকারের কাছ থেকে! যা হোক, পাদ্রীদের উপর কোম্পানীর বিরাগ শক্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়।

কলকাতার মাদ্রাসা ও কাশীর সংস্কৃত কলেজের কথা আগে উল্লেখ করেছি। রাজনৈতিক কারণে এ দুয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রাচ্য-বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্ররূপেও এ দুটি পরে পরিণত হ'ল। সার্ উইলিয়ম জোন্স ইংরেজী ১৭৮৪ সালের জানুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির মুখপত্র হ'ল 'এশিয়াটিক রিসার্চ্চেস'। এর বিশ খণ্ড পর পর বার হয়। এ পত্র পরে 'এশিয়াটিক সোসাইটির জার্ন্যাল' নাম গ্রহণ করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য, সভ্যতা সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালন এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্দেশ্য। 'এশিয়াটিক রিসার্চ্চেস্' পত্রিকায় এসব গবেষণা প্রকাশিত হ'ত। সার্ উইলিয়ম

জোন্সের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ এই গবেষণা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। জোন্স বাদে গ্ল্যাডউইন, উইন্‌ফ্রেড, উইলকিন্স, প্রিন্সেপ, কোলব্রুক, হটন, উইলসন প্রমুখ প্রাচ্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে ক্রমে আত্মনিয়োগ করেন। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস্' পাঠ করলে এঁদের অনুসন্ধান কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তা বেশ বোঝা যায়। বহু দুষ্কৃতির জন্য হেষ্টিংসের শাসন কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত, কিন্তু তাঁর একটি সুকৃতির কথা আমাদের অবশ্যস্বীকার্য্য। তিনি সার্ চার্লস উইলকিন্সকে গীতার ইংরেজী অনুবাদে সহায়তা করেছিলেন। এইরূপে গীতার মহিমা বিদেশে প্রথম প্রচারিত হতে পায়। সংস্কৃত সাহিত্যের উপর তাঁর খুব দরদ ছিল। জার্ম্মানকবি গ্যেটে শকুন্তলার অনুবাদের অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখনও সাধারণ ইংরেজের মনে বিজেতা-বিজিতবোধ বা সাম্রাজ্যবোধ জাগে নি। কাজেই তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা স্বীকার করতে পেরেছিলেন, এবং তাঁদের কেউ কেউ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এর চর্চ্চায় এমনিভাবে মনঃসংযোগ করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তারাই। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আগ্রহাতিশয়ে ১৮০০ সালে এ কলেজটি স্থাপিত হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে-সব যুবক সিবিলিয়ান বিলাত থেকে নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আস্‌ত—আর্বি, ফার্সি ও সংস্কৃত এবং এদেশীয় ভাষা-সমূহের সঙ্গে তাদের ওয়াকিবহাল করা। কিন্তু এর একটি ফল হয়েছিল খুবই শুভ। ওদিকে দেশের নানা স্থান থেকে পণ্ডিত সংগ্রহ করে অধ্যাপনা কার্য্যে নিয়োজিত করা হ'ল। বাংলা, মরাঠী, উড়িয়া, হিন্দুস্তানী নানা ভাষাভাষী পণ্ডিতদের সমাবেশ হ'ল কল্‌কাতায়। সরকারী সাহায্যে দেশ-ভাষায় নানা পুস্তক প্রকাশিত হতে লাগল। সংস্কৃত ও

বাংলার অধ্যাপক হলেন পূর্ব্বোল্লিখিত পাদ্রী উইলিয়ম কেরী। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বহু বিদ্বজ্জন ছিলেন তাঁর সহকারী। বাংলা সাহিত্যে এঁদের দান আজ সর্ব্বজনবিদিত। এঁদের কেউ কেউ বাংলা গদ্যের প্রথম লেখক বলেও পরিচিত। উইলিয়ম কেরী ছিলেন আবার শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এখানেও প্রাচ্য ভাষার আলোচনা চল্‌ত খুব। একদিকে যেমন এরূপ হ'ল অন্যদিকে ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ প্রাচ্য ভাষাসমূহের মহিমা অনুভব করতে সক্ষম হলেন। রাজকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চাও অটুট রেখেছিলেন। সুপণ্ডিত সার্ জন কোলব্রুক এইরূপ একজন সিবিলিয়ান। পাশ্চাত্যের পক্ষে প্রাচ্যের জ্ঞান গরিমা উপলব্ধি করা এঁদের মারফত বিশেষ করে সম্ভব হ'ল। আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর নিকটও তার নিজস্ব সম্পদ অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে উদ্ভাসিত হ'ল।

নানা দিক থেকে বাংলা ভাষারও বনিয়াদ পাকা হয় এ সময়ে। উইলকিন্স সাহেব হুগলীতে সীসার পাতে ছেনি কেটে বাংলা হরফে বই ছাপবার সুবিধা করে দেন। এ বিষয়ে তাঁর সহকারী হলেন পঞ্চানন কর্ম্মকার। হল্‌হেড ইংরেজী ভাষায় প্রথম বাংলা ব্যাকরণ লিখলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের নির্দ্দেশে হেনরি পিট্‌স ফরষ্টার সর্ব্বপ্রথম বাংলায় দেশীয় আইন সংকলিত করেন। এ আইন কর্ণওয়ালিশ কোড নামে অভিহিত। উইল্‌কিন্সের সহকারী পঞ্চানন কর্ম্মকার শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের বাংলা হরফের ছেনি কাটায়ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাংলার ছাপাখানার ইতিহাসে উইলকিন্স ও কেরীর সঙ্গে পঞ্চাননকেও আমাদের স্মরণ করতে হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের নানা দিকে তারা অভিযান চালায়। মাদ্রাজ তাদের করতলে। দক্ষিণে মহীশূরে টিপু

সুলতান তখন ইংরেজের ঘোর বিরোধী। টিপুর বিরোধিতা তখন এতই চরমে উঠে যে, নেপোলিয়ন তাঁকে ইংরেজের যোগ্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে 'ব্রাদার টিপু' বা ভাই টিপু সম্বোধন করে পত্র লিখেছিলেন! দক্ষিণ-পশ্চিমে মরাঠা শক্তিও প্রায় অস্তমিত। কোম্পানী পেশোয়া পক্ষ নিয়ে মরাঠা শক্তির মূলে কঠোর আঘাত দিচ্ছে। ১৮১৭-১৮ সালের শেষ মরাঠা যুদ্ধে মরাঠা শক্তি বিলুপ্ত হ'ল এবং সমগ্র পশ্চিম ভারত পুরোপুরি ইংরেজের অধীন হয়ে পড়ল। পঞ্জাবে রণজিৎ সিংহ শিখ শক্তি সংহত করে খুবই প্রবল হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বরাবর ইংরেজের বন্ধুই ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পরে ১৮৪৯ সালে পঞ্জাব ইংরেজের অধীন হয়।

কিন্তু এ পরবর্ত্তী কালের কথা। নিজামের সাহায্যে টীপু সুলতানকে পরাজিত করেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করে। বাংলায় কিন্তু এর বহু পূর্ব্বেই ইংরেজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে সমাজ-সংরক্ষণের তাগিদে বাংলার জনকয়েক ধনী-মানী, হিন্দু-মুসলমান একযোগে কোম্পানীর হস্তে দেশ-শাসনের ভার তুলে দিয়েছিলেন, পঞ্চাশ বছরের অবিরাম চেষ্টার ফলে তা অনেকটা সুসিদ্ধ হয়েছে। ধন-প্রাণ, মান-সম্মান বজায় রেখে সমাজে শান্তিতে বসবাস করবার এই যে বাঙালীর আগ্রহ তার জন্য তাকে কম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নি। স্বদেশের শাসন ভার বিদেশীর হাতে তুলে দিতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্প-বাণিজ্যও বিলুপ্ত হ'ল। বিদেশীর নির্ম্মম কর আদায়ে শেষ শক্তিটুকু পর্য্যন্ত চলে গেল। শান্তি শৃঙ্খলার কতখানি ব্যাঘাত ঘটলে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ও ধনপ্রাণ নিয়ে বসবাসের অধিকার থেকে কতখানি বঞ্চিত হলে লোকে এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারে আজকার দিনে তা কল্পনারও অতীত। কোম্পানীর ভুজাশ্রয়ে বহুকাল ইপ্সিত, বহুজন বাঞ্ছিত শান্তি বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ভূমির

বন্দোবস্ত আগে পাঁচশালা, পরে দশশালা ও শেষে চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় এসে পাকা হয়ে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে কত ভূস্বামীর উত্থান হ'ল, কত ভূস্বামীর পতন হ'ল তার ইয়ত্তা নেই। পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক শ্রেণীর স্থায়ী ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করে বাংলা দেশে স্থায়ী শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন। সে কালে যত বড় লোক উদ্ভূত হয়েছিল তার অধিকাংশই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল। ইংরেজের আশ্রয়ে এক শ্রেণীর বাঙালী আগেই বর্দ্ধিত হয়ে উঠছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল তারাও অনেকটা ভোগ করতে পায়। এই শ্রেণীর বাঙালী বড়লোকদের সঙ্গে কোম্পানীর বড় বড় চাকুরেদের বেশ দহরম মহরম ছিল। সামাজিক মেলামেশা এদের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। ইংরেজেরা কোন কোন ভারতীয় রীতি গ্রহণেও বাধা বা সংকোচ বোধ করত না। লর্ড ক্লাইভ মহারাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী হামেশা যেতেন। এযুগে লর্ড লিন্‌লিথ্‌গোর বা ওয়াভেলের পক্ষে কল্‌কাতার বা দিল্লীর কোন বড় লোকের বাড়ীতে হামেশা যাতায়াত কল্পনায়ও আসে না।

ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাংলায় যে শ্রেণীর বড় লোকের সৃষ্টি হ'ল তারা ইংরেজকে পরিত্রাতা বলেই গণ্য করতে লাগল। কোনদিন ইংরেজের স্বার্থে ও তাদের স্বার্থে যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে এটা তারা তখন ধারণাই করতে পারেনি। তখন কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্তদের মধ্যেও এক দল নূতন বড় লোকের সৃষ্টি হ'ল। তারা সরকারে ও সওদাগরী আপিসে চাক্‌রি করে সম্পত্তি করলে। ইংরেজদের সম্পর্কে এসে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার মহিমাও কিছু কিছু বুঝলে। রাজা রামমোহন রায় ভূস্বামীর সন্তান হলেও ক্রমে এশ্রেণীরই মুখপাত্র হয়ে পড়েন।

———

মুক্তিকামী রামমোহন

যে সমাজে রামমোহন রায়ের জন্ম তাকে আমরা সে-যুগের মধ্যবিত্ত সমাজ বল্‌তে পারি। তাঁর জন্ম হয় ১৭৭৪ সালে। এর ত্রিশ বছরের মধ্যে দীর্ঘকাল অনাচার অত্যাচার সহ্য করার পর এই সমাজ আবার দৃঢ়ীভূত হবার সুযোগ পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমির মালেকানা স্বত্ব স্থির হলে মধ্যবিত্ত বাঙালীরা তা থেকে লাভবান হতে থাকে। জমিদার-সরকারে ও সওদাগরি আপিসে চাকুরি করেও এরা বেশ দু' পয়সা রোজগার করে। কোম্পানীর নিমক মহালে এজেণ্টের পদ নিয়ে বহু মধ্যবিত্ত বাঙালী লক্ষপতি হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর নিমক মহালে চাকরি করে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৮১৪ সাল পর্য্যন্ত ঢাকা-জালালপুর, রামগড়, রংপুর প্রভৃতি স্থানে সেরেস্তাদারী করে রামমোহন পর বছরের গোড়ার দিকে যখন কলকাতায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করলেন তখন তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। দেশী বিদেশী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর খুবই প্রতিপত্তি। তিনি ইতিমধ্যে শ্রীরামপুরের কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের সাহায্যে গ্রীক, লাটিন, হিব্রু শিখে নিয়েছেন। বলা বাহুল্য, ইংরেজী ভাষায় এর মধ্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি জন্মেছে। ফার্সি ও সংস্কৃত যৌবনেই তিনি আয়ত্ত করেন।

কলকাতায় বসতি স্থাপনের পূর্ব্ব বছর, ১৮১৪ সালের ১০ই এপ্রিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরোবার কথা ছিল। এজন্য ১৮১৩ সালে কোম্পানীকে নূতন সনন্দ-দান সম্বন্ধে বিলাতে আলোচনা চলে ও আইন পাস হয়ে যায়। রাজ্য শাসনে ও ব্যবসা পরিচালনায়

কোম্পানীর এতদিন একচেটিয়া অধিকার ছিল। এবারে কতকগুলি শর্ত্তে অন্যকেও ভারতবর্ষে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হ'ল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যতিরেকে দেশ-শাসনের যাবতীয় ভারই কোম্পানীর হস্তে রইল। আর দুটি বিষয় যা স্থির হ'ল তার সঙ্গে ছিল আমাদের শুভাশুভের ঘনিষ্ঠ যোগ। এত দিন কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্যে পাদ্রীদের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে কোনরূপ উৎসাহ দেওয়া হত না। বরং তাদের এ কার্য্যে নানারূপ বাধারই সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবারে ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারে সব বাধা প্রকাশ্যভাবে তুলে দেওয়া হ'ল। সরকারী যাজক-বিভাগ খুলে একজন বিশপ ও দু'জন আর্চ্চডিকন সরকারী অর্থে পোষণেরও ব্যবস্থা হ'ল। দ্বিতীয় বিষয়টি হ'ল, ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ। এ দুটি ব্যাপারে আজ হয়ত মোটেই বিস্ময়ের উদ্রেক হবে না। কিন্তু তথনকার দিনে এ খুব নূতন কার্য্য বলেই সাধারণের নিকট অনুভূত হয়েছিল। ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য এদেশে আগমনেচ্ছু লোকদের উপর কোম্পানীর বাধা-নিষেধ রহিত হয়ে গেল।

হিন্দু সমাজ ঘোর সনাতনপন্থী, নূতনের আহ্বান তার কর্ণ কুহরে প্রথমে প্রবেশ করে নি। নূতনকে নিজের করে নেবার শক্তি সে বহু দিন হারিয়েছে। ওদিকে খ্রীষ্টান মিশনরীরা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি বহু কুরীতি আর বহু দেবদেবীর পূজার্চ্চনা বিধি দেখে হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রচারে কায়মনে লিপ্ত হলেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের অন্ধকার থেকে খ্রীষ্টতত্ত্বের আলোতে সকলকে নিয়ে যাওয়া। শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের নেতৃত্বে এই কার্য্যভার পরিচালনা করে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেরীর শিক্ষার ফলে সিভিলিয়ানদের ভিতরেও উক্ত মনোভাব বদ্ধমূল হতে লাগ্‌ল। পূর্ব্ব

শতাব্দীতে ইংরেজ কর্ম্মচারীরা যেমন এদেশীয়দের আপন করে নিতে পেরেছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষালব্ধ সিবিলিয়ানদের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হ'ল না। ইংরেজ ও ভারতবাসী এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের ভাব এ সময় থেকে সুরু হয় বলা চলে। নূতন সনন্দে যখন স্পষ্ট করে ধর্ম্মপ্রচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হ'ল তখন খ্রীষ্টান মিশনরীদের আর কোন বাধাই রইল না। তাদের কার্য্য এর পর পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হ'ল। রামমোহন রায় সুশিক্ষিত। নানা শাস্ত্র আলোচনা করে হিন্দু ধর্ম্মের মূল কথা জেনে নিয়েছেন। স্বদেশবাসীদের গোড়ামি ও দৈন্যদশা তাঁকে যেমন ব্যথিত করলে, খ্রীষ্টান মিশনরীদের অযথা আক্রমণ তাঁকে তার চেয়ে কম পীড়া দিলে না।

কয়েক বছর পূর্ব্বেই ১৮০৪ সালে রামমোহন একেশ্বরবাদ সমর্থন করে 'তুহ্ফাৎ-উল্-মুয়াহ্দিন' নামে একখানা ফার্সি পুস্তক লেখেন। এবারে কল্কাতায় বসবাস আরম্ভ করেই (১৮১৫ সালে) তিনি বেদান্তের ভাষ্য লিখ্লেন। হিন্দু শাস্ত্রের সারতত্ত্ব বেদান্ত গ্রন্থ। বেদান্ত একেশ্বরবাদের সম্পূর্ণ পরিপোষক। হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম সাধন এই একেশ্বরবাদ। পৌত্তলিকতার স্থান এতে নেই। সনাতনী হিন্দুগণ তাঁর এ মতবাদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করলেন। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বহু দেবতার পূজার জন্য হিন্দুধর্ম্মের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল। এবারে রামমোহন রায়ের শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তারাও অনেকটা নিরস্ত হতে বাধ্য হ'ল। বস্তুতঃ রামমোহন খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ব বা তিন ভগবানের উপাসনার ঘোর সমালোচনা করে তারা যে হিন্দু পৌত্তলিকতার নিন্দাবাদের অনধিকারী তাই প্রমাণ করে দিলেন। একদিকে সনাতনী হিন্দুরা ও অন্যদিকে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা তাঁর উপর খড়্গাহস্ত হ'ল, কিন্তু কিছুতেই তিনি দম্বার পাত্র নন্। তিনি পূর্ণ স্বাদেশিক। হিন্দুত্বের দৃঢ় ভিত্তির উপরে

দাঁড়িয়ে সকলের সঙ্গে লড়লেন। ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা' বেদান্ত আলোচনার জন্য সর্ব্বপ্রথম সংঘবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই আত্মীয় সভাই ১৮২৮ সালে ব্রহ্মসভা বা ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয়। পাদ্রীদের আর এক দফা আক্রমণ ছিল হিন্দুদের সামাজিক কুরীতিগুলির উপরে। রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন, প্রগতিশীল হিন্দুগণ আত্মসংগঠন ও শুদ্ধিতে সম্পূর্ণ অবহিত। মধ্যযুগের কুসংস্কার সমাজ দেহকে কলুষিত করলেও তা একেবারে অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে যায় নি। রামমোহন রায়ের ঘোর প্রতিবাদে প্রগতিশীল সম্প্রদায়েরও সমর্থন পেয়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত আন্দোলনে সাহিত্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হ'ল।

রামমোহনের কলকাতায় বসতি স্থাপনের সাত-আট বছরের মধ্যেই এখানে সংস্কৃতিমূলক নানা প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এসময়কার দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ভারতবাসীদের চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও দেশীয় ভাষাসমূহে সংবাদপত্র প্রকাশ। দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করেই রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন সুরু হয় এবং তাঁর স্বাধীনতা প্রীতি সাধারণের গোচরে আসে। ১৮১৮ সালের মে-জুন মাসে বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম দু'খানা বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশনের তত্ত্বাবধানে পাদ্রী মার্শম্যানের পুত্র জশুয়া ক্লার্ক মার্শম্যান, 'বাংলা গেজেট' প্রকাশিত হয় কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ও হরচন্দ্র রায়ের সহযোগে বাংলা গেজেট ছাপাখানা হতে। রামমোহনের বন্ধু সিল্ক বাকিংহামের ইংরেজী 'ক্যালকাটা জার্ন্যাল' ১৮১৮ সালের ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হ'ল। রামমোহন রায়ের

রামমোহন রায়

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

তত্ত্বাবধানে 'সম্বাদ কৌমুদী' বার হয় ১৮২১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। তিনি এতে নিয়মিতভাবে প্রবন্ধ লিখতেন। এ প্রবন্ধগুলির ইংরেজী অনুবাদ ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশ করা হত। তখন ফার্সি সমগ্র ভারতের আদালতের ও শিক্ষিত জনের ভাষা। রামমোহন রায় 'মিরাৎ-উল্-আখ্বার' নামক ফার্সী সংবাদপত্র সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে। বাংলা 'সম্বাদ কৌমুদী' ও ফার্সী 'মিরাৎ-উল্-আখ্বার'-এ রামমোহন নানা বিষয়ে তাঁর স্বাধীন মতামত নির্ভীকভাবে প্রচার করতে লাগলেন।

কিন্তু এরূপ স্বাধীন মতামত প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের বেশীদিন বরদাস্ত হ'ল না। তারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে মনস্থ করল। তাদের এ চেষ্টা নূতন নয়। এদেশের প্রথম সংবাদপত্র, অবশ্য ইংরেজী, ১৭৮০ সালের ২৯শে জানুয়ারী জেম্স অগষ্টাস হিকি সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট'। প্রকাশের পর দু'বছর যেতে না যেতেই এ কাগজখানাকে কোম্পানী বন্ধ করে দেয়। কারণ, সরকারের মতে হেষ্টিংসের স্ত্রী ও পদস্থ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য এতে স্থান পেয়েছিল। এর পর ইণ্ডিয়া গেজেট, ক্যালকাটা গেজেট, হরকরা প্রভৃতি আরও কয়েকখানা কাগজ প্রকাশিত হয়। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এসব কাগজের উপর মোটেই প্রসন্ন ছিলেন না। কেননা, এসবে শাসন-ব্যবস্থার ও রাজ্য-জয়ের গর্হিত উপায়গুলির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হ'ত। একারণ ১৭৯৯ সালের মে মাসে লর্ড ওয়েলেস্লী সর্ব্বপ্রথম এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করলেন। নিয়ম হ'ল, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দ্বারা পরীক্ষিত না হয়ে কোন সংবাদ এমন কি বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা চল্‌বে না। সতর বছর চলবার পর বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ সালের ১৯শে আগষ্ট এ আইন তুলে দিলেন। তিনি এর পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি

নিয়ম বেঁধে দিলেন যা অমান্য করলে সম্পাদকদের জবাবদিহি করতে হত। কিন্তু কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতি ছিল এরূপ যে, নিরপেক্ষ সাংবাদিক তার কঠোর সমালোচনা না করেই পারতেন না। ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক সিল্ক বাকিংহাম বিরুদ্ধ সমালোচনা করে সরকারের কুনজরে পড়লেন। অস্থায়ী বড়লাট জন এডাম সুপ্রিম কোর্টের সম্মতি নিয়ে ১৮২৩ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক কড়া প্রেস আইন জারি করেন। তখন কোন আইন বিধিবদ্ধ করতে হলে সুপ্রিম কোর্টেরও সম্মতি নিতে হত। এর পরে বাকিংহামকে জোরপূর্ব্বক স্বদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল! আইনে এই নিয়ম হ'ল যে, কাগজ বার করবার পূর্ব্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হতে লাইসেন্স বা অনুমতি নিতে হবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হলফ করে সেই হলফনামা গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠালে তবে লাইসেন্স মিল্‌বে। কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ তার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব্ব হতেই সম্পাদককে দিয়ে রাখা হত। এসব সত্ত্বেও আইনবিরুদ্ধ বিষয়ের আলোচনা থাকলে কাগজ বন্ধ করে দেওয়ারও ব্যবস্থা হ'ল।

রামমোহন এরূপ আইন মেনে নিয়ে সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে রাজী হলেন না। তিনি এর প্রতিবাদে মিরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। ১৮২৩, ৪ঠা এপ্রিল তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় এই মর্ম্মে লিখ্‌লেন,—

"......এ অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সঙ্গে এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করলাম। বাধাগুলি এই—

"প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ

হলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দারোয়ান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়ে এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া দুরূহ; এবং আমার বিবেচনায় যা নিষ্প্রয়োজন সে কাজের জন্য নানা জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ-আদালতের দুয়ার পার হওয়াও আমার পক্ষে কঠিন। কথায় আছে,—'যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, কোন অনুগ্রহের আশায় তাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

"দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া, সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই যার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করবার মত বে-আইনী ও গর্হিত কাজ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করবার অসম্মানভাজন হবার পরও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হতে পারে এ আশঙ্কার জন্য সে ব্যক্তিকে অপদস্থ হতে হবে, আর এই কারণে তার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হবে। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলতে গিয়ে তাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা গবর্ণমেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করলাম।—'হাফিজ! তুমি কোনঘেষা ভিখারী মাত্র, চুপ করে থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন'।"

রামমোহন রায় এই বলে পারস্য ও হিন্দুস্থানের পাঠকদের নিকট হতে বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু এতেই তিনি নিরস্ত হন নি। তিনি এ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করে দিলেন। তিনি সুপ্রিম কোর্টে ও বিলাতে রাজ-দরবারে প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। প্রথটিতে তাঁর সঙ্গে স্বাক্ষর করেছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রাজ-দরবারে যে

পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমান আমলে যথেষ্ট সম্মান ও কর্ত্তৃত্ব লাভ করলেও সমাজে নির্ব্বিঘ্নে ও শান্তিতে স্বাধীন মানুষের মত জীবন যাপন করা তখন সম্ভবপর ছিল না। ইংরেজ রাজত্বে তা সম্ভব হচ্ছে বলে এ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ হলে স্বাধীনতার মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে। রামমোহনের জীবিত-কালে তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি। তবে বেন্টিঙ্ক বড়লাট হয়ে এ আইনের বন্ধন অনেকটা শিথিল করে দেন।

রামমোহনের স্বাদেশিকতা ও স্বজাতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় ১৮২৮ সালের ১৮ই আগষ্ট জে-ক্রফোর্ডকে লিখিত একখানা পত্রে। হিন্দু মুসলমান স্বাক্ষরিত এক অভিযোগপত্র পূর্ব্ববছর বিধিবদ্ধ জুরী আইনের বিরুদ্ধে ক্রফোর্ডের মারফত পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। এইসঙ্গে ক্রফোর্ডকে লিখিত পত্রে রামমোহন বলেন যে, যে-আইন পাস হয়েছে তাতে খ্রীষ্টান জুরিগণ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের বিচারে নিয়োজিত হতে পারবেন, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান জুরিরা খ্রীষ্টানদের (এদেশীয় খ্রীষ্টানদেরও) বিচারে নিয়োজিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বৈষম্য হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। এরূপ বৈষম্য যদি চল্‌তে থাকে তবে, ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন একদিন উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয় যখন তারা একযোগে অন্যায় ও গর্হিত আইনগুলির বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লড়বে ও লড়ে তাতে জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্লণ্ড নয় যে, দু'চারখানা রণতরীতে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে সহজেই সায়েস্তা করা যাবে। ভারতবর্ষ যদি আয়ার্লণ্ডের এক চতুর্থাংশও উদ্যম ও আগ্রহ দেখায় তা হলে, সুদূরবর্ত্তী হলেও, তার ধনসম্পদ ও বিরাট্ জনবল নিয়ে সে যেমন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুকূল হয়ে

থাকতে পারে তেমনি আবার দৃঢ়চিত্ত শত্রু হয়েও তার ভীষণ ক্ষতির কারণ হতে পারবে।

রামমোহন কিন্তু ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে ইউরোপীয়দের সহযোগিতা মর্ম্মে মর্ম্মে কামনা করতেন। ১৮১৩ সালের সনন্দ বলে বহু ইংরেজ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে এদেশে আসতে লাগল। এদেশীয়দের মধ্যে ধর্ম্ম ও শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যেও বহু লোক এখানে এল। কিন্তু ভারতবাসী ও ইউরোপীয় এ দুই সমাজের মধ্যে যে সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল ও যার একান্ত প্রয়োজন, সরকারের অবিবেচনার ফলে তাতে ভাটা পড়বার উপক্রম হ'ল। ইউরোপীয়েরা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস না করায় ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় আগ্রহশীল হওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু, সরকারী ব্যবস্থায় প্রতিবছর কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেন্সন ও ব্যবসাদির জন্য বহু কোটি টাকা ভারতবর্ষের বাইরে চলে যেত। এর ফল ভোগেও ভারতবাসীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হত। এ কারণ তখন ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের জন্য কলকাতায় আন্দোলন উপস্থিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও তাঁর সহযোগী হন।

দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে রাজা উপাধিতে ভূষিত হয়ে রামমোহন ১৮৩০ সালের শেষে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর ইংলণ্ড গমনের উদ্দেশ্য যদিও ভিন্নপ্রকার ছিল তথাপি এ সময়ে তাঁর উপস্থিতি ভারতবর্ষের পক্ষে বড়ই শুভ হয়েছিল। স্বাধীন দেশে বসে তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশে যেমন সুবিধা হয়েছিল এদেশে বসে ততটা সুবিধা নিশ্চয়ই হত না। তিনি সর্ব্বদেশের পূর্ণস্বাধীনতার পক্ষপাতী। ফরাসী বিপ্লবের ফলে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণী জগতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে স্বাধীন ফ্রান্সের ত্রিবর্ণ পতাকাকে প্রথম সুযোগেই

সম্মান দেখাতে রামমোহন ব্যগ্র হয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি পায়ে যে আঘাত পান জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তার জের তাঁকে ভোগ করতে হয়। ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা প্রচেষ্টা, ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বাধীনতা লাভ, খাস ইংলণ্ড থেকে ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদূরণের চেষ্টা—সকল ব্যাপার সম্বন্ধেই তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, ইংলণ্ডে তখন সবে মাত্র রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তারা এর কিছু আগেও পার্লামেণ্টের বা মিউনিসিপালিটির সভ্য হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকারে চাকরি করতেও তারা পারত না। এ সময় ইংলণ্ডে ক্রীতদাস প্রথা নিরোধক আইন, ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদূরণ আইন যেমন বিধিবদ্ধ হয়, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তেমনি নূতন করে সনন্দ লাভ করে। প্রথমোক্ত কারণ দুটিতে ইংরেজ জাতির উপর শ্রদ্ধা রামমোহনের হয়ত বেড়ে থাকবে, কিন্তু স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য পালনে যথোচিত আগ্রহ প্রকাশ করতে তিনি কসুর করলেন না।

রামমোহন স্বদেশে খুবই খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বেই ওখানকার শিক্ষিত জনও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু জেনে নিয়েছিলেন। তিনি বিলাতে পৌছে নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিলেন ও বিস্তর সম্মান লাভ করলেন। সনন্দ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টারী কমিটি রামমোহনকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করেন। যে কারণেই হোক, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষ্য না দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত লিখে পাঠালেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থা ও ভারত-বাসীদের যাবতীয় সমস্যার কথা তিনি এতে উল্লেখ করেছিলেন। কোন কোনটি এখনও, এই শতাধিক বর্ষ পরেও, কার্য্যে পরিণত হয় নি।

তিনি লিখলেন, ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবার ফলে চল্লিশ বছরের মধ্যে জমিদার শ্রেণী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রজাদের কর-দান ব্যবস্থা সুনির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় তাদের কোন উপকারই হয় নি। প্রজাসাধারণের উপকারের জন্য জমিদারের করভার লাঘব করে তাদেরও দেয় খাজনা হ্রাস করে দেবার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। এজন্য সরকারের রাজস্বের যে ঘাট্‌তি হবে তা, বিলাস দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসিয়ে ও রাজস্ব আদায়ের জন্য উচ্চ বেতনে ইউরোপীয় নিযুক্ত না করে অল্প বেতনে ভারতীয় নিযুক্ত করে পূরণ করা যাবে। আদালতে ও আপিসে ফার্সির পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্ত্তন, জুরি দ্বারা বিচার, দেওয়ানী আদালতে এসেসর নিয়োগ, জজ ও রেভিনিউ কমিশনারের পদ এবং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য স্বতন্ত্র করা, ভারতে ফৌজদারী আইন প্রণয়ন, আইন প্রণয়ন কালে গণ্যমান্য ভারতীয়দের পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ সম্পর্কে তিনি অনুকুল মত প্রকাশ করলেন। পার্লামেণ্টে রামমোহনের এসব মত কিছু কিছু গৃহীতও হ'ল।

রামমোহন ১৮৩৩ সালে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রিল কল্‌কাতার টাউন-হলে যে জনসভা হয় তাতে নব্য দলের মুখপাত্র স্বরূপ রসিককৃষ্ণ মল্লিক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, নূতন চার্টার বা সনন্দ বহু বিষয়ে জঘন্য হলেও এতে ভারতের পক্ষে যা' কিছু শুভকর বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে তা 'রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে। রামমোহন ইংলণ্ড-বাসীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন—ভারতীয়েরা নিজেদের বিষয় ভাব্‌বার ও নিজেদের কাজ করবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রামমোহনের চেষ্টা ও কার্য্য যাচাই করে দেখ্‌লে তাঁকে ভারতের মুক্তি সাধনায় অগ্রদূতের সম্মান অবশ্যই দিতে হবে।

ইংরেজী শিক্ষা ও বাঙালীর রাষ্ট্র-চেতনা

১৮১৩ সালের পর থেকে বহু ইংরেজ মিশনরী ও হিতৈষী ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে এদেশে আগমন করতে সুরু করে,—পাশ্চাত্য রীতিতে শিক্ষা বিস্তারেও তারা মন দেয়। ১৮১৪ সালে রবার্ট মে নামে এক সাহেব পাদ্রী এদেশে এসে চুঁচুড়া অঞ্চলে বহু স্কুল-পাঠশালা স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে দেশীয়দের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল, বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও ফার্সি চর্চ্চারও নানা আয়োজন ছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বাঙালীরা তখন অনুভব করতে থাকে। কাজে কর্ম্মে নিয়ত ইংরেজের সংস্পর্শে তাদের আস্‌তে হত। কাজেই চলনসই রকমের ইংরেজী জানা তখন খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে ইংরেজী ভাষা শেখা একান্ত প্রয়োজন—মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের মনেই এ কথা প্রথম জাগে। তাঁহারই প্রেরণায় দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্ত্তীকালের বিচারপতি অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ) সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এড্‌ওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের নিকট এইরূপ প্রস্তাব করেন। ঈষ্ট মহোদয় অতঃপর ১৮১৬ সালের ১৪ই মে নিজ ভবনে মান্যগণ্য হিন্দুদের এক সভা আহ্বান করলেন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও এ সভায় উপস্থিত হলেন। পণ্ডিতদের মুখপাত্র হয়ে একজন সার্ ঈষ্টকে শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতীকস্বরূপ একটি পুষ্প উপহার দেন! তাঁরা একবাক্যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য একটি কলেজের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন। তাঁরা কিন্তু রামমোহন রায়ের উপর ভয়ানক চটা। এসম্পর্কে তাঁর নাম উল্লিখিত হলে তাঁরা তাঁর

সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখ্‌তেই রাজী হলেন না। কিন্তু তাঁরা তখন বোঝেন নি, তাঁরা যে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তার শিক্ষায় পনর বছরের মধ্যে এমন সমাজ বিপ্লব আরম্ভ হবে যা দেখে স্বয়ং রামমোহন রায়ও বিচলিত হবেন। পরবর্ত্তী সভায় (২১শে মে) কুড়িজন ভারতীয় ও দশজন ইয়োরোপীয়কে নিয়ে কলেজ স্থাপনের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হ'ল এবং স্থির হ'ল যে, সার্‌ হাইড ঈষ্ট বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসকে এ প্রস্তাব অবিলম্বে জ্ঞাপন করবেন। কিন্তু পরে প্রকাশ, সরকারের ইচ্ছানুসারে রাজকর্ম্মচারীরা অতঃপর এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ যোগ রাখ্‌তে পারবেন না! ঈষ্ট প্রমুখ ব্যক্তিগণ তথাপি ব্যক্তিগতভাবে কমিটিকে পরামর্শ দিতে সম্মত হলেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও এদেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাদানে কিন্তু কিন্তু করছিলেন। যা হোক্‌, কয়েক মাসাবধি হিন্দুদের অবিরত চেষ্টায় এবং কলকাতার বিখ্যাত হিন্দু পরিবারগণের প্রচুর অর্থ সাহার্য্যে ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী ৩০৪নং চিৎপুর রোডস্থ গোরাচাঁদ বসাকের গৃহে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইংরেজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষা শেখারই ব্যবস্থা হ'ল এখানে।

রাজা রামমোহন রায় কিন্তু এর কিছু পরেই নিজে একটা ইংরেজী স্কুল পরিচালনা করতে সুরু করেন। তিনি যে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা আগেই পেয়েছি। ১৮২৩ সালে যখন নূতন নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয় তখন তিনি ভারতীয়দের পক্ষে পাশ্চাত্য রীতিতে ইউরোপীয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে এক খানা পত্র লেখেন। রামমোহনের প্রস্তাব তখন গ্রাহ্য হয়নি বটে, কিন্তু বার বছর যেতে না যেতেই ১৮৩৫ সালে গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে মনোযোগী হন। কিন্তু এর পূর্ব্বেই বাংলায় এমন একদল যুবকের

আবির্ভাব হ'ল যাঁরা সর্ব্বপ্রথম নিয়মিতভাবে ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে ধর্ম্ম ও সমাজের প্রচলিত বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁদের মতবাদের সম্মুখে রামমোহনের প্রগতিশীল কার্য্যাবলীও ম্লান হয়ে গেল। সত্য কথা বল্‌তে কি, রামমোহনও বিপ্লবী কার্য্যকলাপের জন্য তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। রামমোহন ধর্ম্মকে ভিত্তি করে সব কাজ করতে চেষ্টা করেছেন, আর এই নব্যদল ধর্ম্মকেই অগ্রাহ্য করে চলেছেন। কিন্তু একমাত্র দেশপ্রীতিই সর্ব্বকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল তাঁদের। আর এই নব-লব্ধ ইংরেজী শিক্ষাই ছিল এজন্যে দায়ী।

১৮১৭-১৮ সালের মধ্যে কল্‌কাতায় স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি নামে আরও দু'টি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্রথমটি পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করত। দ্বিতীয়টি কল্‌কাতার পুরণো স্কুলগুলি সংস্কার ও নূতন স্কুল স্থাপন করতে উদ্যোগী হ'ল। এর ফলে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের পথও পরিষ্কার হয়ে গেল। এ দু'টি ব্যাপারে কিন্তু হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সমাজের গণ্যমান্য সুশিক্ষিত লোকেরা একযোগে কার্য্য করেছেন। সরকারী কর্ম্মচারীদেরও এসবে যোগদান করতে আপত্তি হ'ল না। স্কুল সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালায় কুড়ি থেকে ত্রিশজন মেধাবী ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে হিন্দু কলেজে পাঠান হ'ত। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজচাঁদ বাহাদুর, গোপীমোহন ঠাকুর প্রভৃতির দান হতে কলেজের সেরা ছাত্রদের আবার মাসিক ষোল টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হত। হিন্দু সমাজের যে-সব ছাত্র পরে বিভিন্ন কার্য্যে নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই মেধাবী, অথচ দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ওরূপ সাহায্য পেয়েই তবে তাঁদের উচ্চ শিক্ষালাভ সম্ভব হয়েছে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পনর বছরের মধ্যেই ইংরেজী শিক্ষার ফল সাধারণে প্রকৃষ্ট রূপে অনুভব করতে পায়। কলেজের প্রথম দলের

বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কাশীপ্রসাদ ঘোষের নাম আগে করতে হয়। তাঁরাচাঁদ ১৮২২ সালে দারিদ্র্য বশতঃ শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কাশীপ্রসাদ ১৮২৯ সালে কলেজী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। উভয়েই ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। কাশীপ্রসাদ ইংরেজীতে কবিতা লিখে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর কবিতার মধ্যে দেশপ্রেম সুব্যক্ত। কাশীপ্রসাদ নব্যদলের মত উগ্রপন্থী ছিলেন না। তিনি ১৮৪৬ সালে 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' নামে একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় প্রেস আইন বিধিবদ্ধ হলে কাশীপ্রসাদ কাগজখানি বন্ধ করে দেন।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী কাশীপ্রসাদ ঘোষের অগ্রগামী ছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ছাত্রদলের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। ডিরোজিও অপেক্ষা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ও তাঁর কর্ম্ম গ্রহণের বহু পূর্ব্বে কলেজ ত্যাগ করেন। তাঁর শিক্ষা সুতরাং তারাচাঁদের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তথাপি তাঁর ছাত্রদের মতই তিনিও ঘোর সংস্কারপন্থী ছিলেন, এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের নেতৃত্ব করতেন। তারাচাঁদ রামমোহনের নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মতবাদের যোগ্য শিষ্য। তিনি কৈশোরে ও যৌবনে রামমোহনের অনুগ্রহ ও সাহায্য লাভ করেন। ১৮২৮ সালে যখন রামমোহন ব্রহ্ম সভা বা ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বপ্রথম এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।, তিনি প্রথম যৌবনে নানাস্থানে কর্ম্ম করে সরকারের অধীনে হুগলী-জাহানাবাদে মুন্সেফী চাকুরি গ্রহণ করেন। এ চাকুরি করবার সময়ই সরকারী বিভাগ-গুলিতে, বিশেষতঃ আইন-আদালতে প্রচলিত দুর্নীতিগুলির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেন। একজন মিথ্যা সাক্ষ্য দাতাকে মোকদ্দমায়

সোপর্দ্দ করবার জন্য তিনি মুন্সেফী চাকুরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন! আর এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন হুগলীর ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট! এই ম্যাজিষ্ট্রেট-পুঙ্গবের প্ররোচনায় উক্ত সাক্ষী আদালতে হয়রানির জন্য তারাচাঁদের বিরুদ্ধে জজ আদালতে মোকদ্দমা করলে। জজ সাহেব তারা-চাঁদের কুড়ি টাকা মাত্র জরিমানা করলেন! এরূপ অল্প জরিমানায় সুপ্রিম কোর্টে আপীল করারও উপায় রইল না। তারাচাঁদ অতঃপর কল্‌কাতায় এসে হিন্দু কলেজের নব্য দলের সঙ্গে প্রগতিমূলক আন্দোলনসমূহে একান্তভাবে যোগ দিলেন। তিনি সরকারে চাকুরী গ্রহণ করবার পূর্ব্বে ১৮২৭ সালে নূতন শিক্ষার্থীদের জন্য একখানা ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করেন ও তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রামমোহন-বন্ধু উইলিয়ম এডামের নামে উৎসর্গ করেন। তারাচাঁদের উল্লেখ পরে আমরা আরও পাব। তবে এখানে বলা আবশ্যক, পরবর্ত্তী যুগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিলিয়ানি চাকুরী থেকে অপসৃত হয়ে যেমন স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারাচাঁদের জীবনেও আমরা অনুরূপ কার্য্যক্রমই লক্ষ্য করে থাকি।

হিন্দু কলেজের শিক্ষায় সত্যিকার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এর পরবর্ত্তী যুবক ছাত্রগণ এবং এই ধারা বহু বছর পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই দেশপ্রেম শিক্ষায় প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করেন একজন যুবক শিক্ষক। তিনি জাতে ফিরিঙ্গি—নাম, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ফিরিঙ্গি হলেও তিনি জন্মভূমি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। ১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ কালেই, মাত্র সতর বছর বয়সের হলেও, তিনি বহু কবিতা লিখেছিলেন এবং কল্‌কাতার 'ইণ্ডিয়া গেজেট' নামক প্রগতিপন্থী সংবাদপত্র তা প্রকাশও করেছিল। ১৮২৭ সালে তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক বার হয়।

তাঁর স্বদেশপ্রেম-ব্যাঞ্জক কবিতা 'ফকির অফ জাংঘিরা' নামক কাব্যের মুখবন্ধ। এই কবিতাই স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবিতা। কবিতাটি এই—

My country ! in thy days of glory past
A beautious halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country ! one kind wish for thee !

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এর এরূপ অনুবাদ করেছেন,—

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় ! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !
কোথায় সে বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।

বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি ;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী !

শিক্ষাদানের সুযোগ পেয়ে যুবক ডিরোজিও ছাত্রদের মনে দেশপ্রেমের বীজ প্রথমেই বপন করেছিলেন। স্বাধীনতা হ'ল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র সর্ব্ব বিষয়ে ছাত্রদল যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে ডিরোজিও এই শিক্ষাই তাঁদের দিতেন। কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের মূল কথা তাদের অন্তরে গেঁথে দিলেন। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যার শিক্ষাদান কলেজ গৃহে বসে সম্ভব নয়। এজন্য তাঁর নেতৃত্বে একাডেমিক এসোসিয়েশন নামে এক বিতর্ক সভার সৃষ্টি হ'ল। ডিরোজিওর সভাপতিত্বে ছাত্রগণ সাহিত্য, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রমূলক নানা প্রশ্ন, যেমন পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিক্যবাদ, সত্যবাদিতা, জাতিভেদ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সম্বন্ধেও প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করতেন। ডিরোজিও হেয়ার সাহেবের পটলডাঙ্গা স্কুলেও প্রতি সপ্তাহে নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেন। আর এ সবের শ্রোতাও অধিকাংশই তাঁর ছাত্রদল। তাঁর এই ছাত্রদলের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, আর যাঁরা তাঁর নিকট কলেজে পড়েন নি অথচ তাঁর নিকট হতে প্রেরণা

লাভ করেছিলেন তাঁদের ভিতরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি দেশের নানা কার্য্যে পরবর্ত্তীকালে নেতৃত্ব করে গেছেন। বাঙালীকে স্বদেশপ্রেম শেখাবার কৃতিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র যে দু'জনকে অর্পণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডিরোজিও-শিষ্য রামগোপাল ঘোষ একজন।

নূতন শিক্ষার প্রেরণা পেয়ে ছাত্রদল সমাজের ও ধর্ম্মের প্রচলিত সকল বিধির উপরই বিদ্রূপ তো হলেনই, উপরন্তু তা ভঙ্গ করতেও লেগে গেলেন। সে-যুগে বিজাতীয়ের নিকট হতে আহার্য্য গ্রহণ, গো-মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্ম কতখানি সাহসের বিষয় ছিল আজ হয়ত আমরা তা কল্পনাও করতে পারব না। এই নব্য দলের ধর্ম্মহীনতা প্রগতিপন্থী রামমোহনের প্রাণেও ব্যথা দিয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দু সমাজ এ সব অনাচার দেখে কেঁপে উঠ্‌ল। যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনে হিন্দু-প্রধানগণ একদিন অগ্রণী হয়েছিলেন তার ফল দেখে তাঁরা চম্‌কে উঠ্‌লেন। কলেজ কমিটির অধিকাংশ হিন্দু সভ্যরা এজন্য ডিরোজিওকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিও ১৮৩১ সালের ২৫শে এপ্রিল অপসৃতও হলেন। তখনকার দিনের হিন্দু-প্রধানেরা ডিরোজিওর শিক্ষার সুদূর-প্রসারী ফল কল্পনাও করতে পারেন নি। হিন্দু যুবকগণ ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চা করে সকল বিষয়ে স্বাধীন মতামত গঠন কর্‌লেন। এ সবের নিরিখে স্ব-সমাজের হীন দশা যাচাই করে তার উন্নতি করতেও তাঁরা তৎপর হয়েছিলেন খুব। আর এ সকলেরই মূলে ছিল ডিরোজিওর শিক্ষা। রাধানাথ শিকদার তাঁর আত্মচরিতে যথার্থই লিখেছেন,—

"ডিরোজিও দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য।

তাঁর শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনিভাবে নিবদ্ধ হয়েছে যে, তা আজও আমার সকল কর্ম্মকে নিয়মিত ও অনুপ্রাণিত করছে। তাঁরই নির্দ্দেশে আমি দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। তাঁর নিকট হতে এমন কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করেছি, যা চিরকাল আমার সকল কর্ম্ম প্রভাবিত করবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের উন্নতির নানারূপ জল্পনা-কল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করতেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। নিশ্চিত বলতে পারি, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা—যা সমাজের শিক্ষিতজনের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যা ভারতবাসীর পক্ষে হিতকর না হয়েই যায় না—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।”

কর্ম্ম থেকে অপসৃত হবার পর ডিরোজিও স্ব-সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮৩১, ১লা জুন তিনি 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া' নামক দৈনিক কাগজ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ কাজ তিনি বেশীদিন করতে পারেন নি। ঐ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ডিরোজিওর শিষ্য-দলের যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে হিন্দু সমাজ এতটা বিচলিত হয়েছিল তা কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রমুখ খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ এই সুযোগে তাঁদের খ্রীষ্টান করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একমাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেউ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণও করেন নি। এতদিন পরে আজ একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে কৃষ্ণমোহনের উপরে হিন্দু সমাজ অযথা খড়্গহস্ত না হলে তিনিও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেন কি-না সন্দেহ। অন্যান্য সকলে সমাজে রয়ে গেলেও তাঁদের বিপ্লবী মন কিন্তু বহুদিন সক্রিয় ছিল। কৃষ্ণমোহন 'দি পারসিকিউটেড' নামে পঞ্চাঙ্ক ইংরেজী নাটক লিখে হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ভণ্ডামি জনসমক্ষে ধরে দিলেন।

তাঁর 'এন্‌কোয়ারার' সাপ্তাহিক হিন্দু সমাজের দোষত্রুটি উদ্‌ঘাটন করে দেখাতে কসুর করত না। দক্ষিণারঞ্জন ও রসিককৃষ্ণ পর পর 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে—প্রথমে বাংলা, ও পরে ইংরেজী-বাংলা—দোভাষী একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন। এ কাগজখানিরও অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ-সংস্কার। তবে এ ক্রমে নব্যদলের রাজনৈতিক মুখপত্রে পরিণত হয়। তাঁদের প্রগতিশীল মতামতই এতে স্থান পেত। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে এ কাগজখানির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। জ্ঞানান্বেষণ পত্রের মটো বা শিরোভূষণ ছিল—

এহি জ্ঞান মনুষ্যানামজ্ঞানতিমির হর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

কবিতার বঙ্গানুবাদ ছিল এই—

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন॥
লোকের অজ্ঞানরূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার॥

জ্ঞানান্বেষণের কর্ম্মী-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য্য) তাঁদের নির্দ্দেশে এই মটোটি ও তার বাংলা লিখে দেন। এই গৌরীশঙ্কর 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদকরূপে পরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তিনিও ছিলেন প্রগতিপন্থী।

ডিরোজিও শিষ্যদল এই আদর্শ সন্মুখে রেখে সমাজ ও স্বদেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরা নিজেরা দরিদ্র হলেও, যে জ্ঞান অর্জ্জন করেছেন, স্বদেশবাসীদের ভিতর সেইরূপ জ্ঞান বিতরণ করা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁরা এ কার্য্যে ব্রতী হন। ১৮৩০ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত কল্‌কাতার ও কল্‌কাতার আশে-পাশে বহু

অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আর এ কার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন এই ডিরোজিও শিষ্যদল। তাঁদের অনেকেই এই সময়ে বিস্তর স্কুল পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে স্বয়ং ছেলেদের শিক্ষাদান করতেন।

নব্যদল ১৮৩৩ সালের পূর্ব্বেই একে একে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্পন্ন করে বের হয়ে পড়লেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের ভিতর কৃষ্ণমোহন ও ও রসিককৃষ্ণ প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। পরে সমাজবিরোধী কার্য্যের জন্য তাঁরা স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। অতঃপর কিছুকাল তাঁরা সংবাদপত্র সেবায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন, একটু আগেই তা বলা হয়েছে। এসময় থেকেই কেউ কেউ সাংসারিক প্রয়োজনবশে সরকার চাক্‌রি নিতে বাধ্য হন। রাধানাথ শিকদার জর্জ্জ এভারেষ্টের অধীনে সার্ভে বিভাগে মাত্র ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনে ঢুকেছিলেন, পরে ছশ' টাকা পর্য্যন্ত তাঁর বেতন হয়। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বহু বিদেশী বিদ্বজ্জনমণ্ডলী থেকে তিনি সম্মান লাভ করেছিলেন। তিনি খুব তেজস্বী ও নির্ভীকচিত্ত পুরুষ ছিলেন। সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেও উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই ছিলেন তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর চেষ্টায় সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে কুলি খাটান অর্থাৎ বেগার প্রথা রহিত হয়ে যায়। নব্যদলের আরও অনেকে অবশ্য সরকারী কার্য্যে পরে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়দের মনে যে একদা স্বাধীনতা স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠ্‌বে রামমোহন ছাড়া আরও অনেকের মনে একথা তখন উদয় হয়েছিল। হিন্দু কলেজের মত একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে (পরে কিঞ্চিৎ সরকারী অর্থও এর ভাগ্যে জুটেছিল) যে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হ'ত তার ফলাফল দেখে ভারতহিতৈষী ইংরেজগণ যেমন আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি অন্য একদল ইংরেজ শঙ্কান্বিতও হয়েছিলেন

খুব। এজন্যই বোধ হয়, ১৮৩৩ সালে প্রদত্ত সনন্দে শিক্ষা বাবদে ব্যয়ের কোন বরাদ্দ হয়নি। তবে সনন্দ দানের পূর্ব্বে ইংরেজী শিক্ষার আবশ্যকতা ও ফলাফল সম্বন্ধে বহু সরকারী, বেসরকারী ইংরেজের স্বাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল। মেজর জেনারল সার্ লায়ওনেল স্মিথ নামে একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী ১৮৩১, ৬ই অক্টোবর পার্লামেণ্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে ইংরেজী শিক্ষার ফল সম্পর্কে যা বলেন তা আজকের দিনেও খুবই শিক্ষাপ্রদ। তিনি এই মর্ম্মে বলেন, "ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর মনে একদিন আত্ম-কর্ত্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগ্‌বে, এবং তখন আমাদের ভারতবর্ষ থেকে চলে আস্‌তে হবে। এতে আমাদের ক্ষতির আশঙ্কা ত নাই-ই বরং কিছু লাভেরই আশা করা যেতে পারে। আমেরিকা যখন ব্রিটেনের অধীন একটি উপনিবেশ মাত্র ছিল তখনকার চেয়ে সে এখন স্বাধীন অবস্থাতেই আমাদের বেশী উপকারে আস্‌ছে। ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই স্বাধীন হতে চাইবে। মুসলমান আমলে যে তারা স্বাধীন হতে চায়নি তার কারণ, তখন তাদের শিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজী শিক্ষার ফলে সুতরাং তারা তা চাইবেই। নিজেদের শক্তি সম্বন্ধেও তারা সচেতন হবে ও নিজ শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারবে। এর ফল হবে এই যে, তারা স্বদেশ থেকে প্রত্যেক শ্বেতকায় ব্যক্তিকে বার করে দিতেও স্বভাবতঃই দ্বিধাবোধ করবে না।"

নব্যদলের রাজনীতি

ডিরোজিও শিষ্যদল বিপ্লবী মতবাদের জন্য হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকলেরই নিকট আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সামাজিক আচার-ব্যবহার যেরূপ ভঙ্গ করতে লাগলেন তাতে হিন্দু সমাজের শঙ্কার অবধি রইল না। কিন্তু ক্রমে এ দল জনসেবায় মন দিলেন, সমাজও তাঁদের কর্ম্ম প্রণালীকে তেমন সন্দেহের চক্ষে দেখ্‌লে না। দশ বৎসরের মধ্যেই সবরকম বিরুদ্ধতা থেমে গিয়ে লোকে তাঁদের কর্ম্ম পদ্ধতির হিতকারিতা উপলব্ধি করতে লাগল—ওযুগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

নব্যদলের দেশাত্মবোধ প্রকাশের বাহন হ'ল প্রথম থেকেই সংবাদ পত্র। হিন্দু কলেজে শিক্ষা কালেই 'পার্থেনন' নামক যে কাগজ এঁরা বের করেছিলেন তার প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা ও ইংরেজদের ভারতবর্ষে বাসস্থান সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং হিন্দুধর্ম্ম ও সরকারী আইন-আদালতে ব্যয়বাহুল্যের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছিল। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধিতার জন্য এ কাগজখানা দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ না হতেই বন্ধ হয়ে যায়। তবে কলেজের কিশোর ও যুবক ছাত্রদের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি আলোচনার প্রথম নিদর্শন এতেই পাওয়া গেল। 'এন্‌কোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের কথা আগে উল্লেখ করেছি। রাজনীতি চর্চ্চার ধারা এরাই অব্যাহত রাখ্‌ল। ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের আন্দোলন রামমোহন রায় কি কারণে সমর্থন করেছিলেন তা আগে বলা হয়েছে। নব্যদল প্রথমে এর সমর্থন করলেও পরে দেখা যায় তাঁদের কেউ কেউ মত পরিবর্ত্তন করেছেন। ইউরোপীয় জাতিগুলির বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে তথাকার আদিম অধিবাসীদের চরম দুর্দ্দশা তাঁদের এই মত

পরিবর্ত্তনের কারণ হয়ে থাকবে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু অন্য কারণে এদেশে বেসরকারী ইংরেজদের আগমন মোটেই পছন্দ করত না। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সনন্দ দানের আবেদনে তারা বলেছিল যে, ভারতবর্ষে ইংরেজ বাহুল্য হলে আমেরিকা যেমন তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে এ-ও তাদের তেমনি হাতছাড়া হয়ে যাবে! যা হোক, নব্যদল দেশ-বিদেশের সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করে নিজেদের স্বাধীন মত গঠন করেছিলেন, এবং ধর্ম্ম ও সমাজে, এমন কি রাষ্ট্রনীতিতেও তা প্রয়োগ করতে লাগ্‌লেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সনাতন হিন্দু সমাজের প্রবল বাধা সত্ত্বেও সতীদাহ প্রথা রহিত করে দেন। তিনি সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন করেন নি বটে, তবে তিনি এর প্রয়োগও করেন নি। এজন্য তাঁর শাসনকালে (জুলাই ১৮২৮—মার্চ্চ ১৮৩৫) নানা শ্রেণীর বহু কাগজ প্রকাশিত হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা' গোঁড়া পন্থী, সতীদাহ নিবারক আইনের প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভার মুখপত্র। রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' তখন সতীদাহ নিবারক আইনের সমর্থক হলেও নব্যদলের মতে ছিল ধর্ম্ম ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী ("Coming as far as half the way on religion and politics"—*Enquirer*)। এ সময়েই ইংরেজী 'রিফর্ম্মার' ও বাংলা 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধের উন্মেষে 'সংবাদ প্রভাকরে'র দান অনন্যসাধারণ। এর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

এ দুখানা কাগজ সংস্কারবাদী হলেও ছিল মধ্যপন্থী এবং নব্যদলের ঘোর বিরোধী। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ে প্রগতিশীল পত্রিকা ছিল 'এন্‌কোয়ারার' ও 'জ্ঞানান্বেষণ'। এ সময়কার উন্নতিমূলক প্রচেষ্টাসমূহের সঙ্গে এরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

ইংরেজী ১৮৩৩ সালে আবার কোম্পানীকে নূতন করে সনন্দ দেওয়া হ'ল। ১৮১৩ সালে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারে যে সঙ্কোচ সাধন করা হয়েছিল, কুড়ি বছর পরে তা একেবারে বিলুপ্ত হ'ল। ভারতবর্ষ শাসনের কর্তৃত্বই শুধু কোম্পানীর রইল। ব্যবসার জন্য কোম্পানীর যত ঋণ হয়েছিল, এ সময়ে তা সবই ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপান হয়। ভারতবর্ষের দ্বার এখন থেকে সকলের নিকটই মুক্ত হয়ে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যে ইংরেজ সাধারণভাবে যোগ দিতে সুরু করলে। তবে লবণ ও আফিম এ দুটি জিনিষের ব্যবসা গবর্ণমেণ্টের হস্তেই রাখা হ'ল। গবর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে ভারতবাসীর পক্ষে লবণ উৎপাদন বহু দিন পূর্ব্বেই বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। ব্যক্তি-স্বাধীনতা নষ্ট করে প্রেস আইন, সভা বন্ধ আইন প্রভৃতি যে-সব আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল সনন্দে সে-সব প্রত্যাহারের কোন নির্দ্দেশই ছিল না। ভারতবাসীর শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা এতে করা হয় নি, পরন্তু ভারতবর্ষে সভ্যতা বিস্তারের অছিলায় বিভিন্ন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের হস্তে টাকা দেওয়ারই নির্দ্দেশ ছিল! তবে এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বীকৃত হয়—স্বদেশ-শাসনে ইংরেজদের ন্যায় ভারতবাসীরও সমান অধিকার। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে যোগ্য বিবেচিত হলেই সকলে সরকারী কর্ম্মে নিয়োজিত হতে পারবে—সনন্দে এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকে। কোম্পানীর যথেচ্ছ শাসনকে সংযত করবার একটি উপায় ছিল সুপ্রিম কোর্ট। কোন আইন পাস করাতে হলে এরও সম্মতি নিতে হ'ত কোম্পানীকে। এবারে সুপ্রিম কোর্টের

এ ক্ষমতা বিলুপ্ত করে দিয়ে একে তারই অধীন করা হ'ল। কোম্পানীর এই নূতন সনন্দ ভারতে পৌঁছলে দেশী ও বিদেশী (ইংরেজ) গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এর প্রতিবাদে কল্‌কাতার টাউনহলে ১৮৩৫ সালের ৫ই জানুয়ারী শেরিফ ডব্‌লিউ হিকির সভাপতিত্বে জনসভার অনুষ্ঠান করেন। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর চার্টার বা সনন্দ সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারকে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ জ্ঞাপন।

এসময়কার একটি বিষয় কিন্তু খুবই লক্ষ্য করবার মত। এ বিষয়টির উল্লেখ এখানে আরও প্রয়োজন এই কারণে যে, পরবর্ত্তী যুগে ভারতবর্ষ শাসনে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা যতই প্রকাশ পেতে থাকে ততই ইংরেজরা ভারতবাসীদের থেকে দূরে সরে পড়তে আরম্ভ করে। কোম্পানীর হস্ত থেকে ইংলণ্ডের রাজার ভারত-শাসন ভার গ্রহণ উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে পূর্ণ করে দেয়। কারণ তখন ভারত-শাসনের স্বার্থ একটা কোম্পানী বিশেষের না হয়ে একেবারে সমগ্র ইংরেজ জাতিরই হয়ে যায়। আর ইংলণ্ডেশ্বরের শাসন মানেই তো সমগ্র ইংরেজ জাতিরই শাসন! বেসরকারী ইংরেজদের উপর কোম্পানীর মনোভাব যে মোটেই প্রসন্ন ছিল না তা তাদের এদেশে অবাধ বাণিজ্য ও বসতি স্থাপনে প্রবল বাধা দেওয়ায় ও প্রেস আইন প্রভৃতি বাহাল রাখায় খুবই প্রতিপন্ন হয়েছে। অতঃপর ব্যবসায়ে ইংরেজ জনসাধারণের অবাধ অধিকার স্বীকৃত হলেও দেশ-শাসনে কোম্পানীরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রয়ে গেল। কাজেই শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে ইংরেজ, ভারতবাসী উভয়েই মিলিত হয়ে কোম্পানীর কার্য্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাত। এ সময়কার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভাগুলির এই বৈশিষ্ট্য আমরা খুবই লক্ষ্য করি। পরে ইংরেজের স্বার্থ যখন এদেশে বদ্ধমূল হয়ে পড়ে তখন তারা ভারতবাসী থেকে নিজেদের আলাদা করে ভাব্‌তে শেখে।

এসময়কার ইংরেজদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিও দু' দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের কাগজ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশে পরিচালিত হত। এরা সর্ব্ব বিষয়ে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত থাকত। 'জন বুল' (পরে 'ইংলিশম্যানে' পরিণত) কাগজ ছিল এ শ্রেণীর মধ্যে প্রধান। বেসরকারী ইংরেজরা আইনের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন না করে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার জন্য আর এক শ্রেণীর কাগজ বার করে। এদেশীয়েরাও এ শ্রেণীর কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করত। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (পরে 'বেঙ্গল হরকরা'য় পরিণত) ছিল এই দলের মুখপত্র। এছাড়া 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট', 'ক্যালকাটা কুরিয়র' প্রভৃতি কতকগুলি মধ্যপন্থী কাগজও ছিল।

যে কথা বল্‌ছিলাম। সনন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় বেসরকারী গণ্যমান্য ইংরেজগণ ও ভারতবাসীরা যোগদান করেছিলেন। এ সভায় প্রগতিপন্থীদের অগ্রণী 'জ্ঞানান্বেষণ' সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিকই ভারতবাসীদের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলেন। এ সনন্দ ভারত-বাসীদের পক্ষে কতখানি অশুভকর, রসিককৃষ্ণ তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেন নি। থিওডোর ডিকেন্স নামে একজন ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত সনন্দ সংশোধন ও পুনর্বিবেচনা করতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানিয়ে সভায় যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন তাঁর সমর্থনে রসিককৃষ্ণ মল্লিক নিম্ন মর্ম্মে বক্তৃতা করেছিলেন,—

"মিঃ ডিকেন্স পার্লামেণ্টের নূতন আইনের গুরুতর দোষ ত্রুটিগুলির উল্লেখ করে বক্তৃতা করেছেন। আমি খুব যত্নসহকারে এ আইন পাঠ করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ভারতের অধিকৃত অঞ্চলগুলির সুশাসনের জন্য ধার্য্য হলেও এর ধারাগুলি দ্বারা মোটেই ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

আমি যতই পাঠ করছি ততই এই কথাটি আমার নিকট প্রতিভাত হচ্ছে যে, এ আইনের মূলগত উদ্দেশ্যই হচ্ছে—'স্বার্থ'। এ আইন ভারতবর্ষের উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি; কোম্পানীর অংশীদারদের এবং ইংরেজ জাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোটি কোটি ভারতবাসীর মঙ্গলের কথা মোটেই আইন-কর্ত্তাদের মনে স্থান পায় নি। মিঃ ডিকেন্স কোম্পানীর ব্যবসাগত ঋণের বোঝা ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপাবার বিষয় উল্লেখ করেছেন। আমি এ কার্য্যকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে করি, আর এতেই বোঝা গেছে—ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারদের স্বার্থই দেখেছেন, আমার স্বদেশবাসীর স্বার্থ মোটেই দেখেন নি। আমরা একেই অত্যধিক ঋণভারে প্রপীড়িত, এর উপর পার্লামেণ্ট আবার এই অতিরিক্ত ব্যবসাগত ঋণের বোঝা আমাদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন। এ কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, ভারতবর্ষের রাজস্বকে এই ঋণের দায়ে আবদ্ধ করা আদৌ যুক্তিযুক্ত কি-না। কারণ যদি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বোকামি ও অব্যবস্থার জন্য এ ঋণ হয়ে থাকে তা হলে এ ভার তাদেরই স্কন্ধে পতিত হওয়া উচিত ছিল, আমাদের স্কন্ধে নয়।

"ডিকেন্স মহোদয় যে-সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে কিছু না বলে যে দু-একটি বিষয় উল্লেখ করেন নি সে সম্বন্ধে কিছু বল্‌ব। আমি জানি, অনেকে হয়ত মনে করেন, সামরিক ও বেসামরিক খ্রীষ্টান কর্ম্মচারীদের জন্য ধর্ম্মযাজক নিয়োগ যুক্তিযুক্ত। এ কথার যুক্তিযুক্ততা আমিও অস্বীকার করি না। কিন্তু সামান্য অন্নবস্ত্রেরও কাঙ্গাল দুর্গত ভারতবাসীদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ—ভারতীয় রাজস্ব কেন তাদের ভিতরে এমন একটি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্যয়িত হবে যা তারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখের পরিপন্থী বলে মনে করে? খ্রীষ্টান সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারীদের

জন্যই যদি শুধু এ ব্যবস্থা হ'ত তা হলে হয়ত বিশেষ কিছু বল্‌বার থাক্‌ত না। কিন্তু এখানে এর চেয়ে অধিক কিছু করা হয়েছে। আইনে এই মর্ম্মে বলা হয়েছে যে, বড়লাট ইচ্ছা করলে বিলাতের কর্ত্তাদের অনুমতি নিয়ে চার্চ্চ অফ্‌ ইংলণ্ড এণ্ড আয়ার্লণ্ড ও চার্চ্চ অফ্‌ স্কটল্যাণ্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য যাজক সম্প্রদায়কেও এদেশীয়দের খ্রীষ্টতত্ত্ব শেখাবার জন্যে এবং গীর্জ্জাদি নির্ম্মাণের জন্যে অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। এ দ্বারা কি এ কথাই স্পষ্টই বুঝায় না যে, ভারতবাসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা তাদের এমন একটি ধর্ম্মে দীক্ষা-দানে ব্যয়িত হবে, যে ধর্ম্মকে তারা মোক্ষলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর বলে মনে করে? এ কি ন্যায্য?—এ কি সঙ্গত? যে ধর্ম্ম নিয়ে ওঁরা এত গর্ব্ব করেন তার শিক্ষা কি এই? আমি তাঁদের ধর্ম্ম পুস্তকে এমন কোন শব্দ পাইনি যার মানে এই হয় যে, অনিচ্ছুক লোকের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে যে ধর্ম্মকে তারা অধর্ম্ম বলে মনে করে তাদের মধ্যে সে ধর্ম্ম প্রচার করতে হবে!

"অন্য কোন কোন বিষয়েও ভারতবাসী হিসাবে আমার কিছু বলা আবশ্যক। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককেই গবর্ণমেণ্টের সকল রকম কার্য্য করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হয়েছে, এ ব্যাপারে ভারতবাসীদের কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে কি-না। আমিও বলি, নিশ্চয়ই কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না। কিন্তু এবিষয়টি একটু গভীরভাবে আলোচনা করলে আমরা বুঝ্‌ব, যদিও সনন্দে এরূপ একটা ধারা রয়েছে তথাপি একে ব্যর্থ করবারও যথেষ্ট উপায় করা হয়েছে। আমি (বিলাতের) হেলিবেরী কলেজে অধ্যয়নের অনাবশ্যকতার কথাই বল্‌ছি। আমি এ কলেজের কথা অনেক শুনেছি, এবং শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যত শীঘ্র এর বিলোপ ঘটে ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। ভারতবর্ষে যারা কার্য্য করবে, ভারতবর্ষই

তাদের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। তারা হেলিবেরিতে যে-সব পাঠ নিয়ে থাকে তাতে ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মান মোটেই সম্ভব নয়। ভারতবাসীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, কথা বলে, তাদের নিকৃষ্টতম কুটীরে গমন করে তবে এরূপ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। এ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের যতই সদিচ্ছা থাকুক না কেন, সবই বিফল হবে। সাধারণভাবে কলেজ সম্পর্কে আমার এই আপত্তি। কিন্তু আমি অন্য কারণও দেখাচ্ছি যাতে করে ভারতবাসীদের সরকারী কর্ম্মে যোগদানের সুযোগ একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যতই দুঃখ করি না কেন, একথা ঠিক যে, সমুদ্রপারে যাওয়া ভারতবাসীরা এখনও পাপের কাজ বলে মনে করে। শিক্ষার জন্য বছরের পর বছর বিলাতে থাকা—সে ত আরও পাপের কর্ম্ম। ব্যাপার যখন এই, তখন ভারতবাসী কিরূপে ও-কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারবে? হয় তাকে ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হবে, নয় তাকে ঐহিক সুখ-সুবিধা ত্যাগ করতে হবে। হিন্দুরা এসব উচ্চ পদের যোগ্য কিনা সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু যতদিন তাদের মধ্যে এ সংস্কার থাকবে ততদিন পার্লামেণ্টের এমন কোন ধারা নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল যদ্দ্বারা ভারত-বাসীরা সিবিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারে।

"আমি যতই এ আইন পাঠ করছি ততই বুঝ্‌তে পারছি যে, এতে ইংলণ্ডবাসীর ষোল আনা স্বার্থ ই রক্ষিত হয়েছে। বলা হয়েছে, চা-এর উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে, কিন্তু এতে আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে? আপত্তির কোনই কারণ নেই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ অধিকার বিলুপ্ত করা হয়েছে কেন? ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্য? না। ইংলণ্ডবাসীদের মঙ্গলের জন্যই এ কাজ করা হয়েছে। যদি আমাদের শুভই বিবেচনা করা হ'ত তা হলে লবণ ও আফিমের ব্যবসায়ে

কোম্পানীর একচ্ছত্র অধিকার বিলুপ্ত হ'ল না কেন? সার্ চার্লস্ গ্রাণ্ট এসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কবে যে তা কার্য্যে প্রতিফলিত হবে সে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

"বড়লাটের অবাধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ ডিকেন্স আপনাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইংলণ্ডের আগেকার দিনের সর্ব্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী রাজার চেয়েও ইনি ক্ষমতাশালী। তাঁর ক্ষমতা সংযত করবার উপায় কি? এ আবেদন সাফল্যমণ্ডিত হলে অবশ্য একটা উপায় হবে; কিন্তু যে উপায়টি এতদিন বলবৎ ছিল পার্লামেণ্ট তা কেড়ে নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট সর্ব্বদা বড়লাটের ক্ষমতার রাশ টেনে রাখ্‌ত, কিন্তু এখন আর তা হবার জো নেই। সুপ্রিম কোর্ট এখন বড়লাটের অধীন করা হয়েছে, এবং সম্প্রতি কল্‌কাতার একখানা সংবাদপত্র এরূপ মন্তব্য করেছেন—'যে ইংরেজ জজেরা নিজ স্বাধীনতার জন্য এতদিন আমাদের পরম গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু ছিল, তাঁদের ক্ষমতা অতঃপর বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে বিচার-কার্য্য পরিচালনায়ই পর্য্যবসিত হবে'।

"মিঃ ডিকেন্স ভারতবর্ষের বাণিজ্য-স্বার্থের কথাও উল্লেখ করেছেন। আমি এ আইনে এরূপ কোন ধারা খুঁজে পাচ্ছি না যার ফলে ব্যবসাগত বাধাগুলি নিরাকৃত হতে পারে। আমার স্মরণ হয়, মিঃ গ্রাণ্ট বলেছেন, ব্রিটিশ বণিকগণ এতই কর্ম্মকুশল যে, তাদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন নি, তাই তিনি চা-এর উপর একচেটিয়া অধিকার তুলে দিয়েছেন। কল্‌কাতার বণিকগণ কতখানি কর্ম্মকুশল বল্‌তে পারি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভারতীয় ব্যবসার পক্ষে যে-সব বাধা বলবৎ রয়েছে তা বিদূরিত হলে এদেশ অর্থ ও শক্তি সম্পদে আরও অধিক শ্রীসম্পন্ন হতে পারত কি-না?

"আর একটি বিষয় সম্বন্ধেও আমরা আশা করেছিলাম, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কিঞ্চিৎ অবহিত হবেন, কিন্তু সে আশা বৃথাই হয়েছে। এ

আইনে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কথাও সংযোজিত হয় নি। সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারীদের জন্য দুটি বিশপের পদ সৃষ্টি করা হ'ল, কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হ'ল না! এ অবস্থায় আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই? আইনটি বারবার পাঠ করুন, তা হলে আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন, কতখানি কুৎসিত আকারে এ আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছে। আমার নিবেদন, আইনের কুৎসিত ধারা-গুলির পরিবর্ত্তনের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আবেদন করা হোক্। এ আইন ভারতবর্ষে ইংরেজের নাম ও শক্তিকে মসিলিপ্ত করেছে।"

নব্যদলের রাজনীতিক চিন্তা কতখানি ব্যাপক ও কার্য্যকর ছিল তা পাঠক-পাঠিকা এখন বেশ বুঝ্‌তে পারছেন। অদম্য স্বজাতি প্রীতির মনোভাব নিয়েই যে তাঁরা অতঃপর দেশ-সেবায় মন দিয়েছেন, রসিক-কৃষ্ণের বক্তৃতাই তার দ্যোতক।

এখানে আর একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতবাসীর রাজনীতিক আন্দোলনের সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ। রামমোহন রায় থেকেই এর সূত্রপাত হয়। ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে সার চার্লস মেটকাফ ভারতের বড়লাট হয়েই মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল মোচনে অবহিত হন এবং পরবর্ত্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর আইন জারি করে মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দেন। মেটকাফের এই সাধু অভিপ্রায় জেনে কলকাতার দেশী ও বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঐ সালের ৮ই জুন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে টাউন হলে এক জনসভা আহ্বান করেন। এখানে তাঁকে একখানা অভিনন্দন-পত্র দেওয়ার বিষয়ও স্থির হয়। সভায় বাঙালীদের মধ্যে বক্তৃতা করেছিলেন নব্যদলের রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণারঞ্জনের কথা আমরা পরে আরও জান্‌তে পারব। এ সভায় অস্‌বোর্ণ নামে এক সাহেব দেশী সংবাদপত্রগুলির

শৃঙ্খল মোচন অনাবশ্যক বলে এক বক্তৃতা করেন। রসিককৃষ্ণ এর একটি চমৎকার মুখরোচক জবাব দেন। তিনি বলেন,—

"অস্‌বোর্ণ স্বীকার করেছেন তিনি দেশীয় সংবাদপত্র বুঝেন না, এমনকি তার নামগুলিও পড়তে পারেন না, অথচ তিনি তাদের দুষ্‌ছেন ভয়ানক ভাবে! দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞান থাকা তাঁর উচিত ছিল। 'সমাচার দর্পণের' প্রচার বিভিন্ন জেলায়। নানারূপ জ্ঞাতব্য তথ্যে এ কাগজখানি পূর্ণ থাকে। মহাশয় নিশ্চয়ই সংবাদপত্রের আলোচ্য বিষয়গুলি দেখে ঐ সিদ্ধান্ত করেন নি। দেশীয় ও ইউরোপীয় সংবাদপত্রের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা এর পূর্ব্বেও হয়েছে, কিন্তু সুখের বিষয়, কর্ত্তৃপক্ষ এতে কর্ণপাত করেন নি। কি দেশীয় কি ইউরোপীয় কোন সংবাদপত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচার করতে পারে না, এবং ইংরেজীর ন্যায় দেশীয় সংবাদপত্র একই আইন দ্বারা শাসিত হতে পারে। এদেশীয়দের উপর এরূপ অবিশ্বাস কেন? ভাল মন্দ সকল জাতের মধ্যেই আছে।"

দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মর্ম্মে বল্‌লেন,—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার আবশ্যকতা সম্পর্কে সভায় দ্বিমত নাই। তথাপি আমি কিছু বল্‌তে উদ্যত হয়েছি এই জন্য যে, প্রস্তাবিত আইন ভারতবাসীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সার চার্লস মেট্‌কাফ আমাদের সর্ব্বপ্রকারেই ধন্যবাদের পাত্র। মিঃ টার্টনের সঙ্গে আমি একমত যে, আমরা যে স্বধীনতা চাই তা সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা নয়, তা দায়িত্বপূর্ণ অথচ অবাধ স্বাধীনতা। দোষী ব্যক্তি আইনের অধীন নিশ্চয়ই হবে। সে যদি দণ্ডার্হ হয়, বিচারালয় নিশ্চয়ই তাকে দণ্ড দেবে। আমি এজন্য দুঃখিত যে, প্রাস্তাবিত আইন বিধিবদ্ধ না করার জন্য লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে। যদি তিনি

এ আইন ভাল বিবেচনা করতেন তবে তাঁর উচিত ছিল এ আইন প্রয়োগ করা, যদি ভাল বিবেচনা না করতেন তবে উচিত ছিল আইনটি তুলে দেওয়া। এর কোনটিই না করা নিছক ভণ্ডামী মাত্র।…”

দক্ষিণারঞ্জন এজন্য বেণ্টিঙ্কের উপর কটূক্তি বর্ষণ করলেও নব্যদল অন্য একটি ব্যাপারে তাঁকে পুরোপুরি সমর্থনই করেছিলেন। বেণ্টিঙ্কই প্রথম ইংরেজী শিক্ষাকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গে পরিণত করেন। পূর্ব্বে কোম্পানী এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিল না। ১৮২৩ সালেও তারা ইংরেজীর বদলে সংস্কৃত, আর্বি ও ফার্সি শিক্ষার জন্যই অর্থ-ব্যয়ের ব্যবস্থা করে। এর বার বছর পরে ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রাক্কালে বেণ্টিঙ্ক মহোদয় শিক্ষার ধারা একেবারে বদ্‌লে দিয়ে যান। তাঁর একাজে প্রধান সহায় হন আইন-সচিব লর্ড মেকলে। তখন ‘জেনারল কমিটি অফ্ পাব্‌লিক ইনষ্ট্রাকশ্যন’ নামে এক শিক্ষা-কমিটি শিক্ষার সব ব্যবস্থা করতেন। এ কমিটিতে একদল ছিলেন প্রাচ্য প্রাচীন ভাষাসমূহ চর্চ্চার পক্ষপাতী, আর একদল ছিলেন ইংরেজীর সপক্ষে। বেণ্টিঙ্ক এই দ্বিতীয় দলের মত গ্রহণ করে ১৮৩৫ সালের প্রথম সরকারী অর্থ প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হবে স্থির করলেন। নব্যদল তখন তাঁর এ ব্যবস্থা সমর্থন করেন এই আশায় যে, এভাবে শিক্ষা প্রসার লাভ করলে দেশভাষাগুলি অচিরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে এবং তখন এসবই শিক্ষার বাহন হবার উপযুক্ত হবে। ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনে বেণ্টিঙ্কের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকখানি কার্য্যকরী হয়েছে।

———

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন

প্রথম যুগ

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীদের ভিতর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনও একটি নির্দ্দিষ্ট ধারায় চল্‌তে সুরু হয়। এত দিন কোন নির্দ্দিষ্ট বিধি বা আইন সম্পর্কে প্রতিবাদ সভা করে কর্ত্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি ও আবেদন পত্র পাঠান হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য নিয়ে কোন রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এবারে ১৮৩৬ সালের মাঝামাঝি এরূপ চেষ্টার সূত্রপাত হয়। আর এতে অগ্রণী হয়েছেন দেখ্‌তে পাই রামমোহন-সঙ্গিগণ। হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত দল উগ্রপন্থী রাজনীতিক। তাঁদের মতে রামমোহন-সঙ্গীরা তখন মধ্যপন্থী হয়ে পড়েছেন। নব্যদলের প্রভাব প্রতিপত্তি তখনও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তাঁরা তখনও কি সনাতনী কি রামমোহন-পন্থী সকলের নিকট হতেই দূরে সরে রয়েছেন। বস্তুতঃ রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পর থেকে পাঁচ-ছ বছর পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গিগণ—প্রধানতঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর শিক্ষিত সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ছিলেন। প্রসন্নকুমারের সাপ্তাহিক 'রিফর্ম্মার'-এর কাট্‌তি তখন কল্‌কাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী। এতে প্রকাশিত রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক মতামতের জনপ্রিয়তার এই হ'ল সুতরাং কষ্টিপাথর।

১৮৩৬ সালে ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার দ্বন্দ্ব যদিও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে তথাপি, এ সময় রাষ্ট্রীয় আলোচনার জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা

হয় তাতে ধর্ম্মসভা পন্থীদের যোগ দিতে দেখি না। টাকীর জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, রামলোচন ঘোষ প্রভৃতি রামমোহনের সহচর ও অনুচরগণ অগ্রণী হয়ে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'পূর্ণ চন্দ্রোদয়' সম্পাদক হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্‌শী আমীর প্রমুখ আরও অনেকে এ সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। এ সঙ্ঘের নাম ছিল 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'। নামে হয়ত একে রাজনৈতিক সভা বলে ধারণা হবে না, কিন্তু এ-ই বাঙালী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর একটি নিয়মে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, ধর্ম্ম বিষয়ের বিচার আলোচনা এখানে হবে না। যে-সব রাজকার্য্যাদির সঙ্গে ভারতবাসীর ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্ঠ যোগ তারই আলোচনা ও বিবেচনা এ সভার মূল উদ্দেশ্য। ১৮৩৬ সালের শেষের দিকে এই সভা সংগঠিত হয়। ১৮২৮ সালের আইন অনুসারে নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ আরম্ভ হলে তার প্রতিবাদে এ সঙ্ঘ একটি জনসভা আহ্বানের চেষ্টা করেন। অন্যতম সভ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, ব্রহ্মসভা ও ধর্ম্মসভার সভ্যগণের মধ্যে তখনও দলাদলি থাকায় এ সঙ্ঘ বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি।

এ সময়ে সরকার পক্ষ থেকে শাসনের কোন কোন বিভাগে শিক্ষিত ভারতবাসীর নিয়োগ সুরু হয়। ১৮৩৩ সালের সনন্দে জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে দেশ শাসনে যোগ্য ব্যক্তিদের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু এবারেই তা কথঞ্চিৎ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হতে দেখা যায়। হিন্দু কলেজের ছাত্র নব্যদলের অন্যতম রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি এই সময় রাজ সরকারে ডেপুটি কলেক্‌টরি কর্ম্মে নিযুক্ত হলেন। তবে এ দলেরও রাজনীতি চর্চ্চা তখনই সুরু হয়েছিল। কোন সুগঠিত প্রতিষ্ঠানের বদলে সংবাদপত্রই ছিল তখন তাঁদের রাজনীতি চর্চ্চার একমাত্র বাহন।

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পর ভূম্যধিকারী সভা গঠিত হ'ল। তখন নিষ্কর ভূমির বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে সরকার তরফে কতকগুলি নিয়ম চালু হতে থাকে। এতে জমিদার বা ভূম্যধিকারীদের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। একারণ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়গুলির আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করলেন। ব্রহ্মসভা বা ধর্ম্মসভার দলাদলি তখন একদিকে যেমন হ্রাস পেল উপস্থিত বিপদ সকলকে একযোগে কাজ করতেও তেমনি উদ্বুদ্ধ করলে। কাজেই সনাতনী ও সংস্কারপন্থী সকল ভূম্যধিকারীই ১৮৩৭ সালের ১২ই নবেম্বর হিন্দু কলেজ ভবনে সমবেত হয়ে একটি ভূম্যধিকারী বা জমিদার সভা স্থাপনের মনস্থ করলেন। রাষ্ট্রের একটি বিশেষ শ্রেণীর রাষ্ট্রগত স্বার্থ রক্ষার জন্যই এ সভা স্থাপিত হয়। সুতরাং একে পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। তথাপি এতে যে নিয়ম অনুসৃত হয়েছিল তা গণতন্ত্রের অনুগ। জাতি বর্ণ বিভেদ না করে সকলের নিমিত্তই সভা স্থাপিত হয়েছিল। এরূপ নিয়ম হ'ল যে, ভূমির স্বত্বযুক্ত সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই এর সভ্য হতে পারবেন। কিন্তু তা হলেও এই সভা ভূম্যধিকারী সভাই। পরবর্ত্তী ১৯শে মার্চ্চ (১৮৩৮) ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশী ও বিদেশী, হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ—ভূমির স্বার্থসম্পন্ন সকলেই এর সভ্য শ্রেণীভূক্ত হলেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হলেন থিওডোর ডিকেন্স, জর্জ্জ প্রিন্সেপ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ রায়, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, আশুতোষ দেব, রামরত্ন রায়, রামকমল সেন, মুন্শী আমীর, সত্যচরণ ঘোষাল ও রাধাকান্ত দেব। এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠাপন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার। বলা বাহুল্য, বাধাবিমুক্ত হয়ে ইংরেজরাও কেউ কেউ সে সময় এদেশে জমিদারী ক্রয় করেছিলেন। এ সভা ভূমি সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করেন এবং এর ফলে জমীদার প্রজা উভয়েরই অনেক উপকার

সাধিত হয়। কখনও কখনও পুলিশ, আইন-আদালত ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়েও এ সভা মতামত জ্ঞাপন করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন, দশ বিঘা পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র জমির কর ছাড় দিবার নিয়ম ভূম্যধিকারী সভার উদ্যোগেই হয়েছিল।

ভূম্যধিকারী সভা প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পরে ১৮৩৯, জুলাই মাসে রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়ম এডাম ইংলণ্ডে ভারতবাসীর কল্যাণার্থে ও ভারত সম্পর্কে ইংরেজ সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন। এডাম সাহেব আগে পাদ্রী ছিলেন, পরে রামমোহনের প্রেরণায় একেশ্বরবাদী হন। তিনি ভারতবাসীদের একজন হিতৈষী বন্ধু। এদেশে অবস্থানকালে নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাংলা ও বিহারের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অনুসন্ধানের জন্য এডাম সাহেবকে নিযুক্ত করেছিলেন। এডাম তিন খণ্ড রিপোর্টে তাঁর অনুসন্ধানের ফল ব্যক্ত করেন। তখন এ দুই প্রদেশে অনুমান এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল—রিপোর্টে এ কথা লিপিবদ্ধ আছে। ৩০শে নবেম্বর ১৮৩৯ তারিখে ভূম্যধিকারী সভায় উক্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বিলাতে ভূম্যধিকারী সভার পক্ষে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৮৪১ সালের প্রথম দিকে সোসাইটির মুখপত্রস্বরূপ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এড্ভোকেট' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকও হলেন উইলিয়ম এডাম। জর্জ্জ টম্সন ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদে জোর আন্দোলন চালিয়ে ইতিপূর্ব্বেই ইংরেজ সমাজে মানবহিতৈষী টম্সন নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রতিও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি লণ্ডনস্থ কমিটির সঙ্গে যুক্ত হলেন।

রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সহকর্ম্মী বলে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমে হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করতে পারেন নি বটে, কিন্তু একনিষ্ঠ দেশসেবা এবং দানাদি সৎকর্ম্মের জন্য পরে এর নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন। ভূম্যধিকারী সভারও ছিলেন তিনি প্রাণ। তিনি ১৮৪২ সালে প্রথম বার বিলাত গমন করেন। সেখান থেকে জর্জ্জ টম্‌সনকে তিনি ঐ বছরের শেষের দিকে কল্‌কাতায় নিয়ে আসেন। ইতিপূর্ব্বেই ভূম্যধিকারী সভার কর্ম্মশৈথিল্য প্রকাশ পেয়েছিল। এ সময় 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, জর্জ্জ টম্‌সন এসেই এ সভার দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গ করে দিয়েছেন! যা হোক, ১৮৪৩, ১৭ই জুলাই তারিখে ভূম্যধিকারী সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে জর্জ্জ টম্‌সন বিলাতে তাঁদের এজেণ্ট নিযুক্ত হন। এ সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানাবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লণ্ডনস্থ সোসাইটিতে প্রেরণ করা হবে। কিন্তু ভূম্যধিকারী সভাই কিছুদিন পরে আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল।

টম্‌সনের আবির্ভাবে কল্‌কাতায় এমন একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'ল যাকে ভারতে নিয়মানুগ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগের সম্মান দেওয়া চলে। পূর্ব্ববর্ত্তী সভা দু'টিতে নব্যদল যোগদান করেন নি। ভূম্যধিকারী সভায় তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। কারণ নব্যদলের প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তথাপি তাঁরা রাজনীতি চর্চ্চা বন্ধ করেন নি। জ্ঞানান্বেষণের কর্ম্মী-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 'সম্বাদ ভাস্কর' সংবাদপত্র প্রকাশ করে তাতে প্রগতিশীল মতামত ব্যক্ত করতে লাগ্‌লেন। নব্যদল শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্য্যে এ সময় মন নিবিষ্ট করেছেন। ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভায়

(Society for the Acquisition of General knowledge) ইতিহাস, সাহিত্য, শিক্ষা ও রাষ্ট্রবিধি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে রীতিমত তাঁদের প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা দান প্রভৃতি চলেছে। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এ সভার স্থায়ী সভাপতি ও প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক। জর্জ্জ টম্‌সনের ভারতবর্ষে পৌঁছোবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই ১৮৪২,এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারিচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামে একখানা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। রামগোপাল এর পূর্ব্বে 'জ্ঞানান্বেষণ'ও কিছুদিন পরিচালনা করেছেন। সংবাদপত্র দ্বারা নিঃস্বার্থ দেশ-সেবার এ-ই মনে হয় প্রথম নিদর্শন। কারণ পরিচালকগণ আরম্ভেই লিখ্‌লেন যে, এ পত্র দ্বারা তাঁরা অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা করেন না। গ্রাহক বৃদ্ধি হলেই কাগজ মাসে একবারের অধিক প্রকাশ করা হবে। বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতির সঙ্গে রাজনীতি চর্চ্চাও এর উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য হ'ল। টম্‌সনের কল্‌কাতা পদার্পণের পূর্ব্বেই ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে এখানি পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। এখানে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। নব্যদল রাজনীতিতে প্রগতিপন্থী হলেও ব্রিটিশ শাসনকে সর্ব্বদা স্বীকার করে নিয়েই তবে সবরকম আলোচনা চালিয়েছেন। নূতন সোসাইটির নিয়মের মধ্যেও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রে নব্যদলের মতামত সমর্থন না করলেও তিনি তাঁদের প্রতি খুবই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যে অনেকটা তাঁদের উপর নির্ভর করছে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এঁদের সঙ্গে জর্জ্জ টম্‌সনকে প্রথম সুযোগেই পরিচিত করিয়ে দিলেন। ১৮৪৩ সালের ১১ই জানুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এক অধিবেশনে জর্জ্জ টম্‌সনকে সভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান হ'ল। টম্‌সনও তাঁর ভারত আগমনের উদ্দেশ্য সভায় বিবৃত

করলেন। নব্যদল উদ্দেশ্য জেনে তাঁর দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁদের তরফে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় জনসভার অনুষ্ঠানের ভার নিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলা বাগান বাড়ীতে প্রতি সোমবার জনসভার অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতি সপ্তাহে অতদূরে যাওয়া সম্ভব নয়, অথচ টম্সনের বক্তৃতা শোন্‌বার জন্য তাদের আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে দেখে চিৎপুর ও কলুটোলার মোড়ে ৩১নং ফৌজদারী বালাখানায়ই তাঁরা সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। ভারতবাসীদের আর্থিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা ও তার প্রতীকার সম্বন্ধে টম্সনের মতামত জান্‌বার জন্য সভাগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান নানা সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হতেন ও তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন। ইংরেজদেরও কেউ কেউ সভায় উপস্থিত থাক্‌তেন। ক্রমে নিয়মিত ভাবে রাজনীতি আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। নব্যদল টম্সনের নেতৃত্বে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হলেন। ১৮৪৩, মার্চ্চ মাস থেকে টম্সনের সাহায্যে বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরও পাক্ষিক হতে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।

ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার নিয়ে কল্‌কাতায় তোলপাড় উপস্থিত হ'ল। ১৮৪৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এক অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বঙ্গদেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত ও পুলিশের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আগেকার মত এবারেও সভার অধিবেশন হিন্দু কলেজ ভবনেই হ'ল, এবং স্থায়ী সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সভাপতিত্ব করলেন। কলেজ অধ্যক্ষ ক্যাপ্‌টেন ডি. এল. রিচার্ডসন অভ্যাগতরূপে সভায় উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন প্রবন্ধের যেখানে সরকারী কার্য্যকলাপের কঠোর সমালোচনায়

প্রবৃত্ত সেখানটা শুনে রিচার্ডসন আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। তিনি দক্ষিনারঞ্জনকে বাধা দিয়ে অন্যান্য কথার মধ্যে বল্‌লেন যে, কলেজ-গৃহকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হতে দেবেন না। তাঁর এরূপ বাধাদানে সভাপতি তারাচাঁদ দৃঢ় অথচ স্পষ্টভাবে বল্‌লেন যে, রিচার্ডসন কলেজ-গৃহের অধ্যক্ষ নন্, তিনি নিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র। তাঁকে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করতেই হবে। যদি প্রত্যাহার না করেন তা হলে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের এবং প্রয়োজন হলে গবর্ণমেণ্টের গোচরেও এ ব্যাপার নেওয়া হবে। দক্ষিণারঞ্জন ও সভার সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠ সভাপতি নির্দ্দেশ সমর্থন করেন। রিচার্ডসন বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। সভা সেদিনের মত বন্ধ হয়।

ব্যাপার কিন্তু এখানেই মিট্‌ল না। এ নিয়ে 'ইংলিশম্যান', ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি সংবাদপত্র নব্যদলকে নানারূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও গালমন্দ করতে লাগ্‌ল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এ দলের নেতা, কাজেই তারা এর নাম দিল 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌সন' বা 'চক্রবর্ত্তী চক্র'। ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া খুব গম্ভীরভাবেই লিখ্‌লে যে, এরূপ রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সামারাঙে (যবদ্বীপ) দিলে, কম করে হলেও, বক্তাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ত! এ বক্তৃতাটি পরবর্ত্তী ২রা ও ৩রা মার্চ্চ সংখ্যা 'বেঙ্গল হরকরা'য় সম্পূর্ণ মুদ্রিত হ'ল। হরকরা সম্পাদক নিজ মন্তব্যে এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, এর মধ্যে এমন কিছুই নেই যার জন্ম নব্যদল এরূপ নিন্দাভাজন হতে পারেন। রিচার্ডসন রাজনীতিতে ছিলেন 'টোরী' বা রক্ষণশীল দলভুক্ত। তবে তিনিও ডিরোজিওর ন্যায় সুশিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে কবি ও সমালোচক। তাঁর শিক্ষায় ছাত্রদের মনে সত্যিকার সাহিত্য-প্রীতি জন্মে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ রিচার্ডসনের ছাত্র।

'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' সাপ্তাহিকে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি স্থায়ী রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গঠনেরও আয়োজন হ'ল। কয়েকটি সভায় আলোচনার পর প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বলিত কয়েকটি প্রস্তাব রচিত হয়। প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম এই—প্রথম, সম্যক্‌ আলোচনা ও বিচার বিবেচনা করে সভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে যে, ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায়, আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ব্রিটিশ জাতির সঙ্গে এর যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাতে প্রত্যেকেরই স্বজাতির উন্নতি বিধানে ও স্বদেশের সাধারণ কল্যাণ সাধনে যথাসাধ্য যত্নবান্‌ হওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, এই সভার মতে ব্যক্তিগত চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে কল্‌কাতায় এমন একটি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক ও যুক্তিযুক্ত যার ভিত্তিমূলে সমবেত হয়ে ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং [ভারতীয়] ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উন্নতি, কর্ম্মদক্ষতা ও স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলেই বন্ধুভাবে একযোগে কার্য্য করতে পারবেন। তৃতীয় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সোসাইটি স্থাপিত হবে। এর উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ ভারতীয় লোকদের এবং এখানকার আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠানগুলি, এবং ধনোৎপাদক উপায়গুলির বর্ত্তমান সত্যকার অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ সংগ্রহ ও প্রচার করা এবং শান্তিপূর্ণ ও বৈধ এমন সব উপায় অবলম্বন করা, যার ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর মঙ্গল ও তাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ হওয়া সম্ভব। চতুর্থ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিশ্বরীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, তাঁর শাসন মান্য করে এবং ভারতীয় আইন-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সোসাইটির সকল কার্য্য পরিচালিত হবে। সোসাইটি আইনসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বা যা করলে সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে এরূপ সকল কর্ম্মেরই বিরোধী। পঞ্চম, সাবালক ব্যক্তি মাত্রেই সোসাইটিকে

নির্দ্দিষ্ট হার মত চাঁদা দিলে এবং উপরের মূলবিধিগুলি মান্য করলে সভ্য হতে পারবেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কাউকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হবে না। ষষ্ঠ প্রস্তাবে কয়েকজন সভ্য নিয়ে সাময়িকভাবে একটি কর্ম্মনির্ব্বাহক কমিটি প্রতিষ্ঠার কথা হয়।

২০শে এপ্রিল তারিখে এক জনসভায় এ সকল উদ্দেশ্য নিয়ে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপিত হ'ল। ইংরেজ ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এতে যোগদান করে। যে চারজনের উপর প্রারম্ভিক কার্য্যের (সাধারণকে সোসাইটির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন, কর্ম্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি) ভার দেওয়া হ'ল তাঁরা ছিলেন—তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র। সোসাইটির সভাপতি হলেন জর্জ্জ টম্‌সন ও সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। অন্যান্যদের মধ্যে চন্দ্রশেখর দেব ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হলেন। টম্‌সন ছাড়া তিন জন ইংরেজও এর কর্ম্মীসভ্য হন। জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে ভারতের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই এর সভ্য হতে পারতেন। তবে, আগে যেমন বলেছি, এই নব্যদলও ব্রিটিশ সম্পর্ক বিবর্জ্জিত ভারত-শাসনের কল্পনাও করতে পারেন নি। পূর্ব্ব যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিশৃঙ্খলা বিদূরণ করে যারা দেশ ও সমাজে শান্তিস্থাপন করেছে তাদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার রামমোহন রায়ের মত তাঁরাও কর্ত্তব্য বলেই ধরে নিয়েছিলেন। সোসাইটীর মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় তৃতীয় প্রস্তাবে। ২০শে এপ্রিলের প্রকাশ্য সভায় এ প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও সমর্থন করলেন চন্দ্রশেখর দেব। তারাচাঁদ সম্পর্কে টম্‌সন বলেন, "এরূপ আগ্রহশীল নীরব বিনয়ী কর্ম্মী খুব কমই দৃষ্ট হয়। তাঁর মহৎ কর্ম্মৈষণা ও সাধুতা প্রত্যেকেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।" বাস্তবিক তারাচাঁদই নব্যদলের নেতৃত্ব করেন এবং এজন্য ইউরোপীয় সমাজের ওরূপ

নিন্দাভাজন হন। টম্‌সনের বক্তৃতাও ইউরোপীয়েরা ভাল চক্ষে দেখে নি। এক শ্রেণীর ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রতি বক্তৃতারই বিরুদ্ধ সমালোচনা হতে লাগ্‌ল। 'ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়া' লিখ্‌লে, 'এখন দু'দিকে বজ্রধ্বনি হচ্ছে—পশ্চিমে বালাহিসারে ও কল্‌কাতায় ফৌজদারি বালাখানাতে!' এ উপহাসের মূল লক্ষ্য টম্‌সনের বক্তৃতা। বস্তুতঃ এই সময়ের পর থেকেই ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। 'ফ্রেণ্ড অফ্‌ ইণ্ডিয়া' নব্যদলের রাজনীতি আদৌ পছন্দ করত না। ১৮৪৩ সালের ২০শে নবেম্বর বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর শেষ সংখ্যা বার হবার পর বন্ধ হয়ে গেলে এ কাগজখানিকে বিদ্রূপ করে বলেছিল, 'এদেশবাসী দ্বারা কোন মঙ্গল কার্য্য করান যে কতখানি অসম্ভব তার প্রমাণ টম্‌সন এদেশে থাক্‌তে থাক্‌তেই পেয়ে গেলেন!'

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিও বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের গোড়াপত্তন হলেও যাদের উপর এর রসদ জোগাবার ভার সেই শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে সম্মিলিত কর্ম্মৈষণা তখনও তেমন জন্মে নি। আবার মধ্যবিত্ত সমাজের লোক বলে নেতৃবর্গকেও পরিবার প্রতিপালনের জন্য বিষয়ান্তরে লিপ্ত হতে হয়েছিল। যা হোক্‌, এই সোসাইটি স্থাপনের কয়েক বছর পরে কল্‌কাতায় এমন একটি নূতন সঙ্ঘের পত্তন হ'ল যা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন-না-কোন প্রকারে রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারা অব্যাহত রাখ্‌তে সক্ষম হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবিত কালেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন ও তার মুখপত্র স্বরূপ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানই বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করাতে খুবই সাহায্য করেছিল। হিন্দুশাস্ত্র-সার বেদান্তের উপর ভিত্তি করে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনে মন দিলেন। সংস্কারপ্রিয়

শিক্ষিত দলের ভিতরও ধীরে ধীরে স্বজাতি-প্রীতি ও স্বধর্ম্ম-প্রীতি জাগ্‌তে থাকে। একটি বিষয়ে প্রথমতঃ এর প্রমাণও পাওয়া গেল। খ্রীষ্ট-তত্ত্ব প্রচারে সরকারের সহানুভূতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ সময় ভারতীয়দের ভিতর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ধূম পড়ে যায়। অনেক বঙ্গ সন্তান (যেমন, সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল মধুসূদন দত্ত) তখন নানা প্রলোভনে পড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজ এতে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে প্রাচীনে-নবীনে মিলন হ'ল। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতা যুবক নবীনপন্থী দেবেন্দ্রনাথ রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মুখপাত্র প্রাচীনপন্থী বর্ষীয়ান্ রাজা রাধাকান্ত দেবের হাতে হাত মিলিয়ে এর প্রতিরোধে তৎপর হলেন। তারাচাঁদ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ নব্যদল ও মতিলাল শীল, রাজা রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দেব প্রভৃতি প্রাচীনগণ এজন্য সভা আহ্বান করলেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সন্তানদের জন্য খ্রীষ্টানী-ভাবমুক্ত একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করা। এজন্য প্রচুর অর্থও সংগৃহীত হয়, এবং প্রস্তাবিত স্কুলটির নাম দেওয়া হয় 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'। ১৮৪৬ সালের ১লা মার্চ্চ এই বিদ্যালয়টির কার্য্যারম্ভ হয়। কোষাধ্যক্ষ প্রমথনাথ দেব ও আশুতোষ দেবের নামে সুপ্রসিদ্ধ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে সব টাকা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৪৮ সালের প্রথম দিকে ব্যাঙ্কটি ফেল হওয়ায় বেশীর ভাগ টাকাই নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যালয়টির আর বিশেষ উন্নতি হয়নি বটে, কিন্তু সকলের সমবেত চেষ্টায় যে একদা সুফল ফল্‌তে পারে বাঙালী মনে এ বোধ জাগ্‌তে অধিক বিলম্ব হ'ল না। এ সময়কার আর একটি ব্যাপারও ভারতীয়দের একযোগে কাজ করতে বিশেষ ভাবে প্রবুদ্ধ করে। এ কথাই এখন বল্‌ব।

———

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন

দ্বিতীয় যুগ

জন এলিয়ট ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন (অনেকে ভ্রমক্রমে 'বেথুন' উচ্চারণ করেন) তখন ছিলেন বড়লাটের আইনসচিব। এই বীটনই বর্ত্তমান বীটন কলেজের পূর্ব্বজ বীটন স্কুলের প্রধান উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বীটন সাহেব ১৮৪৯ সালে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দের আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের উদ্দেশ্যে চারটি আইনের খসরা রচনা করেন। 'মফস্বলবাসী' বল্‌ছি এইজন্য যে, তখন বহু ভারত-প্রবাসী বেসরকারী ইউরোপীয় কল্‌কাতা থেকে শত শত মাইল দূরে মফস্বলে ব্যবসা ও কৃষিকর্ম্ম পরিচালনায় ব্যাপৃত ছিল। ১৮১৩ ও ১৮৩৩, বিশেষতঃ শেষোক্ত সালের সনন্দের পর থেকে ইউরোপীয়েরা অধিক সংখ্যায় এদেশে এসে বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত হতে থাকে। নীল চাষ করতে গিয়ে অনেকে জমিদারী তালুকদারীও কিনে ফেলে। অনেকে জাহাজ কোম্পানী, ষ্টীমার কোম্পামী প্রভৃতিও স্থাপন করলে। চা-এর ব্যবসার দিকেও অনেকে ঝুঁকে পড়ে। কল্‌কাতার সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া মফস্বলের কোন ফৌজদারি আদালতে তাদের বিচার হওয়া ছিল এতদিন আইন-বিরুদ্ধ। ইউরোপীয়েরা যখন সংখ্যায় অল্প ছিল তখন এতে তেমন কোন আপত্তির কারণ ছিল না। এখন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য নূতন আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হ'ল। মফস্বলে নিরঙ্কুশ হয়ে তাদের উপদ্রবও বেড়ে চলেছিল এই সময়। সরকারী কর্ম্মচারীরাও এ উপদ্রবের হাত থেকে অনেক সময় রেহাই পেত না। মফস্বল সহরের বিচারালয়ে শ্বেত-কৃষ্ণ বিচার-বৈষম্য তুলে দিতে প্রথমে চেষ্টা করেন লর্ড মেকলে, কিন্তু সে চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। এ-সময়কার

প্রস্তাবিত আইনগুলির মর্ম্ম এইরূপ—প্রথম, মফস্বলের ফৌজদারি আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার-প্রথা প্রবর্ত্তন, দ্বিতীয়—ইউরোপীয় প্রজাবৃন্দের অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ, তৃতীয়—জুরীদ্বারা বিচার, ও চতুর্থ—সরকারী কর্ম্মচারীদের সংরক্ষণ। এই খসরাগুলি প্রচারিত হলে ইউরোপীয় সমাজে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। অধিকার সঙ্কোচের আভাসেই তারা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠ্‌ল। কল্‌কাতার ইউরোপীয়গণ ও ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দের পূর্ণ সমর্থন দিলে ও খসরাগুলি প্রত্যাহার করতে সরকারকে পরামর্শ দিলে। তারা সকলে মিলে এ আইনগুলির নাম দিলে 'ব্ল্যাক এক্ট্‌' বা 'কাল আইন'। গবর্ণমেণ্টও এ সম্বন্ধে আর অধিক দূর অগ্রসর হলেন না। আইন খসরাতেই পর্য্যবসিত হ'ল !

প্রস্তাবিত আইনগুলি যে বিধিবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক ভারতীয়েরা তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিল। তাদের মুখপাত্র হয়ে প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এর যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করে একখানা পুস্তিকা লেখেন। এতে ইংরেজরা তো তাঁর উপর চটেই আগুন। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রামগোপালের যোগ ছিল। তিনি ছিলেন কেরী-প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচার ও হর্টিকালচার সোসাইটির ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট বা সহকারী সভাপতি। এখানে ইংরেজদের প্রাধান্য ছিল। কাজেই পুস্তিকা-প্রকাশের পরবর্ত্তী অধিবেশনেই তারা রামগোপালের নাম সোসাইটি থেকে একেবারে খারিজ করে দিলে !

ন্যায় হোক্‌ অন্যায় হোক্‌, ইউরোপীয়দের এতাদৃশ আন্দোলন-সাফল্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভারতবাসীরাও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। আগেকার জমিদার বা ভূম্যধিকারী সভা ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়েছে। এখন তাঁরা

গবর্ণমেণ্টের দৌর্ব্বল্যও বিশেষ করে পরখ করলেন। সনন্দ আসন্ন; এজন্য তখন থেকেই শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হওয়াও আবশ্যক ছিল। এরূপ না হলে বিশেষ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। কাজেই সত্বর একটি সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে নেতৃবর্গ অগ্রণী হলেন। কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর ১৮৫১, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন বা দেশহিতৈষিণী সভা স্থাপিত হ'ল, আর এর সম্পাদক হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর মাত্র দেড় মাস পরে ২৯শে অক্টোবর ঐ একই উদ্দেশ্যে আর একটি সঙ্ঘ বা সভা স্থাপিত হয়; নাম হয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভা। এ সভার সম্পাদকও হলেন দেবেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় সভা যে প্রথম সভারই পরিণতি তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এ সভার উদ্যোক্তাদের ভিতরে সনাতনী, রাম-মোহন-পন্থী, ডিরোজিও শিষ্যদল সকলকেই দেখ্‌তে পাই। এদিক দিয়ে আগেকার বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, ভূম্যধিকারী সভা, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রত্যেকের চেয়েই এ সঙ্ঘটি অধিকতর প্রতিনিধিমূলক ও গণতান্ত্রিক। এবারকার সভার বিশেষত্ব, এতে একজনও ইউরোপীয় সভ্য নেওয়া হয় নি; আর সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ রক্ষাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। রাজা রাধাকান্ত দেব হলেন এর সভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ সহকারী সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) সহকারী সম্পাদক, এবং রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত সদস্যবর্গ। এসোসিয়েশন যে নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি সভায় পরিণত হতে চাচ্ছে—

এসব কথা প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১১ই ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক রূপে বোম্বাই ও মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট পত্রে পরিষ্কার রূপে বিবৃত করলেন। তিনি স্পষ্টই লিখ্‌লেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ শীঘ্রই ফুরোবে। কাজেই এ সময়, নূতন সনন্দ দানের পূর্ব্বে, কল্‌কাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে দেশ-শাসনের সুব্যবস্থা ও নিজেদের উন্নতি-সাধন উদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের পক্ষে শাখা বা মূল সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। আর বর্ত্তমানে সকলেরই একযোগে একটি নিখিল ভারতীয় সভার মারফত পার্লামেণ্টে আবেদন-পত্র পাঠান অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তবে যদি একটি সমিতিতে মিলে মিশে কাজ করা অসুবিধাজনক হয় তবে তাঁরা যেন নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতিনিধিমূলক সভা স্থাপন করে ঐরূপ কাজ সুরু করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ব্বেই বাঙালী-মনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটী নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা উদিত হয়েছিল এ দ্বারা তা পরিষ্কার জানা যাচ্ছে। মাদ্রাজে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি শাখা ও বোম্বাইয়ে একটি স্বতন্ত্র সভা অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসময় স্থাপিত হ'ল। বোম্বাইয়ের সভা প্রতিষ্ঠিত হয় নৌরজী ফুরদুঞ্জি ও দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায়।

১৮৫৩ সালে কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার কথা। কাজেই এসোসিয়েশনের প্রথম কার্য্য হ'ল—শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। তখনকার দিনে ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাক্‌বার রেওয়াজ ছিল না। কাজেই কোন আইন বা বিধি সম্পর্কে ভারতবাসীর মতামত জানাবার একমাত্র উপায় ছিল পার্লামেণ্টে বা বড়লাটের নিকট বা উভয়ত্র 'পিটিশন' বা আবেদন-পত্র পেশ। এসোসিয়েশনও একখানা আবেদন-পত্র রচনা করে পার্লামেণ্টে দাখিল করলেন। এই আবেদন-

পত্রখানি নানা কারণে স্মরণীয়। প্রথমেই এর রচয়িতা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কথা আমাদের স্মরণ করতে হয়। তিনি দরিদ্রের সন্তান। অর্থাভাবে কৈশোরেই লেখাপড়া ছেড়ে দশ টাকা মাইনের এক চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে কোম্পানীর মিলিটারী অডিট বিভাগে মাত্র পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম নিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই চার শ' টাকার একটি পদে উন্নীত হন। এই পদে নিযুক্ত থাক্‌তেই ১৮৬১, ১৪ই জুন তারিখে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত ঘটে। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাঙালার মনে নব বল ও নূতন আশার সঞ্চার করে গেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক রূপে তখনকার গবর্ণমেণ্টের নীতি সুপথে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করেছিলেন হরিশ্চন্দ্র; নীল হাঙ্গামার কালে দরিদ্র নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে লেখনী চালিয়ে অত্যাচারী নীলকরদের ভয় ও ঈর্ষ্যারও তিনি কারণ হয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্র যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য হলেন তখন হিন্দু পেট্রিয়ট জন্ম গ্রহণও করে নি। তিনি তখনও অপরিচিত ব্যক্তি। তবে ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজের চেষ্টায় রীতিমত অধ্যয়নের ফলে নানা বিষয়ে এতখানি পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই সভ্যগণ তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন। পার্লামেণ্টের এই আবেদন-পত্র রচনার ভার পড়ল তাঁর উপর। এই আবেদন-পত্রখানি ভারতবাসীর রাষ্ট্র-চেতনার ইতিহাসের এক উৎকৃষ্ট দলিল। রামমোহন রায়ের পরে, তখন পর্য্যন্ত এমন ব্যাপক ভাবে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের কথা অন্য কোথাও ব্যক্ত হয় নি। কংগ্রেসকে বহুদিন পরেও উল্লিখিত দাবিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে হয়েছে।

ভারত সুশাসনের উপায় ও ভারতীয়দের রাষ্ট্রীয় অধিকারের পথ নির্দ্দেশ—এ দুটি বিষয় ছিল এই আবেদন-পত্রের মূল কথা। আবেদনে

রাজনারায়ণ বসু
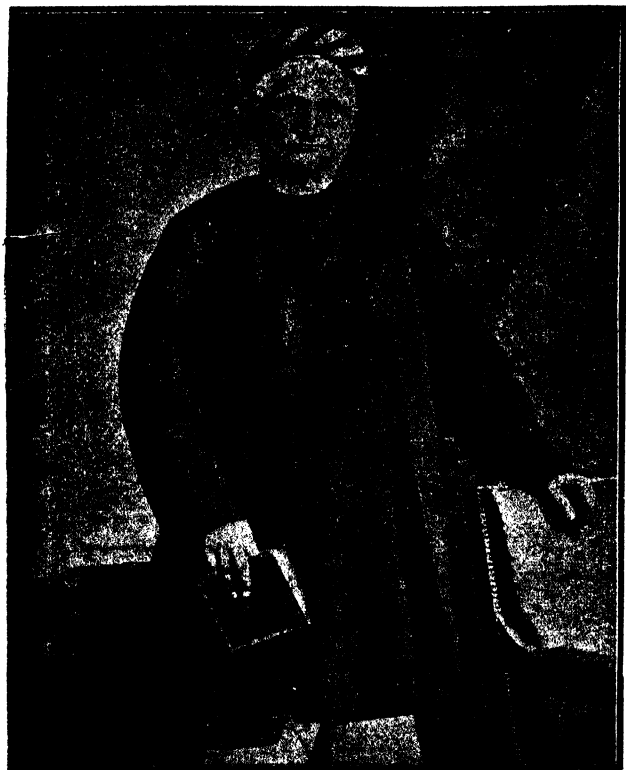
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্পষ্ট ভাষায় বলা হ'ল যে, মোগল আমলের চেয়ে কোম্পানীর আমলে প্রতি বছর বেশী রাজস্ব আদায় হচ্ছে। মোগল যুগে সব অর্থ ই ভারতবর্ষে থেকে যেত ও তা ভারতবর্ষের উপকারে আস্‌ত। এখন রাজস্বের এক মোটা অংশ বিলাতে চলে যায়, ফলে কোম্পানীর শাসনে ভারতবাসী ক্রমেই গরিব হয়ে পড়ছে। পূর্ব্বকার সনন্দ দান কালে দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগের কথা ছিল, কিন্তু তা কার্য্যে পরিণত করবার কোন চেষ্টাই হয় নি। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভারতবাসী যতখানি সুবিধা-সুযোগ লাভের আশা হৃদয়ে পোষণ করেছিল, এতদিনে তা অংশতঃও পূর্ণ হয় নি। বিচারে বৈষম্য, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা, প্রবলের উৎপীড়নে দুর্ব্বলের ধন-প্রাণ নাশ, লবণ ও আফিমের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রভৃতি অ-ব্যবস্থা দূর করে, এবং ভারতীয় শিল্প উৎপাদনে উৎসাহ দিয়ে, ভারতবাসীর শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করে ও উচ্চতন সরকারী পদগুলিতে ভারতবাসী নিয়োগ করে—শাসন ব্যবস্থা সুসংস্কৃত করবার দাবিও এ আবেদন-পত্রে জানান হ'ল। শাসন-প্রণালীর সংস্কারের কথাও এই সর্ব্বপ্রথম এসোসিয়েশন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানালেন। পরবর্ত্তীকালে শাসন-বিভাগ ও বিচারবিভাগকে আলাদা করবার যেমন কথা ওঠে, এ সময়ও তেমনি শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদকে স্বতন্ত্র করে গঠনের প্রস্তাব চলে। কারণ, বড়লাটের শাসন-পরিষদই ছিল তখনকার দিনে ব্যবস্থা-পরিষদ, আর এ-ই সব আইন কানুন তৈরী করত। এসোসিয়েশন এবারে ব্রিটিশ শাসিত উপনিবেশগুলির আদর্শে একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা-পরিষদের প্রস্তাব করলেন। তাঁদের প্রস্তাব—পার্লামেণ্টের ও বড়লাটের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে, একটি নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের উপর আইন-কানুন করবার ক্ষমতা অর্পণ করা হোক্। আর চারটি প্রদেশ (বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) থেকে প্রত্যেকটির পক্ষে তিন জন

করে বার জন নেতৃস্থানীয় ভারতীয় সদস্য, প্রত্যেক প্রদেশের সরকার তরফে একজন করে চার জন সিবিলিয়ান সদস্য ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত সভাপতি এই সতর জন নিয়ে ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হোক্। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভারতবাসীদের মতানুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কথা এ প্রস্তাবের মধ্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে, কারণ ব্যবস্থা-পরিষদে অধিকাংশই (সতর জনের মধ্যে বার জন) ভারতীয় সদস্য থাক্‌বার প্রস্তাব করা হয়। এরূপ প্রস্তাব যে পার্লামেণ্টে গৃহীত হবে না তা হয়ত জানাই ছিল, কিন্তু আবেদন-পত্রে যে-সব মূল নীতি ব্যক্ত হয়েছে তার কোন কোনটি পার্লামেণ্ট গ্রহণ না করে পারেন নি। সনন্দে শাসন-পরিষদ ও ব্যবস্থা-পরিষদ আলাদা করে দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল মাত্র বার জন সদস্য নিয়ে—আর এতে রইলেন স্বয়ং বড়লাট, জঙ্গীলাট, চারজন শাসন-পরিষদের সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য একজন জজ, ও চারটি প্রাদেশিক সরকারের মনোনীত চার জন প্রতিনিধি। ভারতবাসী মনোনয়নের কোন কথাই এতে রইল না।

আবেদনে উল্লিখিত কোন কোন মূল নীতি আংশিক ভাবেও যে সনন্দে গৃহীত হয়েছিল তার আভাষ এই মাত্র আমরা পেলাম। এসোসিয়েশন কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ অত দীর্ঘ দিন রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সনন্দের মেয়াদ কমিয়ে এবারে মাত্র দশ বছর করা হ'ল। কোম্পানীর শাসন-ক্ষমতাও ঢের সঙ্কুচিত হ'ল। বিলাতে ডিরেক্টর সভার পরিবর্ত্তে ভারত-শাসন ব্যবস্থা কার্য্যতঃ বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোলই নিয়ন্ত্রিত করতে লাগলেন। সিবিলিয়ানি চাকৃরিতে কোম্পানীর খুশীমত লোকই এতদিন নিয়োজিত হত। এবারে ব্যবস্থা হ'ল, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যে-সব ছাত্র উৎকৃষ্ট বিবেচিত হবে তাদেরই এ চাকুরি দেওয়া হবে। বাংলা দেশ এতকাল বড়লাটের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। অতঃপর অন্যান্য

প্রদেশের মত একেও লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণরের অধীন করা হ'ল। সার্ ফ্রেডারিক হ্যালিডে বঙ্গের প্রথম লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বহু বছর যাবৎ ভারতবাসীর মুখপাত্রস্বরূপ শিক্ষা,শাসন, বিচার, লবণ নীলাম, পুলিশ, নীল-চাষ প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে অভাব-অভিযোগ ও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ সরকারে নিবেদন করেন এবং কোন কোন বিষয়ে সফলকামও হন। এখানে বলে রাখি যে, শতাধিক বর্ষ অধিকার ভোগের পর, ১৮৬২-৬৩ সালে সরকার লবণের ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এতদিনে সরকারী নীতির ফলে স্বদেশীয় লবণ শিল্প একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। লিভারপুল লবণ তখন বাঙালী রসনার স্বাদ জোগাতে ব্যস্ত! দীর্ঘকাল ভারতবাসীরা লবণ তৈরীর অধিকার থেকে কিন্তু বঞ্চিতই ছিল। বহু আন্দোলন ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের ফলে ইদানীং তারা এই মৌলিক অধিকার আংশিকভাবে ফিরে পেয়েছে। কিন্তু সে কথা পরে আস্‌বে।

সনন্দ দানের পর বছর, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে বোর্ড অফ্‌ কণ্ট্রোলের তরফে সার্ জন উড নূতন করে শিক্ষানীতির নির্দ্দেশ দিয়ে 'এডুকেশান ডেস্‌প্যাচ' নামে একখানা দলিল বিলাত থেকে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন। এই দলিলে বর্ণিত নীতিগুলি পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করেছে বলা চলে। উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা—এতে স্তর ভেদে বিবিধ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অবিলম্বে কল্‌কাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করে উচ্চ শিক্ষা যেমন নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হ'ল তেমনি ভারতবাসীদের স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য নূতন আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা জানিয়ে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষারও মোড় ফিরিয়ে দিলে। মেকলের শিক্ষা-নীতিতে শুধু

ইংরেজী শিক্ষাই সমর্থন পেয়েছিল। এবারে ইংরেজী বাংলা উভয়বিধ শিক্ষারই নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। আরও ঠিক হ'ল, বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীগুলিতেই শিক্ষার বাহন হবে ইংরেজী, নিম্ন শ্রেণীগুলিতে শিক্ষার বাহন বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষাই থাক্‌বে। বাংলাদেশে আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের ভার প্রথম যাঁর উপর পড়েছিল তাঁর নাম আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত। তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দীন অবস্থা থেকে নিজ প্রতিভাবলে তিনি ক্রমে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে সমাসীন হন। তখন স্পেশাল ইন্‌স্পেক্টর রূপে কয়েকটি জেলায় আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভারও তাঁর উপর পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বিদ্যালয় স্থাপন করেই ক্ষান্ত হন নি, শিক্ষা-পদ্ধতিও যথাসাধ্য নিজ মত অনুযায়ী চালিত করলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গসাহিত্যের সেবায় রত হয়েছিলেন। নব পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাও নিয়োজিত হ'ল। পাঠ্য-পুস্তক রচনা করে শৈশব থেকে বাঙালী মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চারে তিনিই প্রথম প্রবৃত্ত হন। এর পর শিক্ষা-ডিরেক্টরের সঙ্গে মতানৈক্য হেতু তিনি অধ্যক্ষ ও ইন্‌স্পেক্টরী পদ দুই-ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। এসময় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও শিক্ষা পদ্ধতি নূতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে সুরু হ'ল। ১৮৫৭ সালে কল্‌কাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভারত-বাসীদের মধ্যে যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ক্রমে তা সম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। আর এই ঐক্যবুদ্ধি উন্মেষের ফলেই কংগ্রেসের উৎপত্তি।

ইউরোপীয় ও ভারতবাসীদের মধ্যে বিচার-বৈষম্য বিদূরণ ও বিচারের সুব্যবস্থা সম্পর্কে এসোসিয়েশন পূর্ব্বাপর অবহিত ছিলেন। আর এর প্রতিষ্ঠার মূলেও তো রয়েছে এই ব্যাপার। বিচার-বৈষম্য ভারতবাসীর

কণ্ঠে কাঁটা হয়ে রইল। মফস্বলে ইউরোপীয়েরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, যত দুঃখ-ভোগ ভারতবাসীরই ললাট-লিখন। গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৬-৫৭ সালে বিচার বৈষম্য দূর করবার উদ্দেশ্যে আইন করার চেষ্টা করলে। ইউরোপীয় সমাজ এবারে ধুয়া তুলল, মফস্বলের ফৌজদারি আদালতে তাদের বিচার হোক্ আপত্তি নেই, কিন্তু কোন ভারতবাসী তাদের বিচার করতে পারবে না। এর প্রতিবাদে ১৮৫৭, ৯ই এপ্রিল তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আনুকূল্যে এক জনসভার অধিবেশন হয়। রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইউরোপীয় সমাজের এই অন্যায় আবদারের প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেন। এসময় জর্জ্জ টমসন আবার ভারতে এসেছিলেন। তিনিও সভায় বক্তৃতা করলেন। কিন্তু একমাস পরেই সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের এ উদ্যম বন্ধ হয়ে যায়। যা হোক্, এর পাঁচ বছর পরে ১৮৬১ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদ আইন করে ইউরোপীয়দের বিশেষ অধিকারগুলি তুলে দিলেন। এবারেও কিন্তু ভারতবাসীকে তাদের বিচারের অধিকার পেলে না!

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীল-চাষ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, এর আভাষ আগে পেয়েছি। কিন্তু একক ভাবে নীল-চাষীদের পক্ষ সমর্থন তাঁরা করেন নি। ভূস্বামী, প্রজা উভয় মিলেই এই সভা। শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ জড়িত বলে তাঁরা হয়ত তখন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। পরে কিন্তু এই এসোসিয়েশন জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়ই ষোল আনা অবহিত হয়েছেন। আর সিপাহীবিদ্রোহের সময় থেকেই এঁর এই অধোগতি আরম্ভ। ১৮৫০-১৮৬০ এই দশ বৎসরে বাংলাদেশে নীল-চাষ সম্পর্কে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য ও হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক প্রজা-দরদী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবল

ইউরোপীয় সমাজ ও ততোধিক প্রবল ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্র-গুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে নীল-চাষীদের অপরিসীম দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শিক্ষিত সাধারণের গোচরে আনলেন। নীল-চাষের ইতিহাস নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের কালিমায় রঞ্জিত। কোম্পানীই প্রথমে নীল-ব্যবসা চালাতে সুরু করে। পরে তার ব্যবসাধিকার বিলুপ্ত হলে বেসরকারী শ্বেতাঙ্গরা এ ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। আইন করে নীলকরদের খুব সুবিধাও করে দেওয়া হ'ল। চুক্তিভঙ্গ করলে নীল-চাষীরা ফৌজদারী আইনে দণ্ডিত হবে এ-ও একবার স্থির হয়! এ আইন অবশ্য পরে রদ হয়ে যায়। কিন্তু আবার ১৮৬০ সালের একাদশ আইনে সাময়িকভাবে হলেও, পুনরায় চুক্তিভঙ্গের জন্য দণ্ড দানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

নীল-চাষ সম্বন্ধে ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় বলেছিলেন যে, এতে জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু এর পর কুড়ি বছরের মধ্যেই নীল-চাষীর দুঃখ চরমে ওঠে। মফস্বলের ফৌজদারী আদালত ইউরোপীয়গণের বিচারের অধিকারী ছিল না। গরীব চাষীরা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা পরিচালনে অপারগ। এজন্য ইউরোপীয়দের উপদ্রব ক্রমে অতি মাত্রায় বেড়েই চল্‌ল। নীলকরদের অত্যাচারের কথা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সমাচার দর্পণে' প্রথম উল্লিখিত হতে দেখি। এর সাতাশ বৎসর পরে ১৮৪৯ সালে সুলেখক অক্ষয় কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নীলকরদের অত্যাচারের কথা বিশদভাবে প্রকাশ করেন। পরে হরিশ্চন্দ্র এ উদ্দেশ্যে তাঁর সবল লেখনী ধারণ করলেন। নীল-চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রুশিয়ার 'সার্ফ' ও আমেরিকার নিগ্রো দাসদের সামিল হয়ে পড়েছিল। নীলকর কর্তৃক টাকা দাদন দিয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে চাষীকে প্ররোচনা, আশানুরূপ ফসল না হলে পর বছর নীল উৎপাদনে তাকে বাধ্য করান, নীল চাষের জন্য দশ বৎসরের

চুক্তি, পুরুষানুক্রমে নীলকরের আজ্ঞাবহ প্রজায় পরিণতি, নীলকরদের জমিদারী তালুকদারী ক্রয়, প্রজাবৃন্দের দ্বারা বেগার খাটান, চুক্তিভঙ্গকারী চাষীদের নীলকুঠীতে কয়েদ রাখা, প্রভৃতি যত রকম রকম অত্যাচার উৎপীড়ন হতে পারে নীলকররা নির্ব্বিঘ্নে নীল-চাষীদের উপর তা সবই করতে লাগ্‌ল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় থেকে মফস্বল অঞ্চলে নীলকরগণ কেউ কেউ এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করে! এতেও প্রজাদের ক্লেশ বহুগুণে বর্দ্ধিত হ'ল। ১৮৬০ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত নীল কমিশনে সাক্ষীরা যে-সব সাক্ষ্য প্রমাণ দিলেন তা থেকে এ সকলই প্রমাণিত হয়ে গেল।

বারাসত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যাস্‌লি ইডেন (ইনি পরে বঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর হয়েছিলেন) এই মর্ম্মে একটি পরোয়ানা জারি করেন যে, নিজ জমিতে নীল চাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন, এজন্য তাদের উপর জোরজুলুম করা বে-আইনী। এতে আশ্বস্ত হয়ে ১৮৫৯ সালে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ দরিদ্র, নিরক্ষর চাষী একযোগে ধর্ম্মঘট করে। বহু স্থানে চাষ হলেও নদীয়া, যশোহর ও পাবনাতেই নীল-চাষ হ'ত খুব বেশী। যশোহর চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক দু'জন গ্রাম্য লোক নীল-চাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ তখন মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক। তিনিও এ ধর্ম্মঘট পরিচালনায় তাঁদের খুব সহায়তা করেন। চাষীদের এই ধর্ম্মঘট বা জোট নীল হাঙ্গামা নামে অভিহিত। নীল-চাষীদের এই ধর্ম্মঘট কিরূপ ব্যাপক ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল তা ঐ সময়ের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর সার্‌ জন পিটার গ্রাণ্ট কমিশনে প্রদত্ত তাঁর নিজ মন্তব্যে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, "তিনি যখন যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলার মধ্যবর্ত্তী কুমার ও কালীগঙ্গার ষাট-সত্তর মাইল নদীপথ ষ্টীমারযোগে

অতিক্রম করেন তখন সহস্র সহস্র নর-নারী ও শিশু এই নদী দুটির দু'ধারে উপস্থিত হয়ে সমবেতভাবে তাঁকে এই প্রার্থনা জানায় যে, নীল চাষ যেন তাদের দিয়ে আর করান না হয়।" এ দৃশ্য গ্রাণ্টের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। নীল কমিশনে সাক্ষ্য দান কালে হরিশ্চন্দ্রও বলেন, "আমি এই নীল হাঙ্গামা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত পর্য্যালোচনা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমান নীল-চাষ প্রজার অহিতকারী। আমি এই মত বহুবার প্রকাশ করেছি।"

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ডাকবিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে বিভিন্ন জেলায় অবস্থান কালে নীলকরদের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেন। তাঁর এই অভিজ্ঞতার ফল—বাংলা ১২৬৭ সালের (১৮৬০ ইং) আশ্বিন মাসে প্রকাশিত 'নীল-দর্পণ'। এর ইংরেজী অনুবাদ পাদ্রী জেম্স লঙ প্রকাশ করেন। এজন্য সুপ্রিম কোর্টে নীলকরদের তরফে লঙের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু হয়। বিচারে তাঁর এক মাস কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হ'ল! জরিমানার টাকা দিয়ে দেন স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। লঙ সাহেব এই অনুবাদ কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়ে করান। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, মধুসূদনও এই কারণে তাঁর সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় হরিশ্চন্দ্রও মারা গেলেন। বাঙালী তার দুঃখ, কবিতায় প্রকাশ করলে—

"নীল বানরে সোণার বাঙ্গলা করলে এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হ'ল কারাগার॥"

বাঙালী মনে নীল কমিশন খুবই আশার সঞ্চার করেছিল বটে, কিন্তু এর সুপারিশগুলি তেমন আশাপ্রদ হয় নি। নীল কমিশন নীল-চাষের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন! তাঁরা নীলকরদের অত্যাচার নিবারণের জন্য সাক্ষাৎভাবে কোন নিয়ম বেঁধে দেন নি। তবে বিচারের সুব্যবস্থার

জন্য গবর্ণমেণ্ট জেলাগুলিকে বেশীসংখ্যক মহকুমায় বিভক্ত করে সর্ব্বত্র আদালত প্রতিষ্ঠা করলেন। পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হ'ল। দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাধে এজন্য স্থানে স্থানে সৈন্যও মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হ'ল। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হয়ে নীলকরগণ অতঃপর চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা রুজু করায় বহু নীল-চাষী একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায়। তথাপি, নীলকরদের উৎপীড়ন পরে যে অনেকটা কমে যায় তা ঐ ধর্ম্মঘটেরই ফলে বল্‌তে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৬৮ সালের অষ্টম আইন দ্বারা "নীলচুক্তি আইন" রদ করা হয়। ১৮৯২ সালে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত আরম্ভ হলে বঙ্গে নীল চাষ একেবারে কমে গেল।

সিপাহী বিদ্রোহের কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করেছি। এর কথা একটু পরেই আলাদা করে বল্‌ব। এ সময় জীবনের সর্ব্ব বিভাগকেই রাজনীতির প্রেরণা সচল করে দিলে। সমাজ-সংস্কারে, সাহিত্য-রচনায়, সংবাদপত্র-পরিচালনে, ধর্ম্মালোচনায় (সংকীর্ণ অর্থে), নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠায়, সভা-সমিতি স্থাপনে বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে এক নব যুগের সঞ্চার হ'ল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় সমাজে তখন মধ্যমণি। তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিপত্তি হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনে নিয়োজিত। তখন সাহিত্যিক ও সম্পাদক রূপে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গদেশে সুপরিচিত। বাঙালী-মনে নবযুগের প্রভাবের ছাপ ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র এই কবিতাংশটিতে সুস্পষ্ট,—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?
কোটী কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায় হে, স্বর্গ-সুখ তায়।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে রামনারায়ণ) ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত নাটক রচনায় লিপ্ত। বাঙালী নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের নাটকগুলি অভিনয় করছে। দীনবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' নাটক লিখেই বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে গুপ্ত-কবির নিকট শিক্ষানবীশী করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা গদ্যে নূতন যুগের সূচনা করতে ব্যস্ত। ইংরেজী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদনায় যেমন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাংলা 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনে তেমনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করলেন। প্রকৃত পক্ষে, দ্বারকানাথই বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনে নবযুগের প্রবর্ত্তক। বীটন সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, হেয়ার স্মৃতি-সভা প্রভৃতির সঙ্গে সে যুগের দেশী-বিদেশী সংস্কৃতির প্রধান উপাসকমণ্ডলী যোগ দিয়েছিলেন। কল্‌কাতায় যেমন বেসরকারী চেষ্টায় বীটন বালিকা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল, এর কয়েক বছর পরে সুদূর মফস্বলেও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরকারী নির্দ্দেশে বহু স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বেসরকারী ভাবে যাঁরা এবিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন রাড়ুলী নিবাসী হরিশ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ও কুমারখালী নিবাসী কৃষ্ণধন মজুমদার তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হরিশ্চন্দ্র বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতৃদেব। এইভাবে নানা স্থানে বাঙালীরা স্কুল কলেজও প্রতিষ্ঠা করলেন। এক কথায় বল্‌তে গেলে শহর ও পল্লীবাসীর জীবনে নূতন সাড়া এল এ যুগে।

সিপাহী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিবিধ প্রচেষ্টা, নীল-আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে এইমাত্র বল্‌লাম। এসময়কার আর একটি প্রধান ঘটনা—প্রধানতম বল্‌লেও হয়—সিপাহী বিদ্রোহ বা সিপাহী যুদ্ধ। বিদ্রোহ শুধু কোম্পানীর সিপাহী সৈন্যদের মধ্যেই হয় নি, এ আরও ব্যাপক ছিল। তথাপি সিপাহীদের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হয় বলেই হয়ত এর এই নাম দেওয়া হয়ে থাক্‌বে। এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টা বা নীল 'বিদ্রোহে'র সঙ্গে সিপাহী যুদ্ধের পার্থক্য মূলগত। প্রথম দুটি আন্দোলন চলেছিল গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে। গবর্ণমেণ্টের নিকট ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে এই আশায়ই এদের পরিচালকগণ সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের প্রকৃতি হ'ল ভিন্ন রূপ। এ একেবারে ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেই নিজের প্রভু হতে চাইলে, আর ইংরেজ-শাসনের ভিত্তিমূলে প্রবল ভাবে ধাক্কা দিলে। পলাশীর যুদ্ধের পর এক শ' বৎসরের মধ্যে কোম্পানী ধীরে ধীরে তার পক্ষপুট বিস্তার করেছে সর্ব্বত্র। তারা একার্য্যে যে বাধা পায় নি তা নয়, কিন্তু এরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের জনগণ কখনো এমন করে তাদের বাধা দান করে নি। ইংরেজ এবারে বুঝ্‌তে পারলে ভারতবাসীর চিত্ত জয় করার ধারণা বৃথাই। ভারতবাসীদের মধ্যে এমন শক্তি এখনও রয়েছে যা সংহত হলে ইংরেজের শ্রেষ্ঠতর শক্তিকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তে পারে।

সিপাহী বিদ্রোহ বা যুদ্ধ আরম্ভ হয় ১৮৫৭ সালের ১০ই মে তারিখে। এর পর পুরা দু' বছর এই বিদ্রোহ চলে। কোম্পানীর সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত হয় এর দমনের জন্য। সিপাহী যুদ্ধ সম্পর্কে বহু পুস্তক-

লিপিবদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও এর খাঁটি ইতিহাস লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। কেউ কেউ সিপাহী বিদ্রোহকে 'নেশনাল ওয়ার অফ্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' বা স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেছেন। একথা স্বীকার করতে কিন্তু অনেকেরই আপত্তি হবে। এ সময় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীরা বিশিষ্ট শ্রেণীর সহযোগে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের স্বাধীনতা লাভ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। ওরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাহত হয়ে অন্যের আশ্রয়ে তা সিদ্ধিরই চেষ্টায় ছিল। একে সুতরাং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও তুলনা করা চলে না। সামান্য 'চা' নিয়ে বিবাদ সুরু হলেও আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র আমেরিকান উপনিবেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন, এর শাসনে ব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার। লর্ড ডালহৌসীর আমলে (১৮৪৮-১৮৫৬) রেলপথ, তার ও টেলিগ্রাফ বিভাগ সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই এর সাহায্যে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ তখনও জাগ্রত হবার অবকাশ পায় নি। তখন বিদ্রোহ দমনে এ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হ'ল খুব। উক্ত মতবাদের সপক্ষে কিন্তু একটা কথা বলা যায়। দিল্লীর বাদশাহের কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃতির মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় আদর্শের নির্দ্দেশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাদশাহ্ তখন নামে মাত্র পর্য্যবসিত হয়েছেন। আর বাদশাহী শাসন যুগোপযোগীও নয়। ও সময়ে নবজাতীয়তার মন্ত্রে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উদ্বুদ্ধ। শিক্ষিত ভারতবাসীর মনকেও এ তখন স্পর্শ করেছে। পূর্ব্ব যুগের সামন্ত-তন্ত্রের তখন বিদায় নেবারই পালা। যে কারণেই হোক্, এই নবজাতীয়তা-বোধ বিদ্রোহীদের মন স্পর্শ করে নি। যারা এই জাতীয়তা-বোধে আগেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে তাদের সমর্থনও বিদ্রোহীরা পেলে না। এ প্রকারান্তরে ইংরেজেরই

সহায় হ'ল। এ দুটি কারণেই তাদের সঙ্ঘশক্তি তখন বিরাট্ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

লর্ড ডালহৌসী জবরদস্ত শাসক। ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি দুটি প্রধান পথ বেছে নিলেন। প্রথমতঃ তিনি এই নীতি প্রচার করলেন যে, অপুত্রক রাজাদের রাজ্য তাদের মৃত্যুর পর সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে। এ নীতির বলে চার বছরের মধ্যে সাতারা, ঝাঁশী ও নাগপুর ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হয়ে গেল! ১৮৫৬ সালে কুশাসনের ওজুহাতে ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করে সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশ দখল করলেন। একদিকে যেমন এই কার্য্য চল্‌ল, অন্যদিকে তেমন যাদের সাহায্যে ইংরেজ প্রভুত্ব সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই দেশীয় সৈন্যদল পুনর্গঠনে তিনি মন দিলেন। কোম্পানীর সৈন্যদল তখন তিন পল্টনে বিভক্ত—বাঙালী পল্টন, বোম্বাই পল্টন ও মাদ্রাজী পল্টন। এর মধ্যে বাঙালী পল্টনই ছিল সুশিক্ষিত ও সকলের সেরা। কারো কারো ধারণা যে, বাঙালী সিপাহী নিয়েই বাঙালী পল্টন গঠিত। এ কিন্তু ঠিক্ নয়। আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারের উচ্চ শ্রেণীর, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নিয়েই বাঙালী পল্টন গঠিত হয়েছিল। 'বেঙ্গল আর্মি' বা বাঙালী পল্টন নামটিই আজও হয়ত ভ্রান্তির উদ্রেক করছে। তখনকার দেশীয় সৈন্যদের নাম সাধারণভাবে দেওয়া হ'ত সিপাহী।

বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু, ও খুবই ধর্ম্মপ্রবণ। তাদের ভিতরে ঐকমত্য ও একপ্রাণতা যথেষ্ট। এজন্য তাদের দাবি কোম্পানীকে বহু বার অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়েছে! সিন্ধু যুদ্ধে ব্রহ্ম যুদ্ধে ও সমুদ্রপারের কোন কোন যুদ্ধে যেতে বাঙালী পল্টন অস্বীকার করে ও কর্ত্তৃপক্ষও তাদের উপর জোর জুলুম বা জিদ না করে তাদের অস্বীকৃতি মেনে নেয়। গুর্খা ও শিখ যুদ্ধে—উভয়কেই

ইংরেজরা হারিয়ে দেয় এই বাঙালী পল্টনেরই সাহায্যে। এ যুদ্ধগুলিতে বাঙালী পল্টনের সিপাহীদের কৃতিত্ব এত বেশী যে, গুর্খা ও শিখেরা ইংরেজের অপেক্ষা বাঙালী পল্টনের সিপাহীদেরই পরম শত্রু বলে জ্ঞান করতে শিখ্‌লে। লর্ড ডালহৌসী এহেন বাঙালী পল্টনের মর্য্যাদা স্বীকারে যেমন অরাজী ছিলেন, এর উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে থাকৃতে তাঁর মন তেমনি সায় দিলে না। তিনি ১৮৫৬ সালে নিয়ম করলেন—যারা নিরাপত্তিতে কোম্পানীর আদেশ পালন করবে এমন লোককেই বাঙালী পল্টনে নেওয়া হবে,আর শিখ ও গুর্খাদেরও ইতিমধ্যেই সৈন্যদলে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাঙালী পল্টনের সিপাহীরা এতে প্রমাদ গণলে। দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের যোগ ঘনিষ্ঠ। কাজেই এ কথা আগ্রা-অযোধ্যা ও বিহারেও রাষ্ট্র হতে বিলম্ব হ'ল না। বহু সিপাহীর জন্মভূমি হ'ল রাজ্যচ্যুত অযোধ্যার নবাব ও ঝাঁশীর রাণীর দেশ। পেশোয়ার-পোষ্য-পুত্র নানা সাহেবও বিঠৌরের বাসিন্দা হয়েছেন। ডালহৌসী তাঁর ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কাজেই উত্তর ভারতের সামন্ত নৃপতি ও সাধারণ অধিবাসী উভয়ের মধ্যেই কোম্পানীর উপর বীতশ্রদ্ধা দেখা দিল। সিপাহীদের অন্ন মারা যাবার উপক্রম হওয়ায় এই বীতশ্রদ্ধা অতি দ্রুত জাতক্রোধে পরিণত হয়। ক্ষেত্র অনেক আগেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, টোটায় চর্ব্বি সংযোগ—সে উপলক্ষ্য মাত্র। ডালহৌসীর ভারতবর্ষ-ত্যাগের পরেই বিদ্রোহ সুরু হয়। কাজেই তাঁর শাসন-নীতিই যে প্রত্যক্ষ ভাবে এর জন্য দায়ী তা বুঝ্‌তে বিলম্ব হ'ল না।

এক শ্রেণীর মুসলমানদের ভিতরও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। দিল্লীর বাদ্‌শাহের প্রতি কোম্পানীর ব্যবহার কখনো তারা ক্ষমা করতে পারে নি। ওয়াহাবী সম্প্রদায় এই বিদ্বিষ্ট মনোভাব থেকেই ইন্ধন সংগ্রহ করে। ঐ সময় ব্রিটিশ-বিদ্বেষী মুসলমানরাও দলে দলে

সিপাহীদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ও ইউরোপীয় সমাজ কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ও পরেও বিদ্রোহের জন্য মুসলমানদের প্রধানতঃ দায়ী করেছিল। শাসন-যন্ত্রও মুসলমানদের বিরোধী হয়েই ছিল বহুদিন।

এ সময়কার সিপাহী ও ব্রিটিশ পক্ষের অনাচার-অত্যাচার আজ ইতিহাসের বস্তু। কিন্তু এর পরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে-সব নীতি অনুসরণ করলেন তা একদিকে যেমনি হ'ল বহু দূর প্রসারী, অন্যদিকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ-বৈষম্যও ষোল কলায় পূর্ণ করে দিলে। কর্ম্মে ও লক্ষ্যে এরা ক্রমে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ল। এর সূচনা আমরা কয়েক বছর পূর্ব্বে বীটন সাহেবের বিচার-বৈষম্য বিদূরণ আইনগুলির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আন্দোলন চরমে উঠে। বাংলায় ব্যাপক জঙ্গী আইন প্রবর্ত্তন ও বাঙালীকে নিরস্ত্রীকরণের জন্য জিদ, ব্রিটিশ সেনানী বিদ্রোহীদের উপর যে-সব অত্যাচার করে ও যেভাবে তাদের গ্রাম ও ঘরবাড়ী দাহ করতে সুরু করে তার সমর্থন—এ সব কারণে 'ইউরোপীয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তাদের ভারতীয় বিদ্বেষ এত বেড়ে গেল যে, নূতন বিধিবদ্ধ প্রেস আইন অনুযায়ী 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া'কে গবর্ণমেণ্ট জাতিবিদ্বেষ প্রচারের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন ও সম্পাদককে এই প্রথম অপরাধের জন্য দণ্ড দান না করে সতর্ক করে দিলেন! বলা বাহুল্য, সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড ক্যানিং এক বছরের জন্য প্রেস আইন ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন! তিনি ইউরোপীয়দের পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, এজন্য তারা তাঁর উপরে অগ্নিশর্ম্মা হ'ল ও সভা করে তাঁকে বিলাতে ফিরিয়ে নেবার জন্য পার্লামেণ্টে দরখাস্ত করতেও কসুর করলে না! ইউরোপীয়েরা

লর্ড ক্যানিংকে বিদ্রূপ করে 'ক্লেমেন্সি ক্যানিং' বা 'দয়াময়ী ক্যানিং' উপাধি দিলে। এক দিকে ইউরোপীয় সমাজ যখন তাঁর উপর খড়্গহস্ত, এবং ভারতীয়েরা ভয়বিহ্বল, তখন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ক্যানিং-এর উদার নীতির সমর্থন করেন ও যারা জিঘাংসা বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমগ্র ভারতীয়দের উপর কঠোর আইন প্রয়োগের দাবি জানাচ্ছিল তাদের ঘোর প্রতিবাদ করতে থাকেন। বিলাতের মন্ত্রীসভাও কিন্তু লর্ড ক্যানিংকেই সমর্থন করলেন ও বিদ্রোহের মধ্যেই পার্লামেন্টে আইন পাস করিয়ে (১৮৫৮, ২রা আগষ্ট) নিজেরা ভারতশাসন-ভার গ্রহণ করলেন। পরবর্ত্তী ১লা নবেম্বর রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন যে, ভারতবাসীদের ধর্ম্মের উপরে অতঃপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না, এবং রাজ-সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োজিত করা হবে। এ ঘোষণা দ্বারা একদিকে যেমন শিক্ষিত ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা হ'ল অন্যদিকে অশিক্ষিত জনগণের ধর্ম্মপ্রবণতাও মেনে নেওয়া হ'ল। ঘোষণায় আর একটি বিষয়ও স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হ'ল।

সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম প্রত্যক্ষ কারণ—কারণে-অকারণে লর্ড ডালহৌসী প্রবর্ত্তিত নীতি অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির ব্রিটিশ এলাকাভুক্তি। এই নীতি একেবারে বর্জ্জন করবার কথা হ'ল অতঃপর। দেশীয় রাজন্যবর্গও সুতরাং এই ঘোষণা পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন ও বিদ্রোহীদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কোন দেশীয় রাজ্যকেই একেবারে ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত করা হয় নি। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কুশাসনের ও ষড়যন্ত্রের ওজুহাতে বহু রাজন্যকে গদিচ্যুত করেছেন, কিন্তু রাজ্য গ্রাস না করে তাদের বংশধর বা কোন

শিশিরকুমার ঘোষ
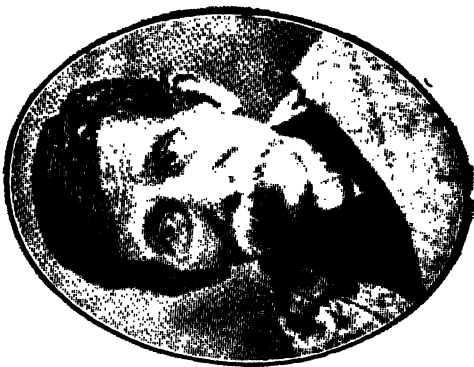
মতিলাল ঘোষ

রাসবিহারী ঘোষ

নিকট আত্মীয়কে গদিতে বসিয়েছেন। এই নীতির ফলে যে একটি বিসদৃশ ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে তার কথাও এখানে একটু বলি। ভারতবর্ষে এখন ছোট বড় বহু শত দেশীয় রাজ্য বর্ত্তমান। কাশ্মীর, মহীশূর, হায়দ্রাবাদের মত বড় রাজ্য, আবার পাঁচ-শ, হাজার একর জমি পরিমিত পল্লী নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যও রয়েছে এখানে। এসব রাজ্যের অধিকাংশেরই গঠনতন্ত্র, শাসনপ্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি সেকেলে ধরণের। ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে বর্ত্তমানের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চল্‌ছে তখন পার্শ্ববর্ত্তী অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের লোকেরা মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার মধ্যেই বর্দ্ধিত হচ্ছে। এর ফলে এক ভারতবর্ষের মধ্যেই দু'রকম—একটি অত্যগ্রসর আর একটি অনগ্রসর —ভারতের সৃষ্টি হয়েছে! ভারতের ঐক্যবদ্ধ শাসনের পক্ষে এ এক ভীষণ বাধা। গত পঁচাশী বছর ধরে যে ব্রিটিশ নীতি অনুসৃত হয়েছে— বর্ত্তমান পরিণতির জন্য তাকেই দায়ী করতে হয়।

পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ হ'ল তাতে আগেকার বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল তুলে দেওয়া হ'ল। এ সময় সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট বা ভারত-সচিবের পদ সৃষ্টি হয়। তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রীসভারও একজন মন্ত্রী হবেন এবং পনের জন অতিরিক্ত সদস্য নিয়ে গঠিত ইণ্ডিয়া কৌন্সিল নামক পরামর্শদাতৃ সভারও কর্ত্তা থাক্‌বেন। আর ভারতে বড়লাট ভাইস্‌রয় বা রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসন কার্য্য পরিচালনা করবেন। অতঃপর ভারত-সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতা খুবই বেড়ে গেল।

সিপাহী বিদ্রোহ কিন্তু শাসন-যন্ত্রে একটা মৌলিক পরিবর্ত্তনও সাধন করলে। একটি কোম্পানীর হস্ত থেকে ভারত শাসন ও সংরক্ষণ কার্য্য ইংলণ্ডেশ্বরের নামে সমগ্র ব্রিটিশ জাতিই এবারে গ্রহণ করলে। গ্লাড্‌ষ্টোনের আমল পর্য্যন্ত বিলাতে এ একটি দলীয় প্রশ্ন রইলেও,

ভারত-শাসন ক্রমে সমগ্র জাতিরই দায়িত্ব হয়ে পড়ল। আর কথায়ই আছে, 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'। দশ জনের কাজ বলে ভারত-সচিব ও ভাইস্‌রয়ের উপর ভারত-শাসনের ভার ছেড়ে দিয়ে পার্লামেণ্ট নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেন। এজন্যই ভারতবর্ষ সম্পর্কে পার্লামেণ্টে বাৎসরিক আলোচনার দিনে কোরাম বা নির্দ্দিষ্ট ন্যূনসংখ্যক প্রতিনিধির অভাবে অধিবেশন বন্ধ করে দেবার উপক্রম হ'ত! ভারতবর্ষ-প্রবাসী বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ আগে কোম্পানীর আমলে ভারত-সরকারকে যেমন আলাদা করে ভাব্‌ত, অতঃপর তাদের পক্ষে তা আর সম্ভব হ'ল না। ভারতবর্ষ সমগ্র ইংরেজ জাতির সম্পত্তি, সুতরাং তাদেরও সম্পত্তি বলে তারা বিবেচনা করলে। ভারত-শাসনের সঙ্গে তাঁরা নিজেদের বিশেষ ভাবে জড়িয়ে ফেল্‌লে। গবর্ণমেণ্টও এতদিন তাদের কতকটা ভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখ্‌ত, এবং ভারতীয় ও ভারত-প্রবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে ব্যবহার-সাম্য স্থাপনে মধ্যে মধ্যে প্রয়াস পেত। অতঃপর শাসকগোষ্ঠী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের দায়িত্ব একই স্তরে উন্নীত বা অবনমিত হ'ল। তাদের উভয়েরই চক্ষে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী একটি স্বতন্ত্র বস্তু বলে প্রতিভাত হতে লাগ্‌ল। শুধু নীতির জন্যই ইংরেজ শাসকবর্গ একেবারে বেসরকারী ইউরোপীয়দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বল্‌লে ভুল হবে, আত্মরক্ষার প্রাথমিক তাগিদেও তারা এরূপ হতে হয়ত উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। প্রবাসী ইউরোপীয়দের স্বার্থও তারা ষোল আনা অটুট রাখ্‌তে বদ্ধপরিকর হ'ল। ইংরেজের ব্যবসা-স্বার্থ দেশে ইতিপূর্ব্বেই প্রবল হয়ে উঠেছে। সহরে ও মফঃস্বলে প্রচুর ইংরেজ বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। তাদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্ত্তৃপক্ষ দেশ রক্ষায় ও দেশ শাসনে তাঁদের সহযোগিতা পূর্ণ ভাবে আদায় করলেন। ইউরোপীয় স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে তাঁরা যতখানি আগ্রহ প্রকাশ করলেন ঠিক ততখানি তাঁরা ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাখ্‌লেন।

ব্রিটিশ জাতি ভারত-শাসন ভার গ্রহণের পর থেকে তার সামরিক নীতিও বদলাতে সুরু হয়। বিদ্রোহ দমনে ডালহৌসির অনুসৃত নীতিই কিন্তু কার্য্যকরী হয়েছিল। নব-গঠিত শিখ ও গুর্খাবাহিনী এবারে সরকারকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আগেই বলেছি, ব্রিটিশ নীতি-চাতুর্য্যের ফলে শিখ ও গুর্খারা ইংরেজের পরিবর্ত্তে নিতান্ত ভ্রমবশতঃই স্বদেশবাসী হিন্দুস্থানী সিপাহীদেরই শত্রু বলে গণ্য করত। লর্ড ডালহৌসী বিলাতে বসেই বিদ্রোহের প্রাক্কালে লিখেছিলেন, 'হিন্দুস্থানী সিপাহীদের বিরুদ্ধে শিখ ও গুর্খারা বিশ্বস্তভাবে শয়তানের ("devils") মতই লড়বে!' সেনাপতি ম্যান্‌স্‌ফিল্ড বলেন, 'শিখরা যে সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা না করে আমাদের পক্ষ নিয়ে লড়েছে তার কারণ এ নয় যে, তারা আমাদের খুব প্রীতির চক্ষে দেখে; তার কারণ এই যে, তারা বাঙালী পল্টনকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে!' সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার জন লরেন্স ছিলেন পঞ্জাবের চীফ কমিশনার। তিনিও নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, "নিঃসংশয়ে বল্‌তে পারি, বাঙালী পল্টনের ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐকমত্য আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হয়েছে। এই ত্রুটির (?) সংশোধন করতে হলে পল্টন প্রথমতঃ ইউরোপীয় সৈন্য ও দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন জাত থেকে সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা ভর্ত্তি করতে হবে।" সিপাহী বিদ্রোহের পর কুড়ি বছরের মধ্যেই ভারতীয় সৈন্যদলের এই 'ত্রুটি' (অর্থাৎ 'ঐকমত্য' ও 'ভ্রাতৃত্ববোধ') দূরীভূত হয়। সরকার বাঙালী পল্টনের চেহারা বদলে দিয়ে শিখ, পঞ্জাবী, মুসলমান, পাহাড়ী, জাঠ, রাজপুত ও গুর্খা দিয়ে সৈন্যদল পূর্ণ করলেন। ব্রিটিশ সৈন্যও অধিক সংখ্যায় ভারতে স্থিত হ'ল এর পর থেকে।

কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে সৈন্য সংগ্রহ করায় একদিকে সমগ্র ভারতীয় জাতি যেমন যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ থেকে গেল অন্যদিকে আইন বলে

তাদের নিরস্ত্র করে রাখবারও ব্যবস্থা হ'ল। ১৮৭৯ সালে সার রিচার্ড টেম্প্‌ল বোম্বাই-এর গবর্ণর ছিলেন। তিনি তখন বলেন, "ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর পূর্ব্বেকার যুদ্ধ করবার ক্ষমতা হ্রাস পেতে পেতে এখন একেবারে শূন্যে গিয়ে পৌছেছে। আর এ ব্যাপারটি আমাদের শাসনের একটি প্রধান রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত। সরকার এ বিষয়ে এতই সচেতন রয়েছেন যে, পঁচিশ বৎসরের অনুসৃত নীতির ফলেই ভারতবাসীরা সাধারণ ভাবে নিরস্ত্র হয়ে পড়েছে।" সিপাহী বিদ্রোহের অন্যূন পঁচাশী বছর পরে আজও ভারতবাসী জাতি হিসাবে নিরস্ত্র ও যুদ্ধ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ!

বিদ্রোহ উত্তর ও মধ্য ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও আগ্রা-অযোধ্যাই এর প্রধান লীলাক্ষেত্র। বিদ্রোহী সিপাহীদের ও ব্রিটিশ বাহিনীর নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে ও-অঞ্চল একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বিদ্রোহ প্রশমিত হ'ল বটে, কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আন্‌তে কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এসময় একজন বাঙালী তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করলেন। ডিরোজিও-শিষ্যদলের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে আমরা একজন উগ্র রাজনীতিক বলেই জানি। কিন্তু সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালীর রাজনৈতিক উগ্রতাও একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই প্রকাশ পেত। ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হোক্, এ তারা চাইত না। দক্ষিণারঞ্জনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মতবাদের উগ্রতাও কেটে গেছে। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং দক্ষিণারঞ্জনকে রায়বেরিলীর অন্তর্গত বাজেয়াপ্ত তালুক শঙ্করপুরের স্বত্ব দিয়ে আগ্রা-অযোধ্যায় প্রেরণ করলেন। ঐ প্রদেশের বাজেয়াপ্ত তালুকগুলি বুঝে বুঝে 'রাজভক্ত' লোকদের স্থায়ীভাবে প্রদান করা হয়েছিল। দক্ষিণারঞ্জন তালুকদারদের সঙ্ঘবদ্ধ

করে ১৮৬১ সালের নবেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ শহরে 'আউধ্ বা অযোধ্যা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। এসোসিয়েশনের মুখপত্র-স্বরূপ 'সমাচার হিন্দুস্থানী' নামে ইংরেজী ও 'ভারত-পত্রিকা' নামে হিন্দুস্থানী সংবাদপত্রও প্রকাশিত হ'ল। বিধ্বস্ত অযোধ্যার পুনর্গঠনে দক্ষিণারঞ্জনের কৃতিত্ব সামান্য নয়। তিনি পনর বছরের অধিক কাল সেখানে বাস করেন এবং নানা জনহিতকর কার্য্যে ব্রতী হন। ও-অঞ্চলের রাজনীতি-চর্চ্চারও মূলাধার ছিলেন তিনি। তাঁর কর্ম্মশক্তি নিয়োজিত না হলে এই দেশের দৈন্য-দশা ঘুচ্তে আরও বহুকাল হয়ত চলে যেত। সিপাহী-বিদ্রোহ দমনে যে নৃশংসতা অবলম্বিত হয় তার ফলে অযোধ্যার মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখনও তালুকদার ও প্রজা ছাড়া অন্য কোন শ্রেণী সেখানে খুঁজে পাওয়া ভার। তালুকদার শ্রেণী ক্রমে সরকার পক্ষে ঝুঁকে পড়ল; অতঃপর জনসাধারণের নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা অধিকাংশই অন্য প্রদেশ থেকে আগত, অযোধ্যা-প্রবাসী —নেহ্রু, সাপ্রু, কুঞ্জরু, মালবীয় প্রভৃতিরা।

সিপাহী যুদ্ধের অনাচারের ফলে ১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কোম্পানীর আমলে ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে কতকগুলি বড় বড় দুর্ভিক্ষ হয়ে গেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আমরা সকলেই জানি। ১৮০৩ সালে বোম্বাইয়ে ও ১৮৩৭ সালে মাদ্রাজে বড়রকমের দুর্ভিক্ষ হয়। তারপরে এল ১৮৬১ সালের দুর্ভিক্ষ। শিক্ষিত ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ সিপাহী যুদ্ধের সময় কর্ম্মে প্রকাশিত হবার সুযোগ পায় নি। এবারে তা যেন দুকূল উপ্চে পড়ল। দুর্ভিক্ষের ক্লেশ ভারতবাসীদের একভ্রাতৃত্ব ও একজাতীয়ত্ব বোধে অনুপ্রাণিত করতে লাগ্ল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ

এমনি একান্তভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থ-রক্ষায় অগ্রসর হ'ল যে, এর প্রতিক্রিয়া ভারতীয় মনে উপস্থিত হতেও অধিক বিলম্ব হ'ল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রভাব তখন অনেকটা কমে গেছে, কেননা শাসক শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ মিলিয়ে নিতেই তখন এ সচেষ্ট। তথাপি এ যতটুকু স্বাধীন সত্তা বজায় রাখ্‌তে পেরেছিল তা হরিশ্চন্দ্রের পরবর্ত্তী 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের চেষ্টায়। কৃষ্ণদাস প্রথমে এই এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে কৃষ্ণদাস পালকে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্ত্তী যুগে হিন্দু পেট্রিয়টে কৃষ্ণদাস পাল ও সোমপ্রকাশে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইংরেজের নূতন মনোভাব বিশ্লেষণ করে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বদেশবাসীকে সজাগ করে দেন।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' ১৮৬০ সালের মধ্যেই লিখে শেষ করেন। মেঘনাদ বধ বাঙালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন বা তার প্রশস্তিবাদ করতে তখন কেউই ভরসা পেত না। ক্যানিঙের আমলে যে প্রেস-আইন নূতন করে বিধিবদ্ধ হয় তার বলে সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা সবই বাজেয়াপ্ত হতে পারত। শিক্ষিত বাঙালী-মন তখন হয়ত এতটা অসাড় হয়ে পড়েনি, তাই সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ব্যর্থতার গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রামের বীরত্বও উপলব্ধি করতে পারত। হয় ত কেউ কেউ এ বীরত্ব লক্ষ্য করেছিল ও নির্জ্ঞানের এই অবদমিত বাসনাকে প্রাচীন কাব্যের ছাঁচে ঢেলে সাধারণের কাছে প্রকাশ করতেও চেয়েছিল। রাবণ-সন্তান রাক্ষস-বীর ইন্দ্রজিৎকেই মধুসূদন করলেন তাঁর কাব্যের নায়ক। আর জ্ঞাতিশত্রু বিভীষণ—যাঁর গোপন কথা প্রকাশের ফলে হ'ল রাক্ষস-

কুলের পরাজয়, তাঁকে সাজালেন দেশদ্রোহী করে! তিনি কাব্যছন্দে বিভীষণের দেশদ্রোহিতা ও জ্ঞাতিদ্রোহিতা ও তার বিষময় ফল স্বদেশবাসীদের চোখের সাম্‌নে ধরিয়ে দিলেন। সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে এ কাব্যখানি এতটা সমাদর লাভ করেছিল তার একটি কারণ, এতদিন পরে, মনে হয়, শুধু ছন্দের নূতনত্ব বা রসের গভীরতাই নয়, এর উপরে আর একটি জিনিষও রয়েছে, তা হ'ল বাঙালী তথা ভারতবাসীর তখনকার মনের কথা জোরের সঙ্গে প্রকাশ। বাঙালী বীর্য্যেরই উপাসক হতে চাইছে।

বাঙালীর নবজাতীয়তা বোধ

সিপাহী যুদ্ধের পরে সরকার তরফে সৈন্যদল সম্পর্কে যে-সব নীতি অনুসৃত হতে সুরু হয় এই মাত্র তার আভাষ দিয়েছি। একদিকে রাণী ভিক্টোরিয়ার উদারনীতিমূলক ঘোষণা, অন্যদিকে সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট রক্ষণশীল নীতি—দুয়ের মধ্যে পড়ে লর্ড ক্যানিং-এর পরবর্ত্তী ভাইস্‌রয় লর্ড এলগিন (১৮৬২-৬৩) বড় ফাঁপরে পড়লেন। তিনি ভারত-সচিব সার চার্লস উডকে (ইনিই প্রথম ভারত-সচিব বা সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট) লিখ্‌লেন যে, গণ্যমান্য ও সুশিক্ষিত ভারতবাসীদের যদি শাসন কার্য্যের অংশভাগী না করা হয় তা'হলে তাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে সরকারের ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াবেন। আর যদি শাসন-ব্যাপারে তাঁদের সহযোগিতা গ্রাহ্য হয় তা'হলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘট্‌বে। এই দোটানায় পড়ে, যাহোক্, কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, যতটা সম্ভব প্রভুত্ব নিজেদের হাতে রেখে কোন কোন অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বশীল পদে ভারতবাসিকে নিযুক্ত করা চল্‌বে !

তখন, কল্‌কাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষা সাধারণের অধিগম্য হয়েছিল। ভারতীয় যুবকগণ উচ্চতম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে পাশ্চাত্যের জ্ঞানগরিমা উপলব্ধি করলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি এযুগের বিশেষ কৃতি ছাত্র। কৃতি ছাত্রদের অনেকে স্বভাবতঃই সরকারী উচ্চ পদগুলিতে নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু ডেপুটি কলেক্টরী ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটীই ছিল তখন ভারতবাসির পক্ষে সর্ব্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য উন্মুক্ত পদ। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রথম শ্রেণীর মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তিও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটীর বেশী কিছু আশা করতে পারেন নি! সিবিলিয়ানী পদ বিলাতে সাধারণের নিকট উন্মুক্ত হলেও ভারতবাসীর পক্ষে এতদিন তার সুযোগ গ্রহণ আদৌ সম্ভবপর হয় নি। ১৮৬০ সালের পর থেকেই প্রথম বাঙালী যুবকগণ উচ্চ শিক্ষা লাভার্থে বিলাত গমন করতে আরম্ভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়ে ১৮৬৩ সালে সিবিলিয়ানী পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। তিনিই ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম আই-সি-এস। পশ্চিম ভারতে বোম্বাই প্রদেশে তাঁকে স্থিত করা হয়। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষও একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিলাত গিয়েছিলেন। মনোমোহন 'বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা'র সভ্য ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বন্ধু রামলোচন ঘোষের পুত্র। ইনি অল্প বয়সেই ইংরেজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ সালের আগষ্ট মাসে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা বের করে তাঁরই উপর এর সম্পাদনা ভার অর্পণ করেন। তখন মনোমোহনের বয়স মাত্র সতর বছর! সিবিল সার্বিস পরীক্ষার নিয়মাদি পরিবর্ত্তনের ফলে দু-দুবার চেষ্টা করেও মনোমোহন কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। অবশেষে ১৮৬৬ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা পাস করে স্বদেশে ফিরে আসেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাফল্য লাভের পর থেকেই বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সিবিলিয়ানী পরীক্ষার নিয়ম-কানুন এমনি ভাবে রদ-বদল করতে লাগলেন যে ভারতীয়দের পক্ষে এতে উর্ত্তীর্ণ হওয়া একরূপ দুর্ঘট হয়ে উঠ্‌ল। শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সরকারের অভিপ্রায় বুঝতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। পাদ্‌রি টমসন ও গ্যারাট এ সম্পর্কে বলেন যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ধ্বংসাবশেষের উপর যে শাসন-কাঠামো খাড়া করা হ'ল তাতে শিক্ষিত

ভারতবাসীর স্থান ছিল না বল্‌লেই চলে! মেজর ইভান্স বেল বলেন, ১৮৬২ সালে যখন হাইকোর্ট ও ব্যবস্থা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তখন এদেশীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদ দান সম্বন্ধে খুবই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে অতি সামান্যই কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একটি আইন করে কল্‌কাতার সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত এবং সুপ্রিম কোর্ট—সব নিয়ে ১৮৬২ সালে বর্ত্তমান কল্‌কাতা হাইকোর্ট গঠিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও এসময় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রযুক্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনও এ সময়ে তৈরী হ'ল।

১৮৬১ সালে পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়ান কৌন্সিল্‌স্ এক্‌ট' নামে ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদ সম্পর্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ আইন অনুসারে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ পুনর্গঠিত হ'ল। এবারে বড়লাটের শাসন-পরিষদে একজন পঞ্চম সদস্য নিযুক্ত হলেন। বড়লাট, জঙ্গীলাট ও শাসন-পরিষদের পাঁচজন সদস্য—এই সাতজন এবং বেসরকারী অন্যূন ছয় ও অনধিক বার জন মনোনীত সদস্য নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠনের কথা হয়। ১৮৭০ সালে আইন কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়ে স্থির হয়, যখন যে প্রদেশে পরিষদের অধিবেশন হবে তখন সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তাও এতে অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে যোগদান করবেন। বাংলা দেশ থেকে একজন সিনিয়র সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীকেও অতিরিক্ত সদস্য করে নেওয়া হয়। ১৮৬১ সালের আইনেই কিন্তু স্থির হ'ল, বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে অর্দ্ধেক হবেন ভারতীয়। এই আইন অনুসারে গঠিত প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্য মনোনীত হলেন পাতিয়ালার মহারাজা, কাশী-নরেশ এবং গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার্ দিনকর রাও। এতে কিন্তু একজনও বাঙালী গ্রহণ করা হয় নি।

পূর্ব্বে বোম্বাই ও মাদ্রাজে গবর্ণরের কৌন্সিল পরিষদ ছিল। আইন-প্রণয়নে তাদের ক্ষমতা ছিল বড়লাটেরই সমান। ১৮৩৪ সালের পার্লামেণ্টীয় আইনের তাদের এ ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়। অতঃপর সপরিষদ বড়লাট সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য আইন তৈরী করতে লাগ্‌লেন। পরে ১৮৬১ সালের আইন বলে আবার বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল। তারা প্রাদেশিক ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাপ্ত হলেও, প্রত্যেকটি আইনে বড়লাটের সম্মতি নেবার কথা হয়। এইরূপে শাসন স্পষ্টতঃই কেন্দ্রীভূত করা হ'ল।

বাংলার জন্য কিন্তু পূর্ব্বে কোনরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই ছিল না। এই আইনে এ প্রদেশে ব্যবস্থা-পরিষদ প্রবর্ত্তনের জন্য বড়লাটকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। বড়লাটের ঘোষণা অনুসারে ১৮৬২ সালের ১৮ই জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হ'ল। পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় পরবর্ত্তী ১লা ফেব্রুয়ারী। এ পরিষদে সদস্য সংখ্যা বার জন। এদের মধ্যে চার জন বাঙালী। সদস্যগণ দু' বছরের জন্য মনোনীত হতেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রমাপ্রসাদ রায়, নবাব আবদুল লতিফ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম মনোনীত সদস্য। এ বছরের ১লা আগষ্ট রমাপ্রসাদ রায়ের মৃত্যু হলে তাঁর স্থলে রামগোপাল ঘোষ ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। মনোনীত সদস্যদের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। শাসন সম্পর্কে কোনরূপ অভিযোগ বা প্রশ্ন পেশ করবার বা কোন বিষয়ে শাসন-পরিষদের সদস্যদের জবাবদিহি করাবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। নির্দ্দিষ্ট আইন বিধিবদ্ধ কালেই তাঁরা শুধু পরামর্শ দিতে পারতেন। তাঁদের কিন্তু ভোট-দানের অধিকারও এবারে স্বীকৃত হয় নি। অন্যান্য ব্যবস্থা-পরিষদের মনোনীত সদস্যদের বেলায়ও এই নিয়ম চালু হ'ল।

রমাপ্রসাদ রায় রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি

ঐ সময়ে হাইকোর্টের লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ পদে তিনিই প্রথম বাঙালী। সরকার ভারতবাসীদের মধ্যে তাঁকেই প্রথম হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁকে যখন এ সংবাদ দেওয়া হ'ল তখন তিনি মৃত্যু-শয্যায়। প্রকৃতপক্ষে, শম্ভুনাথ পণ্ডিতই প্রথম ভারতবাসী, যিনি হাইকোর্টে বিচারাসনে বসে প্রথম জজীয়তি কার্য্য করেছিলেন। ইনিও সে-যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। নবাব আব্দুল লতিফ ইংরেজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও তখন মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয়। কল্‌কাতার মহম্মডান এসোসিয়েশনের ছিলেন তিনি অন্যতম কর্ণধার। সার্ সৈয়দ আহ্‌মেদের পূর্ব্বেই তিনি স্বধর্ম্মীদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে বক্তৃতা করেছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রামগোপাল ঘোষ তখনকার বাঙালী-সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি। আমরা এতক্ষণে বহুবার এঁদের প্রসঙ্গ করেছি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী। তিনি ছিলেন রামমোহন রায় পন্থী। রাজনীতিতেও তিনি মধ্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। লর্ড ডালহৌসী প্রসন্নকুমারকে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ক্লার্ক এসিষ্ট্যাণ্ট পদে নিয়োগ করেছিলেন। তখন কোন ভারতীয় সদস্য পরিষদে না থাকায় আইন প্রণয়ন কালে তাঁর মতামত জেনে নেওয়া খুবই প্রয়োজন হ'ত। তিনি পরে এই পরিষদেও সভ্য হন। তিনি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর দানেই 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদের সৃষ্টি হয়েছে। ডিরোজিও-শিষ্যদের ভিতর রামগোপাল ঘোষ প্রসিদ্ধ বাগ্মী বলে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৪৭ সালেই বাগ্মিতার জন্য ইংরেজদের নিকট তিনি 'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস' বা ভারতীয় ডিমস্থিনিস আখ্যা পান! তাঁর স্বাদেশিকতা ছিল অনুপম। স্বদেশবাসীর স্বার্থরক্ষা কল্পে ব্যবস্থা-পরিষদে ও কল্‌কাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে রামগোপালের বক্তৃতা তাঁর মৃত্যুর বহু

পরেও লোকে স্মরণ করত। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তিনি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য ছিলেন।

রামগোপাল ঘোষের জীবিত-কালেই যে বাঙালী-প্রধান শিক্ষিত যুবক সমাজের চিত্ত অধিকার করেছিলেন তাঁর নাম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। তিনি ।নজেও কিন্তু তখনও যুবক। কিন্তু তাঁর কথা বল্‌বার পূর্ব্বে আর একজনের কথা আমাদের স্মরণীয়। তিনি হলেন প্যারীচরণ সরকার। মোহাবিষ্ট শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে ফিরিয়ে আন্‌তে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। প্যারীচরণ সরকার আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। বহু কাল বারাসতের সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে কার্য্য করে এই সময় কল্‌কাতার হেয়ার স্কুলে বদ্‌লী হয়ে আসেন। প্রথম ইংরেজী শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি যে পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলা বাল্য-শিক্ষার মত এখনও আদর্শস্থানীয়ই হয়ে আছে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি বাঙালী-সমাজের সব চেয়ে বেশী উপকার করেছেন মাদক-দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন সুরু করে দিয়ে। আধুনিক স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি প্রধান স্তম্ভ হ'ল এই মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন। জাতির চিত্তশুদ্ধি ও শক্তি লাভের পক্ষে এর আবশ্যকতা মহাত্মা গান্ধী শুধু স্বীকারই করেন নি, তিনি ভারতব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে শিক্ষিত অশিক্ষিত জন-সাধারণকে মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত করাতেও অনেকটা সক্ষম হয়েছেন। মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১৮৬১ সালে সর্ব্বপ্রথম সুরাপান নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু কল্‌কাতায় এইরূপ একটি সভা স্থাপন করে প্যারীচরণ সরকারই ১৮৬৩ সালে এই মারাত্মক ব্যাধির দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি সকলের আগে আকর্ষণ করলেন। তখনকার

শিক্ষিত সমাজ ছিল এ ব্যাধি দ্বারা ব্যাপক ভাবে আক্রান্ত। ডিরোজিও-শিষ্যদল ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে মদ্যপানেও রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কত লোককে যে মদ্যপানের আতিশয্যে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য বিলুপ্ত করে ইহলোক থেকে অকালে বিদায় নিতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রসিদ্ধ স্বদেশহিতৈষী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও অতিরিক্ত মদ্যপান হেতু নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র আটত্রিশ বৎসর বয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। কাজেই, প্যারীচরণ সরকারের প্রচেষ্টা এ সময় বাঙালী সমাজ, বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীর মহোপকার সাধন করেছিল। তিনি 'এডুকেশন গেজেট'-এর সম্পাদক ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ করে মাদক দ্রব্য নিবারক আন্দোলন চালাবার জন্য 'ওয়েল উইশার' নামে একখানি ইংরেজী ও 'হিতসাধক' নামে একখানি বাংলা পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তিনি ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে, ১৮৬৪ সালে 'টেম্পারেন্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই কার্য্যে সহায় হয়েছিলেন সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও রেভারেণ্ড সি, এইচ, এ, ডল সাহেব। সুরেন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন, প্যারীচরণের এ আন্দোলন যুবক সমাজের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়েছিল, ও এজন্য নিষ্ঠার সঙ্গে নানা সৎকর্ম্ম করতে যুবকগণ অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

এ সময়কার আর একটি প্রধান ঘটনা উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ। আগে বলেছি, দুর্ভিক্ষ ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাতে বিশেষ সাহায্য করেছে। হিন্দুর গৌরবময় যুগে বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য দুর্ভিক্ষের সময় দুর্গতদের সাহায্যকারীকে তাদের অন্যতম প্রধান বান্ধব বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসীরা পরস্পরকে পরস্পরের বান্ধব ভাবতে শেখে। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ এই বোধকে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট করে। এই দুর্ভিক্ষে চল্লিশ লক্ষ অধিবাসীর ঘরে

অন্নাভাবে হাহাকার ওঠে ও এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুর কবলে গিয়ে শান্তি লাভ করে! সরকারী কর্ম্মচারীদের অকর্ম্মণ্যতা দেখে শিক্ষিত ভারতবাসীর চোখ একেবারে খুলে গেল। তাঁরা নূতন করে নিজেদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করতে আরম্ভ করেন। অল্প কাল পরে সে যুগের বিখ্যাত লেখক ভোলানাথ চন্দ্র ও অন্যান্য মনীষীরা এর কারণ অনুসন্ধান কল্পে অর্থনীতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সমূহ বিপদ থেকে উড়িয়াদের জন্য বাঙালীরা যে উদ্যোগ-আয়োজন করেছিলেন তা অভূতপূর্ব্ব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে বাঙালীরা সাহায্য ভাণ্ডার খুল্‌লেন ও উড়িয়াদের দুঃখ নিবারণে অগ্রসর হলেন। তখন প্যারীচরণের গৃহ অন্নসত্রে পরিণত হয়েছিল।

বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধ—অন্য কথায় জাতীয়তাবোধ—এসময় কার্য্যতঃ পুষ্টিলাভ করে আরও একটি বিশেষ কারণে। আর এর মূলাধার হলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেই কেশবচন্দ্র বাঙালী যুবক সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে সমর্থ হন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম বলে শীঘ্রই তিনি পরিচিত হলেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিলেন। সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার, সকল বিষয়েই কেশব অগ্রণী। এসব নিয়ে কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতভেদ ঘটে। এই মতভেদ ১৮৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিচ্ছেদে পরিণত হয়। কেশবচন্দ্র পরে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। এর পূর্ব্বে তিনি বন্ধুগণ সঙ্গে নিয়ে সমগ্র উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করলেন ও বাংলা দেশের ঢাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও গেলেন। তাঁর নির্দ্দেশে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্রাহ্ম-সমাজের অনুরূপ নূতন সমাজও গঠিত হ'ল। কেশবচন্দ্রের সমগ্র ভারত

ভ্রমণ নানা স্থানের শিক্ষিত ভারতবাসীদের মনে একাত্মবোধ উন্মেষে বিশেষ সাহায্য করে। তাঁর বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ করে দিলে। কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সমগ্র ভারত ভ্রমণ এবং সকলকে ঐকমত্যে আনয়নের কার্য্যকর চেষ্টা এই প্রথম। এ ব্যাপারে জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হবার সুযোগ পেল।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার মূলক আন্দোলন শিক্ষিত ভারতবাসীর স্বজাতি-প্রীতিরও উদ্রেক করে। প্রথম, জাতিভেদ প্রথার অনৌচিত্য তিনি উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করলেন। তাঁর চেষ্টায় বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিবাহ প্রথাও প্রবর্ত্তিত হ'ল। ১৮৭২ সালে সিবিল ম্যারেজ বা বিবাহ আইন পাস হবার পর এই বিবাহ প্রথা আইনতঃ সিদ্ধ হ'ল। এই আইন এখন ১৮৭২ সালের তিন আইন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ কল্পে শিক্ষিত যুবকদল এসময় বদ্ধপরিকর হন। যাঁরা ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হলেন তাঁরা এ আন্দোলনে একেবারে মেতে উঠ্‌লেন। যাঁরা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন নি—যেমন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, কেশবচন্দ্রের উপদেশের ফলে তাঁদের প্রাণেও জাতিভেদের নির্ম্মমতা কাঁটার মত বিঁধতে লাগ্‌ল। সুরেন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। কেশবচন্দ্রের চেষ্টার ফলে জাতিভেদ প্রথা একেবারে উচ্ছেদ না হলেও এর নির্ম্মমতা ক্রমে অনেকটা কমে যায়; তথাকথিত উচ্চ-নীচদের পরস্পরের মধ্যে মমত্ব ও আত্মীয়তাবোধ বৃদ্ধি পায়। আর জাতীয়তার ভিত্তিই তো ঈদৃশ অনুভূতি। মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের সূত্র কেশবচন্দ্রের ঐ প্রকার চেষ্টার মধ্যেই আমরা পেয়ে থাকি।

এই সময়কার আর একটি বিশেষ ঘটনা—কেশবচন্দ্রের 'যীশুখ্রীষ্ট—ইউরোপ ও এশিয়া' শীর্ষক ইংরেজী বক্তৃতা। এ বক্তৃতাটি তখন

স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দমোহন বসু

খ্রীষ্টান ও হিন্দু সমাজে আলোড়ন উপস্থিত করেছিল। বড়লাট লর্ড লরেন্স থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদে পাদরি পর্য্যন্ত খ্রীষ্টানগণ ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টান হয়ে যাবেন! হিন্দু সমাজ কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুবর্ত্তীদের খ্রীষ্টান আখ্যা দিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, পরবর্ত্তী কালে যে জনসাধারণ ব্রাহ্মদের খ্রীষ্টানের সামিল গণ্য করতে থাকে তার মূলই হ'ল ঐ বক্তৃতা। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ সালে বিলাত যান। সেখানে রাণী ভিক্টোরিয়া থেকে আরম্ভ করে নানা শ্রেণীর ইংরেজের নিকট তিনি প্রভূত সম্মান লাভ করেন। তিনি ইংলণ্ডে বসে 'ইংলণ্ডস্ ডিউটি টু ইণ্ডিয়া' (ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশের ব্যবহার এবং আব্‌গারী বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করে ইংলণ্ডবাসীর দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করেন। কেশবচন্দ্র স্বদেশে ফিরে সমাজ সেবায় মন দিলেন। তিনি সামান্য-শিক্ষিতের জন্য 'সুলভ সমাচার' নামে এক পয়সা মূল্যের একখানা বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তিনি মজুর শ্রেণীর শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করলেন। এ বিষয়ে তাঁর সহায়ক হন শ্রমিক বন্ধু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি যুবক ব্রাহ্মদের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারেও বিশেষ অবহিত হন। মনোমোহন ঘোষের পরে ১৮৬২ সাল থেকে কিছুদিন তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্র সম্পাদন করেছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' তাঁর পিতৃব্য পুত্র নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় বহুকাল চলেছিল। ১৮৮৫ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত নেশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কল্‌কাতা থেকে আর যে দু'জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই নরেন্দ্রনাথ সেন একজন। অন্য জন, 'নববিভাকর'-সম্পাদক গিরিজাভূষণ

মুখোপাধ্যায়। কেশবচন্দ্রের আর একটি কীর্ত্তি—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীস্থ সাধকবর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের গুণপনা লোকসমক্ষে প্রকাশ।

কেশবচন্দ্র যখন তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজকে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ' নাম দেন তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে অভিহিত হতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা স্বাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে সব কাজ করতেন। কিন্তু তাঁর মত পুরোপুরি স্বজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ত্ব'জন—রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র মহাশয়। রাজনারায়ণ বসু ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত, আবার হিন্দুশাস্ত্রেও পারঙ্গম। তিনি ছিলেন গবর্ণমেণ্টের চাক্‌রে, মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। কিন্তু তখনকার দিনে গবর্ণমেণ্টের চাক্‌রেরাও জন-আন্দোলনে যোগ দিতে পারতেন। সংবাদপত্র সেবাতেও তাঁদের কোন বাধা ছিল না—হরিশ্চন্দ্রের বেলায়ই আমরা তা দেখেছি। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে অবস্থানকালে সমাজের উন্নতিমূলক অনেকগুলি সভা-সমিতি স্থাপন করেন। এই সব সভা-সমিতির মধ্যে ১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' একটি। ছ' বছর পরে ১৮৬৭ সালে ভারতীয়দের মিলন-ক্ষেত্র রূপে চৈত্র বা হিন্দু মেলা নামে যে জাতীয় মেলার সূচনা হয় ও এ পরিচালনার জন্য যে জাতীয় সভার সৃষ্টি হয় তার মূলে হ'ল রাজনারায়ণের এই সভা। 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' একটি পূর্ণ স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠান। আলাপে, ব্যবহারে, রীতিতে সব বিষয়েই এর স্বাদেশিকতা। 'গুড মর্ণিং', 'গুড ইভনিং'-এর বদলে 'সুপ্রভাত', 'সুরজনী' কথার চলন, ১লা জানুয়ারীর পরিবর্ত্তে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদ্‌যাপন ও পরস্পরের মধ্যে অভিনন্দনাদি জ্ঞাপন, কথাবার্ত্তায় ইংরেজী ব্যবহৃত হলে প্রতিটি শব্দের জন্য এক পয়সা দণ্ডস্বরূপ দান—সভ্যগণের এই

সব নিয়ম মেনে চল্‌তে হত। তখন শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজীয়ানা এতই বেড়ে যায় যে, এরূপ করা তখন একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আর নবগোপাল মিত্রের কথা? একটু পরেই তাঁর প্রধান কীর্ত্তি চৈত্র বা হিন্দু মেলার কথা বল্‌ব। তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গী ও আদি ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্রের উগ্র মতবাদ নবগোপালের একেবারে অসহ্য বোধ হ'ত। তাই কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ১৮৭২ সালে হিন্দুধর্ম্ম অস্বীকার করে যখন সিবিল ম্যারেজ আইন পাস হয় (এ আইন ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বলে পাস হয় নি, কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজও এর বিপক্ষতা করেছিল) তখন তিনি জাতীয় সভার উদ্যোগে ১২৭৯ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখে কল্‌কাতায় হিন্দুধর্ম্ম সম্পর্কে একটি বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' নামে এই যুগান্তকারী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা তখন হিন্দু সমাজে নূতন তেজ সঞ্চার করেছিল। আর নবগোপাল হয়েছিলেন এর মূল কারণ। স্বাজাত্যবোধ তাঁতে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল। ইউরোপের বহু অঞ্চলের জনগণ তাদের ক্ষুদ্র শ্রেণী ও প্রদেশ স্বার্থ ভুলে ঐ সময় এক একটি নেশান বা জাতিতে পরিণত হয়। ইটালী ও জার্ম্মাণীর জাতীয়তার দৃষ্টান্ত তখন সকল শিক্ষিত ভারতবাসীর সম্মুখে। নবগোপালও 'নেশন' ও 'নেশনাল' কথার বড়ই ভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সংবাদপত্রের নাম 'নেশনাল পেপার', কুস্তীর আখ্‌ড়ার নাম 'নেশনাল' জিমনাসিয়ম,' সভার নাম 'নেশনাল' সোসাইটি। স্বদেশবাসীরা তাই আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'নেশনাল নবগোপাল' বা 'নেশনাল মিত্র'! তিনি হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও সমাজকে জাতীয়তার পতাকা তলে সমবেত করে এক নবজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।

জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা

চৈত্র বা হিন্দু মেলা

চৈত্র বা হিন্দুমেলা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করে। এজন্য এ সম্বন্ধে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে বল্‌তে হবে। রাজনারায়ণ বসু আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, তাঁর জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কার্য্যবিবরণ হতে "Prospectus of a society for the promotion of National Feeling among the educated natives of Bengal", অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিকল্পে একটি সভার অনুষ্ঠানপত্র রচিত হয়। এই অনুষ্ঠানপত্র পাঠে তাঁর অন্যতম বান্ধব নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলার ভাব পান। হিন্দু মেলা স্থাপনের পর এর অধ্যক্ষতা করবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এ-ও তাঁর (রাজনারায়ণ বসুর) সভার আদর্শে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু 'মেলা' নামটী নবগোপালেরই দেওয়া। মেলা কথাটির সঙ্গে ভারতবাসীর যোগ প্রকৃতিগত ও ঘনিষ্ঠ।

এই চৈত্র মেলায় শিক্ষিত সমাজ সমবেত ভাবে স্বদেশের কথা আলোচনা করতে সুরু করেন। এজন্য ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তে এর স্থান স্ব-মহিমাতেই উজ্জ্বল। নবগোপাল মিত্র ছিলেন এর প্রাণ। তাঁর এ কার্য্যে বিশেষ সহায় হয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নে রাজনারায়ণের ভাববীজটী ফল-পুষ্প-ভারাবনত একটি সুন্দর মহীরুহে আত্ম-প্রকাশ করে ১৭৮৮ শকে (ইংরেজী ১৮৬৭ সাল) চৈত্র সংক্রান্তিতে। নবগোপাল সহকারী সম্পাদক রূপে চৈত্র মেলার যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করতেন। দ্বিতীয়

অধিবেশনে ১৭৮৯ শক, ৩০শে চৈত্র তারিখে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,

"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। এক দিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দু মেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। **আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।**

"ইহার আরো একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর, এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা এই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে। ভারতবর্ষের এই একটি প্রধান অভাব, আমাদের সকল কর্ম্মেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য যাচ্ঞা করি, ইহা কি সাধারণ লজ্জার বিষয়? কেন আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে; অতএব **যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।"**

মেলার কার্য্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হ'ল ও প্রত্যেকটী পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক মণ্ডলী গঠিত হ'ল। মেলার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব্বতোমুখী। আর এর সম্পাদনে বঙ্গের গুণী-মানীরা অনেকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের ভিতর রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, দুর্গাচরণ লাহা, প্যারীচরণ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, কৃষ্ণদাস পাল, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, সালিকরাম, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাদাস কর, গোপাললাল মিত্র, অম্বিকাচরণ গুহ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু মেলার কর্তৃপক্ষগণ জাতীয় জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে সজীব করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। ঐক্যবোধ বৃদ্ধি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য—নানা বিষয়েই এঁরা দৃষ্টিক্ষেপ করেন। জাতীয় জীবনের সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কার কল্পে সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রথম। আর এ সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্য, বহু দূরবর্ত্তী হলেও, ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় চৈত্র মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে এ কথা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেন। এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই মেলার কার্য্যক্রম পুরোপুরি আরম্ভ হয়। প্রায় প্রতিবারেই অধিবেশনের আরম্ভে গীত হ'ত ভারতবাসীর সুবিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'গাও ভারতের জয়'। রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইতিহাসে এর স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। ভারতীয় প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর রচয়িতা। সঙ্গীতটি এই,

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান? কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?

ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী, শত খনি রত্নের নিধান।

হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা, কোথা দিবে তাদের তুলনা?

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা, অতুলনা ভারত-ললনা।

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ, বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন।

বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস, কবিকুল ভারত-ভূষণ,

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী, অধীনতা আনিল রজনী;

সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ, পৃথ্বরাজ আদি বীরগণ?

ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু, আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, যতোধর্ম্মস্ততো জয়।

ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?

হোক্ ভারতের জয়, ইত্যাদি।

সঙ্গীতের পর সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র রাজ্য, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সমাজ প্রভৃতি বিবরণ সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে পাঠ করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত বিবরণীর একস্থানে তিনি বলেন,

"আবিসিনিয়া যুদ্ধযাত্রাকে ১৭৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কেননা, এই যুদ্ধ ব্যয়ের কিয়দংশ ভারতবর্ষকে সহ্য করিতে হইয়াছে।"

এই সামান্য পঙ্‌ক্তি কয়টিতে গবর্ণমেণ্টের নবানুসৃত সামরিক নীতির দুটি স্পষ্ট দিক প্রতিভাত। সিপাহী যুদ্ধের পর এমন কোন পল্টন আর রইল না যারা সমুদ্র পারে যেতে আপত্তি করতে পারে। আবার এ সময় থেকেই ভারতবর্ষের বাইরেও সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় অর্থ ব্যয় ও ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ হতে সুরু হয়।

মেলা ক্ষেত্রে সংস্কৃত বাংলা কবিতা, বিজ্ঞান শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ এবং কুস্তী প্রদর্শনের পর উৎকৃষ্ট কুস্তীগীর, লেখক ও শিল্পীদের পারিতোষিক বিতরণ হ'ত। লেখক ও কবিদের মধ্যে পরবর্ত্তী কালে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রজনীকান্ত গুপ্ত। স্বদেশীয় চারু ও কারু শিল্পের সমাবেশ ও বিভিন্ন স্বদেশী কুস্তি ও কসরত প্রদর্শন মেলার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। মহিলাদের হস্তনির্ম্মিত সূচীশিল্প—আসন, জুতা, থলে, খরপোস, পশমের ও সূতীর কার্য্য, কৃষ্ণনগরের পুতুল, বারাণসী শাড়ি, ঢাকার স্বর্ণকারদের রূপা ও সোণার গড়ন, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তি, ভারতীয় চিত্রকরদের পট-চিত্র ও অন্যান্য ধরণের আঁকা ছবি প্রদর্শনী-বিভাগে স্থান পেত এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ও মহিলা শিল্পী নিজ নিজ দ্রব্যের গুণানুসারে পুরস্কার পেতেন। প্রদর্শনীতে হস্তশিল্প ছাড়া ফল, ফুল, মূল, চারা, শস্য, বীজ প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্রব্য, এবং লাঙ্গল, চরখা, তাঁত প্রভৃতি কৃষি ও শিল্পকরণ যন্ত্রাদি রাসায়নিক ক্রিয়া এবং কুস্তী, অশ্বচালন, পাইকখেলা, বাঁশবাজী প্রভৃতি খেলা দেখান হ'ত।

চৈত্র মেলায় একজন হতেন সভাপতি। তবে সভাপতিকেই যে প্রধান বক্তা হতে হবে এমন কোন নিয়ম ছিল না। তৃতীয় বৎসরে মেলার সভাপতি হন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, কিন্তু প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন বসু

মহাশয়। ইনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা করেন। হিন্দু মেলার আদর্শে মফস্বলেও বারুইপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরে বাংলা ১২৭৬ সাল থেকেই কলকাতার মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এ মেলার তৃতীয় অধিবেশনে ১২৭৮, ৩০শে ফাল্গুন মনোমোহন বসু প্রধান বক্তা ছিলেন। ১৮৭৪ ও ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মেলা হয় কল্‌কাতার পাশি বাগান উদ্যানে। ১৮৭৫ সালের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। রাজনারায়ণ সভাপতিরূপে বরোদা-নিবাসী বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সকে সঙ্গীত ও নড়ালের জমিদার রাইচরণ রায়ের ব্যাঘ্র শিকারে নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্য স্বর্ণপদক উপহার দেন। এবারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (তখন মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক) 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে একটী জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ সালের হিন্দুমেলায়ও আর একটি বিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন দিল্লীতে যে দরবার করেছিলেন তাকে উদ্দেশ করেই এ কবিতাটি লিখিত। এর প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি এই,

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়িগো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয় কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারই সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোণার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে? ইত্যাদি

মেলা এর পরও কয়েক বৎসর চলেছিল। ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত যে এর রীতিমত অধিবেশন হয় তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

যে ব্যাপক আদর্শ নিয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজ চৈত্র মেলা উদ্‌যাপনে অগ্রসর হয়েছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাই আমরা স্বদেশ-প্রেমিক মনোমোহন বসুর বক্তৃতাসমূহে। মনোমোহন সে-যুগের একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি। তিনি 'মধ্যস্থ' নামে একখানা পত্রিকারও (প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে মাসিক) সম্পাদনা করেছিলেন। বাঙালী তাঁরই কাছে জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা নিলে। তাঁর নাম ভারতবাসীর চিরস্মরণীয়। তিনি দ্বিতীয় মেলায় প্রদত্ত অভিভাষণের প্রথমেই বল্‌লেন,

"স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নির্ম্মৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটি মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে যে, যখন জাতি-গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য-পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারত-ভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এক্ষণে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে **স্বাধীনতা** নাম দিয়া তাহার অমৃতাস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল কখন দেখি নাই, কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ 'স্বাবলম্বন' নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইব না। ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

চৈত্রমেলা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৌদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, আস্তিক সকলেরই মিলন ভূমি। এর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোমোহন বলেন,

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হওয়ানাবধি এদেশে যত কিছু উত্তম বিষয়ের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রায় রাজপুরুষগণ অথবা অপরাপর ইংরাজ মহাত্মারাই তাহার প্রথম উত্তেজক এবং প্রধান প্রবর্ত্তক। কিন্তু এই চৈত্রমেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয়দিগের নামগন্ধমাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে, তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্র, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভূগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্তসম্ভূত! স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।"

তিনি তাই স্বদেশবাসিগণকে সম্বোধন করে বল্‌ছেন,

"অতএব হে স্বদেশস্থ ভ্রাতৃগণ! আসুন আমাদের পরম হিতের জন্য, জননী জন্মভূমির জন্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষার জন্য, শারীরিক বলাধান জন্য, মনের ঔৎকর্ষ জন্য, শিল্প-বিজ্ঞান জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, আসুন আমরা সকলে একত্র মিলিত হই! আজ ইহাকে অতি ক্ষুদ্র দেখাইতেছে বলিয়া অনাদর করা নির্ব্বুদ্ধির কর্ম্ম, আপনাদিগের দ্বারা লালিত পালিত হইলে ইহাই তখন মহামহীরুহ হইয়া উঠিবে! যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর লক্ষ্ণৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগড় ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমব্যবসায়ী, সমশিল্পী, এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্র মেলার রঙ্গভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে—যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কারকে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই

মেলাকে স্বজাতীয় গৌরব-ভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখনই জানিবেন এই নব-রোপিত বৃক্ষের ফল লাভ হইল! সেই শুভ ফল আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক—ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। অতএব পুনশ্চ বলি, আসুন, আমরা মিলিত হই! জননী জন্মভূমি অধিকতর আপনাদের আদেশ করিতেছেন, তাঁহার দুঃখ বিমোচনে অগ্রসর হউন! চেষ্টা করিলে কখন ব্যর্থ হইবে না।”

হিন্দু মেলার তৃতীয় অধিবেশনে মনোমোহন বসু মহাশয় সামাজিকতার প্রচলিত অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ ‘জাতীয়তা বোধ’ সম্বন্ধে এইরূপ বলেন,

“সামাজিকতার যে অন্য একটি মহোচ্চ ব্যুৎপত্তি আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক হিন্দুজাতি যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যুৎপত্তিবোধক সামাজিকতাই লক্ষ্য।…তাহাকে পাইবার জন্যই এত প্রয়াস। সে সামাজিকতার অভাবে কোন জাতি, জাতিপদবাচ্য হইতে পারে না—সে সামাজিকতার অভাবে স্বাতন্ত্র্য আর অনৈক্য, যথেচ্ছাচার আর পরতন্ত্রতা, ইহারাই সমাজরাজ্যের অধিপতি হইয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খলার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। অতএব সেই সামাজিকতাকে উদ্ধার করা যে কতদূর আবশ্যক হইয়াছে তাহা বলা যায় না। সে সামাজিকতার অন্য নাম জাতিধর্ম্ম। সেই স্বজাতিধর্ম্ম আমাদিগের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার কারাগারে পরবশ্যতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করা সর্ব্বপ্রযত্নে বিধেয়।”

কিন্তু তা করতে গেলে অগ্রে ‘আত্মনির্ভর’ নামক শাণিত অস্ত্র দ্বারা ‘পরবশ্যতা’ রূপ শৃঙ্খলকে ছেদন করতে হবে। সেই আত্মনির্ভর লাভ করবার জন্য এইরূপ সমাবেশই অদ্বিতীয় উপায়। তাই মনোমোহন বলেন,

“স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর

সৎসম্ভাষণ, পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কিবা উন্নতি আর কিবা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প-সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করলেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। মনোমোহন বসু মহাশয় অভিভাষণে তাই স্বদেশ সেবার বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করে বলেন,

"[অর্থ সাহায্য ব্যতীত] যাঁহার যে বিষয়ে যেমন ক্ষমতা, তিনি সেই বিষয়ে তদনুরূপ সহকারিতা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যিনি মান্য ব্যক্তি, তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা মেলার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করা উচিত। যিনি অনুসন্ধিৎসু প্রজ্ঞাবান বলিয়া খ্যাত, তাঁহার সদুপায় নির্দ্ধারণ ও সদুপদেশ দান করা কর্ত্তব্য। যিনি বিদ্বান্, তিনি অধ্যক্ষ শ্রেণীর বিদ্যোৎসাহী বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাহার গুরুত্ব বিধান করুন। যিনি কবি, তিনি হিতজনক প্রসঙ্গ-পুষ্প ভাব সূত্রে গ্রন্থন করিয়া মেলার অঙ্গশোভা সম্পাদন করুন। যিনি বক্তা, তিনি সদ্বক্তৃতা দ্বারা সমাজের উৎসাহ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগরূক করিতে থাকুন। যিনি সঙ্গীতজ্ঞ, তিনি সুমধুর সঙ্গীত রসে মেলাভূমিকে অমৃত রসে প্লাবিত করুন। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় কৌতুকী, তাঁহারা যোদ্ধা প্রতি যোদ্ধা আনয়ন করিয়া বল ও কৌশলের শিক্ষক হউন। যাঁহারা দৃশ্যকাব্যের রসজ্ঞ, তাঁহারা রঙ্গভূমির বিশুদ্ধ আমোদ দেখাইয়া আমোদ ও উপদেশ দান করুন। যাঁহারা উদ্ভিদ্ বিদ্যার ভাবগ্রাহী, তাঁহারা নানাজাতি কুসুম, নানাজাতি ফলমূল, নানাজাতি তরুলতা, নানাজাতি শস্য, এবং নানাজাতি

জলজ শৈবালাদি আহরণ করিয়া অথবা আহরণকারীদিগকে উৎসাহ দিয়া কৃষি ও বাণিজ্যের শোভা ও ভৈষজ্যের উন্নতি সাধন করুন।”

হিন্দু মেলার পঞ্চম অধিবেশন হয় বাংলা ১২৭৮ সালের ৩০শে মাঘ। এ অধিবেশনে মনোমোহন ধনী ও ভূস্বামীদের ঔদাসীন্যের জন্য ক্ষেদ প্রকাশ করে বলেন, “রাজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতবর্ষীয়সভা এবং সাধারণ ঐক্য বিধান বিষয়ে এই হিন্দু মেলা, আমাদিগের মগ্নাবস্থার তৃণাশ্রয়বৎ হইয়াছে ; এই দুইটিকে প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে হইবেক, ভগবানের কৃপা হইলে এই উভয়ের সাহায্যেই অকূলে কূল পাইতে পারি।”

‘ভারতবর্ষীয় সভা’ (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন) কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই জন স্বার্থের বদলে শ্রেণী অর্থাৎ জমিদারি স্বার্থই বেশী করে দেখতে আরম্ভ করে। এর কর্ণধারগণ ব্রিটিশের ভক্ত হয়ে পড়েন ও তাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মে যোগ দিতে থাকেন। মনোমোহন আক্ষেপ করে বলেন যে, হিন্দু বা জাতীয় মেলায় সুমেরু সমান অর্থ দান করলেও তাতে রায় বাহাদুর, রাজা অথবা ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া উপাধি পাওয়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এজন্যই হয়ত স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দু মেলা থেকে তাঁরা ধীরে ধীরে সরে পড়েছেন। ভারতবর্ষীয় সভাকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতবাসীর যথাযোগ্য মুখপাত্র করে দাঁড় করাতে ‘অমৃতবাজার পত্রিকার’ সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ খুবই চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি তাতে সফল হন নি। এর পরেই ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন শিক্ষিত সাধারণের তরফে প্রতিষ্ঠিত হ’ল। এ কারণে, ভূম্যধিকারীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত মনোমোহনের ভাষণের এই অংশ খুবই শিক্ষাপ্রদ,

“আয়রে সৌভাগ্যশালী প্রিয় পুত্রগণ! আয়রে আমার ধন-কুবের প্রধান সন্তানগণ! আয়রে রাজ্যাধিকারি—ভূম্যধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ! যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্র বন্ধনের আর একতারূপ অতুল্য

একাবলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব্ব, সর্ব্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথ-প্রদর্শক কর; তিনি অচিরে নির্ম্মল আনন্দ মন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস! তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশা ভরসা—মধ্যাবস্থ তোমাদের কনীয়ান্ ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তি-পরায়ণ আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেরূপ সম্পত্তি বল, সম্ভ্রম বল, প্রভুত্ব বল থাকিত, তবে বৎস! কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না। তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে? তোমরা অনুবল হইলে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে—যত্নাস্ত্রে সকল বিঘ্নের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে! অতএব প্রাণ-প্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; জননীর দুঃখাবমার্জ্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরুক হও, উত্থানংকর, চক্ষুরুন্মীলন কর, পবিত্র প্রতিজ্ঞাজলে অভিষিক্ত হও, স্বাবলম্বনরূপ বসন পরিধান কর, ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর, আশারূপ আসা গাছটি করতলে লও, ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে—শ্রবণ কর, স্বজাতিকুঞ্জের গৌরবশাখীকে ভর করিয়া কর্ত্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা সারী জয়-জয়ন্তী তানে গান করিতেছে—নববঙ্গের নবোত্তম কুসুমের যশঃ সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে—নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষা-রূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকরশ্রেণীরূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে—আবার বৃক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর "সৌভাগ্য অরুণ" তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে! তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদেষ সকল ভ্রাতাকে একত্র কর, সেই অরুণের আশ্চর্য্য আলোক দেখিয়া পুলক পাইয়া এই

ভারত-লোক-বাসী সকলই শব্দ করুক 'জয় জয় জয় !' হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক, 'জয় জয় জয় !' আকাশে শব্দ হউক 'জয় জয় জয় !'

"হিন্দু মেলার জয় !" "হিন্দু মেলার জয় !" "হিন্দু মেলার জয় !"

হিন্দু মেলার উদ্দেশ্য এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝে নিয়েছি। 'পরবশ্যতা' দূর করে স্বাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করতে পারলে আমরা স্বজাতি-ধর্ম্ম ফিরে পাব। তখন আমাদের মূল লক্ষ্য আস্‌বে হাতের মুঠোর মধ্যে। বারুইপুরে অনুষ্ঠিত মেলায় মনোমোহন আমাদের আদর্শের নাম দিয়েছেন 'উন্নতি'। গ্রামবাসী সাধারণ জনগণ তাঁর শ্রোতা। সুতরাং একটি সুন্দর উপমা দিয়ে এর মর্ম্ম কথা তিনি তাদের বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বল্‌লেন,—"শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভূজা ! তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে ;—প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যান-তত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন এবং দশম হস্তে ঐক্য ! উদ্যম নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র, বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্রদ্বারা দৈত্যপতি "পরবশ্যতার" বক্ষস্থল বিদ্ধ করিতেছেন !"

হিন্দু মেলা শিক্ষিত সাধারণের মনে যে নবজাতীয়তার উন্মেষ সাধন করেছিল তা আমরা পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাপরম্পরায় সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারব। এই সময়ে বহু মনীষী হিন্দু মেলার নব-জাতীয়তার সূত্র গ্রহণ করে ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর হতে অহর্নিশ উপদেশ দিয়েছেন। কারণ আত্মনির্ভর না হলে আত্মশক্তি অর্জ্জন অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতে এই আত্মশক্তিই যে সবচেয়ে বড় কথা।

কর্ম্মের আহ্বান

১৮৭০-১৮৮০, এই দশ বৎসর বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে একটি ভীষণ কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের যুগ। এক দিকে হিন্দু মেলার আহ্বান, অন্য দিকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির একরাষ্ট্র-ভুক্তি ও আমেরিকার নিগ্রোদাসদের স্বাধীনতা লাভ—এ সবের ফলে বাঙালী মনে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন উদিত হ'ল। সুয়েজ খাল উন্মোচনে (১৮৬৯) যেমন দ্রুত গমনাগমনের সুবিধা হ'ল তেমনি ইউরোপীয় জাতীয়তা ও গণতন্ত্র-মূলক ভাবধারা ও দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গেও ভারতবাসী অতি দ্রুত পরিচিত হতে লাগ্‌ল। ও-সবের প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্যেও সুস্পষ্ট। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত-সঙ্গীতে' উদাত্ত স্বরে বল্‌লেন—

"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশের পর বাংলায় মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল। কবিতাটি প্রথম ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ১২৭৭, ৭ই শ্রাবণ সংখ্যা 'এডুকেশন গেজেটে' মুদ্রিত হয়। এ ধরণের কবিতা প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট ভূদেববাবুর জবাবদিহি করতে হয়েছিল!

হেমচন্দ্র ছাড়া আরও বহু বঙ্গকবি ও নাট্যকার ভারত-মাতার দুর্দ্দশার কাহিনী এসময় ছন্দে ও কথায় গ্রথিত করতে লাগ্‌লেন। মনোমোহন বসু লিখ্‌লেন—

দিনের দিন, সবে দীন, হয়ে পরাধীন !
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনু ক্ষীণ ॥
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য-ভূমে,
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রাহু মুখে লীন ॥
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এম্নি কৈল দৃষ্টি হীন ॥
তুঙ্গ দ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভুষী শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন !
তাঁতি, কর্ম্মকার করে হাহাকার,
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র, বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশে কি দুর্দ্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা, কিসে রবে লাজ,
ধ'র্ব্বে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ, বাকল টেনা ডোর কপীন।
ছুঁই, সূতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে,
দীয়াশেলাই কাটী, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটী জ্বালিতে ; খেতে, শুতে, যেতে, কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

('হরিশ্চন্দ্র'—পৌষ ১২৮১)

সপ্তম এড্ওয়ার্ড যখন যুবরাজরূপে ভারতবর্ষে আসেন তখন নবীনচন্দ্র সেন লেখেন—

"ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার !
লবণাম্বুরাশি-বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে লিবরপুলে লবণ তাহার !"

এলাহাবাদ-প্রবাসী গোবিন্দচন্দ্র রায় কবিতায় বল্‌লেন—

"কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুখ সাগর সাতারি পার হবে ।
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ওকি শেষে নিবেশে রসাতল রে,
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পরদাস খতে সমুদায় দিলে ।
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
পর লৌহ বিনির্ম্মিত হার বুকে,
পর দীপ মালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ।"

'অবলা-বান্ধব' সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় গাইলেন—

সোণার ভারত আজ যবনাধিকারে ।
ভারত সন্তান বক্ষঃ ভাসে অশ্রুধারে ।
জ্ঞান রত্নাদির খনি, সভ্যতার শিরোমণি,
আজি সেই পূণ্যভূমি, ডোবে গভীর আঁধারে ।

*　　　*　　　*

ভারত শ্মশান হোক, মরু হয়ে পড়ে রোক,
তবু অধীনতা বেড়ি, রেখোনারে পায়ে ধরে ।

('বীরনারী'—১৮৭৫)

উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত বিখ্যাত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকে (১৮৭৫) গীত হ'ল—

"হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোণার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক সাগরেতে ভাসি, ভারত মা দিবানিশি,
স্মরি পূর্ব্ব যশোরাশি, কান্দিতেছে অবিরাম ;
কে এখন নিবারিবে, জননীর অশ্রুজল!"

বঙ্গকবি যখন ভারত-মাতার অশ্রুজল নিবারণ করতে স্বদেশবাসীকে আহ্বান করলেন ঠিক সেই সময়ে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির ছলা-কলা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ রোধে তৎপর হ'ল। ভারত-সন্তানগণ দেশী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাতে লাগলেন বটে, কিন্তু স্বদেশ-শাসনে তাঁদের কোন দায়িত্ব স্বীকৃত হ'ল না। তাঁরা যে নিজ বাসভূমে পরবাসী। ভারত-সচিব ডিউক অব্ আর্গাইল ১৮৬৯ সালে পার্লামেণ্টে বলেছিলেন যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত ষোল জন ভারতীয় আই-সি-এস পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হলেও মাত্র একজন কৃতকার্য্য হতে পেরেছেন! ভারতীয়েরা অযোগ্য বলে এরূপ হয় নি। আট-ন' বছরে এ পরীক্ষার নিয়ম-কানুন এতবার বদলান হয় যে, কত কষ্ট স্বীকার করে বিলাতে গিয়েও ভারতীয় যুবকগণ বিফল মনোরথ হতে বাধ্য হতেন। এত সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কিন্তু ১৮৭১ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর আই-সি-এস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ও স্বদেশে ফিরে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য্যে অধিষ্ঠিত হন। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছিল, আর ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন অতঃপর ইউরোপীয় সমাজকে তাদের উপর ঈর্ষ্যান্বিত ও কুপিত করেও তুল্‌লে।

সমগ্র ভারতে বাঙালী আবার শিক্ষায় অধিক অগ্রসর। এজন্য কর্ত্তৃপক্ষের নজর তার উপরই পড়ল বেশী করে। ১৮৬৯ সালেই বাংলার বাইরে কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে এই আদেশ জারি হয়েছিল যে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীকে সরকারী কার্য্যে পারতপক্ষে যেন নিয়োগ করা না হয়!

বাংলা দেশে অতঃপর চেষ্টা চলে যাতে বাঙালী সাধারণ উচ্চ শিক্ষা লাভের 'দুরাকাঙ্ক্ষা' হৃদয়ে পোষণ করতে না পারে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য পূর্ব্বে হিন্দুরাই অগ্রণী হয়ে নিজ ব্যয়ে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিষয়ে সরকারের গতি ছিল অতীব মন্থর। বঙ্গের ছোটলাট সার্ জর্জ্জ ক্যাম্‌বেল (১৮৭১-৭৪) উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য যা' কিছু সামান্য সরকারী ব্যবস্থা, জন-শিক্ষার জন্য অর্থ সংকুলানের ওজুহাতে তারও মূলে আঘাত করে বস্‌লেন। তাঁর আদেশে কল্‌কাতার সংস্কৃত কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও বহরমপুর কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ফাষ্ট আর্টস কলেজে অবনমিত হ'ল। তার এ কার্য্যে বাংলার শিক্ষিত সমাজে খুব আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু এসব অগ্রাহ্য করে বড়লাট ও ভারত-সচিব ক্যাম্‌বেলের কার্য্যই সমর্থন করলেন। তিনটি কলেজের খরচ কমিয়ে যে সামান্য অর্থ উদ্বৃত্ত হ'ল, প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে তা হ'ল মরুভূমিতে জলবিন্দু! জন-শিক্ষা সমস্যার কণা মাত্রও এ দ্বারা পূরণ হ'ল না। লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল রইল যে, উচ্চ শিক্ষা বন্ধ করে বাঙালীকে দাবিয়ে রাখাই সরকারী কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য। স্বদেশপ্রাণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময়, ১৮৭২ সালে, বঙ্গসন্তানদের উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য মেট্রোপলিটান (অধুনা, বিদ্যাসাগর) কলেজ স্থাপন করলেন।

রাজরোষ শুধু বাংলা ও বাঙালীর উপর নিবদ্ধ থাকে নি, অন্যত্রও এর প্রকোপ কম-বেশী পতিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ থেকেই মুসলমানদের

উপর ইংরেজ চটেছিল। তার উপর ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতবর্ষে খুবই চাঞ্চল্য উপস্থিত করলে। সরকারের মতে ওয়াহাবীরা ব্রিটিশকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে ভারতের শাসন-যন্ত্র হস্তগত করারও মতলবে ছিল। তবে একথা সত্য যে, উত্তর ভারতে ওয়াহাবী দলভুক্ত একদল গোঁড়া মুসলমান সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে মোগল সম্রাটকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাতে যেমন উদ্‌গ্রীব হয়, বিদ্রোহের পরে অত্যাচার-অনাচারে দুর্ভিক্ষে নিষ্পেষিত হয়ে ব্রিটিশের উপর খুবই বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে। সমগ্র উত্তর ভারতে তারা ছড়িয়ে ছিল। তবে তাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল পাটনা। ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁকে সরকার ১৮১৮, তিন আইন অনুসারে ১৮৭১ সালে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত করলেন। তাঁর প্রকাশ্য বিচারের জন্য কল্‌কাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেণ্টন নরম্যানের এজলাসে আবেদন করা হ'ল। এ উদ্দেশ্যে ওয়াহাবীরা বোম্বাই হাইকোর্ট থেকে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ এ্যানেষ্টিকে এনেছিলেন। তিনি ছলজবাবে লর্ড মেওর শাসনকালের (১৮৬৯-৭২) অনাচার-অবিচারের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেন। এ্যানেষ্টির এই বক্তৃতাসমেত মোকদ্দমার বিবরণ ওয়াহাবীরা পুস্তিকাকারে ছেপে চারদিকে বিলি করলে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, যৌবনে এই পুস্তিকাখানি পাঠ করে তাঁরা যেন একেবারে মেতে উঠেছিলেন। এর কিছু পরেই, ১৮৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর, টাউন হলের সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌বার সময় প্রধান বিচারপতি নরম্যান (তখনও বর্ত্তমান হাইকোর্ট-ভবন নির্ম্মিত হয় নি, টাউন হলেই কোর্ট বস্‌ত) আব্‌দুল্লা নামে এক আততায়ীর ছোরার আঘাতে অচৈতন্য হয়ে পড়েন ও সেই দিন রাত্রেই মারা যান। ইউরোপীয় সমাজ এজন্য এতদূর ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, আবদুল্লার ফাঁসি হবার পর তার শব কবর দিতে না দিয়ে সংকার করিয়ে ফেলল!

এর অব্যবহিত পরে ১৮৭২, ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামান ভ্রমণ কালে শের আলী নামক এক কয়েদীর হস্তে বড়লাট লর্ড মেও-ও প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই শের আলী খাইবার গিরির পাদদেশে জাম্‌রাদ গ্রামের বাসিন্দা। এ দুইটি ওয়াহাবী দলের কুকার্য্য বলে সরকার পক্ষের ধারণা। তাঁরা অতঃপর নির্ম্মম হস্তে এ আন্দোলন দমন করলেন। বাংলা-বিহারের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ কিন্তু কখনও ওয়াহাবীদের সমর্থন করেন নি। তাঁরা বহু পূর্ব্বেই কল্‌কাতায় নেশনাল মোহম্মডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতন্ত্রানুগ রাজনীতিক আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন নির্ম্মূল হলে উত্তর ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন কল্পে নিয়মিত চেষ্টা সুরু হয়। সার্ সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে ১৮৭৪ সালের ২৪শে মে আলিগড়ে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এ কলেজটি পরে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। মুসলমান সমাজে সার্ সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি।

বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের আমল (১৮৭২-৭৬) দু'টি কারণে বিশেষ স্মরণীয়। এ সময় বাংলা-বিহারে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসামের কতকাংশ নিয়ে তখন বঙ্গ প্রদেশ গঠিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, বহু নিন্দিত সার্ জন ক্যাম্‌বেল খুব ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্য করে দুর্ভিক্ষের উগ্রতা অনেকটা প্রশমিত করেন।

এ সময়কার আর একটি ব্যাপার যা নিয়ে শিক্ষিত সমাজে ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—তা হ'ল বরোদার গাইকোয়াড়ের গদিচ্যুতি। ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্ণেল ফেয়ার সাহেবের হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে ব্রিটিশ এলাকায় গাইকোয়াড়ের বিচার হয় ও ফলে তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটে। এই নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষ করে কল্‌কাতায় ভীষণ আন্দোলনের

সূত্রপাত হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট, সোমপ্রকাশ ও অমৃতবাজার পত্রিকা এ নিয়ে জোর লেখালেখি সুরু করলেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুযায়ী এঁরা মিত্র রাজাদের স্বাধীন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় যা-ই থাকুক না কেন, ভারতে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তখন ব্রিটিশ জাতির অভিপ্রায়। এ কারণ, রাজন্য-ভারতের আভ্যন্তরিক শাসনে মধ্যযুগীয় শাসন পদ্ধতি বাহাল রেখে একে ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা করে রাখাই ছিল যেমন তাদের স্বার্থ, বাইরের ব্যাপারে একে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনাও তাদের তেমনি ছিল প্রয়োজন,—যাতে ভবিষ্যতে সিপাহী বিদ্রোহের মত কোনরূপ ব্যাপক ব্রিটিশ বিরোধী উত্থান না ঘটতে পারে। শিক্ষিত ভারতবাসী, বিশেষ বাঙালী, কিন্তু রাণীর ঘোষণার প্রতিই চোখ নিবদ্ধ রাখ্‌লে।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্বিস থেকে বিতাড়ন এ সময়কার আর একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। সার্ জর্জ্জ ক্যাম্‌বেলের উচ্চ শিক্ষা হ্রাসের চেষ্টা, তার উপরে উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সরকারের দুর্ব্যবহার—দু-ই বাঙালী তথা ভারতবাসীকে আত্মস্থ হতে প্রবুদ্ধ করলে। ১৮৭১, ২২শে নবেম্বর তারিখে সুরেন্দ্রনাথ শ্রীহট্টে এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ নিয়ে যান। ভারতবাসীরা উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হলে স্বার্থহানির বিশেষ সম্ভাবনা—ইউরোপীয় কর্ম্মচারীরা এ বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁদের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌লেন। সুরেন্দ্রনাথের যোগ্যতায় তাঁদের অনেকে ঈর্ষান্বিত হলেন। এইচ. সি. সাদার্লাণ্ড নামে এক ফিরিঙ্গী সাহেব তখন ওখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। ডিরোজিও-ও ফিরিঙ্গী ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে গণ্য করতেন। পরবর্ত্তী কালের ফিরিঙ্গীরা কিন্তু ইউরোপীয়দের হালচাল অনুকরণে প্রবৃত্ত হয় ও ব্রিটেনকেই মাতৃভূমি জ্ঞান

করতে শেখে। কবে থেকে তাদের মনোবৃত্তির এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে বলা কঠিন। তবে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তারা ইংরেজের বিশেষ সাহায্য করায় সৈন্যবিভাগ পুনর্গঠিত হলে তারা তাতে বিশিষ্ট স্থান লাভ করে; অন্যান্য চাক্‌রিতেও তারা অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত হতে থাকে। তারা এদেশে ইংরেজের স্বার্থকেই নিজেদের স্বার্থ বলে গণ্য করতে লাগ্‌ল। পরবর্ত্তী ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলনের সময়ও তারা ইউরোপীয় সমাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করে। এরূপ মনোবৃত্তি যুক্ত ফিরিঙ্গী সমাজের একজন ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারর্লাণ্ড। নৌকাচুরির অপরাধে ধৃত যুধিষ্ঠির নামে এক আসামী ফেরার বা পলাতক—এইরূপ লেখা একটি নথি সুরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থাপিত করা হলে সুরেন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর করেন। যুধিষ্ঠির কিন্তু আসলে ফেরার ছিল না। সাদার্লাণ্ডের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি এ ব্যাপারের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অযোগ্য প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। সুরেন্দ্রনাথের বিচারের জন্য কমিশন বস্‌ল। সভ্যগণ একযোগে তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য সাব্যস্ত করলেন! ভারত গবর্ণমেণ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে পঞ্চাশ টাকা মাসহারার ব্যবস্থা করে সুরেন্দ্রনাথকে কর্ম্মচ্যুত করলেন! সুরেন্দ্রনাথ এর প্রতিকারের জন্য বিলাত যান। ভারত-সচিব ভারত-গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তই বাহাল রাখ্‌লেন। বার কৌন্সিলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সরকারী কর্ম্মচ্যুতি হেতু ব্যারিষ্টার হবার অনুমতি সুরেন্দ্রনাথ পেলেন না! তিনি ১৮৭৫ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পিতৃবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক পদ দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাতে ও ভারতে কর্ত্তৃপক্ষের এতাদৃশ ব্যবহারে সমগ্র শিক্ষিত সমাজ বিচলিত হয়ে উঠ্‌ল। তারা কিন্তু বসে রইল না, তাদের কর্ম্মশক্তি নব নব পথ অনুসন্ধানে নিয়োজিত

হ'ল। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। ব্রিটিশগণ প্রথম প্রথম হিন্দুদের খাতির করত বটে, কিন্তু পরে যখন হিন্দুরা দেশ শাসনে যোগ্যতা দেখিয়ে প্রতিযোগী হতে চাইলে, তখন থেকেই প্রাধান্যচ্যুতির আতঙ্ক তাদের পেয়ে বস্‌ল। তাদের এ আতঙ্ক ক্রমেই বেড়েই চলে।

যে-সব প্রতিষ্ঠান ও মনস্বী ব্যক্তি এই দুর্দ্দিনে ভারতবাসীর মনে সাহস, শক্তি ও আশার সঞ্চার করে তাদের সুপথে চালিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্‌বেন। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে', ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায়, ও জাতীয় নাট্যশালা জাতিকে শক্তির সন্ধান দিতে তৎপর হলেন। শিশিরকুমারের নাম আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েক বার পেয়েছি। তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে যশোহর পোলুয়া-মাগুরা থেকে ১৮৬৮ সালে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ ও সম্পাদনা আরম্ভ করেন। তিনি তিন বছর পরে কল্‌কাতায় পত্রিকা তুলে নিয়ে আসেন। অমৃতবাজারের সহজ সরল তেজোদৃপ্ত লেখা এক দিকে যেমন বাঙালী মনে শক্তি সঞ্চার করতে লাগ্‌ল, অন্য দিকে ইউরোপীয়দের নিকট রাজদ্রোহের আকর বলেও প্রতিভাত হ'ল। সরকারী নীতির ছলা-কলা শিশিরকুমার সবিস্তারে ফাঁস করে দিতেন। ক্যাম্বেলের শিক্ষানীতি ও গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি সম্পর্কে শিশির কুমারের দৃঢ় লেখনী তখন শিক্ষিত সমাজকে আগ্রহ করে তুল্‌তে বিশেষ সাহায্য করলে। শিশিরকুমার ছিলেন প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র শাসনের পক্ষপাতী। তাঁর পূর্ব্বেও কেউ কেউ, যেমন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, গণতন্ত্রের কথা বলেছেন; কিন্তু ভারতবাসীরা যে তখনই প্রতিনিধিমূলক শাসনের যোগ্য, তা শিশিরকুমারই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করেন। তাঁর ইণ্ডিয়ান লীগের কথা পরে বল্‌ব।

ভারতবাসীর জাতীয়ত্ব বোধের উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়। আমরা যে সময়ের কথা এখন বলছি তখন তিনি একজন কুশলী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি উপন্যাস লিখে বাঙালী পাঠকের চিত্ত ইতিমধ্যেই তিনি জয় করে নিয়েছেন। তিনি ১২৭৯ সালের (ইং ১৮৭২) বৈশাখ মাসে 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশ করেন এবং ক্রমাগত পাঁচ বৎসর স্বহস্তে সম্পাদনা করে আত্মবিস্মৃত বাঙালীর মোহনিদ্রা সজোরে ভেঙ্গে দিলেন। বাঙালীর পূর্ব্বগৌরব, বর্ত্তমান শক্তি ও ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার কথা তাঁর অমর লেখনী-মুখে অতি পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হতে লাগ্‌ল। বাংলা সাহিত্যের মহীয়ান্ রূপ তিনি আত্মবিভ্রান্ত ইঙ্গ-বঙ্গের সম্মুখে উদ্ভাসিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পরবর্ত্তী কালের রচনা, তাঁর অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' তখনও অজ্ঞাত। কিন্তু এই সময়েই তিনি বাঙালীকে স্ব-প্রতিষ্ঠ হতে উপদেশ দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখ্‌লেন—

"যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও, পূর্ব্বগৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই; বরং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতি বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে! যতদিন জাতি-বৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈর ভাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না—কেননা সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের

আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।”

বঙ্কিমচন্দ্র ‘কমলাকান্ত-প্রসূতি’ জননী বঙ্গভূমির ভাবী মূর্ত্তি দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়ে দিলেন,

“চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভূজা—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রু-মর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!”

“এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি।”

ভারতবাসীর অবরুদ্ধ কর্ম্মশক্তিকে একটি বিশেষ পথে চালনা করলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি প্রথম এলোপাথ ও পরে হোমিওপাথ চিকিৎসক হিসাবে কল্‌কাতায় সুপরিচিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও স্বাধীনচিত্ততা বাঙালীর মুখে মুখে কীর্ত্তিত। ভারতবর্ষের অধীনতায় যেমন বিজ্ঞান কার্য্যকরী, একে সবল স্বাধীন করবার পক্ষেও বিজ্ঞান অনুরূপ কার্য্যকরী। এই সত্য তিনিই এ সময় ভারতবর্ষে প্রচার করেন এবং বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগ আলোচনা ও আয়ত্ত করবার জন্য

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হন। আট বছরের অবিরাম চেষ্টার ফলে ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা স্থাপিত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান-সভার প্রস্তাবে বঙ্গদর্শনে (১২৭৯, ভাদ্র সংখ্যা) যা লিখেছিলেন তা এখনও বহু পরিমাণে সত্য। তিনি লেখেন—

"বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু।"

"বিজ্ঞান মহায়সশকট বাহনে, তড়িৎ-তার সঞ্চালনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।"

ভারতবর্ষ তখন সত্যসত্যই একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালায় রূপান্তরিত। অবাধ-বাণিজ্য নীতি প্রবর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষের শিল্প-সম্পদ বিলুপ্ত প্রায়, ভারতবর্ষ এক বিরাট্ কৃষি-ক্ষেত্রে পরিণত। সে যুগের প্রসিদ্ধ লেখক ভোলানাথ চন্দ্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জ্জিস্ ম্যাগাজিনে' (১৮৭৪) বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব করে এই মর্ম্মে লিখলেন,—

"কোনরূপে দৈহিক বল প্রয়োগ না করে, রাজানুগত্য অস্বীকার না করে এবং কোন নূতন আইনের জন্য প্রার্থনা না জানিয়ে আমরা আমাদের পূর্ব্ব সম্পদ ফিরিয়ে আন্‌তে পারি। চরম ক্ষেত্রে, একমাত্র না হলেও সবচেয়ে অধিক কার্য্যকরী অস্ত্র—'নৈতিক শত্রুতা' (moral hostility)। এ অস্ত্র অবলম্বনে কোন অপরাধ নেই। আসুন, বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিব

না—এই সঙ্কল্প আমরা সকলে গ্রহণ করি। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য।”

বাঙালী জীবনের এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলার রঙ্গমঞ্চও কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নি। ১৮৭২ সালের মাঝামাঝি ‘নেশনাল থিয়েটার’ নামে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কল্‌কাতায় আত্মপ্রকাশ করে। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতিরা মিলে এর প্রতিষ্ঠা করেন। নীলদর্পণ, ভারত-মাতা, হরিশ্চন্দ্র, বীরনারী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, প্রভৃতি জাতীয় ভাব মূলক নাটক এখানে ও অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতি উপলক্ষেও বহু নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কল্‌কাতায় যুবরাজ (সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড) আগমন করেন। সরকারী উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজ ভবানীপুরস্থ বাস-ভবনে হিন্দুপুরনারীদের সমবেত করে তাদের দ্বারা যুবরাজকে অভ্যর্থনা করান। এ নিয়ে হিন্দু সমাজে হুলুস্থুল উপস্থিত হয়। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বাজিমাৎ’ কবিতা লিখে এ ঘটনাকে অমর করেছেন। জগদানন্দের কার্য্যকে ব্যঙ্গ করে ‘গজদানন্দ’ প্রহসন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ’ল। রাজভক্ত প্রজাকে রক্ষার জন্য বড়লাট স্বয়ং অর্ডিন্যান্স জারি করে এর অভিনয় বন্ধ করে দেন। ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’র অভিনয়ও অশ্লীলতার ওজুহাতে বন্ধ করান হয় ও বিচারে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত অমৃতলাল বসু ও উপেন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। মোকদ্দমা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়াল। হাইকোর্টে কিন্তু ‘সুরেন্দ্র-বিনোদিনী’ অশ্লীল প্রমাণিত হ’ল না। অমৃতলাল ও উপেন্দ্রনাথ মুক্তি পেলেন। ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার জনসাধারণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রিত আইন পাস করে এর স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করলেন।

সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন

তৃতীয় যুগ

শিশিরকুমার ঘোষের নামের সঙ্গে এখন আমরা সুপরিচিত। তাঁর কার্য্য-কলাপের আভাষও আমরা কিছু কিছু পেয়েছি। ভারতবাসীরা পার্লামেণ্টারী বা প্রতিনিধিমূলক শাসনের সম্পূর্ণ উপযোগী—এ মত তিনিই প্রথম ১৮৭০ সালে তাঁর নিজ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দেশ-শাসনের ভার গ্রহণ করতে হলে স্বদেশবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। যে-সব দেশে পার্লামেণ্টীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত, সে-সব স্থানে শিক্ষিত সাধারণের রাজনৈতিক সভা-সমিতির প্রাচুর্য্য আছে। ভারতবর্ষে এরূপ প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব। কল্‌কাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রায় জমিদার-সভায় পরিণত হলেও রাজনীতি আন্দোলন-আলোচনার এ-ই তখনও একমাত্র প্রতিষ্ঠান। শিশিরকুমার একে সাধারণ মধ্যবিত্তদের অধিগম্য করবার জন্য এর বার্ষিক চাঁদা পঞ্চাশ টাকা থেকে পাঁচ টাকায় কমিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু এসোসিয়েশনের কর্ত্তারা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনিই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রসর হন। শিশিরকুমার পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন, তাঁর অগ্রজ হেমন্তকুমার বঙ্গের মফস্বল অঞ্চলে গিয়ে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। ১৮৭৫ সালের মধ্যে বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, ঢাকা, হুগলী, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহর অঞ্চলে রাজনৈতিক সঙ্ঘ বা এসোসিয়েশন গঠিত

হ'ল। শিশিরকুমার অতঃপর কল্‌কাতায় একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মন দিলেন।

তখন এক দিকে যেমন 'নেশনাল' কথাটির খুব চল, অন্য দিকে 'ইণ্ডিয়ান' বা ভারতবর্ষীয় কথাটিরও খুব অনুরাগী হয়ে উঠেছেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। শাসনকর্ত্তারা বিশাল ভারতবর্ষকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে এক থেকে অন্যকে স্বতন্ত্র করে রাখ্‌তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাঙালী রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় অগ্রসর, এজন্য তাদের পক্ষে সরকারের এ অভিপ্রায় বুঝতে বিলম্ব হয় নি। শিক্ষিত জনের নিকট ভারতবর্ষ এক অখণ্ড দেশ। সকল ব্যাপারেই তারা ভারতবর্ষকে এক ভাব্‌তে শিখেছে। এইরূপ ধারণার ফলেই শিশিরকুমারের প্রতিষ্ঠানটির 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামকরণ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' নামটিও তিনি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই দিয়েছিলেন। যা হোক, শিশিরকুমার অগ্রজ হেমন্তকুমার ও অনুজ মতিলাল ঘোষের সহযোগে ১৮৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপন করলেন। তাঁর এ কার্য্যে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সহায় হলেন। এ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলেও শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপনও এর উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য ছিল। বার্ষিক চাঁদা মাত্র পাঁচ টাকা ধার্য্য হওয়ায় শিক্ষিত সাধারণ এর সভ্য হতে সক্ষম হলেন। আটত্রিশ জন সভ্য নিয়ে লীগের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। এর সঙ্গে বিশিষ্ট লোকদের কোন না কোন সময়ে সংশ্লিষ্ট দেখ্‌তে পাই। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীমোহন দাশ, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাশ, মনোমোহন ঘোষ, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এঁদের ভিতর উল্লেখযোগ্য। লীগ পরিচালনা সম্পর্কে শিশিরকুমারের

স্বামী বিবেকানন্দ

দাদাভাই. নৌরজী

সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় এঁদের অনেকেই প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরে লীগ ত্যাগ করেন।

লীগ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা নিয়ে সে সময়ের অনেকে অনেক কথা বলেছেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ বরাবর শিশির-কুমারের বিরোধী ছিলেন। তাঁর উগ্র ও প্রগতিশীল মতবাদ তাঁদের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয় নি। লীগ যে বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লীগ পরিত্যাগ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তাদের বিরোধিতা—এদের কোনটিই তার জন্যে কম দায়ী নয়।

সার্ রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭) তখন বঙ্গের ছোটলাট। তিনি একজন বিচক্ষণ রাজপুরুষ। শিশিরকুমারের স্পষ্ট ও সতেজ লেখনী টেম্পল মহোদয়কে তাঁর দিকে অবিলম্বে আকৃষ্ট করে। ইণ্ডিয়ান লীগ ও তার উদ্দেশ্যকে তিনি প্রীতির চক্ষেই দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। শিশিরকুমারের প্রস্তাবিত 'এল্‌বার্ট টেম্পল অফ্‌ সায়ান্স' নামে শিল্প-বিদ্যালয়ে অর্থসাহায্যেরও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়ে কিছুকাল চলেছিল।

শিশিরকুমারের এসকল কার্য্যে প্রধান সহায় হয়েছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষ্ণমোহনকে লোকে বল্‌ত 'পলিটিক্যাল পাদ্রী'। অর্থাৎ, পাদ্রী বা ধর্ম্মযাজক হয়েও তিনি প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চল্‌তেন। ইণ্ডিয়ান্ লীগ প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর বয়স ষাটেরও উপর। তথাপি তিনি কিছুকাল এর সভাপতিত্ব করেছিলেন। উক্ত শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়ও তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। পরে তিনি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি হন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, বার্দ্ধক্যে উপনীত হলেও কৃষ্ণমোহন রাজনীতি চর্চ্চায় ও পৌর-সেবায় যুবজনোচিত কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন।

কৃষ্ণমোহন ডিরোজিও-যুগের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি যৌবনে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিলেন বটে, কিন্তু বরাবর ভারতীয়ই ছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শাস্ত্র-দর্শনাদি আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। এসব বিষয়ে অনন্যতুল্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৫ সালে তাঁকে 'ডক্টর অফ্ ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সঙ্গে প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ও এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

শিশিরকুমার তথা 'ইণ্ডিয়ান লীগ' একটি বিষয়ে খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন। এবং এজন্যই হয়ত সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন যে, 'ইণ্ডিয়ান লীগের দ্বারাও কিছু প্রয়োজনীয় কাজ সাধিত হয়।' শিশিরকুমার বরাবর প্রতিনিধিমূলক শাসনেরই শুধু পক্ষপাতী ছিলেন না, ভারতবাসীরা যে তখনই এর উপযুক্ত এ ধারণাও তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল। সার্ রিচার্ড টেম্পল কল্‌কাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে একটি প্রতিনিধিমূলক কর্পোরেশনে পরিণত করতে চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তারা প্রতিনিধিমূলক শাসনের গুরুত্ব না বুঝে বা নিজেদের প্রাধান্য বিলুপ্তির আশঙ্কায়, যে কারণেই হোক্, এর বিরোধী হলেন! তখন শিশিরকুমার ও তাঁর ইণ্ডিয়ান লীগই সার্ টেম্পলের প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। কল্‌কাতা কর্পোরেশন যে ক্রমে একটি স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তার মূলে ছিল শিশিরকুমারের ঐকান্তিক সমর্থন। ১৮৭৬ সালে কল্‌কাতা কর্পোরেশন আইন বিধিবদ্ধ হয়ে নূতন কর্পোরেশন গঠিত হ'ল। কল্‌কাতা আঠারটি ওয়ার্ড বা পল্লীতে বিভক্ত হয় এবং এখান থেকে মোট আটচল্লিশ জন প্রতিনিধি করদাতাদের ভোটে নির্ব্বাচিত হবার অধিকার পান। কর্পোরেশনে কিন্তু মোট সদস্য-সংখ্যা হ'ল বাহাত্তর

জন। স্থির হয়, বাকী চব্বিশ জন সদস্য গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করবেন। এই নিয়ম বহু কাল চলে। ১৮৯৯ সালে যখন সরকার কর্পোরেশনের এ অধিকার সঙ্কোচ সাধন করেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আঠাশ জন প্রতিনিধি এর প্রতিবাদে সদস্য পদ ত্যাগ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৬ সালেই করদাতাদের ভোটে কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপনের অল্পকাল পরেই কল্‌কাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথের কল্‌কাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু পুণার ছাত্র-সভার আদর্শে কল্‌কাতায় একটি 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' বা 'ছাত্র-সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ছাত্র-সভা প্রধানতঃ সামাজিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করত। আনন্দমোহন এর সভাপতি ও নন্দকিশোর বসু নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্র এর সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র-সভাকে কেন্দ্র করে তাঁর অপূর্ব্ব বাগ্মিতা প্রভাবে ছাত্রসমাজের মনে দেশ-প্রীতি উদ্রেক করতে সক্ষম হলেন। বস্তুতঃ, এই ছাত্র-সভাকেই পরবর্ত্তী ভারত-সভার আদি বল্‌তে হয়। ছাত্র-সভার উদ্যোগে তাঁর প্রথম বক্তৃতা 'শিখ-শক্তির অভ্যুদয়' প্রদত্ত হয় গোলদীঘির উত্তরে পুরাতন হিন্দু-কলেজের হল-ঘরে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' প্রদান করেন ভবানীপুরস্থ লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ভবনে। যুবক সমাজে কিন্তু ঝড় তুল্‌ল তাঁর ম্যাট্‌সিনী ও যুবক ইটালী সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী। ইউরোপীয় ইতিহাস ও সাহিত্য এবং হিন্দুমেলা, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের আলোচনা, স্বদেশীভাবোদ্দীপক সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীত ক্ষেত্র আগে থেকেই প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে। এসময় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যুবক-মনে স্বাজাত্যবোধ সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়ে উঠ্‌ল। নরেন্দ্রনাথ দত্ত

(বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ), ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ নিয়মিত ভাবে তাঁর বক্তৃতা শুন্‌তেন। এই সময় বিপিনচন্দ্র পাল অধ্যয়ন-রত যুবক। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, বিশেষ ম্যাট্‌সিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতাবলী সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র বলেন,

"সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনীর দৈবী প্রতিভা, গ্যারিবল্ডীর স্বদেশ উদ্ধার কল্পে অদ্ভুত কর্ম্মচেষ্টা, য়ুন ইটালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের ও নব্য আয়ার্লণ্ডের (New Irland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্য্যা, এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের ও বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, কিয়ৎ পরিমাণে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।"

যুবক-মনে এই বক্তৃতাবলীর প্রভাব সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্র তাঁর ইংরেজী আত্মজীবনীতে আরও বিশদ করে যে-সব কথা বলেছেন তার কতকাংশের স্থূল মর্ম্ম এই,

"আমরা অষ্ট্রিয়ার অধীন ইটালিয়ানদের অবস্থা ও ব্রিটিশ আমলে আমাদের নিজেদের অবস্থার মধ্যে বহুলাংশে সমতা দেখ্‌তে পেলাম। আমাদেরও মফস্বল অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হলে ভারতীয়েরা কোনরূপ ন্যায় বিচারই পায় না। একই সিবিল সার্বিসের ভারতীয় ও ইউরোপীয় অংশের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য

আমাদের হৃদয়ে জ্বালা বাড়িয়ে দিত। আসাম চা-বাগানের কুলিদের দুর্দ্দশা তখন দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে ব্যক্ত হতে আরম্ভ হয়। 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' ম্যাজিষ্ট্রেটী জুলুমের কাহিনী প্রায়ই প্রকাশ করতেন। এই সকল ব্যাপারে ম্যাট্‌সিনী পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ আমাদের তিক্ত মনকে একেবারে আবিষ্ট করে ফেল্‌লে। আমরা ম্যাট্‌সিনীর লেখা ও যুবক ইটালীয় আন্দোলনের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করলাম। আমরা ক্রমে ইটালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি, বিশেষ 'কার্বোনারি' প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ম্যাট্‌সিনী প্রথমে কার্বোনারির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতালাভের উদ্দেশ্যে ইটালীতে যে-সব গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তারই নাম এক কথায় কার্বোনারি। কার্বোনারির গুপ্ত পদ্ধতি সভ্যদের মধ্যে প্রকারান্তরে ভীরুতারই প্রশ্রয় দিত। এজন্য ম্যাট্‌সিনী এর সম্পর্ক ত্যাগ করে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ম্যাট্‌সিনী সম্পর্কীয় বক্তৃতা থেকে প্রেরণা পেয়ে আমরাও ভারতের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠায় লেগে গেলাম্। কিন্তু তখনও কোনরূপ বিপ্লবী মনোভাব দ্বারা আমরা চালিত হই নি বা স্বদেশের রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির জন্য কোনরূপ গুপ্ত হত্যার কথাও ভাবি নি। সুরেন্দ্রনাথ নিজেই এইরূপ বহু গুপ্ত যুব-সমিতির অধিনায়ক ছিলেন। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রাম যুবকদের ছিল না বটে, কিন্তু তাঁরা আদর্শে খুবই নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। আমি একটি সমিতির কথা জানি—আমি অবশ্য এর সভ্য ছিলাম না—যার সভ্যগণ তরবারীর অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল ছিন্ন করে রক্ত বার করতেন ও সেই রক্ত দিয়ে অঙ্গীকার পত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করতেন!"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'জীবনী-স্মৃতি'তেও তাঁদের একটি গুপ্তসমিতির

কথা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ছিলেন এর সভাপতি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান কর্ম্মনায়ক।

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যুবক সমাজ কর্ম্ম-প্রেরণা লাভ করলে। তিনিও নিজ শক্তি পরিমাপ করতে সক্ষম হলেন। শিশিরকুমারের ইণ্ডিয়ান লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সাধারণগম্য প্রকাশ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে তিনি অতঃপর অগ্রসর হলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র 'বেঙ্গল এসোসিয়েশন' নামে একটি রাজনীতিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ যুগোপযোগী করে এর নাম দিলেন 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিক সমস্যার আলোচনাই হবে এ সভার কাজ। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। প্রথম তিন জনই আবার সে যুগের বিশেষ উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক। সুরেন্দ্রনাথের মত এঁরাও স্বাধীনতার মন্ত্রে তখন উদ্দীপিত। আনন্দমোহন বসু অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার। ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করে কল্‌কাতায় এসে তিনি স্বাধীন আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন ও ছাত্র-সভার মারফত জনহিতে মন দেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সুকবি ও গ্রন্থকার, সরকারী হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত। আদর্শ-নিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য যুবকগণ সহজেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতেন। এখানে তাঁর একটি কার্য্যের কথা উল্লেখ করব।

শিবনাথ তখন সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত। এ সময়, ১৮৭৬ সালের মাঝামাঝি তাঁরই নেতৃত্বে তাঁর অনুরক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, কালীশঙ্কর শুকুল, তারাকিশোর রায়চৌধুরী (পরবর্ত্তী কালের বিখ্যাত সন্তদাস বাবাজী) প্রভৃতি মিলে একটি নূতন সোসাইটি বা সমিতি স্থাপন

করেন। বিপিনচন্দ্র বলেন, সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত এসময়কার অন্যান্য সমিতির সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য ছিল। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্পর্কে ব্রাহ্ম সমাজের প্রগতিশীল মতবাদ পোষণ ও পালনও এ সমিতির উদ্দেশ্য হ'ল। সভা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে একদিন মধ্যরাত্রে শিবনাথের ভবনে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তা প্রদক্ষিণ করতে করতে তাঁরা সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক আদর্শের সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতারও অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। একটি অঙ্গীকারে স্পষ্ট এই নির্দ্দেশ ছিল যে, জীবন গেলেও কেউ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করবেন না। কারণ, তাঁদের মতে ব্রিটিশ জাতি বল প্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করেছে। তবে তাঁরা সরকারী আইন ভঙ্গ করবেন না স্থির করেন। শিবনাথ তখনও সরকারী চাকুরে। তিনি সেদিন অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করতে পারেন নি। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যখন ইঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আগুনের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন এক আশ্চর্য্য বল ও আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আমার মনে জাগিতে লাগিল।" শিবনাথ এর কিছুকাল পরেই সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

ভারত-সভার অন্যতম উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আগে আমরা পেয়েছি। তিনি ফরিদপুরের অন্তর্গত লোনসিংহ স্কুলের বাংলা শিক্ষক ছিলেন। সেখান থেকেই তিনি 'অবলা-বান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। "না জাগিলে ভারত ললনা, এভারত আর জাগে না জাগে না" —বিখ্যাত গানটি তাঁরই রচনা। তিনিও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পূজারী। ভারত-সভা সংগঠনে তাঁর কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। আনন্দমোহন, শিবনাথ ও দ্বারকানাথ তিনজনই আবার কেশবচন্দ্র সেনের

সঙ্গে মতদ্বৈধ হেতু ১৮৭৮ সালে কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। আনন্দমোহন গণতন্ত্রের আদর্শে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গঠনতন্ত্র রচনা করেন। তাঁর আশা ছিল, ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র একদিন এই আদর্শেই রচিত হবে। এইরূপ কর্ম্মী ও মনীষী-বৃন্দের যোগাযোগেই ভারত-সভার জন্ম।

১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে একটি সাধারণগম্য রাজনৈতিক সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় 'হিন্দু ব্যবস্থাদর্পণ' প্রণেতা শ্যামাচরণ সরকারের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বেকার ইণ্ডিয়ান লীগের বিরোধী ছিলেন। তাঁরা কিন্তু এবারে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বিরোধিতা করলেন না, বরং এর কর্ত্তৃস্থানীয় মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি এই সভায় উপস্থিত থেকে উদ্যোগীদের উৎসাহ বর্দ্ধন করলেন। ইণ্ডিয়ান লীগের তরফে সভা-স্থাপনের বিরোধিতা হলেও শেষ পর্য্যন্ত তা টেকে নি। আনন্দমোহন বসু হলেন ভারত-সভার সম্পাদক। 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সভার সভ্য হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেশ্বর মল্লিক, ক্ষেত্রচন্দ্র গুপ্ত, চন্দ্রনাথ বসু, মনোমোহন ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত, নবগোপাল মিত্র, নীলমণি মিত্র (এলাহারাম), রাজনারায়ণ বসু, সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, কেদারনাথ চৌধুরী, প্রসাদদাস মল্লিক, কৃষ্ণমোহন মল্লিক, ভোলানাথ চন্দ্র, অঘোরনাথ কুণ্ডার, শ্রীনাথ বসু, জয়গোপাল সোম।

ভারত-সভা নিখিল ভারতীয় আদর্শ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, ম্যাট্‌সিনীর ইউনাইটেড ইটালী বা ঐক্যবদ্ধ ইটালীই তাঁকে একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। ভারতীয় রাজনীতি এতদিন ছিল একান্তভাবেই বহির্মুখী, এবারে সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় অন্তর্মুখী হবারও সুযোগ পেল। অতঃপর এক দিকে যেমন ব্রিটিশ জাতির নিকট সুবিচারের আশায় পার্লামেণ্টে আবেদন-নিবেদন চল্‌তে থাকে, অন্য দিকে দেশবাসী জনগণকেও শাসকবর্গের অবিচারের কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা চলে। দৃঢ়জনমত গঠন, রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে ঐক্যবুদ্ধির উন্মেষ, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রীতি-সম্বন্ধ স্থাপন ও সমসাময়িক আন্দোলনগুলির সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ সাধন—এই চতুর্ব্বিধ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ইণ্ডিয়ান লীগও নিখিল ভারতীয় উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়, কিন্তু নানা কারণে তার এ উদ্দেশ্য কার্য্যকরী হতে পারে নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আদর্শ পূর্ব্বে কতকটা এরূপ ছিল বটে, কিন্তু একে কার্য্যকরী করতে কর্তৃপক্ষ কখনও তৎপর হন নি। পুণার সার্ব্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন সভা প্রাদেশিক স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত-সভাই সুতরাং নিখিল ভারতীয় উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হ'ল। বিপিনচন্দ্রও বলেন, "সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারত-সভার জন্ম হয় তাহাই সর্ব্বপ্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও কর্ম্মকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে।"

ভারত-সভার কার্য্যকলাপ

স্থরেন্দ্রনাথ বিবিধ যুব-সমিতির নেতৃত্ব গ্রহণ করে যুবক সম্প্রদায়ের মনে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে ইতিপূর্ব্বেই প্রয়াস পেয়েছিলেন। এখন থেকে ভারত-সভার মারফত বিশাল ভারতবর্ষের জনশক্তিকে সংহত করতেও উদ্বুদ্ধ হলেন। এসময় এর স্থযোগও উপস্থিত হ'ল খুব।

তখন ঘোর রক্ষণশীল ডিস্‌রেলী (লর্ড বেকন্‌স্‌ফিল্ড) বিলাতের প্রধান মন্ত্রী। তাঁর সময়ে (১৮৭৪-১৮৮০ জুন) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন পুষ্ট হয়, ইতিপূর্ব্বে তেমনটি আর হয় নি। ও-যুগে ব্রিটিশ শক্তির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রুশিয়া। ১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধে ব্রিটেন তুর্কির পক্ষ নিয়ে রুশিয়াকে হারিয়ে দেয়। ১৮৭৬ সালে রুশিয়া তুরস্ক আক্রমণ করলে ব্রিটেন তার পক্ষ নেয় নি। বিজিত তুরস্ক ও বিজয়ী রুশিয়ার মধ্যে যে সন্ধি হ'ল তার ফলে রুশিয়ার পক্ষে পূর্ব্ব-দক্ষিণ ইউরোপে ও ভূমধ্য-সাগরে অবাধ গতিবিধির স্থবিধা হয়। ব্রিটেন কিন্তু সাম্রাজ্য স্বার্থের জন্য এ সন্ধি স্বীকার করলে না। তখন ১৮৭৮ সালে আবার বার্লিনে বিভিন্ন শক্তি মিলিত হয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করে, রুশিয়াও এতে যোগ দেয়। বিসমার্ক ও ডিস্‌রেলীর চেষ্টায়, রুশিয়ার তুর্কী বিজয় স্বীকৃত হলেও, সমস্ত স্থযোগ স্থবিধা থেকেই তাকে বঞ্চিত করা হয়। রুশিয়া কিছু পূর্ব্ব থেকেই মধ্য এশিয়ায় তার পক্ষপুট বিস্তার করবার চেষ্টা করে। বার্লিন চুক্তির পর সে এই দিকে অধিকতর নজর দিতে থাকে। একারণ ভারতে ব্রিটিশ নীতির উপর প্রতিক্রিয়া হ'ল ভীষণ। ব্রিটিশের আশঙ্কা, আফগানিস্তানের পথে রুশিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে। এজন্য তারা আটঘাট বাঁধতে স্থরু করে।

ডিস্‌রেলী ১৮৭৬ সালে মিশরের খেদিবের নিকট থেকে তাঁর সুয়েজ খাল কোম্পানীর বিরাট অংশ সবই ক্রয় করলেন ও সুয়েজ খালের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে লাগ্‌লেন। এ কারণে ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যে যাতায়াতের পথ ব্রিটিশের পক্ষে নিষ্কণ্টক হ'ল। ডিস্‌রেলী রক্ষণশীল প্রধান মন্ত্রী, লর্ড সল্‌স্‌বেরী রক্ষণশীল ভারত-সচিব, আর লর্ড লিটন (প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লিটনের পুত্র) রক্ষণশীল ভাইস্‌রয়। কাজেই স্বার্থরক্ষার অছিলায় তাঁরা যে ভারতীয় জনমত অগ্রাহ্য করবেন তাতে আর বিচিত্র কি? ডিস্‌রেলী ১৮৭৬ সালে রাণী ভিক্টোরিয়াকে 'এম্‌প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়া,' বা ভারত-সম্রাজ্ঞী উপাধি দান করলেন। ইংলণ্ডে যখন রাজক্ষমতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে, তখন ভারতবর্ষকে খাস জমিদারীতে পরিণত করে এর উপরে অবাধ স্বৈর-শাসন চালালে ব্রিটিশ আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়,—তখন এই বলে খুবই প্রতিবাদ উঠে। বড়লাট লর্ড লিটনের এসব প্রতিবাদ গ্রাহ্য করার কথা নয়। ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে খুব জঁাকাল রকমের এক দরবার অনুষ্ঠান করে তিনি প্রকাশ্যভাবে রাণী ভিক্টোরিয়ার এই উপাধির কথা সাধারণকে জানিয়ে দেন। রাজন্যবর্গকেও নানা উপাধি দেওয়া হ'ল। রাজন্যবর্গ স্বাধীন রাজার তুল্য, তাঁদের উপাধি দান ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা-বহির্ভূত, এরূপ কথাও তখন কেউ কেউ বল্‌লেন। তবে একথাও লোকে বুঝতে পারলে যে, কি ব্রিটিশ ভারত, কি রাজন্য-শাসিত ভারত, সর্ব্বত্র ব্রিটিশ প্রাধান্য মানিয়ে নেওয়াই গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারত শাসনের 'ইস্পাত কাঠামো' (Steel-frame) সিবিল সার্বিস নিয়ে এ সময়ে ভারতবাসীদের মধ্যে খুব বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। ১৮৫৩ সালের সনন্দে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক করা হলে প্রতিযোগীদের বয়স অনূর্দ্ধ তেইশ বছরের মধ্যে রাখা স্থির হয়। আরও

স্থির হয় যে, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ছাত্রদের দু' বছর পড়াশুনা ও শিক্ষানবিসি করতে হবে। ১৮৫৯ সালে পরীক্ষাকালীন বয়স ও শিক্ষানবিসি সময় এক এক বৎসর কমিয়ে যথাক্রমে বাইশ ও এক বৎসর করা হয়। দু'বছর পরে আবার প্রতিযোগিদের বয়স অনূর্দ্ধ একুশ বছরে কমিয়ে শিক্ষানবিসির সময় দু' বছর করা হ'ল। পরীক্ষার নিয়মও ছিল অদ্ভুত। প্রথম থেকেই সংস্কৃত ও আরবি ভাষায় নম্বর ধার্য্য হয় ৩৭৫, আর সে স্থলে গ্রীক ও লাটিনে ধার্য্য হয় ৭৫০। মেকলে এইরূপ ব্যবস্থা করে যান। ১৮৫৯ সালে প্রাচ্য ভাষাগুলির নম্বর বাড়িয়ে ৫০০ করা হ'ল। কিন্তু ১৮৬৩ সালে সত্যেন্দনাথ ঠাকুর পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হলেই আবার নম্বর পূর্ব্ববৎ কমান হয়! প্রায় দশ বছরের মধ্যে বিলাতের এই পরীক্ষায় ষোলজন ভারতীয় প্রতিযোগী উপস্থিত হন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কেউ ঐ সব কারণে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন নি। ১৮৬০ সালে ইণ্ডিয়া কৌন্সিল কমিশন একই সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের জন্য গবর্ণমেণ্টে সুপারিশ করেন। এ অনুসারে কাজ হয় নি। এজন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ১৮৭০ সালে এই মর্ম্মে এক আইন পাস হ'ল যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট যাতে ভারতে বসেই যোগ্য ভারতীয়দের সিবিলিয়ানীর অনুরূপ পদে নিযুক্ত করতে পারেন সেজন্য ভারত-সচিবের অনুমোদন সাপক্ষে তাঁরা যেন নিয়মপত্র রচনা করেন। মোট সিবিলিয়ানী পদের এক-ষষ্ঠাংশে ভারত-বাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট করে রাখ্‌বারও কথা হ'ল এই আইনে।

ভারত-শাসনে ভারতবাসীর অধিকার বরাবর স্বীকৃত হলেও কার্য্যতঃ তাকে এ থেকে প্রায় বঞ্চিত করেই রাখা হয়। তথাপি যেটুকু সুবিধা ছিল, ভারত-সচিব লর্ড সল্‌স্‌বেরি তাতেও বাদ সাধ্‌লেন। তিনি ১৮৭৬ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স একুশ থেকে

একেবারে উনিশ বছরে কমিয়ে দিলেন! এর ফলে ভারত-সন্তানদের পক্ষে এদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করে বিলাতে গিয়ে আই-সি-এস পরীক্ষা দান অসম্ভব হয়ে পড়ে। ওদিকে ১৮৭০ সালে এদেশে বসেই সিবিলিয়ানীর অনুরূপ পদে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে যে আইন বিধিবদ্ধ হয় তা-ও এত দিনে কার্য্যকরী হয় নি। কাজেই দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি ভারতবাসীর অনধিগম্য হয়েই রইল। উচ্চ রাজপদে ভারতীয় নিয়োগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কিরূপ অনভিপ্রেত, ভারত-সচিবকে প্রেরিত বড়লাট লর্ড লিটনের একটি গোপনীয় পত্রে তা পরিষ্কার উল্লিখিত হয়। তিনি লেখেন, "ভারতবাসীদের সিবিল সার্বিসে নিয়োগের দাবি পূরণ করা আদবে সম্ভব নয়। কাজেই, তাদের এ দাবি অস্বীকার করা বা তাদের প্রবঞ্চনা করা —এ দুটির একটি পথ বেছে নিতে হবে। আমরা দ্বিতীটিই বেছে নিয়েছি। বিলাতে ভারতীয়দের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগীদের বয়স হ্রাস করা আইনকে অকেজো করবারই কৌশল মাত্র। এ পত্রখানি গোপনীয়, সুতরাং একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্রও দ্বিধা নেই যে, কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, কি ভারত গবর্ণমেণ্ট কেউ-ই এ অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবেন না যে, আমরা মুখে যা অঙ্গীকার করেছি, কাজে তা ষোল আনাই ভঙ্গ করছি!"

ভারত-সচিবের উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদে ভারত-সভার উদ্যোগে কল্‌কাতা টাউন হলে ১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। শিক্ষিত বাঙালী সমাজ সরকারী নীতিতে এত ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারক নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও সভায় উপস্থিত হয়ে এর কার্য্যে যোগদান না করে পারেন নি। সভার একজন ভারতীয়

প্রতিনিধি মারফত একটি সিবিল সার্বিস মেমোরিয়াল বা স্মারক-লিপি পার্লামেণ্টে প্রেরণের কথা হ'ল। আরও স্থির হ'ল যে, সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে সিবিল সার্বিস স্মারক-লিপির মর্ম্ম সর্ব্বত্র বুঝিয়ে দেবেন। ভারত-সভার কার্য্যের নূতন ধারা অর্থাৎ পার্লামেণ্টে আবেদন-পত্র প্রেরণ ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনমত গঠন—দুই-ই এবারে এই প্রথম অনুসৃত হ'ল। একজন প্রতিনিধি মারফত পার্লামেণ্টে আবেদন-পত্র পেশ করার মধ্যেও নূতনত্ব ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে মে-জুন মাসে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করলেন। বাঁকিপুর, এলাহাবাদ, আগ্রা, লাহোর, অমৃতসহর, দিল্লী, মীরাট, কাণপুর, লক্ষ্মৌ, আলীগড়, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে গেলেন ও জনসভায় সিবিল সার্বিস স্মারকলিপি প্রেরণে সমগ্র শিক্ষিত ভারতবাসীর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন। এসময় উত্তর ভারতের বহু বিশিষ্ট জননেতার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। লাহোরে 'ট্রিবিউন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিটিয়া ও কালীপ্রসন্ন রায়, আলীগড়ে সার্ সৈয়দ আহ্মদ খাঁ, এলাহাবাদে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, লক্ষ্মৌতে পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, মামুদাবাদের রাজা আমীর হোসেন, বারাণসীর হিন্দী সাহিত্য-সম্রাট বাবু হরিশ্চন্দ্র ও বাবু রামকালী চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী শীতকালে (১৮৭৮) ঐ একই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করেন। বোম্বাই, সুরাট, আহ্মদাবাদ, পুণা প্রভৃতি শহরেও জনসভার অনুষ্ঠান হয়। বোম্বাইয়ে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, ফিরোজ শা মেহ্তা ও পুণায় মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে এ কার্য্য সমর্থন করলেন। সুরেন্দ্রনাথ মান্দ্রাজ হয়ে কল্‌কাতায় ফিরলেন। সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বেও অনেকে ভারত পরিভ্রমণ করেছেন, কিন্তু এবারেই সকল অঞ্চলের

অধিবাসীদের মধ্যে এক অত্যাশ্চার্য্য একপ্রাণতা লক্ষিত হ'ল। সিবিল-সার্বিস উপলক্ষ্য করে সকলেই এক অভিনব আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হলেন।

পার্লামেণ্ট সমীপে স্মারকলিপি উপস্থাপিত করবার জন্য ভারত-সভা ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষকে প্রেরণ করলেন। লালমোহন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের অনুজ। সিবিল সার্বিস স্মারক-লিপিতে দুটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল, এক—সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের উর্দ্ধতম বয়স বাড়িয়ে উনিশ থেকে বাইশ বছর করা, দুই—বিলাতে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে একই সময়ে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হয়ে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের গুণানুসারে এক তালিকা ভুক্ত করা। লালমোহন বিলাতে নানাস্থানে বক্তৃতা করে সিবিল সার্বিসে ভারতবাসীর প্রতি অবিচারের কথা ইংরেজ জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। পার্লামেণ্ট ভবনে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ভারত-বন্ধু ও পার্লামেণ্ট-সদস্য জন ব্রাইটের সভাপতিত্বে লালমোহন স্মারকলিপি ব্যাখ্যা করে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার ফলে সদস্যগণের ভিতর এত চাঞ্চল্য দেখা গেল যে, ভারত-সচিব লর্ড সল্‌স্‌বেরি বক্তৃতা দানের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ১৮৭০ সালের আইনের নিরিখে রচিত নিয়মপত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি পার্লামেণ্টে পেশ করলেন! ভারত-সচিব লর্ড সল্‌স্‌বেরীর এরূপ কর্ম্মতৎপরতা দেখে তখন অনেকে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে এতে তখন বিস্মিত হবার কিছুই ছিল না। বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে ভারতবর্ষে বসেই যাতে ভারতীয়কে নিয়োগ করা সম্ভব হয় এ উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে আইন বিধিবদ্ধ হয় ১৮৭০ সালে, কিছু আগেই এ কথা বলেছি। কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কতখানি আগ্রহান্বিত ছিলেন, প্রায় ন' বছর ধরে টালমাটাল করার মধ্যেই তা সুপ্রকট! ১৮৭৯ সালের মে মাসে বড়লাট ঐ আইন কার্য্যকরী করবার

জন্য রচিত নিয়মপত্র ভারত-সচিব সল্‌স্‌বেরীর নিকট পাঠান। ভারত-সচিব নিয়মপত্র গ্রহণ করে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে ভারতবাসী নিয়োগের অনুমতি দিলেন। এ সার্বিসের নাম হ'ল ষ্টেট্যুটারী সিবিল সার্বিস।· নিয়মপত্রে এর ক্ষমতা 'কাভেনাণ্টেড্' অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক সিবিল সার্বিসের চেয়ে ঢের সঙ্কীর্ণ করা হ'ল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, বা গবর্ণমেণ্টের উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে এ শ্রেণীর সিবিলিয়ানদের নিয়োগে স্পষ্ট বাধা সৃষ্টি করা হ'ল। তাদের প্রত্যেকের বেতনও উক্ত সিবিলিয়ানদের দুই-তৃতীয়াংশ ধার্য্য হয়। ছাত্র-সভার প্রথম সম্পাদক নন্দকিশোর বসু সর্ব্বপ্রথম এই ষ্টেট্যুটারী সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত হয়েছিলেন! ষ্ট্যাটুটারি সিবিল সার্বিস কিন্তু মোটেই জনপ্রিয় হয় নি।

১৮৭৮-৭৯ সালে ভারত-সরকার আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আগে আমরা কতকটা আঁচ পেয়েছি। রুশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখাই ব্রিটিশের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতবর্ষে, বিশেষ বাংলা দেশে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব বছর, ১৮৭৭ সালে, দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরের এলাকাভুক্ত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ সুরু হয়। দুর্ভিক্ষ দু' বছর চলে। এর ফলে ঐ সব অঞ্চলের অনুমান বায়ান্ন লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সরকারের দুর্ভিক্ষ তহবিলে যে অর্থ ছিল তা দুর্ভিক্ষ নিরাকরণের বদলে আফগান যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যয়িত হতে সুরু হয়! এ সম্বন্ধেও ভারতবাসী পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহে তীব্র সমালোচনা হতে থাকে। বাংলা সংবাদপত্রগুলি এর সমালোচনায় অগ্রণী ত হ'লই, উপরন্তু দুর্ভিক্ষের কারণ বিশ্লেষণ করে লোকের আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে, এবং সরকারের আবগারি ও অন্যান্য

আত্মঘাতী নীতি সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা দিনের পর দিন করতে লাগল। এসব বিষয়ে সরকারের দায়িত্বহীনতা দেখে সংবাদপত্রগুলি কঠোর বাদানুবাদ চালাতে থাকে। পর-রাজ্য আক্রমণে ভারত গবর্ণমেণ্টের যে নীতি বিচ্যুতি ঘট্‌ছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে তারা কসুর করলে না। সোমপ্রকাশ, সাধারণী, অমৃতবাজার পত্রিকা, চারুমিহির প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এসব সমালোচনা রক্ষণশীল কর্ত্তাদের একেবারে অসহ্য হ'ল। তাঁরা এবারে সুদ্ধমাত্র দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধে বদ্ধপরিকর হলেন! লর্ড লিটন গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণকে সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্য ১৮৭৮ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এক দিনের অধিবেশনেই দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হন্তারক ভার্ণাকুলার প্রেস একৃট পাস করিয়ে নিলেন! এর প্রতিবাদে সোমপ্রকাশ, নববিভাকর ও সাধারণী প্রকাশ বন্ধ হ'ল। শিশিরকুমার দোভাষী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'কে একরকম রাতারাতিই ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করলেন!

ভারত-সরকারের শাসন-নীতি, দুর্ভিক্ষ নিরাকরণে অবহেলা ও আফগান যুদ্ধ—এসকলের প্রতিবাদে ভারতবাসী পরিচালিত সংবাদপত্র-সমূহ যখন ঐক্যমত, এবং ভারত-সভার চেষ্টায় সমগ্র ভারতের জনমত সংঘবদ্ধ তখন কর্ত্তৃপক্ষের মনে এইরূপ ধারণা হ'ল যে, ভারতবর্ষে এক ব্যাপক বিদ্রোহ আসন্ন। সিপাহী বিদ্রোহ হয়ে গিয়েছে মাত্র কুড়ি বছর। কাজেই তার স্মৃতি কর্ত্তৃপক্ষ তখনও হয়ত ভুল্‌তে পারেন নি। ভারত-সরকারের এইরূপ ধারণা যে অমূলক, প্রেস আইনের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু উক্ত ধারণা

সরকারের মনে এতই বদ্ধমূল হয়ে ছিল যে, ভারতবাসীদের ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র করার জন্য লর্ড লিটন 'আর্ম্‌স্‌ এ্যাক্ট' বা অস্ত্র আইন নামে আর একটি আইনও বিধিবদ্ধ করলেন! বিনা লাইসেন্সে অস্ত্রশস্ত্র, এমন কি বন্দুক বা তরবারিটি পর্য্যন্ত রাখা ভারতীয়দের পক্ষে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল! শ্বেত-অশ্বেত, খ্যাত-অখ্যাত সকল বিদেশীই অস্ত্রশস্ত্র রাখ্‌তে ও ব্যাবহার করতে পারবে, কিন্তু ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দু ও মুসলমান এসব রাখলে তা হবে আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ! এরূপ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় শিক্ষিত ভারতীয়ের মন ব্রিটিশের উপর ভীষণ তিক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

ভারত-সভা এ দুটি বিষয় নিয়েই জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও তার মুখপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এই সব প্রতিক্রিয়াশীল আইনের বিরুদ্ধে আশানুরূপ প্রতিবাদ করেন নি, পরন্তু এর কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা জনমত গঠন ও জনসভা অনুষ্ঠানের বিরোধী হয়ে পড়লেন। ভারত-সভাই অগ্রণী হয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূকুটি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে কল্‌কাতার টাউল হলে পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অনুষ্ঠান করেন। তাঁদের এ প্রতিবাদ কার্য্যের অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে জনমত প্রবল তা বোম্বাই, কাণপুর ও এলাহাবাদ এসোসিয়েশন, নাগপুর শীতবল্‌দি ক্লাব এবং বাংলা দেশে ভারত-সভার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল, বগুড়া, ময়মনসিংহ, সেনহাটি, ভজনঘাটা, মেহেরপুর, কাঁথি, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন হতে তা স্পষ্টই বুঝা গেল। এ সবের পক্ষ থেকে ভারত-সভা পার্লামেণ্টে প্রেরণের জন্য একখানা প্রতিবাদ-লিপি রচনার ভার নিলেন।

উক্ত আইনগুলি সম্বন্ধে বিলাতে সরকার-বিরোধী দলের মধ্যে ইতি-পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হয়। তাই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিরোধী দলের

নেতা মিঃ গ্লাডষ্টোনের নিকট ভারত-সভার পক্ষ থেকে প্রতিবাদ-লিপি পাঠান হ'ল। প্রতিবাদ-পত্র পেয়ে উদারনীতিক দলপতি গ্লাডষ্টোন স্বয়ং পার্লামেণ্টে ভারতে অনুসৃত নীতির তীব্র সমালোচনা সুরু করলেন। ভারতবাসীদের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও অস্ত্র-রক্ষার অধিকার অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এ কথাও তিনি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। ১৮৮০ সালে ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল তাতে উদারনীতিক দলের নির্ব্বাচন-প্রার্থী সদস্যগণ এবং বিশেষ করে দলপতি মিঃ গ্লাডষ্টোন তাঁর মিডলোথিয়ান নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে প্রদত্ত বক্তৃতায় ডিস্‌রেলীর শাসনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ভারতবর্ষে অনুসৃত সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করেন। এ নির্ব্বাচনে ডিস্‌রেলী তথা রক্ষণশীল দল পরাজিত হলেন। উদারনীতিক দল জয়যুক্ত হওয়ায় দলপতি গ্লাডষ্টোন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। এসময় লর্ড লিটন বেগতিক দেখে পদত্যাগ করেন। তখন গ্লাডষ্টোন উদারচেতা লর্ড রিপণকে ভারতের বড়লাট করে পাঠান। লর্ড রিপণ এদেশে এসে প্রথমেই প্রেস আইন তুলে দিলেন। 'আর্ম্‌স এ্যাক্ট' কিন্তু রদ হয় নি।

ভারত-সভার কোন মুখপত্র ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে নাম মাত্র মূল্যে সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করে সম্পাদনা সুরু করেন। ভারত-সভা পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, এজন্য নিজেই সব ঝুঁকি মাথায় নিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি সে যুগের একজন বিদ্বান্ ও স্বদেশভক্ত পুরুষ।

ভারতে নবজীবন

রাজনীতি সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবুদ্ধির উদ্রেক করলে বটে, কিন্তু তার উৎস মূলে রস জুগিয়েছেন তিন জন শ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তান। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আজ কে না জানেন? কেশবচন্দ্র সেনের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩) আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। বেদের অভ্রান্ততা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করেন। তিনিও ছিলেন পৌত্তলিকতার বিরোধী ও সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী। তিনি ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ছিলেন। হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করে ও পুস্তক পুস্তিকা লিখে তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করতেন। তিনি যোগী, তাঁর যোগলব্ধ অভিজ্ঞতা সাধারণে জেনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। উত্তর-ভারতের জনগণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে, তাঁর কাছ থেকে নূতন প্রেরণা লাভ করলে। এতদিন হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দাই চলেছে সর্ব্বত্র। এখন, একজন যোগী সাধু পুরুষের মুখে এর মহিমা কীর্ত্তন শুনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে উপকৃত হ'ল। যে আত্ম-বিশ্বাস প্রায় শূন্যে গিয়ে পৌঁছেছিল তা আবার তারা সম্পূর্ণ ফিরে পেলে, এক-ভ্রাতৃত্ব ও এক-জাতীয়ত্ব সূত্রে পরস্পর গ্রথিত হ'ল। রাজদ্বারে আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যাহত হয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায় দয়ানন্দ প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজের ভিতর দিয়ে দেশ ও জাতির মঙ্গল কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করলেন। লালা হংসরাজ, লালা লজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ আর্য্যসমাজীগণ ভারতের নব জাতি গঠনে যেভাবে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন তা সর্ব্বকালেই স্মরণীয়। উত্তর-ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম সকল বিভাগেই দয়ানন্দের শিক্ষার প্রভাব সুস্পষ্ট।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের (১৮৩৬-১৮৮৬) নিকট এসময় বাঙালী তার মনের কথা নিবেদন করতে ব্যস্ত। উচ্চশিক্ষিত হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান তাঁর অমৃত মধুর বাণী শোন্‌বার জন্য শহরের কর্ম্মকোলাহল থেকে দক্ষিণেশ্বরের আম্র কাননে নিরালায় ছুটে চলেছে। যে পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় শিক্ষিত বাঙালীর নিকট প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ হয়ে রয়েছে অবজ্ঞেয় তাদেরই একজন এই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁরই কাছে শিক্ষিত সমাজের ধর্ণা দেওয়া কম বিস্ময়ের বিষয় নয়। কিন্তু এ-ই তখন ঘটেছিল। বাঙালীকে রামকৃষ্ণদেব আশার কথা শোনালেন। পৌত্তলিকার মত ঘৃণ্য বস্তুও যে ধর্ম্মসাধনের অন্যতম অঙ্গ হতে পারে একথা তিনিই প্রথম শিক্ষিত সমাজকে শোনান। হিন্দু, খ্রীষ্টান বা মুসলমান—সকল ধর্ম্মই সমান পূজ্য, সকল ধর্ম্মেই সমান সত্য নিহিত, তিনি 'নিজে আচরি ধর্ম্ম' পরকে একথা শেখালেন। সকলের প্রতি সকলের, প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের প্রেম-পূর্ণ ভ্রাতৃভাব প্রদর্শনে ধর্ম্মের দিক দিয়েও কোন বাধা নেই—পরমহংসদেবের এই বাণী ধর্ম্মবাহুল্য-পীড়িত ভারতবাসীর দেহে বিদ্যুৎ-বেগে শক্তি সঞ্চার করলে। জাতির জীবনে ঐক্যবোধ সৃষ্টি কল্পে শিক্ষিত জনের মহৎ প্রচেষ্টা পরমহংসদেবের মঙ্গল হস্ত স্পর্শে শুদ্ধ সত্তা লাভ করলে। আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী—পরমহংস-দেবের গৃহদ্বার সকলের নিকট মুক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত—সে যুগের গুণীমানী সকলেই তাঁর গুণ ও শক্তিতে মুগ্ধ। রাজদ্বারে লাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমর্থ শিক্ষিত সমাজ এই নিরক্ষর গ্রাম্য পুরোহিতের নিকট শক্তির সন্ধান পেলেন। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) পরমহংসদেবের শিক্ষা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম্মের রূপায়িত করেছেন। আজ কিন্তু উচ্চ-নীচ,

শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলের হৃদয়েই পরমহংসদেবের স্থান দৃঢ়নিবদ্ধ।

কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণের শিক্ষায় আশাহত ভারতবাসী যখন আশান্বিত, তার নীরস মন নবরসপ্লুত—এই কল্যাণ মুহূর্ত্তে ভারত-সভা নূতন চিন্তা ও কর্ম্মধারা জনসাধারণের নিকটে পরিবেশন করলেন। এতদিন সভার কার্য্য গর্হিত রাজ-বিধির প্রতিবাদেই সীমাবদ্ধ ছিল, অতঃপর সভা গঠনমূলক কার্য্যে হাত দিলেন। ভারত-সভার মূল উদ্দেশ্য—ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এজন্য প্রথমেই তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা-কমিটিগুলির সংস্কারে অবহিত হন। শহরের স্বাস্থ্য, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অনেক স্থলে আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এতে কর্ত্তৃত্ব করতেন পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা। জেলা-কমিটিগুলির বয়স তখনও দশ বছর অতিক্রান্ত হয় নি। এর প্রতিষ্ঠার একটু কৌতুকপূর্ণ ইতিহাস আছে। ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় বিলাতে তুলার অভাব ঘটে। তখন মধ্যপ্রদেশ ও বেরার অঞ্চল থেকে তুলা রপ্তানি আরম্ভ হয়। তুলা রপ্তানির জন্য রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ আবশ্যক। এজন্য ভারত-সরকার নিজ ব্যয়ে প্রথম প্রথম রাস্তা নির্ম্মাণে হাত দিলেন। ১৮৭১ সালে তাঁরা একটি আইন বিধিবদ্ধ করে প্রত্যেক জেলার অধিবাসীদের উপর রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণের জন্য রোড-সেস বা পথ-কর নামে একটি নূতন কর বসান। ক্রমে রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ বাদে জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের ব্যয়ও এ দ্বারা নির্ব্বাহিত হতে থাকে। ডিষ্ট্রিক্ট কমিটি নামে এক কমিটির উপর এসব কার্য্যের ভার পড়ে। এ কমিটির দুই-তৃতীয়াংশই বেসরকারী সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সবাই সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হতেন। জেলার শাসনকর্ত্তা কমিটির স্থায়ী সরকারী চেয়ারম্যান বা

সভাপতি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথা ভারত-সভা এই সব জেলা-কমিটি ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য এক প্রস্তাব করে ভারত-সরকারের নিকট পাঠালেন। তখন লর্ড রিপণ ভারতের বড়লাট। প্রেস আইন রদ করে তিনি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। ১৮৮১, অক্টোবর ও ১৮৮২, মে মাসে সপরিষদ বড়লাট জনপ্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা স্বীকার করে এক 'রেজলিউশন' বা প্রস্তাব করেন। এরই ফলে ১৮৮৫ সালে বঙ্গে 'লোক্যাল সেল্‌ফ্‌ গবর্ণমেণ্ট এ্যাক্ট' বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন পাস হয়ে যায়। আজ বঙ্গদেশে যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ড বর্ত্তমান তার ভিত্তি ঐ আইনের মধ্যেই নিহিত। সাধারণের ভোটে লোক্যাল বোর্ডের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও লোক্যাল বোর্ড কর্ত্তৃক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অতঃপর প্রবর্ত্তিত হয়। অবশ্য প্রত্যেক বোর্ডে কয়েকজন করে সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য থাকাও স্থির হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতি কিন্তু সর্ব্বত্র ১৯১৮ সালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত বরাবর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটই ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটিতেও নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সেখানে চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেও হতে পারবেন স্থির হয়।

১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের মূলেও ছিলেন লর্ড রিপণ। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ সালের দশম আইন দ্বারা প্রজার উপর জমিদারের অধিকারগুলি কিছু কিছু সঙ্কোচ সাধন করেন ও পাট্টা কবুলিয়তের ব্যবস্থা করে প্রজাকে জমির স্বত্বাধিকার দান করেন। কিন্তু কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট এতেও বিশেষ নিবারিত হয় নি। বঙ্গের ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্‌বেল ১৮৭২ সালে কৃষকদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে গবর্ণমেণ্টে এক মন্তব্য-লিপি পেশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক

প্রবন্ধ লিখে কৃষকদের দুরবস্থা ও তা প্রতিকারের উপায়সমূহ সাধারণের গোচরে আনেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, প্রধানতঃ তাঁরই আলোচনার ফলে সরকার কৃষকদের সম্পর্কে আইন করতে অগ্রসর হন। ভারত-সভাও প্রজাদের দুঃখ-দৈন্য মোচনের জন্য নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে জনসভার অনুষ্ঠান করেন। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ভারত-সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারত-সভা প্রজা-স্বত্ব বিষয়ক আইন সম্বন্ধে সরকারকে এক স্মারক-লিপি প্রেরণ করেন। প্রস্তাবিত আইনে এর বহু বিষয় গৃহীত হয়। এ আইনের নাম হ'ল '১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন'। জমিতে প্রজার স্বত্ব এবারে সুনির্দ্দিষ্ট হ'ল। কোন জমি বার বৎসর একাদিক্রমে ভোগ করলে তাতে যে প্রজার দখলি স্বত্ব জন্মে তা এবারেই স্থির হয়। জমিদারের তরফে প্রজাকে জমির খাজনা প্রাপ্তির নিদর্শন স্বরূপ দাখিলা দেওয়ার রীতিও এই আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হ'ল।

কিন্তু ভারতবাসীর নিকট লর্ড রিপণের নাম স্মরণীয় অন্য একটি বিশেষ কারণে। আর এই কারণেই সুরেন্দ্রনাথের নেশনাল কনফারেন্স ও এলান অক্টেভিয়ান হিউমের নেশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা অত আসন্ন হয়ে পড়ে। সার্ কোর্টনি ইল্‌বার্ট এই সময় ছিলেন বড়লাটের আইন-সচিব। বঙ্গের ছোটলাট সার্ এ্যাস্‌লি ইডেন (১৮৭৭-১৮৮২) কল্‌কাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বিহারীলাল গুপ্তের একখানি পত্র ও পত্রোল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে নিজ অনুকূল মত লিপিবদ্ধ করে বড়লাটের দপ্তরে প্রেরণ করেন। পত্রের মর্ম্ম ছিল এই যে, ইউরোপীয়দের ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় অপরাধের বিচারে দেশীয় সিবিলিয়ানদের অক্ষমতা যেন অবিলম্বে দূর করা হয়। পূর্ব্বেকার আইনে ইউরোপীয়দের বিশেষ

অধিকারগুলি লোপ করা হয় বটে, কিন্তু তাদের বিচারে দেশীয় বিচারকদের অক্ষমতা বাহালই থেকে যায়। লর্ড রিপণ বিচারে ইত্যাকার বর্ণ-বৈষম্য বিদূরণের জন্য আইন-সচিব সার্ কোর্টনি ইল্‌বার্টকে দিয়ে ফৌজদারী আইন সংশোধন করে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করান। এইজন্যই ঐ খসড়া ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত হয়েছে। খসড়াটি ১৮৮২, ২রা ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হলে যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল ছোড়া হ'ল! ভিতরকার সাহেব সভ্যগণ, মায় তখনকার বঙ্গের ছোটলাট সার রিভার্স অগষ্টাস টমসন (১৮৮২-১৮৮৭) এবং বাইরের সওদাগর, আইন-ব্যবসায়ী, সংবাদপত্র-সম্পাদক প্রভৃতি সমগ্র ইউরোপীয় সমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। ইংরেজগণ লর্ড রিপণকে ব্যক্তিগত ভাবে অপমান করতেও দ্বিধা করলে না। ছোটলাট টমসন সাহাবের জ্ঞাতসারেই তাঁকে ধরে জোরপূর্ব্বক বিলাতে পাঠিয়ে দেবারও ষড়যন্ত্র করেছিল তারা। তখন ইউরোপীয় সমাজ আত্মরক্ষার্থ একটা 'ডিফেন্স এসোসিয়েশন'ও গঠন করলে! এই এসোসিয়েশন থেকেই বর্ত্তমান ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনের জন্ম। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সময় ইউরোপীয়দের মনোবৃত্তির প্রতি ধিক্কার জানিয়ে কবিতায় লিখ্‌লেন,

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন কেশুয়িক, মিলার—
"নেটিবের কাছে খাড়া, "নেভার—নেভার!"
"নেভার" সে অপমান, হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের জানানা?
বিবিজান! দেহে প্রাণ, কখনো তা হবে না॥
হিপ হিপ হিপ হুরে হ্যাট কোট বুট প'রে

সরা ভাবে জগতেরে—তা'দের বিচার,
নেটিবের কাছে হবে? "নেভার—নেভার !!"

এই সময় শিক্ষিত অশিক্ষিত ভারতীয় সমাজ লর্ড রিপণকে তাঁর সাধু সঙ্কল্পের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করে। গ্রীষ্মাবাস সিমলা থেকে কল্‌কাতা পৌঁছলে তারা তাঁকে হাওড়া থেকে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা করে নিয়ে যায়। বেলগাছিয়া উদ্যানে বাঙালীরা সমবেত হয়ে তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করে। বাঙালী জমিদার শ্রেণী প্রজাস্বত্ব আইনের সূচনা হেতু রিপণের উপর তেমন খুশী ছিল না। এদের সমর্থন না পেলেও ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টি ছিল তাঁর পশ্চাতে। তিনি যখন কর্ম্মত্যাগ করে স্বদেশে চলে যান তখন কল্‌কাতা থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত পথিমধ্যে সমস্ত ষ্টেশনে ও শহরে ভারতবাসীরা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। রিপণের এইরূপ জনপ্রিয়তা দেখে "If it be real, what does it mean", "এ যদি সত্য হয়, তা'হলে এর অর্থ কি?" শিরোনামায় একখানা পুস্তিকা লেখেন তৎকালীন রাজস্ব-সচিব সার্ অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন। তিনি পুস্তিকার এক স্থলে লিখ্‌তে বাধ্য হলেন, "বিরাট ভারতবর্ষের শুষ্ক অস্থিতে নবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।" যা হোক্, ইলবার্ট বিল এক বৎসর পরে ১৮৮৩, ২৮শে জানুয়ারী যে আকারে পাস হ'ল তাতে আগেকার অবস্থার বিশেষ কোন প্রতীকার হ'ল না। ইউরোপীয় আসামী অর্দ্ধেক সংখ্যক ইউরোপীয় জুরি প্রার্থনা করলেই দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বা সেসন জজকে তাতে সম্মত হতে হ'ত। জুরির অভাব ঘট্‌লে নিকটবর্ত্তী কোন জেলায়—যেখানে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক জুরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিচার-কার্য্য স্থানান্তরিত করার কথা থাকে। এরূপ অবস্থায় দেশীয় বিচারকগণ প্রায়ই ইউরোপীয়দের বিচারভার গ্রহণ করতেন না।

এসময়কার আর একটি ঘটনা যা নিয়ে কাশী কাঞ্চি দ্রাবিড় মথিত হয়ে উঠ্‌ল—তা হ'ল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু' মাস দেওয়ানী জেলে কারাবাস। হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস এক মোকদ্দমা বিচারের সময় আদালতে শালগ্রাম শিলা আনিয়েছিলেন। 'ব্রাহ্ম পাব্‌লিক ওপিনিয়ন' পত্রে এর একটি বিবরণ ও সমালোচনা বার হয়। এর উপর নির্ভর করে সুরেন্দ্রনাথও এই নিয়ে তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রে তীব্র সমালোচনা করেন। আদালত অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ সালের ৫ই মে হাইকোর্টের বিচারপতি-মণ্ডলীর সম্মুখে তাঁর বিচার হয় ও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর ঐরূপ দণ্ডাদেশ হয়। বিচারপতি সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র পূর্ব্ব নজীর উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথকে কিঞ্চিৎ জরিমানা করে ছেড়ে দেবার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ওরূপ দণ্ডদানে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মধ্যেই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। তাঁর বিলাতিপনা জেনেও হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষতা করায় হিন্দু সাধারণ তাঁকে আপন করে নিলে। ছাত্রসমাজ একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। তারা বিচারের দিনে একযোগে ধর্ম্মঘট করে হাইকোর্টের প্রাঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এ বিষয়ে যিনি তাদের নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁর নাম আজও ভারতবাসীর প্রাণে অপূর্ব্ব শক্তি দান করছে। তিনি পরবর্ত্তী কালের ভারত-বিখ্যাত সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রতিক্রিয়া কম হয় নি। সর্ব্বত্র জনসভায় দণ্ডদানের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হ'ল ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হ'ল। আনন্দমোহন বসু ১৮৮৩ সালের ভারত-সভার কার্য্যবিবরণীতে এই মর্ম্মে লিখেছেন,

"অশুভ থেকে শুভের উদ্ভব—বাক্যটীর যাথার্থ্য এ ঘটনায় যেরূপ সুষ্ঠুরূপে প্রমাণিত হ'ল এমনটি পূর্ব্বে কখনো হয় নি। এ ব্যাপারটিতে সর্ব্বত্র যতখানি গভীর ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা

যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রদেশের জনগণ পরস্পরের জন্য বেদনাবোধ করতে শিখেছে, এবং ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।"

বাস্তবিক, একদিকে ইল্‌বার্ট বিল নিয়ে ইউরোপীয় সমাজের বিসদৃশ আন্দোলন ও অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি অন্যায় দণ্ডাদেশ এ দুটি কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ় হবার বিশেষ সুযোগ ঘটে। আর এই শুভ লক্ষণকে অবিলম্বে বস্তুতান্ত্রিক করে তোলবারও চেষ্টা সুরু হয়। এতদিন নিজেদের দীন অবস্থা যদি-বা বুঝতে কিছু বাকি ছিল, এবারে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের তীব্রতায় তা সম্যক্ উপলব্ধি হ'ল। ইউরোপীয়েরা প্রকাশ্যে বল্‌তে লাগ্‌ল, ভারতবাসীরা দাস জাতি ("subject race"), তারা স্বাধীন লোকের অধিকার ("citizen rights") ভোগের সম্পূর্ণ অযোগ্য! ভারত-সভা এতদিন যে আন্দোলন চালান, তার অন্যতম মূল লক্ষ্য ছিল স্বদেশে ভারতীয়দের প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এর উপায় তখনও তাঁদের মনে নির্দ্দিষ্ট আকারে দেখা দেয় নি। তবে এজন্য যে একটি স্থায়ী তহবীল বা ধনভাণ্ডার আবশ্যক সে সম্বন্ধে সভা পূর্ব্বে এক প্রস্তাব করেছিলেন। সাপ্তাহিক 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' (২১ জুন ১৮৮৩) একটি জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে থাকৃতেই কৃষ্ণনগরের জননায়ক উকীল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ও অন্যান্য জননেতাকে পত্র দ্বারা একটি সুন্দর প্রস্তাব করে পাঠালেন। ১৮৮৩, ৪ঠা জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায়ও এই প্রস্তাব সম্বলিত তাঁর একখানি পত্র প্রকাশিত হ'ল। পত্রের স্থূল মর্ম্ম এই—প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ ভাবে আন্দোলন চালান আবশ্যক। সেজন্য দুটি উপায় অবলম্বন প্রয়োজন—প্রথম, একটি নেশনাল এসেম্বলী বা নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও দ্বিতীয়, আন্দোলন সুষ্ঠুরূপে

পরিচালনার জন্য একটি 'নেশনাল ফণ্ড' বা জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা। তারাপদ এ দুটিকে অভিন্ন জ্ঞান করে প্রথমটিকে 'পুরুষ' ও দ্বিতীয়টীকে 'প্রকৃতি' আখ্যা দেন। পত্রে একটি পরিকল্পনাও সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হয়। ইংলণ্ডবাসীদের ভারতবর্ষের অবস্থা জানাবার জন্য ইংলণ্ডে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি রক্ষা, ভারতবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে স্বদেশে এক দল রাজনৈতিক মিশনরী নিয়োগ (তাঁদের কার্য্য হবে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নানাস্থানে রাষ্ট্রীয় সংঘ, বিপণি সংঘ ও অনুরূপ সংঘ প্রতিষ্ঠা), জাতীয় ব্যবসা ও শিল্পে উৎসাহ দান, কার্য্যকরী শিল্প-যন্ত্রের উদ্ভাবক ও নির্ম্মাতাদের এবং শিল্প বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা লেখকদের পদক, পুরস্কার ও সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা, আর বিভিন্ন ধার্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির চেষ্টা—এসব উদ্দেশ্য নিয়ে উক্ত নেশনাল এসেম্বলী প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সুরেন্দ্রনাথ জেল থেকে বেরিয়ে এসেই এসকল প্রস্তাব শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করবার জন্য সচেষ্ট হলেন। বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে অবিলম্বে একটি নেশনাল কন্‌ফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন স্থাপনের আবশ্যকতা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁদের সম্মতি নিয়ে ভারত-সভার আনুকূল্যে কল্‌কাতায় ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি নেশনাল কন্‌কারেন্স আহূত হয়। ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর—এই তিন দিন কল্‌কাতার এলবার্ট হলে এর অধিবেশন হ'ল। প্রথম দিন বর্ষীয়ান্ রামতনু লাহিড়ী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন সভার পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে কালীমোহন দাশ এবং অন্নদাচরণ আস্তগীর মহাশয়দ্বয়। সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় একশ' প্রতিনিধি যোগদান করেন। আনন্দমোহন বসু তাঁর উদ্বোধন বক্তৃতায় এই মন্তব্য করলেন যে, ভাবী নেশনাল পার্লামেণ্ট বা জাতীয় পরিষদের

এ-ই হ'ল প্রথম স্তর। প্রথম ও পরবর্ত্তী কংগ্রেসে যে-সব বিষয় নিয়ে বার বার আলোচনা হয়েছে, এ সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির মধ্যে তারই সূত্র আমরা পাই। প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা, সিবিল সার্বিসে ও অন্যান্য উচ্চ রাজপদে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ, জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন, অস্ত্র আইন রহিত করণ—এই সব বিষয় নিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কভেনাণ্টেড্ সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

পরবর্ত্তী মে মাসে (১৮৮৪) সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় ভারত ভ্রমণে বার হলেন। বাঁকীপুর, বারাণসী, এলাহাবাদ, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ, আলীগড়, আগ্রা, দিল্লী, আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, লাহোর—উত্তর-ভারতের বহু শহরে তিনি গমন করলেন। পূর্ব্ব বারে সিবিল সার্বিসের অব্যবস্থা বিদূরণেব জন্যই নানাস্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও এবিষয়টি তাঁর বক্তৃতার অঙ্গ ছিল। তবে এবারকার মূল উদ্দেশ্য ছিল আর একটি। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সুষ্ঠু ও স্থায়ী ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার জন্য একটি জাতীয় ভাণ্ডার স্থাপনের আবশ্যকতার কথা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। এবারে সর্ব্বত্র তিনি অদ্ভুত সাড়া পেলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা এতদিনে খুবই জাগ্রত হয়েছে। সিবিল সার্বিসে ভারতীয়দের প্রতি অবিচারের কথা উল্লেখ করে ভারত-সভা বড়লাটের মারফত ভারত-সচিবের নিকট স্মারকলিপিও প্রেরণ করেন।

১৮৮৫ সালের মাঝামাঝি হেন্‌রী কটন নামে এক সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী 'নিউ ইণ্ডিয়া' বা 'নবীন ভারত' পুস্তক লেখেন। বইখানির প্রকাশে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় সমাজেই বেশ একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল।

ভারতবাসীর প্রতি ইউরোপীয়দের বিষম ব্যবহার, সরকারী শোষণনীতি, অবাধ-বাণিজ্য নীতির ফলে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের দুরবস্থা, ভারতীয় রাজস্ব, সরকারী ঋণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কটন সাহেব বইখানিতে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি এক স্থলে লেখেন,

"শিক্ষিত সমাজ দেশের কণ্ঠ ও মস্তিষ্ক। শিক্ষিত বাঙালীরা এখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত জনমত নিয়ন্ত্রিত করছেন। যদিও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরা বাঙালীদের চেয়ে শিক্ষায় ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধে অনগ্রসর তথাপি বাঙালীর মতই তারাও শিক্ষিত জনের আদেশ ও নেতৃত্ব মান্য করতে সমান তৎপর। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এর কোন লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হ'ত না। পঞ্জাবে বাঙালী প্রভাব—লর্ড লরেন্স, মণ্টগোমারি, ম্যাকলাউড কখন কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা এমনই যে, গত বৎসর একজন বাঙালী বক্তা ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে করতে যখন উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ করেন তখন তা কোন বীর পুরুষের দিগ্বিজয় অভিযান বলেই ভ্রম হয়েছিল! এখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢাকা থেকে মুলতান পর্য্যন্ত যুবক সম্প্রদায়ের মনে সমান প্রেরণা জাগায়।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাস "আনন্দমঠ" ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত করেন। তাঁর স্বদেশ-ভক্তিমূলক অন্যান্য গ্রন্থ রাজসিংহ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম পর পর প্রকাশিত হতে থাকে। শিক্ষিতসমাজ সাহিত্যের ভিতর দিয়েও নব চেতনা লাভ করলে। 'আনন্দমঠে' ভারতবাসী সন্তানদল একই কালে মুসলমান ও ইংরেজ শক্তিকে যুদ্ধে হারিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সন্তান দলের এই কৃতিত্ব বাঙালীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করে। পরবর্ত্তী যুগে সন্তানদের বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। মন্ত্রটি এই,

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্

ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্।

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদ করালে,

দ্বিসপ্ত কোটি ভুজৈর্ধৃত খর-করবালে, অবলা কেন মা এত বলে।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদল বারিণীং মাতরম্।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমল-দল-বিহারিণী

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং

নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্ সুজলাং সুফলাং মাতরম্

বন্দে মাতরম্

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং মাতরম্॥

১৮৮৫ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর কল্‌কাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বিশেষ জাকজমক সহকারে জাতীয় সম্মেলন দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হ'ল। ভারত-সভার সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ও সেন্ট্রাল মহম্মডান এসোসিয়েশনও যোগদান করেন। প্রথম বারে কিন্তু এঁরা যোগ দেন নি। এবারকার সম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন।
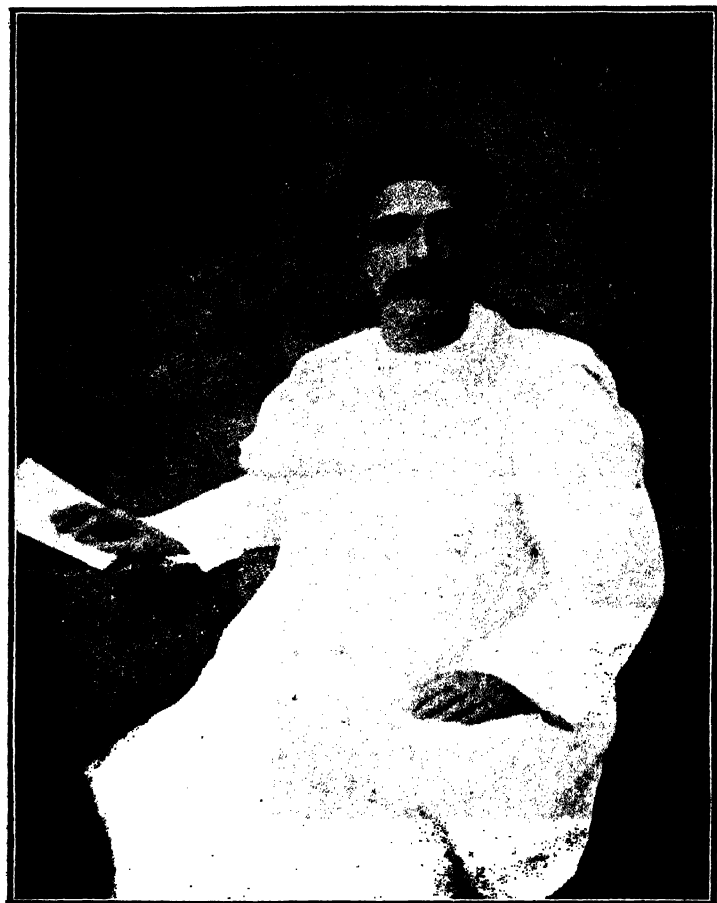
বালগঙ্গাধর তিলক

গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে

আসাম, এলাহাবাদ, বারাণসী, মীরাট, কৃষ্ণনগর, হুগলী, ভবানীপুর, বৰ্দ্ধমান, ভজনঘাট, সেনহাটী, পাবনা, টাকী, বাগেরহাট, কানাইপুর, রামজীবনপুর, চুঁচুড়া, কটক, কাতাদা, বেরা, বৈদ্যবাটী, রাজসাহী, ব্রাহ্মণবারিয়া, নোয়াখালি, ঘাটাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, জঙ্গীপুর, মজঃফরপুর, মহিষাদল, কালনা, ত্রিহুত প্রভৃতি অঞ্চলের জনসভাসমূহ সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। বিহার জমিদার সভার পক্ষে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এবং বোম্বাই থেকে ভি এন্ মাণ্ডলিক সভায় উপস্থিত হন।

এবারকার সম্মেলনেও তিন দিন তিন জন পৌরোহিত্য করেন। প্রথম দিনে সভাপতি হয়েছিলেন দুর্গাচরণ লাহা, দ্বিতীয় দিনে হন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তৃতীয় দিনে মহারাজা নবকৃষ্ণ। প্রথম দিনের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় সম্মেলনের পরিকল্পনার একটু ইতিবৃত্ত প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ১৮৭৭ সালের দিল্লী দরবার দেখে তখন অনেকের মনে এই কথাই উদিত হয় যে, জাতীয় সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য ভারতীয় জননেতাদের নিয়ে এরূপ একটি সম্মেলন হলে বিশেষ ভাল হয়। ১৮৮৩ সালের পূর্ব্বে এ বিষয়টি কার্য্যে পরিণত হতে পারে নি। ঐ বৎসরে কল্‌কাতায় অনুষ্ঠিত 'ইণ্টারনেশনাল একজিবিশন' বা আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীর সুযোগ নিয়ে ভারত-সভা একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। তদবধি ভারতবর্ষের বহু স্থলে—বোম্বাই, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ এবং আজমীরেও এইরূপ সম্মেলন সুরু হয়। বাস্তবিক এই সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যেন আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য উদ্যোগ আয়োজনের সাড়া পড়ে যায়।

জাতীয় সম্মেলনের প্রথম বারের অধিবেশনে যে-সব বিষয়ের আলোচনা সুরু হয়েছিল এবারকার অধিবেশনে তা আরও ব্যাপকতর

ভাবে আলোচিত হ'ল। ব্যবস্থা পরিষদের পুনর্গঠন সম্বন্ধে প্রথম দিনে সুরেন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার আলোচনায় রাজশাহী, পাবনা, চুঁচুড়া প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিনিধি ব্যতীত হেনরী কটন, কালীমোহন দাশ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মাণ্ডলিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দও যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সম্মেলনে দারভাঙ্গার মহারাজা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, আশুতোষ বিশ্বাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উনিশ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হ'ল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে অস্ত্র আইন রহিত করণ, শাসন-ব্যয় হ্রাস, সিবিল সার্বিস প্রশ্ন, শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ, পুলিশ বিভাগ পুনর্গঠন এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক ভারত-শাসন বিষয়ে অনুসন্ধান—ভারতবাসীর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এই সকল বিষয় আলোচিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, প্রত্যেকটি প্রস্তাবের উপরেই বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিনিধি নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথও অধিকাংশ প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। বোম্বাই নগরীতে ২৮শে ডিসেম্বর থেকে যে সম্মেলন হওয়ার কথা, তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তৃতীয় দিনে অধিবেশন শেষে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এই মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করা হ'ল,—"কল্‌কাতার সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ বোম্বাইয়ের আসন্ন সম্মেলনের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছে।"

কংগ্রেস-যুগ

নেশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

পরিকল্পনা

এতক্ষণ পরে আমরা কংগ্রেসের কথায় উপনীত হলাম। ১৮৮৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কল্‌কাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। বোম্বাই শহরে নিখিল-ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে কংগ্রেস বা সম্মেলন উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে তার শুভ-কামনা করে সম্মেলনের পক্ষে তার প্রেরণের কথা এইমাত্র বলেছি। কংগ্রেসে এই তার পঠিতও হয়েছিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় তখন ভারত-সভার কার্য্যে আসাম সফর করছিলেন। তিনিও সাফল্য কামনা করে স্বতন্ত্র-ভাবে কংগ্রেসে এক তার করেন। এ তারও সভায় পঠিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ জননেতাদের কিন্তু আগে যথাসময়ে এই জাতীয় কংগ্রেসের বিষয় জানান হয় নি। শেষ মুহূর্ত্তে তাঁরা যখন এ সম্মেলনের কথা জানতে পারলেন তখনই তাতে তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করলেন। তবে পূর্ব্বে তাঁদের এ বিষয়ে কেন জানান হয় নি সে সম্বন্ধে পরে কিছু বল্‌তে হবে।

বাঙালী মনে নিখিল-ভারতীয় অনুষ্ঠানের কল্পনা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার অন্যূন বিশ বছর পূর্ব্বে জাগ্রত হয়েছিল, এবং তা প্রথম রূপ পেয়েছিল হিন্দু মেলার বার্ষিক অধিবেশনের মধ্যে। পরে শিশিরকুমার ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান লীগ', সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত-সভা নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখে। ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সালের কল্‌কাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে

কংগ্রেসের স্পষ্ট রূপ আমরা দেখ্‌তে পাই। বাংলাদেশে যখন এইরূপ নিখিল-ভারতীয় আদর্শে সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্রনীতির আলোচনা সুরু হয়েছে তখন অন্যান্য প্রদেশেও এ উদ্দেশ্যে নানা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পূর্ব্বে কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের একটি শাখা মাদ্রাজে গঠিত হয়। বোম্বাইয়ে একটি স্বতন্ত্র সভা স্থাপিত হয়েছিল। এ সময় দেখ্‌তে পাই, মাদ্রাজে 'মহাজন সভা' স্থানীয় রাজনীতিক কার্য্য পরিচালনায় রত। বিখ্যাত 'হিন্দু' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাজন সভারও প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম পরিচালক। পুণার সার্ব্বজনিক সভা ১৮৭২ সাল থেকে দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা কার্য্যে লিপ্ত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৭৬ সালে ও-অঞ্চল ভ্রমণ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় লিখ্‌লেন যে, পুণার সার্ব্বজনিক সভা পল্লীগ্রামে অন্যূন কুড়িটি শালিসী আদালত পরিচালনা করছে! মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ে সে যুগের একজন সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী রাজনীতিক। তাঁর নাম মহারাষ্ট্রে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন এই সার্ব্বজনিক সভার প্রাণ। এই সভার মুখপত্র ছিল একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এই সময়ে পুণার মণীষীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লঙ্কার 'নিবন্ধমালা' পত্রিকার ভিতর দিয়ে মারাঠা জাতির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করতে থাকেন। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক-অনুসৃত নব রাজনীতির মূলে ছিলেন তিনি ও তাঁর 'নিবন্ধমালা'। আগেকার বোম্বাই এসোসিয়েশন বহুদিন নির্জ্জীব অবস্থায় থেকে শেষে একেবারে উঠে যায়। ১৮৮৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী সেখানে 'বম্বে প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন' নামে পুনরায় একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হ'ল। সার্ জামশেঠজী জিজিভাই এর সভাপতি। বদরুদ্দিন তায়েবজী, ফিরোজশা মাঞ্চারজী মেহ্‌তা, দিনশা এদুলজী ওয়াচা ও কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং তখন

বোম্বাইয়ের নেতৃপদে সমাসীন। শেষোক্ত তিনজন ঐ সভার সম্পাদক পদে বৃত হন। কিন্তু এ সকলই খণ্ড প্রচেষ্টা। এগুলিকে সংহত করে ভারতীয় মহাজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবিসমূহ ব্যক্ত করবার জন্য একটি সম্মিলিত অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সর্ব্বত্র বহুদিন থেকেই অনুভূত হয়েছিল। 'থিওসফিক্যাল সোসাইটি' শিক্ষিত সমাজের নিকট অপরিচিত নয়। মাদাম ব্লাভাস্কি এর প্রতিষ্ঠাতা। মাদ্রাজ শহরের আডিয়ার এর প্রধান কেন্দ্রস্থল। সে যুগের গণ্যমান্য বহু লোক এর সভ্য হয়েছিলেন। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে তাঁরা এখানে এসে 'কন্‌ভেনশন' বা সভা করতেন। ১৮৮৪ সালে কনভেনশনের পর মাদ্রাজের রাও বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হয়ে প্রস্তাব করেন যে, রাজনীতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি বছর অনুরূপ সম্মেলন করলে মন্দ হয় না। কিন্তু এই মনোভাবকে সুষ্ঠু রূপ দেবার জন্য একজন মহামনাঃ ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হ'ল।

এলান অক্টেভিয়ান হিউমকে অনেকে কংগ্রেসের জনক বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, এ সম্মান তাঁর একার প্রাপ্য নয়। তবে তিনি যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূলে একজন তা আমাদের মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হবে। হিউম সিবিলিয়ান। তাঁর নিবাস স্কটলণ্ডে। ভারতবর্ষে তিনি বহুদিন সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন বিদ্রোহের লীলাক্ষেত্র অযোধ্যার এটোয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। বিদ্রোহের ভয়াবহ দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি ১৮৭০-৭৯ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বপূর্ণ সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিউম স্বাধীনচেতা সিবিলিয়ান, উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর খিটিমিটি লেগেই ছিল। বড়লাট লর্ড লিটন তাঁকে একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব দানের প্রস্তাব করলে ভারত-সচিব লর্ড

সল্‌স্‌বেরি ঐ ওজুহাতেই তা নাকচ করে দেন! শেষ পর্য্যন্ত আবার ঐ কারণেই তাঁকে সেক্রেটারী পদ থেকে অবনমিত করা হ'ল। রেভিনিউ বোর্ডের কার্য্যে সিমলা থেকে এলাহাবাদে তিনি স্থানান্তরিত হলেন। হিউম একজন বিখ্যাত পক্ষিবিদ্‌ ছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষিতত্ত্ব আলোচনায় তিনি বিস্তর অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু পুস্তকও আছে। সিমলায় তাঁর একটি পক্ষী-চিড়িয়াখানা ছিল। সরকারের কুনজরে পড়ায় তাঁর পক্ষিতত্ত্ব আলোচনায়ও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। দীর্ঘ বত্রিশ বছর রাজকার্য্যে নিয়োজিত থেকে ১৮৮২ সালে হিউম অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সিমলারই বাসিন্দা হলেন।

হিউমের অন্যতম প্রধান 'অপরাধ' ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসা। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় হীন অবস্থা দেখে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। তাঁর *Old Man's Hope* নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত "Awake" শীর্ষক কবিতাটিতে এভাব সুব্যক্ত,

1

Sons of Ind, why sit ye idle,
Wait ye for some Deva's aid ?
Buckle to, be up and doing !
Nations by themselves are made !

2

Are ye serfs or are ye freemen,
Ye that grovel in the shade ?
In your own hands rest the issues !
By themselves are nations made !

3

Ye are taxed, what voice in spending
Have ye when the tax is paid ?
Up ! Protest ! Right triumphs ever !
Nations by themselves are made !

4

Yours the land, lives all, at stake, tho'
Not by you the cards are played ;
Are ye dumb ? speak up and claim them !
By themselves are nations made !

5

What avail your wealth, your learning,
Empty titles, sordid trade ?
True self-rule were worth them all !
Nations by themselves are made !

6

Are ye dazed, or are ye children,
Ye, that crouch, supine, afraid ?
Will your childhood last for ever ?
By themselves are nations made !

7

Whispered murmurs darkly creeping,
Hidden worms beneath the glade,

Not by such shall wrong be righted !

Nations by themselves are made !

8

Do ye suffer ? do ye feel

Degradation ? undismayed

Face and grapple with your wrongs !

By themselves are nations made !

9

"Ask no help from Heaven or Hell !

In yourselves alone seek aid !

He that wills, and dares, has all ;

Nations by themselves are made !

10

"Sons of Ind, be up and doing,

Let your course by none be stayed,

Lo ! the dawn is in the East ;

By themselves are nations made !"

কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস 'আলোচনা'য় কবিতাটির এইরূপ অনুবাদ করেছেন :

১

অলস হইয়া বসি ভারত সন্তান,

সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার ?

সাধ কার্য্য—কর সজ্জা—করহ উত্থান,

সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

২

তোমরা কি চিরদাস অথবা স্বাধীন—
দিশেহারা অন্ধকারে ডুবে চিরদিন ?
তোমাদের(ই) হস্তে ইহা মীমাংসার ভার,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৩

এই যে বসেছে টেক্‌স, ব্যয়ের সময়
মতামত দিতে পার—আছে অধিকার ?
সত্যের জানিও জয় জানিও নিশ্চয়,
ওঠ, কর প্রতিবাদ, ভয় কি তোমার ?
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৪

যদিও বিপদাপন্ন সমস্তই হায়
তবু দেশ তোমাদেরি, তোমাদেরি প্রাণ—
সর্ব্বস্বই তোমাদের ; ক্ষমতা কোথায়
সাধিতে অহিত কিংবা করিতে কল্যাণ ?
বোবা কি তোমরা ? সবে চাহ অধিকার ;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৫

ঐশ্বর্য্যে কি উপকার ? কোন্ প্রয়োজন
হেন শিক্ষা শূন্যোপাধি নীচ ব্যবসার ?
মূল্যবান ততোধিক স্বায়ত্ত-শাসন ;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৬

তোমরা কি অন্ধ কিংবা শিশু সমুদয়
হামাগুড়ি দেয় যারা ভয়ে নত ভীত ?
থাকিবে কি চিরকাল শৈশব সময় ?
আপনার যত্নে জাতি হয় সংগঠিত !

৭

কানাকানি আর্ত্তনাদ চলেছে আঁধারে,
হামাগুড়ি দিয়া যায় ক্ষুদ্র কীট চয়,
সাধ্য কি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে
উপত্যকা তলে যারা লুকাইয়া রয় !
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

৮

বোঝ কি এত যে ক্লেশ সহ অবিরাম ?
অপমান অনুভব করে কি হৃদয় ?
কর অন্যায়ের সঙ্গে নির্ভয়ে সংগ্রাম,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

৯

চেয়োনা সাহায্য স্বর্গ নরকের কাছে,
আত্মার ভিতরে খোঁজ সেখানেই আছে,
যে করে সাহস ইচ্ছা সর্ব্বস্ব তাহার
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

১০

ভারত সন্তান সবে হও হে জাগ্রত,
হও কার্য্যে অগ্রসর করি প্রাণপণ,

অবাধে কার্য্যের গতি কর প্রবাহিত,
প্রাণান্তে দিও না তাহা রোধিতে কখন।
দেখ পূর্ব্ব দিকে চেয়ে অরুণ উদয়,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয়!

হিউম ১৮৮৩ সালের ১লা মার্চ্চ কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণকে সম্বোধন করে যে বিখ্যাত পত্র লেখেন তাতেও এই ভাব পরিষ্কার ব্যক্ত হয়েছে। এখানে বলে রাখি, আসাম থেকে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-ভারত তখন কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাভুক্ত। ১৮৮৬ সালে পঞ্জাব ও ১৮৮৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হিউম উক্ত পত্রে এই মর্ম্মে বলেন, "তাঁর মত বিদেশীরা ভারতবাসীদের কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন মাত্র। কিন্তু স্বদেশহিতকর কার্য্যে, শাসন ব্যাপারে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলের আগে তাদেরই অগ্রসর হতে হবে। যদি পঞ্চাশ জন উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসী ব্যক্তি-স্বার্থ ভুলে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তা হলে তাঁরা অনেক সৎ কার্য্য সাধন করতে পারেন। আর যদি এটুকুও সম্ভব না হয় তা হলে চিরকাল পরের দাসানুদাস হয়ে তাঁদের থাকতেই হবে। তাঁরা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, কি ব্যক্তি কি জাতি সকলেরই সুখ ও স্বাধীনতার পাথেয় হ'ল আত্ম-ত্যাগ ও নিঃস্বার্থপরতা। তাঁদের অদৃষ্টের তাঁরাই নিয়ামক।"

হিউম শিক্ষিত ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁদের কর্ম্মপ্রণালী একটি সুনির্দ্দিষ্ট, নিয়মানুগ পথে চালাতে কেন এত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা অন্য একটি কারণের উল্লেখ অনেক স্থানে পাই। বড়লাট লর্ড লিটনের আমলে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই সরকারের উপর ভীষণ বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠে। তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধেরও জল্পনা-কল্পনা করে। দাক্ষিণাত্যে

দুর্ভিক্ষের তাড়নায় কৃষক প্রজাদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়। সেখানকার ফাডকে বিদ্রোহ আজ ইতিহাস-বিখ্যাত। প্রকাশ, মহারাষ্ট্রে বোম্বাই লাট সার্ রিচার্ড টেম্পলের মস্তক নেবার জন্য পাঁচ শ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল! হিউম ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী রূপে এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে লোকেরা কিরূপ যত্নশীল, সাতখণ্ড বইতে লিখিত নাম ধাম থেকে হিউম তা জান্‌তে পারেন। একদিকে নিরক্ষর জনসাধারণ দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণে এসময়ে মরিয়া হয়ে উঠে, অন্যদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকারের ঔদাসীন্য হেতু তাঁদের উপর বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং ভারতব্যাপী বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রবল হয়। লর্ড রিপণের উদার শাসন-নীতি সকলের সন্তোষ উৎপাদন করল বটে, কিন্তু স্বদেশ-শাসনে ভারতবাসীর দায়িত্ব গ্রাহ্য না হলে এ ভাব অধিক দিন স্থায়ী থাকা সম্ভব নয়। হিউমের মনে সিপাহী বিদ্রোহের কথাও জাগরূক ছিল। সার্ সৈয়দ আহ্‌মদ বিদ্রোহকালে ইংরেজের প্রভূত সাহায্য করেন। তিনি ১৮৫৮ সালে বিদ্রোহের মধ্যেই এর কারণ বিশ্লেষণ করে একখানা পুস্তিকা লেখেন। কয়েক বছর পরে এর ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়। তার ভিতর এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন, ভারতবর্ষের ব্যবস্থা-পরিষদে কোন ভারতীয় সদস্যের স্থান না থাকায়ই এরূপ বিদ্রোহ সম্ভব হয়েছে। ভারতবাসীর মনোভাব ইংরেজদের জান্‌বার উপায় ছিল না। বিদ্রোহের প্রাক্কালেও ইংরেজ প্রভুগণ এরূপ ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছুই জান্‌তেন না। ১৮৭৯ সালে ভারতবর্ষের অবস্থা ঠিক সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বেকার অবস্থার সমতুল্য—হিউম একথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রথম সুযোগেই ভারতীয় মন থেকে ব্রিটিশ বিদ্বেষ বিদূরণে তৎপর হলেন। কিন্তু এ কার্য্যের প্রধান সহায় স্বদেশ-শাসনে ভারত-

বাসীকে ব্রিটিশের সমান অংশী করা। হিউম তাই রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করবার পরেই ভারতবাসীদের সংঘবদ্ধ করতে তৎপর হয়েছিলেন।

হিউম এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে ১৮৮৩ সালের প্রথমেই 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল ইউনিয়ন' নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। তিনি এর কর্ত্তব্য তিন ভাগে ভাগ করলেন। পরে তিনি কংগ্রেসের উদ্দেশ্যও ঠিক এইরূপ বর্ণনা করেন। প্রথম, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক অংশকে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ জাতিতে সম্মিলিত করা; দ্বিতীয়, এরূপ সম্মিলিত জাতিকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক সকল দিকেই পুনরুজ্জীবিত করা; তৃতীয়, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের প্রতি প্রযোজ্য যে-সব আইন নিয়ম বা বিধি অন্যায় ও ক্ষতিকর তা দূর করে ইংলণ্ডের সঙ্গে তাদের সখ্যভাব দৃঢ় করা। হিউমের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে করাচী, আহ্‌মদাবাদ, সুরাট, বোম্বাই, পুনা, মাদ্রাজ, কল্‌কাতা, বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা ও লাহোরে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হ'ল। তিনি ঐ বছরের শেষে পুনরায় একটি সম্মেলন আহ্বানেরও পক্ষপাতী ছিলেন।

সম্মেলন হতে কিন্তু দু' বছরের বেশী সময় লাগে। বোম্বাইয়ের কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং সুরেন্দ্রনাথের নিকট থেকে কল্‌কাতা সম্মেলনের কার্য্য বিবরণ চেয়ে নেন্—সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন। ১৮৮৫ সালের মার্চ্চ মাসে প্রস্তাবিত সম্মেলন সম্পর্কে এক বিবৃতি নানা স্থানের নেতৃবর্গের নিকট প্রেরিত হয়। যে-সব কর্ম্মী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতির উন্নতিমূলক কার্য্যে নিয়োজিত তাদের পরস্পরের ভিতর ভাব-বিনিময় এবং আগামী বৎসরে করণীয় রাজনীতিক বিষয়গুলির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য বলে বিজ্ঞাপিত হ'ল। হিউম অতঃপর অল্পদিনের জন্য

বিলাত যান ও এ বিষয়ে লর্ড রিপণ, জন ব্রাইট, প্রভৃতি ভারত-বন্ধুদের পরামর্শ নেন। পার্লামেণ্টে ভারতীয় পক্ষের কথা যাতে ব্যক্ত হতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করলেন। পরে যে ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠিত হয় তার সূত্র এর ভিতরেই পাই। তখন হাউস অফ্ কমন্সে ভারত-সচিবই ছিলেন ভারতের একমাত্র মুখপাত্র, তাঁর কথাই এতদিন পার্লামেণ্টের সভ্যগণ বেদবাক্য বলে মেনে নিতেন। কিন্তু ভারত-সচিবের মারফত শুধু ভারত-সরকারের মতামতই ব্যক্ত হ'ত। ভারতীয় জন-সাধারণের কথা তাঁদের অজ্ঞাতই থেকে যেত। হিউম আর একটি ব্যবস্থা করলেন যার প্রয়োজনীয়তা এখনও খুব বেশী। রয়টার এবং ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলির ভারতস্থিত সংবাদদাতারা ইংরেজ পক্ষের কথাই বেশী করে সরবরাহ করতেন। হিউম 'ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন' নামে একটি ভারতীয় সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন এবং লণ্ডনের ও প্রাদেশিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত সংবাদ মুদ্রণের ব্যবস্থা করলেন। এ প্রতিষ্ঠান অল্প দিন মাত্র স্থায়ী ছিল।

হিউম ভারতবর্ষে ফিরে বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গেও এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শের ফলেই যে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাপকতর করা হয় তার প্রমাণ আছে। হিউম প্রথমে সম্মেলনকে মূলতঃ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান করেই গড়তে চেয়েছিলেন। পার্লামেণ্টে যেমন একটি সরকার-বিরোধী দল থাকে, এখানে জনসাধারণের মতামত অবগতির জন্য লর্ড ডাফরিন একে সেইরূপ আইনানুগ একটি সরকার-বিরোধী দল হিসাবেই দেখতে চান। হিউম এ কথার সারবত্তা বুঝে বন্ধুবর্গকে এ সম্বন্ধে লিখ্লেন। তাঁরা এতে সম্মতি দেওয়ায় সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাজনীতির আলোচনাকেও প্রাধান্য দেওয়া স্থির হ'ল। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হিউম

জগদীশচন্দ্র বসু

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বোম্বাইয়ের গবর্ণরকে এর সভাপতি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এরূপ হলে প্রতিনিধিদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটবে—এজন্য লর্ড ডাফরিন হিউমকে ঐরূপ অভিপ্রায়ও ত্যাগ করতে বলেন। এই লর্ড ডাফরিনই কিন্তু তাঁর আমলের শেষের দিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। এ কথা পরে বল্‌ব। ঐ সময় লর্ড ডাফরিন হিউমকে বলেছিলেন, তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থান কালে এ পরামর্শের কথা যেন সাধারণ্যে প্রকাশ না পায়। শেষের দিকে ডাফরিনের ব্যবহারে তিত-বিরক্ত হলেও হিউম বা তাঁর বন্ধুবর্গ কখনো একথা প্রকাশ করেন নি।

প্রথম অধিবেশন

কংগ্রেস নামটি আজকাল আমাদের বড় প্রিয়। 'ইণ্ডিয়ান নেশনাল ইউনিয়নই' কিন্তু এর অগ্রজ—একথা হয়ত অনেকে জানেন না। বোম্বাইয়ে সম্মেলন আরম্ভের কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে কংগ্রেস নামটি গৃহীত হয়। এই কংগ্রেস পুণায় ২৫শে থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হবে স্থির হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ঐ সময় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় বোম্বাই শহরে অধিবেশন স্থানান্তরিত করা হয় ও ২৮শে তারিখ থেকে অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হতে মোট বাহাত্তর জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন। কল্‌কাতা, কাশী, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বাই, পুণা, সুরাট, আহ্‌মদাবাদ, করাচী, মাদ্রাজ ও মফস্বলের নানা অঞ্চল থেকে প্রতিনিধি আগমন করেন। মাদ্রাজের মহাজন সভা, পুণার সার্ব্বজনিক সভা, বোম্বাই এসোসিয়েশন, সুরাটের প্রজা হিতবর্দ্ধক সভার কর্ত্তৃপক্ষ এসে

যোগ দিলেন। হিন্দু, ট্রিবিউন, ইন্দু প্রকাশ, মরাঠা, কেশরী, ধ্যান-প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, ইণ্ডিয়ান মিরর, নববিভাকর প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও প্রতিনিধিরা উপস্থিত হলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পুণার সার্ব্বজনিক সভার সভাপতি কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ মুলকা, এর অবৈতনিক সম্পাদক সীতারাম হরি চিপলঙ্কর, ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ বামন শিবরাম আপ্টে, 'মরাঠা' ও 'কেশরী'র সম্পাদক গোপালগণেশ আগারকর, কল্‌কাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ. সি. বানার্জ্জী নামে বেশী পরিচিত), 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, 'নববিভাকর' সম্পাদক উকীল গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, এলাহাবাদের 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' সম্পাদক জানকীনাথ ঘোষাল, স্বনামধন্য দাদাভাই নৌরজী, ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, বোম্বাই করপোরেশনের চেয়ারম্যান ফিরোজশাহ্ মাঞ্চারজী মেহ্‌তা, দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা, 'ইন্দুপ্রকাশ' সম্পাদক নারায়ণগণেশ চন্দ্রাবরকর, মাদ্রাজের মহাজন সভার সভাপতি পি রাঙ্গিয়া নাইডু, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পি আনন্দ চার্লু, 'হিন্দু'র সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, 'হিন্দু'র সহ-সম্পাদক ও মহাজন সভার সেক্রেটারী এম্ বীররাঘব আচার্য্য প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু উপস্থিত প্রতিনিধিদের ভিতর কল্‌কাতার সুবিখ্যাত অমৃত-বাজার পত্রিকা'র শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ বা বহু পুরাতন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ভারত-সভার প্রসিদ্ধ কর্ম্মী ও বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর নাম কেন পাই না জানতে স্বভাবতঃ আগ্রহ জন্মে, বিশেষতঃ পর বছরে কল্‌কাতা অধিবেশন যখন এঁরাই অগ্রণী হয়ে সুসম্পন্ন করেছিলেন। হিউমের সহযোগিগণ এঁদের নামের সঙ্গেও নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন।

সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ই বা পূর্ব্বে না জানিয়ে বোম্বাই রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মাত্র সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের কথা জানালেন কেন? এ বিষয় জান্‌তেও কম কৌতূহল হয় না। বাংলা বা কল্‌কাতা থেকে যে উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন নি এ কথা উমেশচন্দ্র সভাপতির প্রারম্ভিক ও সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এর কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন, মৃত্যু ও অন্যান্য আকস্মিক ঘটনার জন্যই এ সম্ভব হয় নি। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম পরিচালক কৃষ্ণদাস পাল এবং সুপণ্ডিত ডক্টর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর মারা যান। অন্যদের কেন যথাসময়ে আহ্বান করা হয় নি এতদিন পরে তার একটি মাত্র কারণ আমাদের নিকট ধরা পড়ে। বিপিনচন্দ্র পাল কোন কোন স্থানে এর ইঙ্গিতও করেছেন। শিশিরকুমার ঘোষ, আনন্দমোহন বসু বা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রগতিবাদী রাজনীতিক। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' রাজদ্রোহ প্রচারে লিপ্ত —এই অপবাদ ইউরোপীয় মহলে সর্ব্বদা ব্যক্ত হ'ত। সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সার্বিস থেকে বিতাড়িত হয়ে যেভাবে জনসেবায় নিয়োজিত, তাতে তিনি সরকারী মহলে বিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারতেন না। উপরন্তু ইতিপূর্ব্বে জনসেবার জন্য তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। হিউম বা কংগ্রেসের অন্যান্য অনুষ্ঠাতারা ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধন করতে চান বটে, কিন্তু তা ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে ও যতদূর সম্ভব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে। এ দুটী কারণই হয়ত তাঁদের নিমন্ত্রণ করায় বিঘ্ন স্বরূপ হয়েছিল। তবে সভায় যে-সব প্রস্তাব পাস হয় এবং তার সমর্থনে যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হয় তাতে কিন্তু রাজভক্তির প্রস্রবণ বয় নি। বক্তাবিশেষ রাজানুগত্য-প্রীতি দেখালেও অধিকাংশ বক্তৃতাই ছিল সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনায় ভরপূর।

যা হোক্, প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হলে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য বিবৃতির নিরিখে তাঁর বক্তব্য স্বল্প কথার ব্যক্ত করেন। এ অধিবেশনের প্রস্তাবসমূহে ও তার উপরে প্রদত্ত বক্তৃতায় শিক্ষিত ভারতবাসীর এতকালের অব্যক্ত ও অবরুদ্ধ মনোভাব কথায় সাধারণের নিকট প্রকাশ পেল। তাঁরা স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি চিন্তায় কিরূপ অগ্রসর তাও সম্যক বুঝা গেল। পরবর্ত্তী কুড়ি-একুশ বছর পর্য্যন্ত কংগ্রেস কিঞ্চিৎ অদল-বদল ও সংযোগ-বিয়োগ করে এই সকল প্রস্তাব ও দাবি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেছেন। এজন্য সংক্ষেপে হলেও এগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন 'হিন্দু' সম্পাদক জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার। রয়াল কমিশন দ্বারা ভারত-শাসন সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবি করা হয় এ প্রস্তাবে। পার্লামেণ্ট উপযুক্তসংখ্যক ভারতীয় ও ইউরোপীয় নিয়ে কমিশন গঠন করবেন এবং ভারতে ও ইংলণ্ডে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। সুব্রহ্মণ্য আয়ার মহাশয় বক্তৃতায় এই মর্ম্মে বলেন, "কোম্পানীর আমলে পার্লামেণ্ট প্রতি বিশ বছর অন্তর ভারত-শাসন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তদন্ত করতেন। ১৭৭৩, ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ সালে এইরূপ ব্যাপক ও বিস্তৃত তদন্ত হয়েছিল। কিন্তু গত বত্রিশ বছরের মধ্যে পার্লামেণ্ট এসম্বন্ধে কোনই তদন্তের ব্যবস্থা করেন নি। ফলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ও আমলাতন্ত্র যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। কোম্পানীর আমল ও বর্ত্তমান আমলের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে নিশ্চয়ই বল্‌তে হবে, বহু বিষয়ে ভারতবাসীরা বর্ত্তমানে লাভবান্ না হয়ে ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে। পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক শাসনভার গ্রহণের পর থেকে ভারতবাসীর অবস্থা হয়ে পড়েছে ভীষণ মন্দ। পূর্ব্বে লোকের দুঃখ দৈন্যে শাসকগণের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। এখন সে সহানুভূতি আর নেই, তার পরিবর্ত্তে

কঠোরতাই এখন সুপ্রকট। গবর্ণমেণ্টের শাসন-ব্যয় ও ঋণ-ভার অত্যধিক। কিন্তু সে অনুপাতে আয়ের পন্থা মোটেই আশানুরূপ বাড়ে নি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে শাসন-সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে সর্ব্বপ্রথম 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিল' নামে ভারত-সচিবের পরিষদ তুলে দেওয়ার দাবি করা হয়। এ কৌন্সিলের কথা আগে বলেছি। এর অধিকাংশ সভ্য ভারতের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিবিলিয়ান। তারা ভারতের নিমক খেলেও ভারতবাসীর শাসনাধিকারের ঘোর বিরোধী ছিল। ভারতবাসীরা চিরকাল তাদের অধীন থাক্‌বে—এইরূপ মনোবৃত্তি দ্বারাই তারা চালিত হ'ত। তারা সুতরাং প্রতিপদে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর উন্নতিমূলক কার্য্যেরই বিঘ্ন জন্মাত। এ কৌন্সিল রাখ্‌বার কোনই প্রয়োজন ছিল না। উপনিবেশ-সচিবের কোন স্বতন্ত্র কৌন্সিল নেই। ভারতের ঘরের দুয়ারে ক্ষুদ্র দ্বীপ সিংহল। সিংহলবাসীরাও ব্যবস্থা-পরিষদের মারফত দেশের বাৎসরিক আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণে ও আইন-প্রণয়নে নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত, আর ভারতবাসীরা এ অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত! ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সদস্যরা তাদের এ অধিকারে বাদ সাধে। নিজ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে—যেমন, আবিসিনিয়া অভিযান, মিশরীয় অভিযান, এমন কি লণ্ডনে তুর্কী সুলতানের অভ্যর্থনা কার্য্যেও ভারতীয় রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয়—ইণ্ডিয়া কৌন্সিল এসব ব্যাপারে টুঁ শব্দটিও করে নি, বরং সায়ই দিয়েছে। ভারত-বন্ধু পার্লামেণ্ট-সদস্য মিঃ ফসেট এ নিয়ে পার্লামেণ্টে ও বাইরে বহুবার প্রতিবাদ করেছেন। এখানে বলে রাখি, সিবিল সার্বিস পরীক্ষা সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রতি অবিচার দূরীকরণেও তিনি বিশেষ প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। বিলাতে পার্লামেণ্ট নামে কর্ত্তা হলেও ভারত-সচিব ও তাঁর পরিষদ কার্য্যতঃ ভারত-শাসনের কলকাঠি নিয়ত নাড়াতেন।

তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল দেশের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনের মূল হ'ল এখানে। কংগ্রেস বহুকাল এ নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে তবে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং প্রস্তাব করলেন যে, নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সংস্কার সাধন করে ভারতীয় প্রতিনিধি সংখ্যা মোট সদস্যের অন্ততঃ অর্দ্ধেক এবং ভারতীয় রাজস্বের আয়-ব্যয় বরাদ্দ ও আইন-প্রণয়নাদি অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী করা হোক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা (আগ্রা-অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশের নাম পরবর্ত্তী কালের দেওয়া) এবং পঞ্জাবে শাসন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হোক্, আর পার্লামেণ্টে একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করা হোক্। ভারতবর্ষের শাসন-কর্তৃপক্ষ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য্য না করলে এই কমিটি সে সম্বন্ধে অভিযোগ শুনবেন ও যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করবেন। আমরা পূর্ব্বেই ১৮৬১ সালের ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের বিষয় অবগত হয়েছি। পঁয়ত্রিশ বছর পরেও এ আইনের কোনরূপ সংশোধন বা পরিবর্ত্তন হয় নি। ভারতবাসী শিক্ষা দীক্ষায় এই দীর্ঘকালের ভিতর খুবই অগ্রসর হলেও দেশ-শাসনে তার অধিকার বরাবরই অগ্রাহ্য হয়ে এসেছে। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও ব্যবস্থা-পরিষদ প্রবর্ত্তিত হয় নি এই সময়ের ভিতর। এ সময় থেকে যে আন্দোলন সুরু হ'ল তার ফলে অবশ্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১৮৮৬ সালে ও পঞ্জাবে ১৮৯৭ সালে ১৮৬১ সালের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হয়। দেশ-শাসনে স্বদেশবাসীদের অধিকার ও দায়িত্ব বরাবর অস্বীকৃত হলেও ভারত-সচিবের কর্ত্তৃত্ব আশাতীত রকম বেড়েই যায়। তেলাং মহাশয় বলেন, "ভারত-সচিব ভারতবর্ষের সত্যকার স্বৈরাচারী মোগল সম্রাট! তাঁর ইচ্ছাই আইন। বর্ত্তমান প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদগুলি সবই শাসক-

বর্গের স্বৈরাচার আইনসঙ্গত করিয়ে নেবার একটা ফন্দি ও আইনানুগ শাসনের মুখোস। ভারতের শাসন-কেন্দ্র লণ্ডন থেকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসা চাই। নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক্‌সভা, মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিলে সুফল ফল্‌বে। সভাপতি উমেশচন্দ্র এ প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা একদিন এমন শাসন-তন্ত্র লাভ করবেন, যা হবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের তুল্য। ব্যবস্থা-পরিষদ থেকে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে, আর এর নিকটই মন্ত্রীসভা সব বিষয়ে দায়ী থাক্‌বেন।

চতুর্থ প্রস্তাবে স্বদেশপ্রাণ দাদাভাই নৌরজী সিবিল সার্বিস সম্পর্কে ভারতবাসীর অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং এই দাবি পেশ করেন যে, ১৮৬০ সালের ইণ্ডিয়া আফিস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিলাতে ও ভারতবর্ষে একই সময়ে পরীক্ষা গৃহীত হোক ও পরীক্ষার্থীদের উচ্চতম বয়স বাড়িয়ে উনিশ স্থলে তেইশ বছর করা হোক্। সিবিল সার্বিস থেকে ভারতীয়দের দূরে সরিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা চলেছিল খুব। ষ্টেটুটারী সিবিল সার্বিস নামে যে একটি বিশেষ শ্রেণীর চাক্‌রি সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সিবিলিয়ানদের সমান পদমর্য্যাদা লাভ বা উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে স্বাভাবিক নিয়মে উন্নয়ন অসম্ভব ছিল। এজন্য এ ব্যবস্থা অপ্রিয় হয়ে উঠে ও এর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ হতে থাকে। দাদাভাই ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করে ইতিপূর্ব্বে যশস্বী হয়েছেন। তিনি বক্তৃতায় দেখালেন যে, যখন ইংলণ্ডে মাথা পিছু গড়ে বার্ষিক আয় ৪৯৫ টাকা, ফ্রান্সে ৩৪৫ টাকা, এমন কি অনুন্নত তুরস্কেও ৬০ টাকা, তখন ভারতবর্ষে মাথা পিছু গড় আয় বার্ষিক মাত্র ২৭ টাকা! আর জমিদার, ধনী, খনি ও কারখানার মালিক, মোটা মাইনের চাকরে ইত্যাদির আয় বাদ দিলে সাধারণ ভারতবাসীর গড় আয় বছরে ২০৲ টাকায় গিয়ে

দাঁড়ায়। ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ, বিদেশী শাসকবর্গের বেতন, ভাতা, পেন্সন বাবদে প্রতি বছর বহু কোটি টাকা ভারতবর্ষ থেকে বিলাতে চলে যায়। বাট্টার হার ইংলণ্ডের সুবিধা মত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় আরও তাদের শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী দিতে হচ্ছে বহু বছর থেকে। দাদাভাই সুতরাং বললেন, "বিদেশীকে প্রদত্ত প্রতিটি পাই পয়সা ভারতবর্ষের পক্ষে বিষম আর্থিক ক্ষতি, ভারতবাসীকে প্রদত্ত প্রতিটি পাই পয়সা দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ আর্থিক লাভ"।

বঙ্গদেশাগত 'নব বিভাকর' সম্পাদক গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় দাদাভাইয়ের প্রস্তাব সমর্থন করে এক তথ্যপূর্ণ জোরাল বক্তৃতা করেন। ভারতবাসীর আর্থিক দুরবস্থা দূর করতে হলে যে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক এ কথা গিরিজাভূষণই প্রথম কংগ্রেসে ব্যক্ত করলেন।— "আমরা দরিদ্র, স্বদেশে যে-সব জিনিষ আমরা পাই, তা না কিনে আমরা বিদেশ থেকে আমদানী জিনিস বেশী মূল্যে কিনব কেন? আমরা যে-সব মোটা বেতন ও পেন্সন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের দিই, তা এদেশের বাইরেই ব্যয়িত হয়। আমরা এত অর্থ ব্যয় করে যে অভিজ্ঞতা ক্রয় করি, তা ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য এদেশে থাকে না, জাহাজ বোঝাই হয়ে বিদেশে চলে যায় ও আমাদের বিরুদ্ধেই নিয়োজিত হয়।"

পঞ্চম প্রস্তাব ভারতের সৈন্য-ব্যয় সম্পর্কে। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপে ব্রিটেন রুষিয়াকেই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। তার পররাষ্ট্র-নীতি এর প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্দ্ধারিত হ'ত। রুশিয়া আফগানিস্তানের পথে ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে, এই ছিল ব্রিটেনের ভয়। লর্ড রিপণ আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে এ সম্ভাবনা কার্য্যতঃ নিরাকৃত করলেও বিলাতী প্রভুরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তাই এ সময় আবার কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে ত্রিশ হাজার নূতন সৈন্য

(দশ হাজার ইংরেজ ও কুড়ি হাজার ভারতীয়) নিয়োগের কথা হয়। প্রস্তাবে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হ'ল। মাদ্রাজ মহাজন সভার সভাপতি রঙ্গিয়া নাইডু এ প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, ভারতীয় বাহিনী এখন আর জাতীয় বাহিনী নেই, অর্থাৎ সৈন্যদের ভিতর জাতীয়তাবোধ লোপ পেয়েছে। তারা এখন বেতনভোগী সৈন্যে পরিণত! রঙ্গিয়া নাইডু বলেন, ভারতীয়দের যুদ্ধশক্তি দাবিয়ে না রেখে তাকে উৎসাহিত করাই কর্ত্তৃপক্ষের উচিত। ভারতীয় বাহিনীকে বেতনভোগী কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার না করে, তাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দান এবং জাতীয় বাহিনীর অঙ্গ বলে স্বীকার ভারতীয়দের যুদ্ধশক্তি বাড়িয়ে দেবার প্রকৃষ্ট উপায়।

এ প্রস্তাব সমর্থন করেন দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা। ভারত-রক্ষা ও ভারতীয়বাহিনী সম্পর্কে তাঁর গবেষণা এযুগেও শিক্ষিত ভারতবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দান্‌শা বলেন, "১৮৫৬ সালে ভারতীয় বাহিনীতে সৈন্য ছিল ২৫৪,০০০ আর ১৮৮৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৮৯,০০০ জনে। কিন্তু পূর্ব্বে যেখানে ব্যয় হ'ত সতর কোটী টাকা, এ সময় তা বেড়ে প্রায় ছাব্বিশ কোটী টাকায় দাঁড়িয়েছে।" এর কারণ কি? দীন্‌শা বলেন, সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে ১৮৫৯ সালে ভারতীয় সৈন্যদল যখন পুনর্গঠিত হয়, সেই সময় থেকেই এই বিসদৃশ ব্যাপার সুরু হয়েছে। তখন থেকেই দেশীয় সৈন্য হ্রাস পায় ও ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আর এই ব্রিটিশ সৈন্যদের বেতন ও ভাতা বাবদে খরচা পড়ে খুবই বেশী। সৈন্য-ব্যয় বৃদ্ধির আর একটি কারণ, সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনী বড় একটা বাইরে পাঠান হ'ত না যদি-বা পাঠান হ'ত তার ব্যয়ভার ইংলণ্ডকে বহন করতে হ'ত। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের অধীন করা হলে এ ব্যবস্থা উল্টে

গেল। ভারতে স্থিত সৈন্য সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হতে থাকে, কিন্তু তার ব্যয়ভার ভারতবর্ষের স্কন্ধেই সম্পূর্ণ চাপান হয়!

ষষ্ঠ প্রস্তাবে বলা হয় যে, যদি সৈন্য-সংখ্যা ও সৈন্য-ব্যয় বৃদ্ধি একান্তই প্রয়োজন হয় তা হলে বিদেশাগত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়ে ও লাইসেন্স ট্যাক্স আদায় করে তা যেন নির্ব্বাহ করা হয়। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ব্রিটিশ বাণিজ্য ও স্বার্থ অটুট রাখ্‌বার জন্য অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এর ফলে ভারতের শিল্প ব্যবসায় বিলুপ্ত হয়ে ভারতবর্ষ এক বিশাল কৃষিক্ষেত্র ও ভারতবাসী এক বিরাট কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হ'ল।

এই সময় ব্রিটিশ তরফে ব্রহ্মযুদ্ধ চল্‌ছে। সপ্তম প্রস্তাবে ফিরোজ শা মেহ্‌তা ব্রিটিশের এ কার্য্যের নিন্দা করে বলেন, যদি শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ অধীন করাই হয় তা হলে একে যেন ভারতবর্ষ ভুক্ত না করে একটি ক্রাউন কলোনী বা সাক্ষাৎ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত উপনিবেশে (যেমন, সিংহল) পরিণত করা হয়। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ ভুক্ত করা হলে তার সমগ্র ব্যয়, মায় যুদ্ধ ব্যয়, ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপান হবে। দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ ভুক্ত হলে ব্রহ্মের শাসনাধিকার ব্রহ্মবাসীরা লাভ করতে পারবে না, ক্রাউন কলোনী হলে তারা স্বাভাবিক নিয়মেই শাসনাধিকার অন্ততঃ খানিকটা লাভ করবে!

প্রথম অধিবেশনের পরই কংগ্রেসের এই প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষের নানা স্থানে জনসভায় গৃহীত হয়। জনসাধারণও ক্রমে কংগ্রেসের হিতকারিতা বুঝে তার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে।

বহির্মুখী প্রচেষ্টা

প্রথম পর্ব্ব

(১৮৮৬—১৮৯২)

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ রাজ তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ জনসাধারণের অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য হেতু ভারতসচিবই ক্রমে ভারতবর্ষের প্রকৃত কর্ত্তা হয়ে পড়েন ও তাঁর আশ্রয়ে এখানে এক বিরাট্ আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তি বিশেষে কেউ কেউ ভারতীয়ের প্রতি সদয় হলেও, এই শাসকশ্রেণী তার দেশ-শাসনের অধিকার স্বীকার করতে একেবারেই নারাজ ছিল। ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ, তথা কংগ্রেস তাই পার্লামেণ্টকে নিজ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ করতে প্রথম থেকেই চেষ্টিত হলেন। তখনকার যুগের শিক্ষিত ভারতবাসীরা ইংলণ্ডবাসী ইংরেজদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন। ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের গণতন্ত্র-প্রীতি ও পার্লামেণ্টীয় শাসন-পদ্ধতি, সে যুগে শুধু ভারতবাসীকে কেন, অন্যান্য বহু জাতিকেও তাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'মাদার অফ্ পার্লামেণ্টস্' বা জগতের যাবতীয় পার্লামেণ্টের জননী আখ্যাও পেয়েছেন। ভারতবাসীর প্রতি পার্লামেণ্টের যাতে শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কংগ্রেস আন্দোলন করতে সুরু করলেন।

পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত ১৮৮৬ সালে কল্‌কাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। এবারকার সভাপতি হলেন দাদাভাই নৌরজী। কংগ্রেস এক বছরের

মধ্যে শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয়ে উঠেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চারশ'র উপর প্রতিনিধি এসে এ অধিবেশনে যোগ দিলেন। এ অধিবেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিভিন্ন প্রদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও জনসভা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে এতে পাঠান। পূর্ব্ব বারে এরূপ হতে পারে নি। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতিও নূতন গঠিত হ'ল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অন্যতম পরিচালক, প্রত্নতত্ত্বে সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। উক্ত এসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উত্তরপাড়ার জমিদার উনআশী বছর বয়স্ক অন্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম দিনের সভায় কংগ্রেসের শুভ কামনা করে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সামাজিক বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী, সমাজ ও প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান, এজন্য জাতীয় কংগ্রেসে এর আলোচনা অসম্ভব। দাদাভাই নৌরজী তাই একে একটি নিছক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেই নিজ অভিভাষণে আখ্যা দিলেন। সেই থেকে কংগ্রেস একটি পুরোপুরি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলেই গণ্য। কংগ্রেস-মঞ্চ থেকে দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা যুক্তি-প্রমাণ প্রয়োগে ভারতীয় জনগণের দুঃখদৈন্যের কথা ব্যক্ত করলেন। তিনি হিসাব করে দেখালেন, ইংরেজী ১৮৪৮ সাল থেকে সাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমে এত খারাপ হয়ে পড়েছে যে, সরকারী হিসাবমতেই অন্যূন সাড়ে চার কোটি লোক প্রত্যহ একাহারে বা অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়। নানা খাতে প্রতি বছর বহু কোটি টাকা বিলাতে চলে যায় বলেই এই ভয়ঙ্কর পরিণতি। সুতরাং প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা, সিবিল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগ, সৈন্য-ব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাব পূর্ব্ববৎ গৃহীত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ বঙ্গের জন প্রিয় নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য যথাসাধ্য

চেষ্টা করলেন। প্রতিনিধিমূলক শাসন সম্পর্কীয় প্রধান প্রস্তাবটিতে নির্ব্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এই প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ভারতবাসীরা, কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণী ছাড়া, সকলেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। 'ভলান্টিয়ার' বা স্বেচ্ছাসৈনিক দলে ইংরেজ, ফিরিঙ্গী,—এমন কি ভারতীয় খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হতে পারত, কিন্তু ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দু মুসলমানকে এ থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমানের অস্ত্র রাখ্‌বারও উপায় নেই। 'আর্মস এক্ট্' বা অস্ত্র আইন তাদের নিরস্ত্র করেছে। কংগ্রেস এ অধিবেশনে এই বিষম অবস্থার প্রতিবাদ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান আগ্রা-অযোধ্যা) প্রতিনিধি রাজা রামপাল সিংহ এই প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন,

"সরকার আমাদের যা কিছু মঙ্গল করেছেন সেজন্য আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের যে ভীষণ অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়েছে, সেজন্য আমরা কথনই কৃতজ্ঞ হতে পারি না। আমাদের প্রকৃতি অবনমিত করার জন্য, আমাদের ভিতরকার যুদ্ধ-শক্তি নিয়মিত ভাবে বিলুপ্ত করার জন্য, একটি যোদ্ধা ও বীর জাতিকে কলম-পেষা কেরাণী দলে পরিণত করার জন্য আমরা কথনও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাক্‌তে পারি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অবস্থা এথনও অতটা সঙ্গীন হয়ে উঠে নি। ভারতের সর্ব্বত্র আমাদের মধ্যে এথনও এমন অনেকে আছেন, যাঁরা অসি চালনা করতে সক্ষম এবং আবশ্যক হলে স্বদেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। যে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা এতথানি ঋণী, তার জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হব না। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গেই আমার এ কথাও মনে হচ্ছে যে, গ্রেট ব্রিটেনের সকল

রকম সুকীর্ত্তি, সব রকম সুমহৎ আবিষ্কার, যে-সব কার্য্য দ্বারা আমাদের উপকার করেছেন বা করতে চেষ্টা করেছেন সে-সব সত্ত্বেও তুলাদণ্ডে ওজন করলে তার অপকর্ম্মের পরিমাণ হবে ঢের বেশী, এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আনন্দিত না হয়ে ভারতবাসীকে দুঃখিত হতে হবে একদিন।

"এসব কথা কঠোর হলেও সত্য। জাতীয়তাবোধ ও স্বজাতি ও স্বদেশ রক্ষার শক্তি বিনষ্ট করলে একটি জাতির যে পরিমাণ ক্ষতি করা হয় অন্য কিছুর দ্বারাই তা পূরণ হবার নয়।

"গবর্ণমেণ্ট যে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করেছেন তার ফলে আমাদেরই যে শুধু দুঃখভোগ করতে হবে তা নয়। আপনারা জগতের বিভিন্ন দিকে দৃক্‌পাত করুন, প্রতিটি দেশেরই রণসম্ভার ও সৈন্যসামন্ত বিশালাকার। সমগ্র সভ্যজগতের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। আজ হোক্, কাল হোক্, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হবে, এবং তাতে গ্রেট-ব্রিটেনও নিশ্চয়ই জড়িয়ে পড়বে। গ্রেট-ব্রিটেন তার সকল ধন-সম্পদ দিয়েও জনসংখ্যার প্রতি হাজারে এক শ' যোদ্ধা সংগ্রহ করতে পারবে না, যা ইউরোপের অন্য কয়েকটি শক্তি করতে সক্ষম। ইংলণ্ড ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, এজন্য কতকটা সুরক্ষিতও বটে, কিন্তু ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপথ শত্রু সমাকীর্ণ। ভারতবর্ষগামী স্থল-পথ উন্মুক্ত ও সকলের জানা। ভারতবর্ষ অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই, এবং এই ভারতবর্ষই, যাকে অধীন করে রাখায় ব্রিটেনের এত সম্পদ ও মর্য্যাদা—ইউরোপীয় শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এ একদিন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। তখন ইংলণ্ড এই বলে অনুশোচনা করবে যে, লক্ষ লক্ষ সাহসী ভারতবাসীকে অস্ত্রবিদ্যা না শিখিয়ে তার মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর উপর ভারত রক্ষার ভার ছেড়ে দিয়ে কি ভুলই না করেছে!

"কিন্তু আমাদের পক্ষেও এ নীতি খুবই অশুভকর, সুতরাং নিন্দার্হ। উচ্চ-নীচ সকলেই আমরা অস্ত্রের ব্যবহার ভুলতে বসেছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই আত্ম-নির্ভর শক্তিও চলে গেছে যা মানুষকে সাহসপূর্ব্বক বিপদের সম্মুখীন হতে উদ্বুদ্ধ করে, যেজন্য মানুষ মনুষ্যপদবাচ্য হয়। যখন আমি পাঁচ বছরের বালক তখনই আমার পিতামহ আমাকে সব রকম ব্যায়াম শিখিয়েছিলেন, অস্ত্র-চালনা ও রণকৌশলও তখন থেকে শিখি। কিন্তু আজকাল কে তার পুত্রকে এরূপ শিক্ষা দেন? কোন্ যুবক আজকাল এ সব জান্‌তে পারেন? পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে, যুদ্ধের বাসনা না নিয়েও যুবকগণ যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌তেন ও একদিন না একদিন যথাস্থলে বীরত্ব দেখাতে পারবেন ভেবে উৎফুল্ল হতেন। বর্ত্তমানে তাঁরা এরূপ মনোভাব প্রায় হারাতে বসেছেন। যদি মানুষকে উপযুক্ত সৈন্য হতে হয়, বিপদের সময়—যা প্রত্যেক দেশের পক্ষেই আসা সম্ভব—তার সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয় তা হলে তাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করতেই হবে। শৈশব থেকে পিতামাতাকে, বয়োজ্যেষ্ঠকে অস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ব্বেও অযোধ্যায় সকল ভদ্র-সন্তানকেই যুদ্ধবিদ্যা শেখান হত।"

অস্ত্র-আইন তুলে দেওয়ার বা তার কঠোরতা হ্রাসের পক্ষেও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশনকে একটী সঙ্গীতে স্মরণীয় করে রেখেছেন। পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'বন্দে মাতরম্' তখন গীত না হলেও, হেমচন্দ্র তার একটি বিশেষ অংশ এই সঙ্গীতে নিবদ্ধ করেন।

কি আনন্দ আজি ভারত-ভুবনে—ভারত-জননী জাগিল !
আহা কি মধুর নবীন সুহাসি
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি উষার কপোলে জ্বলিল !

মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল !—ভারত-জননী জাগিল !

পূরব-বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,
দেরাইস্‌মাইল্, হিমাদ্রির ধার,
করাচী মান্দ্রাজ, সহর বোম্বাই,
সুরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই, চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;

প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,
এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর মুখে জয়ধ্বনি করিল !

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে,
গাহিল সকলে মধুর কাকলে গাহিল—"বন্দে মাতরম্,
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং সুখদাং বরদাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীং
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং সুখদাং বরদাং মাতরম্
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্।"
উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে, ভারত জগত মাতিল।

দুটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র গঠনের প্রস্তাবের পরই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এ বৎসর ১৮৬১ সালের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হয়। সিবিল সার্বিস সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্যও পঞ্জাবের ছোটলাট এচিন্সনের সভাপতিত্বে তের জন সদস্য নিয়ে এক কমিটি গঠিত হ'ল। এতে ভারতীয় ছিলেন পাঁচ জন। এঁদের মধ্যে সার্ সৈয়দ আহ্মদ খাঁ ও হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করবার মত। এর সিদ্ধান্তের কথা যথাসময়ে বল্‌ব।

১৮৮৭ সালে কংগ্রেস হয় মাদ্রাজে। এবারকার সভাপতি হলেন একজন মুসলমান বোম্বাই নিবাসী বিখ্যাত ব্যারিষ্টার বদরুদ্দিন তায়াবজী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সার্ টি মাধব রাও একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ। একাধিক মিত্ররাজ্যে প্রধান মন্ত্রিত্ব করে তখন অবসর জীবন যাপন করছিলেন। এবার ছ'শর উপর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন।

অধিবেশনের পূর্ব্বেই মাদ্রাজ প্রদেশে জনসাধারণের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে যায়। বীররাঘব আচার্য্য কংগ্রেস সম্পর্কে তামিল ভাষায় এক পুস্তিকা লিখে তার ত্রিশ হাজার খণ্ড বিতরণ করেন। দশ হাজারের অধিক অধিবাসী যুক্ত প্রত্যেক শহরে কংগ্রেসের বাণী প্রচারের জন্য সাব কমিটি গঠিত হ'ল। মাদ্রাজে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করে অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে। কংগ্রেসের বার্ত্তা সাধারণকে এমন কি জনমজুরদেরও কিরূপ উৎসাহিত করেছিল তা একটি ব্যাপারে বেশ বুঝা যায়। মাদ্রাজে কংগ্রেসের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হয় তার ভিতর সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হয় জন মজুর ও সাধারণ লোকের প্রদত্ত এক আনা থেকে দেড় টাকা

পর্য্যন্ত চাঁদায়। মান্দালয়, রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর থেকেও মাদ্রাজীরা চাঁদা পাঠায়।

পূর্ব্ব দু' বছর কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা বলে কিছু ছিল না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যেরূপ ভাবে প্রস্তাব রচনা করতেন প্রকাশ্য কংগ্রেসে তাই পাস করিয়ে নিতেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং দূরদর্শী রাজনীতিক মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের সহায়তায় এবারে প্রথম বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা গঠিত হয়। উপস্থিত কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ভিতর হতে কয়েকজনকে বাছাই করে নিয়ে এই সভা গঠিত হ'ল। পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর যাবৎ এই সভাই কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের নিরিখে এবারেও কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। মূল প্রস্তাব—প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্র—উত্থাপন করলেন দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ। এ প্রস্তাব সম্পর্কে টি মাধব রাও, মাদ্রাজের ব্যারিষ্টার আর্ডলি নর্টন, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ধর, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত বক্তৃতা করেন। মালবীয়জী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষ শাসন সম্পর্কে মোটেই মনোযোগী নন্। ভারতবর্ষের বজেট আলোচনা পার্লামেণ্ট অধিবেশনের শেষের দিকে ফেলা হয়। গত বারে এ বিষয় আলোচনাকালে সওয়া ছ'শ সদস্যের মধ্যে মাত্র ঊনত্রিশ জন উপস্থিত ছিলেন! পার্লামেণ্ট নিজের কর্ত্তব্য নিজে করবেন না, প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদ প্রবর্ত্তিত করে ভারতবাসীকেও তা করতে দিবেন না। অথচ অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, কেপকলোনি প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হয়েছে। আর এই সুপ্রাচীন সুসভ্য ভারতবর্ষের বেলাতেই যত আপত্তি! বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে পঁয়তাল্লিশ

হাজার বরিশালবাসীর সহিযুক্ত একখানা আবেদন পত্র কংগ্রেসে পেশ করেন। তিনি বহু জনসভায় প্রতিনিধিমূলক শাসন-তন্ত্রের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে বক্তৃতা করেন ও এইরূপ সহিযুক্ত একখানা আবেদন-পত্র ইতিপূর্ব্বে পার্লামেণ্টও প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন যে, অশিক্ষিত জনগণ—নমঃশূদ্র, মুসলমান প্রভৃতিও প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থার খুবই পক্ষপাতী। স্বদেশবাসীরা তাদের জন্য আইন-কানুন প্রণয়ণ করবেন শুনে তারা এই মত প্রকাশ করেছে যে, তাদের দুঃখ-দৈন্য শীঘ্রই ঘুচে যাবে। এবারে তাঞ্জোর থেকে তিন জন সূত্রধর প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে একজন কংগ্রেস-সভায় বক্তৃতা করে নিজেদের দুঃখ-দৈন্যের কথা ব্যক্ত করলেন। দেশ-রক্ষা বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদে ভারতীয় নিয়োগ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্বেচ্ছাসৈন্য সংগ্রহ ও অস্ত্র-আইনের কঠোরতা বিদূরণ প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নরেন্দ্রনাথ সেন, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এ প্রস্তাবগুলির উপর বক্তৃতা করেন।

স্থির হ'ল কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হবে এলাহাবাদে। কিন্তু এর ভিতরে কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। কংগ্রেস প্রথম থেকেই প্রতি বার রাজানুগত্য স্বীকার করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাত্র প্রথম তিন অধিবেশনেই কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। কল্‌কাতা অধিবেশনে স্বয়ং লর্ড ডাফরিন ও বোম্বাই ও মাদ্রাজ অধিবেশনে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ অধিবেশনের পরই কর্ত্তৃপক্ষের মতিগতি বদ্‌লে গেল। এর প্রধান কারণ হ'ল, যা কারো কারো মুখে পরে ব্যক্তও হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে প্রজাশক্তি তথা ভারতীয় জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগসাধন। কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নিজ নিজ প্রদেশে গিয়ে সভাসমিতি অনুষ্ঠান করেন এবং কংগ্রেসের আদর্শ

ও প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝিয়ে দেন। ১৮৮৮ সালের আরম্ভেই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অন্যূন এক হাজার জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ও তার ভিতর বহু সভায় পাঁচ হাজারেরও অধিক লোক উপস্থিত থাকে। জমিদারের অনুপস্থিতিতে জমিদারীতে প্রজাবৃন্দের কিরূপ দুর্দ্দশা হয় একথা ব্যাখ্যা করে 'কেম্‌বক্স্‌পুরের মৌলবী ফরিদুদ্দিন ও রামচন্দ্রের মধ্যে কথোপকথন' নামে কংগ্রেস কর্ত্তৃক একখানা পুস্তিকার বহুলক্ষ খণ্ড বিতরণ করা হয়। এখানে, জমিদার বল্‌তে ব্রিটিশ রাজ ও জমিদারী বল্‌তে ভারতবর্ষ।

ওদিকে হিউম সাহেবও পুস্তিকা লিখে ও নিজেও বক্তৃতাদি করে সকলকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। কংগ্রেসের দাবী পূরণে কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য ও অবহেলাই বিশেষ করে তাঁদের একার্য্যে প্রবৃত্ত করেছিল। ১৮৮৮ সালের প্রথমেই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার্ অকল্যাণ্ড কলভিন কংগ্রেসের ও এর প্রধান উদ্যোক্তা হিউমের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেন। হিউম সাহেবও যথা সময়ে এর জবাব দেন। তিনি জবাবের একস্থলে বল্‌লেন, "আমাদের কর্ম্মদোষে ভারতবর্ষে যে ভীষণ শক্তি মাথা নাড়া দিয়ে উঠবার উপক্রম হয় তা থেকে রেহাই পাবার জন্য একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন খুবই অনুভূত হয়েছিল। কংগ্রেস অপেক্ষা কোন নিরাপদ প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করাও অসম্ভব।" এসময় থেকে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাও সুরু হয়। 'ভারতে হিন্দু মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি' —বড়লাট ডাফরিন স্বয়ং এই মতবাদ প্রচার করলেন। ধর্ম্মে বিভিন্ন হলেও হিন্দু মুসলমান দু'ই যে একজাতি ভুক্ত, একই পিতামাতার সন্তান একথা তিনি বা তাঁর অধস্তন ব্যক্তিরা স্বীকার করলেন না। ডাফরিনের এই মতবাদ আমাদের জাতীয়তাবোধের মূলে কি আঘাতই

না দিয়েছে! সরকারের এই বিভেদ-নীতির ছাপ এ সময়ে একটি ব্যাপারে স্পষ্ট হয়ে পড়ল। ডাফরিন কংগ্রেসের উপর এতখানি বীতরাগ হন যে, ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রাক্কালে ১৮৮৯ সালে তিনি একটি বক্তৃতায় বললেন, কংগ্রেসের পাণ্ডারা বিরাট্ জনসংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য, ("microscopic minority"), এরূপ আন্দোলন দ্বারা অন্ধকারে তাঁরা ঝাঁপ দিচ্ছেন ("jump into the dark")! ডাফরিনের এই কথাগুলি পরে লর্ড কার্জ্জনও বহু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা পূর্ব্বেও হয়েছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জামালুদ্দিন নামে একজন মিশরীয় ধর্ম্ম-প্রচারক ভারতবর্ষে এসে শিক্ষিত মুসলমানদের কর্ণে প্যান-ইস্‌লাম বা জগতের সব মুসলমানের স্বার্থ এক, এই মন্ত্র দিয়ে যান! এরই বশবর্ত্তী হয়ে মহম্মদ ইউসুফ বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৮৮৩ সালে স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্ত্তনের আলোচনা কালে মুসলমানদের জন্য সভ্য সংখ্যা সংরক্ষিত করার জিদ করেন! এই মহম্মদ ইউসুফ কিন্তু ঐ বক্তৃতাতেই নারীর ভোটাধিকার দানের সপক্ষেও মত প্রকাশ করেছিলেন। এই বৎসর পাব্‌লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সিবিল সার্বিস পরীক্ষার্থীদের বয়স উর্দ্ধতম তেইশ ও ন্যূনতম একুশ স্থিরীকরণে এবং ষ্টেটুটারী সিবিল সার্বিস প্রথা তুলে দিয়ে নিম্নতন বিভাগের দক্ষ কর্ম্মচারীদের উচ্চতর পদে নিয়োগে কমিশনের সকল সদস্যই একমত হলেন। কিন্তু একই সময়েই বিলাতে ও ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে অধিকাংশ সভ্যই মত দেন। বলা বাহুল্য, হিন্দু সভ্য তিন জন এর অনুকুলেই মত প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান সভ্যদ্বয়—সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ ও অপর একজন এই বলে এর বিরুদ্ধতা করলেন যে, ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হলে হিন্দুরাই সব পদ অধিকার করবে, মুসলমানদের প্রতি সুবিচার

করা হবে না! এর ভিতরেই সরকারের বিভেদ প্রচেষ্টার সূত্র আমরা পরিষ্কার লক্ষ্য করি। পূর্ব্বে ১৮৭৭ সালে কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে সৈয়দ আহ্‌মদ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন ও একটি সভার সভাপতিত্বও করেন! সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ মুসলমান সমাজে খুবই প্রতিপত্তিশালী। তিনি পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন নামে কংগ্রেস-বিরোধী একটি রাজনীতিক সভা স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, তাঁর একার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। মুসলমানগণ যাতে কংগ্রেসে যোগদান না করে সেজন্য তিনি অতঃপর তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে থাকেন। উক্ত কমিশন সিবিল সার্বিস ছাড়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের রেল, বন, চিকিৎসা, আবগারি প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগেও ভারতবাসী নিয়োগের ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন।

এ সময়ের আর একটি ঘটনাও এখানে স্মরণীয়। এ ব্যাপারেও বঙ্গদেশ অন্যান্য প্রদেশের অগ্রগামী। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই ১৮৮৮ সালে প্রথম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক সমস্যাগুলির আলোচনা কংগ্রেসে করা সম্ভব নয় বলে এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজন অনুভুত হয়েছিল। ঐ বৎসর ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর কল্‌কাতায় প্রথম সম্মেলন হয় স্বনামধন্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের সভাপতিত্বে। সম্মেলনের প্রথম ও প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল,—আসাম চা-বাগানের শ্রমিকদের দুর্দ্দশা। মাদ্রাজ কংগ্রেসে 'প্রাদেশিক ব্যাপার' বলে এ বিষয়ে আলোচনা স্থগিত থাকে। এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীহট্ট-নিবাসী বিপিনচন্দ্র পাল ও সমর্থন করেন শ্রমিক-বন্ধু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ স্বয়ং শ্রমিকের (মহেন্দ্রলাল বলেন 'কুলি' কথাটি ঘৃণিত বলে অব্যবহার্য্য) বেশে বিভিন্ন চা-বাগানে কিছুদিন কর্ম্ম করে তাদের দুর্দ্দশা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করলেন। এই সব

অভিজ্ঞতা তিনি বাংলা 'সঞ্জীবনী' ও ইংরেজী 'বেঙ্গলী' পত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করেন। তিনি সম্মেলনেও 'কুলী-জীবনের' কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। চা-বাগানের শ্রমিকদের সমস্যা বস্তুতঃ প্রাদেশিক নয়, কারণ বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চা-বাগানের শ্রমিক সংগৃহীত হ'ত। দ্বাদশ অধিবেশনে কংগ্রেস তাই এ সমস্যা আলোচনার বিষয়ীভূত করে নেন্। চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থা ছিল নীল-চাষীদের চেয়েও ভীষণ। চুক্তিভঙ্গের অপরাধে দণ্ডদান তো আইনেরই বিধান ছিল। এ ছাড়া হাজার হাজার নারী-পুরুষের জীবনও নির্ভর করত চা-বাগানের ম্যানেজার সাহেবদের মর্জ্জির উপর। তাদের ক্রোধের মুখে কত লোককে যে সে-যুগে প্রাণ হারাতে হয়েছে তার সংখ্যা নেই। সার্ হেন্‌রী কটন আসামের চীফ্ কমিশনার হয়ে শ্রমিকদের দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা করেন, কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের প্রতিবন্ধকতায় তা কার্য্যকরী হয় নি।

১৮৮৮ সালে কংগ্রেস এলাহাবাদে আহূত হয়। কিন্তু এবার যে একটা ঘোর বিপদ উপস্থিত হতে পারে তার আভাষ সারাবর্ষব্যাপী কংগ্রেস-বিরোধী সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল। এলাহাবাদে কংগ্রেস অনুষ্ঠানের ভার পড়েছিল জনপ্রিয় নেতা প্রসিদ্ধ উকীল পণ্ডিত অযোধ্যানাথের উপর। তিনি ছিলেন সেবারে অভ্যর্থনা-সমিতিরও সভাপতি। সার্ অক্‌ল্যাণ্ড কল্‌ভিন স্বয়ং এলাহাবাদে উপস্থিত। কাজেই কিরূপ বাধার সৃষ্টি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। সরকারী চাতুর্য্যের ফলে অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের জন্য স্থান নির্ণয়ে চার চার বার অকৃতকার্য্য হন। অযোধ্যানাথ এতেও কিন্তু টলেন নি। গোপনে গোপনে লাট-প্রাসাদের সন্নিকট 'লাউদার ক্যাসেল'ই তিনি ভাড়া করে ফেল্‌লেন! দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার্ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ পরে এই ভবনটি

ক্রয় করেন। ১৮৯২ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তা এখানেই সুসম্পন্ন হয়েছিল।

এবারকার সভাপতি হন প্রসিদ্ধ এণ্ড্রু ইউল কোম্পানীর মালিক স্কটলণ্ডবাসী ভারত-বন্ধু মিঃ জর্জ্জ ইউল। তিনি বলেন, সরকার যত বেশী বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করবেন, কংগ্রেস ততই শক্তিশালী হয়ে উঠ্‌বে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধিরা যাতে কংগ্রেসে যোগ দিতে না পারেন তার চেষ্টাও কি কর্ত্তৃপক্ষ কম করেছিলেন? কংগ্রেসে যোগদানেচ্ছু মাদ্রাজের এক ভদ্রলোককে শান্তিরক্ষার ওজুহাতে বিশ হাজার টাকার মুচলেকায় আবদ্ধ করে তবে ছেড়ে দেওয়া হয়! এরূপ নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও এবারকার কংগ্রেস প্রতিনিধি সংখ্যা পূর্ব্ব বারের দ্বিগুণ অর্থাৎ বার শ'র উপরে দাঁড়ান! সার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও অযোধ্যা থেকে বিস্তর মুসলমান এসে কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এবারেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সত্বর অবহিত হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ সময় গণিকাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইনের প্রস্তাব চলে তা সমর্থন করে কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবের উপর বক্তৃতাকালে ক্যাপ্‌টেন ভিয়ারসে নামীয় এক সেনানী বলেন যে, ভারত-সরকার সৈন্য-বাহিনীর জন্য দু' হাজার গণিকা পোষণ করে থাকেন!

ভারতবর্ষে আমলাতন্ত্র যখন প্রবলভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে লাগ্‌ল তখন নেতাদের প্রচেষ্টাও বেশী করে বহির্মুখী হয়ে পড়ল। পার্লামেণ্টকে কি করে নিজেদের মতানুবর্ত্তী করা যায় অতঃপর এই চেষ্টাই হ'ল তাঁদের। এলান হিউম ১৮৮৫ সালেই বিলাতে ভারতীয়দের মুখপাত্র স্বরূপ একটি সোসাইটি স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। ১৮৮৭ সালে দাদাভাই

নৌরজী কংগ্রেসের কথা প্রচারের ভার নেন্। পর বৎসর উইলিয়ম ডিগ্‌বির তত্ত্বাবধানে লণ্ডনে কংগ্রেসের একটি আপিস স্থাপিত হয়। ১৮৮৯ সালের ২৭শে জুলাই লণ্ডন শহরে কংগ্রেসের শাখা রূপে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি' স্থাপিত হ'ল। এর পরিচালনা ভার পড়ল দাদাভাই নৌরজী, উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ, ডবলিউ এস্ কেন ও উইলিয়ম ডিগ্‌বির উপর। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের মুখপত্র স্বরূপ 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানা প্রথম প্রতি মাসে বার হ'ত, পরে ১৮৯৮, ৭ই জানুয়ারী থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটি ও 'ইণ্ডিয়া পত্রিকা' দু-ই তুলে দেওয়া হয়।

১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল পুনরায় বোম্বাইয়ে। কংগ্রেসের কার্য্যে জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা ক্রমশঃ বেড়ে চল্‌ল। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় উনিশ শ' প্রতিনিধি এবারকার অধিবেশনে যোগদান করলেন। এঁদের মধ্যে মুসলমান সদস্য ছিল প্রায় এক পঞ্চমাংশ। পণ্ডিতা রমাবাঈ, লেডী বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ, রমাবাঈ রানাড়ে, নিকম্ব, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী ঘোষাল—এই ছয়জন মহিলাও এবারে কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য পার্লামেণ্ট-সদস্য চার্ল্‌স ব্রাড্‌ল এ সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন। ব্রাড্‌ল সাহেবকে লোকে বল্‌ত 'মেম্বর ফর ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ ভারতবর্ষের পক্ষে সদস্য! তিনি পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের দুঃখ-দৈন্যের কথা যেমন করে ব্যক্ত করতেন এমনটি আর কেউ করতেন না। বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলে কৃতজ্ঞ ভারতবাসীরা দূর দূরান্ত থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগ্‌ল। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করলেন। অধিবেশনের মধ্যে কংগ্রেস একটি বিশেষ দিনে তাঁকে জাতির

পক্ষ থেকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এবারে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন ফিরোজ শাহ্ মেহ্তা ও সভাপতি সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ।

সভাপতির আসন থেকে সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ এই কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করলেন যে, ভারতবর্ষের দুর্দ্দিন ১৮৫৮ সাল থেকেই সুরু হয়েছে। ভারত-শাসন সম্পর্কে দেখা শুনা করবার এখন আর কেউ নেই। ভারত-সচিব স্বৈরাচার শাসকে পরিণত, ভারতবাসীর ভালমন্দ তিনি দেখেন না। নইলে লর্ড রিপণ যখন কৃষক সমাজের উপকারের জন্য কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেন তখন তা তিনি অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। একথা ধ্রুব সত্য যে, কোন দেশেই 'কৃষি ব্যাঙ্ক' ছাড়া কৃষি ও কৃষকের উন্নতি হয় না।

কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন ও পার্লামেণ্টে পেশ করবার জন্য ব্রাড্লকে অনুরোধ জানান। অর্দ্ধেক নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্য নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদগুলির গঠন, নির্ব্বাচিত সদস্যদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বজেট আলোচনার অধিকার, শাসন ও রাজস্ব বিষয়ক আইন প্রণয়নে তাঁদের মতামত গ্রহণ অর্থাৎ ভোটাধিকার দান, নির্ব্বাচন প্রণালী প্রভৃতি সম্পর্কে এই পরিকল্পনায় পরিষ্কার নির্দ্দেশ থাকে। নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতীয় সদস্য নির্ব্বাচন করবেন প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির ভারতীয় সদস্যরা—এই মর্ম্মে উক্ত পরিকল্পনার একটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও তা সমর্থন করেন পুণ্যশ্লোক গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে। এ দু'জনকেই আমরা এই প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিতে দেখি। দু'জনই ভারতমাতার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।

বালগঙ্গাধর তিলক প্রথম যৌবনেই স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' ও একটি

স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলটি কিছুকাল পরে ফার্গুসন কলেজে পরিণত হয়। 'মরাঠা' ও 'কেশরী' নামে ইংরেজী ও মরাঠী দু'খানা সংবাদপত্রও সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হ'ত। সোসাইটির সভ্যগণ দরিদ্র জীবন যাপন করতেন ও মাসে পঁচাত্তর টাকার অধিক বেতন গ্রহণ করতেন না। 'কেশরী'তে বোম্বাই প্রদেশের এক মিত্ররাজ্যের শাসন-বিধির সমালোচনা প্রসঙ্গে গুপ্ত কথা প্রকাশের জন্য ১৮৮২ সালে বিচারে তিলক ও তাঁর সহকর্ম্মী আগারকারের চার মাস কারাদণ্ড হয়। জনসেবায় তিলকের এই প্রথম কারাবাস। ১৮৯০ সালে সোসাইটির অন্যান্য পরিচালকগণের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে মতানৈক্য হেতু তিনি সোসাইটির সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং মরাঠা ও কেশরীর পরিচালনা ও সম্পাদনা ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। বিবাহ-সম্মতি আইন এই বৎসরই বিধিবদ্ধ হয়। তিলক এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান। গোখ্‌লের সঙ্গে তাঁর বিরোধিতা স্থরু হয় এই সময় থেকে। তিলক শুধু অঙ্ক শাস্ত্রেই কৃতবিদ্য ছিলেন না, হিন্দুশাস্ত্রেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। মরাঠী 'গীতা-রহস্য'ও ইংরেজী 'ওরায়ন' তাঁকে অমর করে রাখবে।)

পুণ্যশ্লোক গোখ্‌লে উক্ত সোসাইটির দারিদ্র্য-ব্রতাবলম্বী সভ্য ও শিক্ষক। তিনি অর্থনীতিতে স্থপণ্ডিত। আলোচনা ও গবেষণা করে ভারতবর্ষের অবস্থা তিনি সম্যক অবগত হয়েছেন। সামাজিক বিষয়ে তিনি ছিলেন উদার প্রগতিপন্থী, মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের যোগ্য শিষ্য। তিনি ১৯০৫ সালে 'সার্ভেণ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে এক ভারত-সেবক মণ্ডলী গঠন করেন। ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করাই এ সোসাইটির উদ্দেশ্য। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হিসাবে গোখ্‌লের কার্য্য, বিশেষ—জনশিক্ষা প্রবর্ত্তনে সরকারকে প্রবুদ্ধ করবার চেষ্টা তাঁর স্বদেশবাসীরা বহুকাল স্মরণ করবে।

তিনি আমরণ কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন এবং ১৯০৫ সালে বারাণসী অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

বোম্বাইয়ের অধিবেশনে গোখ্‌লে মহোদয় সিবিল সার্বিস সম্পর্কীয় প্রস্তাবের সমর্থনে একটি জোরাল বক্তৃতা করলেন। এ সম্বন্ধে পাব্‌লিক সার্বিস কমিশনের মতামত আগে উল্লিখিত হয়েছে। সিবিল সার্বিসে মোট ৯৪১ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। ১৮৭০ সনের পার্লামেণ্টীয় আইন অনুসারে এর এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ১৫৮ জন ভারতীয় হবার কথা। কমিশন এই সংখ্যা কমিয়ে ১০৮ জন ভারতীয় নিয়োগের পক্ষে মত দেন! ঐ সংখ্যাও কিন্তু কমিয়ে আবার ৯৩ করা হ'ল। পর বৎসর কল্‌কাতা অধিবেশনে গোখ্‌লে স্বয়ং এ ব্যবস্থার নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তখন এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন যে, শিক্ষিত সমাজের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে এতখানি অমনোযোগী হলে ফল বিষময় হবে। গোখ্‌লের এ কথায় কর্ণপাত না করে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁরই পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিলেন!

প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রণালা প্রবর্ত্তন ও শাসন-কার্য্যে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থা এ দু-ই ছিল তখনকার দিনে কংগ্রেসের প্রধান দাবী। পার্লামেণ্টই এ সকলের নিয়ন্তা, একারণ নেতৃবৃন্দ বিলাতে জনমত গঠনে উদ্যোগী হলেন। এ অধিবেশনেই এলান হিউম, আর্ডলি নর্টন, জর্জ্জ ইউল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এন্‌ মুধোলকার, ফিরোজ শা মেহ্‌তা প্রভৃতিকে নিয়ে বিলাতে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের ব্যবস্থা হ'ল। এই প্রতিনিধি দল ১৮৯০ সালে বিলাত গমন করেন। তাঁরা লণ্ডন, অক্সফোর্ড ও মফস্বলে নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে ভারতবর্ষের দাবী সম্পর্কে ইংরেজ জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, তাঁরা এবারে ইংরেজ সাধারণের বিশেষ সহানুভূতি

লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এ অধিবেশনে এই নিয়ম স্থির হ'ল যে, প্রতি দশ লক্ষ ভারতবাসী পিছু পাঁচ জন করে প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক এলান হিউমের সহকারী নিযুক্ত হলেন এলাহাবাদের বিশিষ্ট জননেতা পণ্ডিত অযোধ্যানাথ। তাঁকে পরামর্শ দানের জন্য বঙ্গে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাদ্রাজে আনন্দ চার্লু ও বোম্বাইয়ে ফিরোজ শা মেহ্‌তা ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন।

কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হ'ল কল্‌কাতায়। পূর্ব্ব বৎসরে যে নিয়ম স্থির হয় তার ফলে এবারে প্রতিনিধি সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়ে সাত শ'র কিছু উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দর্শক সংখ্যা হ'ল প্রায় সাত হাজার। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ। মনোমোহন বরাবর ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী পক্ষ সমর্থন করতেন। তিনি মোকদ্দমা পরিচালনার সময় পুলিসের দৌরাত্ম্য ও শাসকবর্গের ঔদাসীন্য সবিশেষ আলোচনা করতেন। ফলে সে যুগে শাসকবর্গের অনাচার অনেকটা প্রশমিত হয়। মনোমোহন অসহায়ের বন্ধু, আবার দুর্নীতিপরায়ণ শাসকের ভীতির কারণ, এজন্য তাঁর সুনাম সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মনোমোহন শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করার বরাবর পক্ষপাতী ছিলেন। প্রতি বছর কংগ্রেসে এবিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপনেও তিনি ছিলেন অগ্রণী।

এবারকার মূল সভাপতি ফিরোজ শা মেহ্‌তাও বোম্বাইয়ের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। ফিরোজ শার ধনবল প্রচুর, কর্ম্মশক্তি অসাধারণ, স্বৈর-শাসনেরও ঘোর বিরোধী। একারণ দাদাভাই নৌরজী বিলাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার পর থেকেই বোম্বাইয়ের নেতৃত্ব ভার স্বভাবতই তাঁর উপর পড়ে। তিনি কংগ্রেসে কর্তৃত্ব করেছেন বহুদিন।

পূর্ব্বেকার ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের সংশোধন করে প্রতিনিধি-মূলক শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য চার্লস ব্রাড্‌ল ১৮৯০ সালে পার্লামেণ্টে একটি আইনের খসড়া পেশ করেন। এ খসড়ার নিরিখে আইন প্রণয়ন জন্য লালমোহন ঘোষ পার্লামেণ্টকে অনুরোধ জানিয়ে কংগ্রেসে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। ভারতীয় বজেট পেশের পূর্ব্বে যাতে কমন্স সভার সভাপতি ভারতীয়দের দাবী উপস্থাপিত করার সুবিধা দান করেন সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে এবারে এক নূতন প্রস্তাব গৃহীত হয়। চিরস্থায়ী ব্যবস্থা একমাত্র বাংলারই নিজস্ব। যে-সব অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় নি সে-সব স্থলে সরকারী রাজস্ব বিভাগ এত দ্রুত কর বাড়াতে থাকে যে, প্রজাদের আর্থিক কষ্ট ও দুঃখ চরমে ওঠে। প্রতি বছর জমির খাজনা দেড় গুণ দ্বিগুণ বেড়ে গিয়ে শেষে পনর গুণ বিশ গুণে গিয়ে ঠেকেছিল! কংগ্রেসের একটি বক্তৃতায় প্রকাশ, একটি গ্রামে হিসাব করে দেখা যায়, ভূমির মোট উপসত্ব যা, খাজনাও ধার্য্য হয়েছে তাই। এজন্য পঞ্চম অধিবেশন থেকেই বঙ্গদেশের অনুরূপ অন্যান্য প্রদেশেও যাতে ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় সেজন্য প্রতিবছর কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকে। এবারেও এইরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

লবণ করের প্রতিবাদেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ১৮৮৮ সালে সরকারী আদেশে এই লবণ কর বসান হয়। দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা হিসাব করে দেখান, এই অত্যাবশ্যক দ্রব্যটি প্রতি বছর ভারতবাসীরা প্রত্যেকে গড়ে মাত্র দশ পাউণ্ড খেতে পায়! ইউরোপে মাথা পিছু গড়ে ব্যবহৃত হয় ছাব্বিশ পাউণ্ড! ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কমিটির দ্বারা বিলাতে প্রচার কার্য্য চালাবার জন্য এবারে ব্যয় বরাদ্দ হ'ল চল্লিশ হাজার টাকা, আর ভারতবর্ষের জন্য ব্যয় ধরা হ'ল মাত্র পাঁচ

হাজার! কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ বিলাতে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয়তা এতই অনুভব করলেন যে, ১৮৯২ সালে সেখানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন করারও প্রস্তাব করেন। সুসাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, প্রথম ভারতীয় মহিলা-চিকিৎক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচ জন মহিলা এবারকার অধিবেশনে যোগদান করেন। কাদম্বিনী সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলেও ছিলেন।

ইংরেজ আমলে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সহর পল্লী সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রতিরোধ কল্পে প্যারাচরণ সরকারের প্রচেষ্টার কথা আগে উল্লেখ করেছি। কর্ত্তৃপক্ষ খোলাভাটী প্রথা প্রবর্ত্তন করে দেশীয় মদ উৎপাদনে ও ব্যবহারে এদেশবাসীকে উৎসাহ দিতে থাকেন! এক সময় সুরেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল ও সুগায়ক বরিশালবাসী বরদাপ্রসন্ন রায়ের সহযোগে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তও বিশেষভাবে আন্দোলন চালিয়ে বহু সুরা-বিপণি ও সুরা-উৎপাদন কেন্দ্র বন্ধ করতে সক্ষম হন। বিলাতে পার্লামেণ্টেও কেন্ প্রমুখ ভারত-বন্ধুগণ গবর্ণমেণ্টের আবগারি নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এর ফলে ভারত-সরকার খোলাভাটী প্রথা রহিত করতে অবহিত হলেন। কংগ্রেস এবারে এ বিষয়ের উল্লেখ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

১৮৯১ সালে নাগপুরে মাদ্রাজের বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী আনন্দ চার্লুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন হ'ল। চার্লস্ ব্রাড্‌ল, মাধব রাও ও রাজেন্দ্র লাল মিত্র এ বছর ইহধাম ত্যাগ করায় সভাপতি মহাশয় নিজ অভিভাষণে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের মধ্যে এবছর থেকে সীমানির্দ্দেশের কার্য্য সুরু হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখনও ১৮৭৮ সালের আফগান যুদ্ধ ও ভারতের

উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা ভুল্‌তে পারেন নি। কাজেই কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই সীমা নির্দ্দেশের মধ্যে আর একটি যুদ্ধের সন্ধান পেলেন। সৈন্য-ব্যয় সম্পর্কে দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা এবারে হিসাব করে দেখালেন যে, ১৮৬৪ হতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে সৈন্য-ব্যয় বাড়ে মাত্র পাঁচ কোটি টাকা, আর ১৮৮৫-৮৬—১৮৯০-৯১ সালের মধ্যে তা বাড়ে চুয়ান্ন কোটি টাকা! আর এ বর্দ্ধিত হ'ল শুধু রুশিয়ার ভাবী আক্রমণ ঠেকাবার জন্য। তাই এ অধিবেশনে বালগঙ্গাধর তিলক এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভাবী আক্রমণের (যা পঁচিশ বছরের মধ্যে নাও হতে পারে) আশঙ্কায় জলের মত অর্থব্যয় না করে, ভারতবাসীরা যাতে সত্য সত্যই আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে পারে সেজন্য অস্ত্র-আইনের কঠোরতা ও পক্ষপাতিত্ব বিদূরণ, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য মিলিটারী কলেজ স্থাপন, যোদ্ধৃ জাতিদের নিয়ে 'মিলিশিয়া' বা সৈন্যদল এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় থেকে স্বেচ্ছাসৈন্য নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হোক্। আলী মহম্মদ ভীমজী তিলকের প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, জার্ম্মানীতে বাৎসরিক সৈন্যব্যয় মাথা পিছু ১৪৫ টাকা, ফ্রান্সে ১৮৫ টাকা, ইংলণ্ডে ২৮৫ টাকা, আর ভারতবর্ষে ৭৭৫ টাকা!

বন-করের প্রতিবাদেও এবারে একটী প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বন আইন দ্বারা ভারতবাসীর যুগ-যুগান্তের অধিকার লোপ করা হয়। এর ফল কিরূপ বিষময় হ'ল একটি দৃষ্টান্তে তা বেশ বুঝা যাবে। বন-কর স্থাপনের ফলে সর্ব্বত্র গোচারণ ভূমির বিশেষ অভাব ঘটে এবং এক মাদ্রাজেই এক বছরে তিন লক্ষ গরু মারা যায়! জনশিক্ষার ওজুহাতে উচ্চ শিক্ষা সঙ্কোচের জন্য সরকার শিক্ষা ব্যয় কমাতেও বদ্ধপরিকর হলেন এ সময়। শিক্ষাবিৎ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র একটি প্রস্তাবে এর

অশ্বিনীকুমার দত্ত
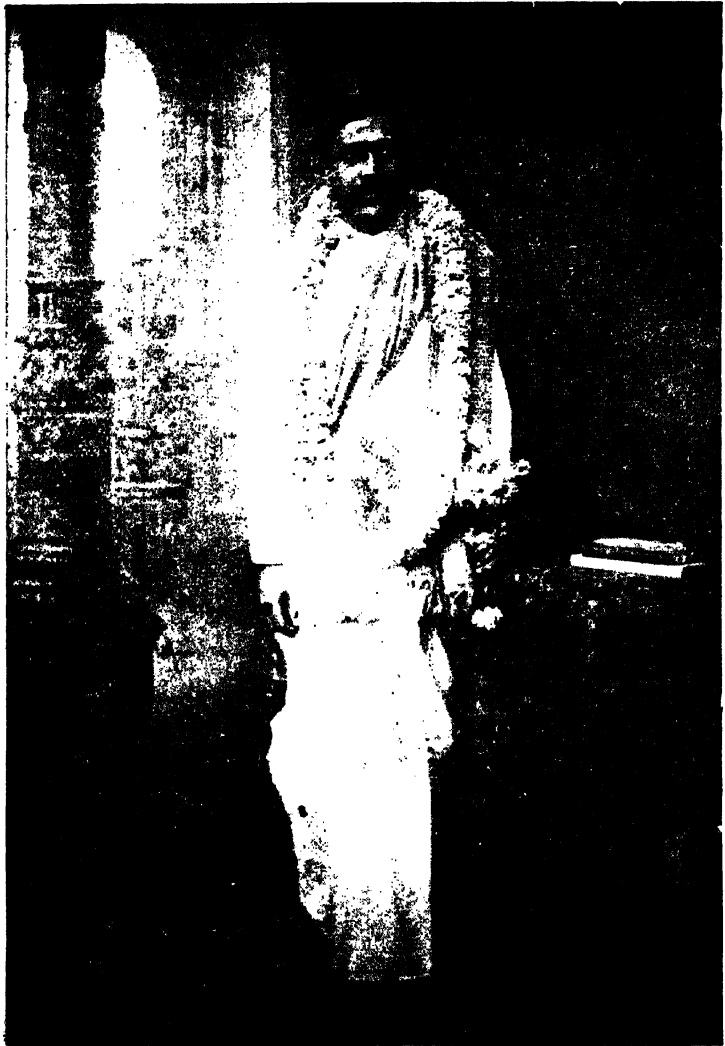
অরবিন্দ ঘোষ

প্রতিবাদ করেন এবং সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে একটি কমিশন স্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।

কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হ'ল এলাহাবাদে। এলাহাবাদের জননায়ক পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এবারে মারা যান। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ ও মূল সভাপতি হন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিলাতের সেণ্ট্রাল ফিন্‌স্‌ব্যুরি কেন্দ্র হতে দাদাভাই নৌরজী ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হন, এজন্য উমেশচন্দ্র অভিভাষণে আনন্দ জ্ঞাপন করলেন। সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই বিলাতের রক্ষণশীল সরকার ইণ্ডিয়া কৌন্সিল আইন পাস করলেন। নির্ব্বাচনের নিয়মাদি না জেনে আইন সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে সভাপতি মহাশয় দ্বিধা বোধ করেন। বঙ্গের কোন কোন জেলায় জুরীর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচ-সাধন করা হ'ল এ বছরে। উমেশচন্দ্র তাঁর বক্তৃতায় এসব বিষয়ের উল্লেখ করে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এ অধিবেশনে দার্শনিক প্রবর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শিক্ষাসম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৮৯২ সালের 'ইণ্ডিয়া কৌন্সিল্‌স্‌ এ্যক্ট' বা ভারতের ব্যবস্থা-পরিষদ আইনের কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। ১৮৬১ সনের পরে এত কাল আর এ ধরণের আইন বিধিবদ্ধ হয় নি। কংগ্রেস প্রথম অধিবেশনেই প্রতিনিধি-মূলক শাসন-পরিষদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী ভারতবাসী নিয়ন্ত্রিত করলে দুঃখ-দৈন্যের অবসান হবে, কংগ্রেস নেতারা এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হয়ে বহু বৎসর আন্দোলন করেছেন। একটু আগে বলেছি, ১৮৯০ সালে চার্লস্‌ ব্রাড্‌ল হাউস অফ কমন্সে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ সম্পর্কে একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করেন। ইতিমধ্যে ব্রাড্‌ল সাহেব মারা

গেলেন। তাঁর জীবিত কালেই কিন্তু ভারত-সচিব লর্ড ক্রস হাউস অফ লর্ডসে সরকার পক্ষে একটি বিল উত্থাপন করেছিলেন। এ বিলে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের নামগন্ধও ছিল না। হাউস অফ কমন্সে এ বিল উত্থাপন করেন সহকারী ভারত-সচিব মিঃ কার্জ্জন (তখনও তিনি লর্ড হন নি)। ক্রসের বিলই কমন্সে গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হ'ল।

সদস্য-নির্ব্বাচনের নিয়মাবলী রচনার ভার ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর দেওয়া হ'ল। কি নিখিল-ভারতীয় কি প্রাদেশিক সর্ব্বত্রই সদস্য-সংখ্যা হ'ল খুবই সামান্য। স্থির হ'ল, অন্যূন দশ জন ও অনধিক ষোল জন সদস্য নিয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ, অন্যূন আট জন ও অনধিক কুড়ি জন সদস্য নিয়ে মাদ্রাজ ও বোম্বাই ব্যবস্থা-পরিষদ, অনধিক কুড়ি জন সদস্য নিয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ এবং পনর জন সদস্য নিয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে।

কংগ্রেসে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয় ও ব্রাড্‌ল যে খসড়া পার্লামেণ্টে পেশ করেন তাতে প্রতি পরিষদের অর্দ্ধেক সদস্য প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয়দের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবার এবং এক চতুর্থাংশ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত ও বাকী অংশ সরকারী সদস্য হবার কথা ছিল। নির্ব্বাচন-প্রণালী এমন ভাবে ধার্য্য হয় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় থেকেও উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচিত হতে পারতেন। উক্ত আইনে কিন্তু এসব কিছুই গৃহীত হয় নি। বেসরকারী ভারতীয় সদস্য-সংখ্যা নির্ণয়ের ভারও ভারত-গবর্ণমেণ্টের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এবারে সদস্যগণ বজেট আলোচনা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকার লাভ করলেন, কিন্তু বজেটের উপর ভোট দানের অধিকার এবারেও তাঁরা পেলেন না! এইরূপে কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হয়।

বহির্মুখী প্রচেষ্টা

দ্বিতীয় পর্ব্ব

(১৮৯৩-১৮৯৮)

মনোমোহন ঘোষ কংগ্রেসে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বিলাতের বিখ্যাত নেতা জন ব্রাইট তাঁকে বলেন—নির্ম্মম শস্য-কর তুলে দেবার জন্য তাঁদের ত্রিশ বৎসর আন্দোলন চালাতে হয়েছিল। নবম কংগ্রেসের সভাপতি রূপে দাদাভাই নৌরজীও বলেন, শস্য আইন, দাসত্ব আইন, কারখানা আইন, পার্লামেণ্টীয় সংস্কার আইন প্রভৃতি পার্লামেণ্টে বিধিবদ্ধ করাবার জন্য ইংরেজদের দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাতে হয়। তাঁদের এ কথার ব্যঞ্জনা এই যে, কংগ্রেস আন্দোলন চালিয়েছে মাত্র আট বছর, ব্রিটিশের নিকট থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে হলে আরও বহু বছর তাঁদের আন্দোলন করতে হবে। কাজেই নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেস ব্রিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অধিকতর ধৈর্য্য সহকারে আন্দোলন চালাতে তৎপর হলেন।

১৮৯২ সালে ভারতীয় সমস্যাসমূহের প্রতি পার্লামেণ্টের সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দাদাভাই নৌরজী ও সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের চেষ্টায় একটি ইণ্ডিয়ান পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠিত হয়। কমিটি অল্প কাল মধ্যেই এক শ' চুয়ান্ন জন পার্লামেণ্ট-সদস্যের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হলেন। এই সদস্যদের সাহায্যে একই সময়ে বিলাতে ও ভারতবর্ষে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব ভারত-সচিবের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৯৩, ২রা জুন পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। এদিকে ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য-গ্রহণের নিয়মও সত্বর স্থিরীকৃত হ'ল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের প্রস্তাবের

নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড, করপোরেশন, বণিক সভা, জমিদার সভা প্রভৃতির উপর সদস্যের নাম সুপারিস করে লাট দপ্তরে পাঠাবার ভার দেওয়া হ'ল। লাটসাহেব ইচ্ছা করলে এ-সব গ্রহণ করতে পারেন বা নাকচ করতেও পারেন। তবে সাধারণতঃ তাঁদের সুপারিসই তিনি গ্রহণ করতেন। নির্ব্বাচন-প্রথার গোড়াপত্তন হ'ল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কুড়ি জন সদস্যের মধ্যে সাত জন সদস্য এইরূপে গৃহীত হবার কথা হয়। কল্‌কাতা করপোরেশন থেকে সর্ব্বপ্রথম সদস্য প্রেরিত হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কংগ্রেসের নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল লাহোরে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে। জনহিতব্রতী সর্দ্দার দয়াল সিং মাজিটিয়ার নাম আমরা আগে পেয়েছি। তিনি হলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। এবারকার প্রতিনিধি সংখ্যা ৮৬৭ ও দর্শক সংখ্যা চার হাজারের উপর। এখানে একটি কথা বলে রাখি যে, যে বছর যে কেন্দ্রে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত সে বছর সে কেন্দ্র থেকে বিস্তর লোক কংগ্রেসে প্রতিনিধি রূপে প্রেরিত হতেন। এবারে পঞ্জাব থেকে চারশ' একাশী জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। দাদাভাই নৌরজী তাঁর অভিভাষণে কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসী আন্দোলনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু ব্রিটিশ জাতিকে এই অনুরোধও জানান যে, তাঁরা যেন তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি আস্থা স্থাপন করে তাদের দাবি পূরণে সর্ব্বদা অবহিত থাকেন। ভারতের মর্ম্মান্তিক দারিদ্র্যের জন্য দাদাভাই শাসন-ব্যবস্থাকেই দায়ী করলেন। ভারতবাসী স্বোপার্জ্জিত ফল ভোগে সমর্থ হলে রুশিয়াকে ব্রিটেনের ভয় করবার কোন কারণই থাকবে না। কারণ তখন তারা তার হয়ে লড়তে সক্ষম হবে। তিনি এই আশা ব্যক্ত করে অভিভাষণ শেষ করলেন যে, অবিলম্বে ইংরেজ ও ভারতবাসী সকল বিষয়ে সমান অধিকার লাভ করবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয় ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্যবস্থা-পরিষদ-আইনে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয় নি বলে এর সমালোচনা হ'ল খুব। বড়লাট ভারতীয় সদস্য গ্রহণের যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করেছেন ও বোম্বাইয়ে যে ভাবে পরিষদে সদস্য গৃহীত হয়েছে, গোখ্‌লে একটি বক্তৃতায় তার কঠোর সমালোচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সার্বিস প্রস্তাব গ্রহণের কথা উল্লেখ করে পার্লামেণ্টকে অভিনন্দন জানান। পঞ্জাবে ব্যবস্থা-পরিষদ প্রবর্ত্তনের অন্য আর একটি প্রস্তাব পাস হয়। লালা লজপত রায় একটি বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা ধনজন দিয়ে মিশরে, আবিসিনিয়ায় ও আফ্‌গানিস্তানে ব্রিটিশের সাহায্য করেছি, আর তার প্রতিদানেই আমাদের শিক্ষা সঙ্কোচের ব্যবস্থা চলেছে!" এবারে নূতন করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডাক্তার বাহাদুরজী। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিসে ভারতীয় নিয়োগের দাবি তিনি এ প্রস্তাবে জানালেন।

কংগ্রেসের দশম অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রঙ্গিয়া নাইডু ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে বল্‌লেন, 'শাসকবর্গ বিদেশ থেকে ভারত শাসন করেন বলে ভারতীয় রাজস্বের উপর অত্যধিক টান পড়ে। রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য-রক্ষার জন্য ব্যয় হয়, অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তনে ভারতবর্ষ-জাত শিল্পাদির বিলোপ সাধিত হয়েছে। এসব কারণেই ভারতবর্ষ আজ শ্রীহীন।' এবার মূল সভাপতি হলেন পার্লামেণ্টের আইরিশ সদস্য মিঃ এলফ্রেড ওয়েব। তিনি হিসাব করে দেখান, ভারতীয় রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ প্রতি বছর ভারতবর্ষের বাইরে ব্যয়িত হয়। এরূপ ব্যবস্থা বহুদিন চল্‌লে দেশ গরিব হবে না ত কি?

এবছরে দু একটি বিসদৃশ ব্যাপার ঘট্‌ল। প্রথম, ভারত-গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সকৌন্সিল ভারত-সচিব ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের উপর কর বসান! বস্ত্র-শিল্প কারখানার তখন সবে শৈশব অবস্থা। এ সময়ে ওরূপ বাধা নূতন শিল্পের পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু ভারত-সচিবের মতে ব্রিটিশ তথা লাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ যে ভারতীয় স্বার্থের চেয়ে বড়! কংগ্রেস প্রথম প্রস্তাবেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ইণ্ডিয়া কৌন্সিল উচ্ছেদ সম্পর্কে ব্যারিষ্টার আর্ডলি নর্টন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইণ্ডিয়া কৌন্সিল ভারতীয় স্বার্থের কিরূপ বিরোধী, গ্লাড্‌ষ্টোন ও অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অভিমত উদ্ধৃত করে তিনি সকলকে তা বুঝিয়ে দেন। শাসন ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন বসাতে পার্লামেণ্টকে অনুরোধ জানিয়ে কংগ্রেস আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

তৃতীয়টি সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে। একই সময়ে বিলাতে ও ভারতে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গ্রহণের অনুকূলে হাউস অফ কমন্সে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সে সম্পর্কে ভারত-সচিব ভারত-গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির নিকট মতামত চেয়ে পাঠান। এক মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া অন্য সব প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট মায় ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সব মতামত ভারত-সচিবকে প্রেরণ করলেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের আপত্তি খুবই কৌতুককর। তাঁরা বলেন, ভারতেও পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হলে বিলাতে প্রতিযোগী গ্রহণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে ও এজন্য আয়ার্লণ্ডের ও কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশের প্রার্থীদের বিশেষ অসুবিধা ঘট্‌বে! ভারত-সচিব ১৮৯৪, ১৯শে এপ্রিল ভারত-গবর্ণমেণ্টকে জানান যে, পার্লামেণ্টে গৃহীত হলেও তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে

এ প্রস্তাব কার্য্যকর হবে না! পার্লামেণ্টে গৃহীত প্রস্তাব প্রকারান্তরে অকেজোই করা হ'ল।

একাদশ অধিবেশন হয় পুণা শহরে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বর্ষীয়ান্ রাও বাহাদুর ডি এম্ ভিদে মারাঠার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করে এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, ভারতবর্ষ এমন একটি জাতিতে পরিণত হবে যার ভিত্তি হবে দৃঢ়, প্রস্তরবৎ শক্ত। এবারকার সভাপতি হলেন দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করবার সময় ডাঃ বাহাদুরজী বলেন, "সুরেন্দ্রনাথের নাম করলেই আত্মত্যাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-শক্তি, এবং ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের একটি পরিপূর্ণ মূর্ত্তি আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে।"

সুরেন্দ্রনাথ সভাপতির মঞ্চ থেকে দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টাকাল অনর্গল বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে এ দৃশ্য নূতন। ভারতবর্ষ ও ভারত-শাসন সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ই তিনি বক্তৃতায় আলোচনা করলেন। কংগ্রেস মণ্ডপে সমাজ-সংস্কার সম্মেলনের অধিবেশন সম্পর্কে রক্ষণশীল বালগঙ্গাধর তিলক ও উদারপন্থী গোপালকৃষ্ণ গোখ্লের মধ্যে বিতর্ক ও কলহের সৃষ্টি হয়। সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেন যে, কংগ্রেস সম্মিলিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিখ, রক্ষণশীল, উদারপন্থী সকলেরই আশ্রয়স্থল। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রসারের ও দাবি পুরণের জন্যই এর সৃষ্টি। সমাজ-সংস্কারের আলোচনা এখানে হওয়া বিধেয় নয়। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। কাজেই নিজ অভিজ্ঞতা থেকে পরিষদের কর্ম্মপ্রণালী ও তাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। ব্যবস্থা-পরিষদগুলিতে জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতীয়দের

কত সামান্য আসন দেওয়া হয়েছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বাংলা দেশের লোক সংখ্যা সাত কোটি, কিন্তু পরিষদে প্রতিনিধি গৃহীত হয়েছেন মাত্র সাত জন! আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন, গত যাট বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজস্বে একচল্লিশ কোটি টাকা ঘাটতি পড়েছে, আর জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ কোটি থেকে দু'শ দশ কোটি টাকায়! এর মধ্যে বেয়াল্লিশ কোটি টাকা বেড়েছে গত দশ বছরেরই ভিতর। ব্রিটিশ রাজ্য উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রসারিত করার যে বাতুলতাসুলভ প্রচেষ্টা তার ফলেই এই বিষম অবস্থার সূত্রপাত। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের সদিচ্ছায় আস্থাবান্। তার আওতায় এসে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বহু দেশ যেমন স্বাধীনতা লাভ করেছে ভারতবর্ষও এক দিন সেরূপ স্বাধীনতা লাভ করবে—এই বলে সুরেন্দ্রনাথ তার বক্তৃতা পরিসমাপ্ত করেন।

প্রথম প্রস্তাবে তিন মাসের মধ্যে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করে সাধারণ সম্পাদক ও ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সলকে প্রেরণ করতে জানকীনাথ ঘোষাল পুনা-সমিতিকে অনুরোধ জানান। দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন বৈকুণ্ঠ নাথ সেন। এ সময়ে ভারতীয় রাজস্ব-ব্যয় সম্পর্কে একটী পার্লামেণ্টারি কমিটি বসেছিল। কমিটির আলোচ্য বিষয় যাতে ব্যাপকতর করা হয়, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হ'ল তাই। অর্থাৎ, কোন্ কোন্ খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাই শুধু না দেখে কি ধরণের নীতি দ্বারা চালিত হয়ে এরূপ ব্যয় করা হচ্ছে তা-ও যেন নির্ণয় করা হয়। এ প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ কমিশনই ওয়েলবি কমিশন নামে পরিচিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি তথ্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় সিবিল সার্বিস, পেন্সন, ভাতা, সুদ (এক কথায় 'হোম চার্জ্জেস') সামরিক ব্যয়, বাণিজ্য-নীতি প্রভৃতি কোটি কোটি

ভারতবাসীর কিরূপ মৃত্যুর কারণ হয়েছে তা তিনি বিশেষরূপে ব্যক্ত করেন।

উপনিবেশসমূহে প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতি ইউরোপীয়দের ব্যবহার নির্ম্মম। এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের ব্যবসা ও অন্যান্য অধিকার লোপেরও বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ ক'রে এই প্রথম এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এ অধিবেশনে বিখ্যাত ভারতবন্ধু রেভারেণ্ড জাবেজ টি সাণ্ডার্লণ্ড যোগ দান করেন ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্র কর্ত্তৃক উত্থাপিত শিক্ষাসংকোচ সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতিবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করেন। রেলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধা সম্পর্কেও এক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সিবিল সার্বিস সম্পর্কীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবারেও ব্রিটিশ কমিটির জন্য ষাট হাজার টাকা ব্যয় ধার্য্য হয়। দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা হিউম সাহেবের সহযোগী রূপে জয়েণ্ট জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন।

১৮৯৬ সালে কল্‌কাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন হ'ল। এবারকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়। তিনি এ সময় অসুস্থ থাকায় তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। এ বছর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মারা যান। রমেশচন্দ্র অভিভাষণে তাঁর কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। এ সময় একটি কথা উঠে যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ, যেমন মেজিষ্ট্রেট প্রভৃতি, শিক্ষিত ভারতীয়ের চেয়ে জনসাধারণের অবস্থা ভাল জানেন, ও তাঁরাই তাদের অধিকতর মঙ্গল সাধন করে থাকেন। রমেশচন্দ্র বলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীই দরিদ্র নিরক্ষর ভারতীয় জনসাধারণের স্বাভাবিক ও অবিসংবাদিত নেতা।

মূল সভাপতি মহম্মদ রহিমুতুল্লা সায়ানি। কংগ্রেসে এই বার বছরে

দু'জন মুসলমান সভাপতি হলেন। সায়ানি তাঁর অভিভাষণে বিশদ আলোচনা করে দেখান যে, মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানের আপত্তির কারণগুলি সবই ভুয়ো। তিনি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে কংগ্রেসে সম্মিলিত হতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন।

এবারকার কংগ্রেসে কতকগুলি নূতন বিষয়েরও প্রস্তাব ও আলোচনা হ'ল। ভারত-সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না। ভারত-সরকার উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষ। প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের হুকুম তামিল করতে বাধ্য। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রাদেশিক রাজস্বের বেশীর ভাগই ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রাস করে ফেল্‌তেন। প্রতি বছর প্রাদেশিক সরকারের যা' কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকত, পাঁচ বছর অন্তে হিসাব হলে তাও আবার তাঁরা নিয়ে নিতেন। অথচ জাতির সকল রকম গঠনমূলক কার্য্য, যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পোন্নতি প্রভৃতি সকলই ছিল একান্ত ভাবে প্রাদেশিক সরকার-গুলিরই করণীয়। প্রতি বছর ভারত গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে বাকী সবই যাতে প্রাদেশিক সরকারগুলি নিজ নিজ প্রদেশের জন্য ব্যয় করতে পারেন, সরকারকে তার ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়ে বালগঙ্গাধর তিলক কংগ্রেসে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ভারত-সরকার অমিতব্যয়ী স্বামী, সর্ব্বরকম খেয়াল খুশী চরিতার্থ করার জন্য চাই তার অর্থ; প্রাদেশিক সরকারগুলি তার এক একটি পত্নী, যা' কিছু পুঁজি পাটা আছে নীরবে সব দিয়েও এদের সোয়াস্তি নেই!

দ্বিতীয় নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন আনন্দমোহন বসু মহাশয়। শিক্ষা-বিভাগে ভারতীয়দের প্রতি অবিচার ও অসম ব্যবহার এ প্রস্তাবের মূল বস্তু। তিনি বলেন, ১৮৮০ সালের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অন্ততঃ

শিক্ষাবিভাগে ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে কোন তারতম্য করা হ'ত না। তাঁরা সকলেই সমান বেতন পেতেন, ও পাঁচ শ' টাকা মাসিক বেতনে তাঁদের চাকরী আরম্ভ হ'ত। ১৮৮০ সালে ভারতীয় কর্ম্মচারীদের প্রারম্ভিক বেতন কমিয়ে তিন শ' তেত্রিশ টাকা ও ১৮৮৯ সালে আড়াই শ' টাকা করা হয়! তখন পর্য্যন্তও কিন্তু পদমর্য্যাদা সমান ছিল। ১৮৯৬ সালে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে বেতনের তারতম্য ত আছেই, উপরন্তু পদমর্য্যাদারও তারতম্য করা হয়েছে। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম চাকুরি-গুলি দু' শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে—ভারতীয় ও প্রাদেশিক। ভারতীয় শ্রেণীতে বিলাতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা থাক্‌বেন, প্রাদেশিক শ্রেণীতে থাক্‌বেন ভারতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা। বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও ভারতীয়েরা এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত হবেন! কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষ পদেও তাঁরা নিযুক্ত হতে পারবেন না স্থির হয়। এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপারের ফলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককেও প্রাদেশিক বিভাগেই চিরদিন কর্ম্ম করতে হয়েছে। আনন্দমোহন কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের সঙ্গে আমরা ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হয়েছি। তিনি বরাবর কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে কোন-না-কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এক একটি পরিক্ষা-কেন্দ্র না করে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করার প্রস্তাব এবারেই প্রথম কংগ্রেস থেকে উত্থাপিত হয়, আর এ প্রস্তাবের মূল হলেন কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও যে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে তার সূচনা এই প্রস্তাবেরই মধ্যে। কালীচরণ বলেন, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা উচ্চতম শিক্ষায় ও গবেষণায় নিয়োজিত না হলে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা নেই।

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে আসাম চা-বাগানের শ্রমিক সম্বন্ধে প্রস্তাব তুলতে দেওয়া হয় নি এই কারণে যে, এ একটি প্রাদেশিক প্রশ্ন। বস্তুতঃ এ প্রশ্ন যে মোটেই প্রাদেশিক নয়, পূর্ব্বেই তা দেখান হয়েছে। চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। তিনি বলেন যে, চা-করদের দুর্ব্যবহারের কথা শুনে আসামগামী শ্রমিকদের ষ্টীমার থেকে ব্রহ্মপুত্রে ঝাপিয়ে পড়তে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন! বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় স্বাভাবিক ওজস্বীনী ভাষায় চা-শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করলেন।

মাদ্রাজ ও বোম্বাই গবর্ণরের শাসন-পরিষদ দু'জন সদস্য নিয়ে গঠিত। একটি প্রস্তাবে এই সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে তিন জন করার ও তৃতীয় সদস্যপদে কোন বেসরকারী ভারতীয় নিয়োগের দাবি জানান হয়। পরে প্রাদেশিক ও ভারতীয় শাসন-পরিষদে, এমন কি ভারত-সচিবের কৌন্সিলে যে ভারতীয় সদস্য গৃহীত হয়েছেন তার মূল আমরা এই প্রস্তাবের ভিতরেই পাই। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (পরে লর্ড) আর একটি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ ধরণের প্রস্তাব পূর্ব্বে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে উত্থাপিত হয় নি। এ সময়ে ঝালোয়ারের মহারাজাকে কোন অপ্রকাশ্য কারণে গদিচ্যুত করা হয়। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এই দাবি করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও রাজন্যদের গ্রহণযোগ্য কোন সাধারণ ট্রাইবুনালে প্রকাশ্য বিচার ব্যতিরেকে মহারাজাদের গদিচ্যুত করা বাঞ্ছনীয় নয়। কংগ্রেস নেতৃবর্গ অতঃপর রাজন্য-ভারতের প্রতি যতই আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন, সরকারী নীতিও তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হতে সুরু হয়।

এ সময় দুর্ভিক্ষ ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, গবর্ণমেণ্ট-অনুসৃত নীতির ফলে ভারতে আজ

এই দুর্দ্দিন উপস্থিত। আকবরের আমলে শ্রমিকগণ যে পরিমাণ মজুরি পেত, এখন তার চেয়ে ঢের কম পায়। অথচ জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে। ভারতের দারিদ্র্যসম্পর্কে প্রত্যেকবার পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়! এবারে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেন আর এন মুধোলকর। তিনি বলেন, ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষিব্যাঙ্ক, কারিগরি শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও আয়কর হ্রাস না হলে ভারতবাসীর দারিদ্র্য মোচন হওয়া কঠিন। তখন পাঁচ শ' টাকা বার্ষিক আয়ের উপরেও আয়কর ধার্য্য হ'ত! সরকারী চিকিৎসা বিভাগে বৈষম্য বিদূরণের প্রস্তাব করেন এবারে ডাঃ নীলরতন সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দ্দশার কথা পরমেশ্বরম্ পিলৈ একটি প্রস্তাবে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষে এখন আমরা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য হতে পারি। পার্লামেণ্টের দ্বারও আমাদের নিকট মুক্ত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাড়পত্র ছাড়া ভারতীয়দের চলাফেরা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। রাত্রে ঘরের বার হতে দেওয়া হয় না, নির্দ্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্যত্র বসবাস করতে তারা অক্ষম, রেলের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাদের গমনাগমন নিষিদ্ধ। ট্রাম থেকে ভারতীয়দের ফুটপাথে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া সেখানকার দৈনন্দিন ব্যাপার। হোটেলে আহার বা সাধারণগম্য পথে গমন করতেও তাদের দেওয়া হয় না; ভারতীয়ের গায়ে থুথু দেওয়া হয়, আরও কতরকম অপমান নির্যাতন যে তাদের সহ্য করতে হয় তার ইয়ত্তা নেই।' নাটালে এই সময় একটি কঠোর আইন পাশ হয়—চুক্তির মেয়াদ ফুরোলে হয় ভারতীয়দের নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে, নতুবা মাথা পিছু বছরে তিন পাউণ্ড করে সরকারে টেক্স দিতে হবে! আর ভারত গবর্ণমেণ্টও এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেছিলেন!

এবারকার কংগ্রেসের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল শিল্প-প্রদর্শনী। শিল্প-প্রদর্শনী

এখন কংগ্রেসের একটি বিশেষ অঙ্গ, কিন্তু এখানেই তার সূত্রপাত। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এই শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের মূলে ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন হ'ল বেরারের রাজধানী অমরাবতীতে। ১৮৯৭ সাল ভারতবাসীর পক্ষে নানা কারণে স্মরণীয়! স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্বধর্ম্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করেন। তাঁর এই বক্তৃতায় ও পরবর্ত্তী কয়েকবছর যাবৎ হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব প্রচার হেতু বিদেশে—ইউরোপে ও আমেরিকায়, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর মর্য্যাদা আশ্চর্য্যরকম বর্দ্ধিত হয়। স্বামীজী পুরো চার বছর পরে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন ও সর্ব্বত্র দিগ্বিজয়ী বীরের সম্মান লাভ করেন। ভারতবাসী তাঁর মধ্যে অপূর্ব্ব সাহস, তেজ, শক্তি ও পরিপূর্ণতার প্রকাশ দেখে দুঃখ-দৈন্যের ভিতরেও যেন শক্তিমান হয়ে উঠ্‌ল। পরমহংসদেবের শিক্ষায় বিবেকানন্দ শক্তিমান্, স্বদেশে ফিরে নরনারায়ণের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করলেন। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। তিনিই প্রথম ভারতবাসীকে বহির্ম্মুখী মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে নিজের দোষ-ত্রুটি ক্ষালনে অবহিত হতে উপদেশ দিলেন। 'ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্যের জন্য ভারতবাসীই দায়ী, তা নিরাকরণের উপায়ও তারই হাতে'—এই মহামূল্য বাণী তিনিই ভারতময় প্রথম প্রচার করেন।

এ বছরটী আরও নানা কারণে স্মরণীয়। ভারত-সরকারের অমিতব্যয়িতার কথা কংগ্রেস বরাবর ঘোষণা করে এসেছেন। ব্যয় সঙ্কোচের জন্য নানারূপ প্রস্তাব ত নেতৃবর্গ করেছেনই। এই আন্দোলনের ফলে পার্লামেণ্ট সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য একটি কমিশন বসান। লর্ড

ওয়েলবী সভাপতি ছিলেন বলে এ কমিশন ওয়েলবী কমিশন নামে পরিচিত। ভারতবন্ধু সার্ উইলিয়ম ওয়াডারবর্ণ, ডবলিউ এস্ কেন ও দাদাভাই নৌরজী কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনে সাক্ষ্য দেবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে চার জন আহূত হন। এঁরা হলেন বোম্বাইয়ের দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা, পুণার গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, মাদ্রাজের জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দাদাভাই নৌরজী সদস্য হলেও কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। সাক্ষ্যদানের পরে নেতৃবর্গ ভারতে ফিরে আসেন ও পরবর্ত্তী কংগ্রেসে যোগদান করেন।

সুরেন্দ্রনাথ জুন মাসেই কল্‌কাতায় ফিরে এলেন। এই জুন মাস বাঙালীর নিকট আর একটি কারণে স্মরণীয়। সমগ্র বাংলা, বিহার ও আসাম জুড়ে ১২ই জুন এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাতে ধনপ্রাণ নাশ হয় বিস্তর। ভূমিকম্পের সময় রাজশাহীর অন্তর্গত নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের তৃতীয় দিনের অধিবেশন হচ্ছিল, অধিবেশন শেষ হবার মুখেই এই ভূমিকম্প হয়।

পূর্ব্ব বছর থেকেই দুর্ভিক্ষ ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সুরেন্দ্রনাথ এ নিয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসাধারণের সাহায্যের জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান। বোম্বাইয়ে এ সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তা ছাড়া এখানে আরও একটি নূতন বিপদ দেখা দিল। প্লেগ মহামারী সর্ব্বপ্রথম ভারতের বোম্বাই প্রদেশে আবির্ভূত হয় ও শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটাতে থাকে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণে ভীষণ আতঙ্কের উদ্রেক হ'ল। সরকার প্লেগ কমিটি প্রতিষ্ঠা করলেন। পুণায় প্লেগ নিবারণের জন্য যে সব উপায় অবলম্বিত হ'ল তা নিয়ে খুবই কথা উঠে। সরকারী কর্ম্মচারী হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের গৃহে এমন কি অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, দেবমন্দির ও মস্‌জিদে ঢুকে প্লেগাক্রান্ত

ব্যক্তি অন্বেষণের সময় এমনভাবে কার্য্য করে চল্‌ল যা জনসাধারণের পক্ষে খুবই আপত্তিজনক। 'প্লেগ কর্ম্মচারীদের চেয়ে প্লেগ ভাল'—উত্যক্ত হয়ে লোকে এরূপ কথাও বল্‌তে লাগ্‌ল! নাটু ভ্রাতৃদ্বয় এর প্রতীকারের আশায় উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন-লিপি প্রেরণ করেন। নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম আজ জাতীয় ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। সর্দ্দার নাটু ও তাঁর ভ্রাতা বংশপরম্পরায় রাজভক্ত প্রজা। মরাঠা দেশে ইংরেজ-আধিপত্য স্থাপনে ব্রিটিশকে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ যথোচিত সাহায্য করেন। এর পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজের নিকট থেকে তাঁরা জায়গীরও ভোগ করতেন।

প্লেগ কমিটির উপর লোকের বিদ্বেষ এত বেড়ে গেল যে, এর সভাপতি মিঃ র‍্যাণ্ড ও কর্ম্মচারী লেফ্‌টন্যাণ্ট এয়ারেষ্ট আততায়ীর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। আততায়ীরা অবিলম্বে ধরা পড়ল ও বিচারে চরম দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। কিন্তু ভারতীয় আমলাতন্ত্র এতেই নিরস্ত হ'ল না। যে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় আগেই তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাঁদের উপরই কোপ পড়ল। নাটু-ভ্রাতৃদ্বয় ১৮২৭ সালের বোম্বাই রেগুলেশন অনুযায়ী বিনা বিচারে বন্দী হলেন! তাঁদের সম্পত্তিও সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল। তাঁরা আঠার মাস বন্দী জীবন কাটিয়ে মুক্তিলাভ করেন। এ নিয়ে তখন ভারতবর্ষে খুবই আন্দোলন ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয়! কিন্তু আর যে একটি ব্যাপার ঘট্‌ল তাতে আমলাতন্ত্রের নিপীড়ন নীতি অন্য সকল ব্যাপার ছাপিয়ে উঠ্‌ল।

বালগঙ্গাধরতিলক কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা। তাঁর কথা ইতিপূর্ব্বে কিছু বলেছি! তিনি পাঁচ বছর একাদিক্রমে বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলনের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক রূপে কিছুকাল তিনি কাজ করেন। পরে

সমাজ-সংস্কার সম্মেলন সম্পর্কে মতদ্বৈধতা হেতু সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেন। তিনি আড়াই বছর যাবৎ বোম্বাই ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিলক ১৮৯৩ সালে গণপতি উৎসব ও ১৮৯৫ সালে শিবাজী-উৎসবের সূচনা করেন। তদবধি প্রতিবছর শিবাজীর জন্মদিনে এই উৎসব প্রতিপালিত হতে থাকে। এই সব কারণে ইতিমধ্যেই তিনি মরাঠাজাতির হৃদয় জয় করেছেন। ১৮৯৬ সালের দুর্ভিক্ষ নিবারণে তিলক স্বয়ং সরকারকে বিশেষ সাহায্য করেন। পর বছর প্লেগ আরম্ভ হলে তিনি পুণায়ই থেকে গেলেন ও নিজ জীবন বিপন্ন করে রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিলক প্লেগ-কমিটির অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং নিজে হিন্দু প্লেগ হাসপাতাল স্থাপন করে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন।

১৮৯৭ সালের ১৩ই জুন শিবাজী উৎসব নিষ্পন্ন হয় ও এর বিস্তৃত বিবরণ ১৫ই জুন তারিখের কেশরী পত্রে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২২শে জুন র‍্যাণ্ড ও এয়ারেষ্ট নিহত হন। আমলাতন্ত্র কাকতালীয়বৎ যুক্তিতেই তিলককে রাজদ্রোহ অপরাধে দায়ী করে ২৬শে তারিখে গ্রেপ্তার করে। তিনি হাইকোর্টে দায়রায় সোপর্দ্দ হলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর ছ'জন ইউরোপীয় ও তিনজন ভারতীয় জুরীর সম্মুখে তাঁর বিচার হ'ল। ইউরোপীয় জুরীরা তাঁকে দোষী ও ভারতীয় জুরীরা তাঁকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। জজ অধিকাংশের মত গ্রহণ করে তিলককে দেড় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সুপণ্ডিত ম্যাকসমূলার ও উইলিয়ম হাণ্টার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট আবেদন করে কারাগারে তিলকের পড়াশুনা করবার সুবিধা করে দেন। এক বছর কারাদণ্ড ভোগের পর ১৮৯৮ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি অব্যাহতি পান। তিলকের সঙ্গে অন্য দু'খানা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরও কারাদণ্ড হয়েছিল।

একদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ভূমিকম্প অন্যদিকে নির্ব্বাসন, কারাদণ্ড ও ভারতব্যাপী বিক্ষোভ—এরূপ অবস্থার মধ্যে অমরাবতীতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল চিত্তূর শঙ্করন নায়ারের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি ছিলেন তিলক-বন্ধু গনেশশ্রীকৃষ্ণ খ্যাপার্দ্দে। প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় সাত শ'। সভাপতি তাঁর তেজোব্যঞ্জক বক্তৃতায় ভারতময় বিক্ষোভের কথা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করলেন। তিনি তিলকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি কি সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এখনও নির্ব্বাক্। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তা জান্‌তে চাইছে,—ভবিষ্যৎ বংশধরগণও তা জান্‌তে চাইবে। উন্নতির প্রকাশ্য পথরোধের আয়োজন হলে তা নিশ্চিত অপ্রকাশ্য অলিগলির মধ্যে নিজ পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হবে। তিনি উপসংহারে বল্‌লেন—"আমরা কি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌ব, না তার উন্নতি সাধনে, উন্নততর অবস্থায় পৌঁছতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব! দীর্ঘকালের পরাধীনতায় ও দাসত্বে ভারতবাসীর জাতীয় শক্তি বিলুপ্ত ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে; তার ঐশ্বর্য্য ও মহত্ত্ব থেকেও আজ সে বিচ্যুত। ভারতবর্ষ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় উপনীত হতে চায় ও অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে যোগ্য আসন লাভের আকাঙ্ক্ষা করে তা হলে তা সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষিত ভারতবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টা-যত্নেই সম্ভব হবে।"

শিক্ষিত সাধারণের উপর আমলাতন্ত্র যে নিপীড়ন সুরু করেন তার ফলেই কংগ্রেসের 'এক্‌ষ্ট্রিমিষ্ট' বা চরমপন্থী দলের সৃষ্টি। কোন কোন কংগ্রেস নেতার মনে এ সময় জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার প্রয়োজনীয়তার কথা উদিত হয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত বহু পূর্ব্বেই এরূপ আন্দোলন সুরু করেন। তিনি এই অধিবেশনেই স্পষ্ট ভাষায়

বলেন, "বছরে তিন দিন কংগ্রেস করে বা সেই উপলক্ষ্যে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা করে দেশের যথার্থ উন্নতি হবে না। এ তামাসা মাত্র। সারা বছর ধরে প্রতি দিন, প্রতি মুহূর্ত্ত সমগ্র ভারতীয় সমাজের স্তরে স্তরে, তিল তিল করে এ কার্য্যটি করতে হবে। এজন্য একটি সঙ্ঘ গঠন আবশ্যক।"

কংগ্রেসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবছরও শাসন-প্রণালী সম্পর্কীয় নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। এ সময় ভারত-সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর নীতি পরিচালনে ব্যস্ত। এজন্য তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। ওয়াচা মহাশয় এর প্রতিবাদ করে বল্‌লেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই এই যুদ্ধের ব্যয় ভার সম্পূর্ণ বহন করা উচিত। একটি প্রস্তাবে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বিলাতে ওয়েলবী কমিশনকে এই অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নির্ব্বাচিত সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, বজেটের উপর ও আইন প্রণয়নে নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের ভোটদানের অধিকার, সামরিক ও অসামরিক ভারত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ব্যয় বণ্টন প্রভৃতি সম্বন্ধেও যেন কমিশনে আলোচনা হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এবারকার অধিবেশনে তুটি খুব গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হ'ল। প্রথমটি বিনা বিচারে নির্ব্বাসন সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি ফৌজদারী আইনে নব প্রস্তাবিত রাজদ্রোহ ('সিডিশন') ধারার সংশোধন সম্পর্কে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বলেন, "বঙ্গের ১৮১৮ সালের তিন আইন, মাদ্রাজের ১৮১৯ সালের তুই আইন ও বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের পঁচিশ আইন এযুগে একেবারে অচল। বিনা বিচারে কাউকে বন্দী করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। বোম্বাই আইন অনুসারে ধৃত নাটু-

ভ্রাতৃদ্বয়কে হয় অবিলম্বে কারামুক্ত করা হোক্, নতুবা প্রকাশ্য বিচারালয়ে তাঁদের বিচার হোক্।" সুরেন্দ্রনাথ আরও বলেন, "পুণায় পিটুনি পুলিশ বসিয়ে ভয়ানক ভুল করা হয়েছে। এর চেয়েও বড়রকমের ভুল হয়েছে তিলক ও দু'জন সম্পাদককে রাজদ্রোহ আইনে দণ্ডিত করে। তিলকের জন্য আমার প্রাণ বেদনায় ভরপুর। সমগ্র জাতিই আজ তাঁর জন্য ক্রন্দন-রত।"

এই আমলাতন্ত্র অন্যদিকে দমন-নীতি পাকাপোক্ত করবার জন্য ফৌজদারী আইনের রাজদ্রোহ বিষয়ক ১২৪ (ক) ধারা সংশোধনেও উঠে পড়ে লাগ্‌লেন। কোন লেখায় বা বক্তৃতায় ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ('contempt' and hatred') প্রকাশিত হলে লেখক বা বক্তাকে আইনতঃ দণ্ডনীয় করে ঐ ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হ'ল। শুধু তাই নয়, মেজিষ্ট্রেট যে-কোন লোককে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিজেই তার বিচার করতে পারবেন। দায়রায় বা হাইকোর্টে রাজদ্রোহ অপরাধ বিচারের যে প্রথা ছিল তাও রহিত করার প্রস্তাব হ'ল এর মধ্যে। মেজিষ্ট্রেট সদাচরণের ('good behaviour') প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য যে-কোন ব্যক্তির নিকট উপযুক্ত পরিমাণ জামিন দাবি করতে পারবেন। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে লেখার স্বাধীনতা এইরূপে ব্যাহত হলে জাতির উন্নতির পথে বিষম বিঘ্ন ঘটবে - এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ধীরমতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে উক্ত মর্ম্মে আইন সংশোধিত করিয়ে নিলেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ তখনও বিলাতের জনমতের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান্। বিলাতে জনমত গঠনের জন্য এবারেও ষাট হাজার টাকা মঞ্জুর হ'ল!

কংগ্রেসের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হয় মাদ্রাজে, ১৮৯৮ সালে। এবারে

সভাপতি হলেন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার রাজনীতিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রাণ আনন্দমোহন বসু। আনন্দমোহন তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে সরকারের দমন নীতি, শিক্ষা নীতি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অগ্রসর নীতি ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা হ্রাস প্রচেষ্টার তীব্র সমালোচনা করেন। এ সময়ে সরকারী নীতি এতটা দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠে যে, রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সভাপতি মহাশয়ের জনৈক বন্ধু তাঁকে লেখেন, "আপনি কি ব্রিটিশ-রাজের মিত্র? তা হলে এই সব আত্মঘাতী নীতি থেকে কর্ত্তৃপক্ষকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করুন। আর আপনি যদি শত্রু হন, তা হলে আমার পরামর্শ এই যে, নীরব থাকুন এবং সব বিষয়েই নিজেরাই নিজেদের পথ বেছে নিন্।" সরকারের দমন ও পেষণ নীতির ফলে ক্রমশঃই কর্ত্তৃপক্ষের উপর ভারতবাসীর আস্থা টল্‌তে লাগ্‌ল।

এ অধিবেশনেও যথারীতি শাসন সম্পর্কীয় বহু প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। রাজদ্রোহ মূলক আইনের কথা আগে বলেছি। এবার কংগ্রেসে এর প্রতিবাদ করে এক প্রস্তাব পাস হ'ল। প্রস্তাবক জাম্বুলিঙ্গ মুদালিয়ার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বল্‌লেন, "আস্থা ও সদিচ্ছার বদলে গবর্ণমেণ্টের উপর লোকের অবিশ্বাস ও সন্দেহই বিদ্যমান। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি সকলের মনে একটা তিক্ত ভাব বিরাজ করছে।"

এক সময় সরকার 'সিক্রেট প্রেস কমিটি' নামে সংবাদপত্র শাসনের জন্য একটি কমিটি স্থাপন করেন। আজকাল 'সেন্সর' কথাটির সঙ্গেই আমরা খুবই পরিচিত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ও রচনার উপর গোপনে গোপনে বিচার-আলোচনা করা হ'ল ঐ প্রেস কমিটির কাজ। ডবলিউ এ চেম্বার্স এর প্রতিবাদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও নরসিংহ চিন্তামণি কেলকার তা সমর্থন করে এক জোরাল বক্তৃতা দেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কয়েকটি স্বায়ত্ত-শাসন মূলক প্রতিষ্ঠান

ছিল তাতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাদের বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মে। সরকার এই অধিকারটুকুও বরদাস্ত করতে পারলেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কল্‌কাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন করে ও বোম্বাইয়ে সিটি ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট মারফত এই প্রতিপত্তি বিলোপের চেষ্টা চল্‌ল। গণেশশ্রী খাপার্দ্দে এর প্রতিবাদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তা সমর্থন করেন। যোগেশচন্দ্র বলেন, কল্‌কাতা করপোরেশনের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের অপরাধ, করদাতাদের স্বার্থরক্ষায় তৎপরতা এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে কর্ত্তব্য সম্পাদন!

দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠ্‌ল। নাটালে ভারতীয় বিরোধী আইনের কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ভারতের বড়লাট লর্ড এল্‌গিন (১৮৯৪-১৮৯৮) ঐ নিষ্ঠুর আইনে সম্মতি দান করলেন। বাস্তবিক লর্ড এল্‌গিনের আমলেই ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে ভারতীয়দের দুর্গতি সুরু হয়—লর্ড কার্জ্জন এসে প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন মাত্র। ট্রান্সভালে এই মর্ম্মে একটি আইন পাস হ'ল যে, শহর-গুলির মধ্যে ভারতবাসীরা বাস করতে পারবে না। শহর হ'তে খানিকটা দূরে যেখানে ময়লা আবর্জ্জনা পুড়িয়ে ফেলা হয় সে সব অঞ্চলেই তাদের বসবাসের উপযুক্ত স্থান বলে স্থির হয়। এ সময়কার ভারত-সচিব ছিলেন লর্ড জর্জ্জ হ্যামিলটন। তিনি ভারতীয়দের উপর খুবই বিরূপ—ভারতীয়দের 'অসভ্য' জাতি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর নিকট থেকে সুবিচারের আশা দুরাশা! এইসব অনাচার অবিচারের প্রতিকারের আশা না দেখে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এই সময় দক্ষিণ-আফ্রিকার নাটাল ও ট্রান্সভাল প্রদেশে জোর আন্দোলন সুরু করেন। কংগ্রেস এবারেও ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

———

স্বৈর-শাসন ও কংগ্রেসের কার্য্যক্রম

(১৮৯৯-১৯০৪)

লর্ড কার্জ্জন ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কংগ্রেস তাঁকে যথারীতি অভিনন্দন জানালেন ও এই আশা ব্যক্ত করলেন যে, তাঁর আমলে ভারত-শাসনে আবার উদার-নীতি অনুসৃত হবে। কিন্তু কার্জ্জনের কার্য্যাবলী এর বিপরীতই প্রমাণিত করলে। দুর্ভিক্ষ নিবারণে এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বিচার-বৈষম্য বিদূরণে তিনি কতকটা চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বৈর-শাসন কংগ্রেস নেতৃবর্গকে শীঘ্রই বিদ্বিষ্ট করে তুল্‌ল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, ভারত-সভার পক্ষ থেকে ১৮৯৯ সালে কার্জ্জনকে অভিনন্দন করবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লাটপ্রাসাদে গমন করেন। কিন্তু দেশী পাদুকা পরিহিত বলে কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পান নি! এই সামান্য ব্যাপার থেকেই তাঁরা তাঁর ভাবী স্বৈর-শাসনের আভাষ পেলেন। বস্তুতঃ লর্ড কার্জ্জন একটি বক্তৃতায় এই কথা স্পষ্ট ব্যক্ত করলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের মূল উদ্দেশ্য দুটি—একটি, ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করা, অন্যটি, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার। কংগ্রেসের উপরও তিনি ছিলেন খুব বিরূপ। ১৯০০, ১৮ই নবেম্বর তিনি ভারত-সচিবকে এক পত্রে লেখেন, "আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসের পতন সন্নিকট, এবং আমার একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা হ'ল, ভারতে অবস্থিতি কালেই একে শান্তিতে মরণের পথে এগিয়ে দেওয়া।" কাজেই যতই দিন যেতে লাগ্‌ল ততই শিক্ষিত সমাজ তাঁর নীতির স্বরূপ বুঝ্‌তে পারলেন।

গবর্ণমেণ্ট-নীতি যখন ভারতবাসীর উন্নতির পরিপন্থী ও ক্রমে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল হতে স্থরু হয় তখনও নেতৃবর্গ নূতন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে কংগ্রেসের কার্য্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করেন নি। তাঁরা ব্রিটিশ জনসাধারণের তথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায়পরায়ণতার উপরই আস্থাশীল রইলেন ও পূর্ব্বের মত বিলাতে জনমত গঠনের জন্য প্রতি বছর প্রচুর টাকা ব্যয় করতে লাগ্‌লেন। আমরা দেখেছি, কংগ্রেস বহু বছর বিলাতের জনমত গঠনের জন্য ষাট হাজার টাকা করে ব্যয় করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক কার্য্য চালাবার উদ্দেশ্যে মোটেই ব্যয় বরাদ্দ করেন নি, তাঁরা এদিকে তেমন তৎপরও হন নি। দূরদর্শী রাজনীতিক অশ্বিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনে এই ত্রুটির প্রতি নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন।

বাস্তবিক, প্রবীণ দলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বহির্মুখী, আর নবীন দলের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্তর্মুখী। নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মধ্যে পরে যে বিরোধ চরমে গিয়ে পৌঁছে তার মধ্যেও ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পার্থক্য। তখন বহির্মুখী প্রচেষ্টার যে প্রয়োজনীয়তা ছিল না তা নয়, তবে এর সঙ্গে অন্তর্মুখী প্রচেষ্টাও যে বিশেষ আবশ্যক, এ সরল সহজ কথাটি প্রবীণ দল স্বীকার না করায় পরবর্ত্তী কালে যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। এর পরে ক্রমেই কংগ্রেসের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ দেখ্‌তে পাই। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০২ সাল থেকে তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর রীতিমত ব্যাখ্যা স্থরু করেন।

কংগ্রেসের অমরাবতী অধিবেশনের সময় সার এণ্টনি ম্যাক্‌ডনাল্ড ছিলেন বেরারের চীফ কমিশনার। তিনি সে সময় এই অধিবেশনে আপত্তি করেন নি। ১৮৯৯ সালে এই ম্যাক্‌ডনাল্ড উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার ছোটলাট হন। এবার কিন্তু তিনি লক্ষ্মৌ শহরে

কংগ্রেসের অধিবেশন হতে দিলেন না! শহর থেকে আট মাইল দূরে গম ও ইক্ষুক্ষেত পরিবেষ্টিত মশা-মাছি-শূকর-নেকড়ে সমাকীর্ণ গ্রাম অঞ্চলে এবারে অধিবেশন হ'ল। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হলেন এবারকার কংগ্রেসের সভাপতি। সরকারী দমন-নীতি ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি তাঁর অভিভাষণে বিশদরূপে উল্লেখ করেন। পূর্ব্ববছর বিধিবদ্ধ 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহ আইন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে রাজনৈতিক বিষয়ের স্বাধীন আলোচনা বন্ধ করলে রাজদ্রোহ অতি দ্রুতই ব্যাপ্তিলাভ করবে। রমেশচন্দ্র বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্। ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিস্তর গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফলে তিনি যে-সব সত্যে উপনীত হয়েছেন তার একটি হ'ল এই, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের জন্য এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি দায়ী নয়। এর কারণ, ভারতবাসীর অত্যধিক কর-বৃদ্ধি এবং যন্ত্র-শিল্পে উন্নত ইংলণ্ডের সঙ্গে অবাধ প্রতিযোগিতা হেতু ভারতের গ্রাম্য শিল্পসমূহের বিনাশ। মোট উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠাংশ কর দেওয়াই ভারতবর্ষের সনাতন রীতি ছিল। এই রীতি বদল হওয়ায় ভারতবাসীর এত দারিদ্র্য। রমেশচন্দ্র বলেন, স্বায়ত্ত-শাসন লাভেই ভারতবর্ষের দৈনদশা বিদূরিত হওয়া সম্ভব। তাঁর মতে ইংরেজ শাসকবর্গের ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের উপর ভারতবাসীর আস্থা আর তেমন নেই।

গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৯ সালে কল্‌কাতা করপোরেশন আইন বিধিবদ্ধ করে এর ক্ষমতা অনেকটা সঙ্কুচিত করলেন। এতদিন নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যা মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ছিল, বর্ত্তমান আইনে তা কমিয়ে অর্দ্ধেক করা হ'ল। মনোনীত সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় অর্দ্ধেক! চেয়ারম্যান সরকারী কর্ম্মচারী, এ কারণ সব সময়ের জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভোট দিতেন। সুতরাং করপোরেশনে গবর্ণমেণ্ট সংখ্যাধিক্য হলেন। লর্ড

কার্জ্জনের আগ্রহাতিশয়েই স্বায়ত্ত-শাসনের মূলনীতি এইরূপে ব্যাহত করা হ'ল। আইন পাস হবার পূর্ব্বে ও পরে কল্‌কাতায় এ নিয়ে তুমুল আন্দোলন চলে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র প্রমুখ আঠাশ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি করপোরেশনের সদস্য পদে ইস্তফা দেন! বোম্বাই করপোরেশনের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করার জন্যও সেখানকার ব্যবস্থা-পরিষদে একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করা হয়। এবারকার অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ এসবের প্রতিবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করে বল্‌লেন, "আমি এবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় যে, স্বদেশী হোক্ বিদেশী হোক্ প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই প্রধানতম রক্ষাকবচ হ'ল জনসাধারণের সন্তোষ, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা। অভিযোগ নিরাকৃত না করে সাধারণের প্রীতি কেমন করে অর্জ্জন করা সম্ভব? আর নিয়মানুগ পন্থা বা বৈপ্লবিক উপায়—এ দুটির একটীও অবলম্বন না করলে তাদের অভিযোগই-বা কিরূপে নিরাকৃত হবে? আমরা নিয়মতন্ত্রের বন্ধু, কেননা আমরা বিপ্লবের শত্রু। আমরা আমাদের পথ বাছাই করে নিয়েছি, প্রতিপক্ষ তাঁদের পথ বাছাই করে নিন্। তাঁরা কি আমাদের পক্ষ নিতে চান, না বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগ দিতে চান? নিয়মতন্ত্র ও বিপ্লব—এ দুয়ের ভিতরে কোন মধ্য পন্থা নেই। হয় তুমি প্রথমটির পক্ষ নেবে, না হয় তুমি বিপ্লবের পতাকা তলে গিয়ে দাঁড়াবে।"

এই কথা বলে তিনি এই বক্তৃতা শেষ করলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষের মতিগতি সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। তাঁরা অতীতের সুকৃতি বিনষ্ট করতে, উন্নতির গতি রোধ করতে আনন্দ অনুভব করছেন।

ভারতীয়দের প্রাত কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব আরও দুটি বিষয়ে প্রকাশ পেল। বিদেশ থেকে 'তারে' যে-সব বার্ত্তা ভারতবর্ষে আস্‌ত তার উপর খবরদারি করবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে

'টেলিগ্রাফিক প্রেস মেসেজেস্ বিল' নামে একটি আইনের খসড়া পেশ করা হ'ল। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এই সময় বোম্বাই ও মাদ্রাজে নিয়ম করা হ'ল যে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনগুলির কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কোন রাজনীতিক আন্দোলনে বা সভায় যোগ দিতে পারবেন না! এর প্রতিবাদেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন হ'ল লাহোরে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন লাহোর চীফ কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল প্রবাসী বাঙালী কালীপ্রসন্ন রায়। পঞ্জাবের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এজন্য তাঁকেই পাঞ্জাবীরা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পদের যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। এবারকার মূল সভাপতি নারায়ণগণেশ চন্দাবরকর। সভাপতিত্ব করবার পরই তিনি বোম্বাইয়ে গিয়ে হাইকোর্টের বিচারাসনে বসেন। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং, বদরুদ্দীন তায়েবজী, এস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার, চিতুর শঙ্করণ্ নায়ার, আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ আরও অনেকে সেযুগে হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এ অধিবেশনেও বিচার, শাসন, শিক্ষা, সামরিক নীতি, সরকারী রাজস্ব, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা, বঙ্গের মত অন্যান্য প্রদেশেও চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, সুরাপানের অপকারিতা, দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য, উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হ'ল। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়ান মাইন্‌স্ এক্ট' নামে ভারতবর্ষের খনিসমূহ সম্পর্কে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু এ প্রসঙ্গে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করলেন। তিনি বল্‌লেন, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত না হলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

এমন দেশ কোথায় আছে যেখানে স্বদেশী শিল্পের উপর ট্যাক্স বসিয়ে বিদেশী শিল্পের সুযোগ করে দেওয়া হয়? এমন দেশ কোথায় আছে যেখানে বিদেশী বণিক্ ও উৎপাদকের সুবিধার জন্য চিনির মত স্বদেশ-জাত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর বসান হয়? এমন দেশ কোথায় যেখানে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করা হয়? কাজেই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া শিল্পোন্নতি সম্ভব—যাঁরা এ মতের অনুবর্ত্তী তাঁরা সাবধান হউন।"

এবারে লালা লজপৎ রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক প্রস্তাব করলেন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কংগ্রেসে যাতে প্রতি বছর অন্ততঃ অর্দ্ধদিন সময় দেওয়া হয় এ-ই ছিল প্রস্তাবের মর্ম্ম। প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ল। কংগ্রেসে কার্য্যকর গঠনমূলক প্রস্তাব এই প্রথম। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এ উদ্দেশ্যে দুটি কমিটি গঠিত হ'ল ও উভয় কমিটিরই সম্পাদক হলেন লালা হরকিষণ লাল। বাংলা দেশ থেকে শিল্প কমিটিতে চোদ্দ জন সভ্য গৃহীত হন। তাঁদের ভিতর বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা কমিটীতে ছিলেন আনন্দ-মোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নীলরতন সরকার, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বঙ্গের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌গণ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ থেকে এ কমিটীতে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। এ সময় জামশেঠজী নাজিরবান্‌জী টাটা বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য একটি বিদ্যাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। কংগ্রেস এজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। এই অর্থ দ্বারা বাঙ্গালোর সায়ান্স ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯০১ সালে কংগ্রেস হ'ল কল্‌কাতায়। কল্‌কাতার অধিবেশনে

এবারেও এর সঙ্গে একটি শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল। প্রদর্শনীর সভাপতি হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেসের সভাপতি বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ নেতা দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা। ওয়াচা মহাশয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন থেকেই গবর্ণমেণ্টের সমর-নীতি, রাজস্ব ও বাট্টা-হার সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করে যশস্বী হয়েছেন। এবারেও তাঁর অভিভাষণে ভারতের দারিদ্র্য, তার কারণ ও এসব নিরাকরণের উপায়াদি সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। ভারতবাসী দেশ-শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তবে ভারতবর্ষের শ্রী ফিরে আস্‌তে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন দীন্‌শা তাই বলেন, "মলির ভাষায় বল্‌তে গেলে সাম্রাজ্যমত্ততা ও এর পরিপূরকস্বরূপ দমন-নীতি ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু আজ হোক্ কাল হোক্ সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই রাজনীতিক উন্মত্ততা চলে যেতে বাধ্য। তখন উদার নীতি নিশ্চয়ই এর স্থান গ্রহণ করবে। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের সুফল কখনও অস্বীকার করে নি। কিন্তু তাই বলে তারা চিরকাল এর গুণগান করে একটি চাটুকার জাতিতে পরিণত হবে এরূপ আশা করা ভুল। আমরা সুশাসনে আছি নিঃসন্দেহ, কিন্তু বহু মন্দ এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। আমাদের বাসনা এই, মন্দ দূরীভুত হয়ে সময়ে আমরা আরও উৎকৃষ্টতর শাসন-প্রণালী লাভ করি।"

এই উৎকৃষ্টতর শাসন-প্রণালী কি ধরণের হবে সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে কেউ কখনো বলেন নি। মিঃ স্মেড্‌লি নামে একজন নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি এবারে এ সম্বন্ধে বল্‌লেন, "আপনারা বিভিন্ন প্রস্তাবে যে-সব দাবি করেন তা নিতান্তই সামান্য; কর্ত্তৃপক্ষ এগুলি পূরণ করে আপনাদের 'হোম রুল' (বা স্বরাজ) না দিয়ে দূরে সরিয়ে

রাখ্‌তে পারেন। কিন্তু আমি বলি—আপনারা ভারতবর্ষের 'হোম রুল' এর জন্য কায়মনে চেষ্টা করুন, ভগবান্ আপনাদের সহায়।"

ভারতবর্ষের নানা সমস্যা সম্বন্ধে বহু প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে একজন ভারতীয় আইনজ্ঞ গ্রহণের প্রস্তাব করা হ'ল এবারে। চীফ কমিশনার সার হেনরি কটন আসামের চা-বাগান শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে শ্রমিকদের যে ফৌজদারী আইনে দণ্ডনীয় হবার বিধি আছে তা তুলে দেওয়া হোক্। কটনের প্রস্তাব কার্য্যকরী না হওয়ার মূলেও ছিলেন লর্ড কার্জ্জন। কটন সাহেব তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, বড়লাট লর্ড কার্জ্জন প্রথমে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দেন, কিন্তু পরে চা-করদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এতে বিঘ্ন ঘটান। কংগ্রেসের এ অধিবেশনে একটি গঠনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের নূতনত্ব হ'ল, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন না জানিয়ে একেবারে দেশবাসীর কাছেই আবেদন জানান। প্রস্তাবটির প্রথম অংশের মর্ম্ম এই, কংগ্রেসের মতে বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশার একটি প্রধান কারণ—উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় নীতিতে জনগণের অজ্ঞতা। সুতরাং এ বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করতে স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন সচেষ্ট হন। প্রস্তাবটির দ্বিতীয় অংশে বলা হয় যে, ভারতবর্ষের আর্থিক সমস্যা দূর করতে হলে গ্রামে শহরে সর্ব্বত্র ভারতবাসীদের মূলধন সরবরাহ ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন আবশ্যক। কংগ্রেস এজন্য স্বদেশবাসীদের মধ্য থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে সকলকে আহ্বান করেন। বিলাতে কংগ্রেস-কার্য্য চালাবার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় এবারে প্রত্যেক প্রতিনিধির প্রবেশ-মূল্য দশ টাকা থেকে কুড়ি টাকায় বাড়ান হ'ল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও মহাদেবগোবিন্দ রাণাড়ের মৃত্যুতে কংগ্রেস প্রথমেই শোক প্রকাশ করলেন।

এবারকার কংগ্রেসের আর একটি বিশেষত্ব—মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি। ব্যারিষ্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের অবিসম্বাদিত নেতা। ১৮৯৪ সাল থেকেই তিনি তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনে যথাসাধ্য তৎপর রয়েছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে পরমেশ্বরম্ পিলৈ এযাবৎ কংগ্রেসে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। এবারে গান্ধীজী স্বয়ং কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রবাসী ভারতীয় সম্পর্কে মদনজিতের কার্য্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ইতিমধ্যে বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০০) হয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিটিশ ও বুয়র নামে পরিচিত ওলন্দাজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহু দিনের পুরাতন। কেপ কলোনি ও নাটাল প্রদেশে ইংরেজ এবং অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট ও ট্রান্সভালে বুয়রদের প্রাধান্য ছিল। ওখানকার বাসিন্দা হলেও উভয়েরই কাজ ছিল দেশের ধনরত্ন আহরণ। ক্রীতদাস প্রথা লোপ পেলে তাদের ঠিকা জনমজুরের আবশ্যক হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষ থেকেই অতঃপর ঠিকা জনমজুর সংগৃহীত হতে থাকে। পরে ভারতীয় বণিক্‌রাও ব্যবসা করতে সেখানে যায় ও বসতি স্থাপন করে। ১৮৮১ সালে একবার ব্রিটিশ ও বুয়রদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে ও প্রধানমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন বুয়রদের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। কিম্বারলীর হীরকখনির উপর ব্রিটিশের লোভ ছিল বরাবর। তারা ঐ অঞ্চলে ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করলে। কিম্বারলী বুয়র অঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত, কাজেই এর ন্যায্য অধিকারী বলে বুয়ররাই নিজেদের জাহির করতে লাগল। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে মনকষাকষি, পরে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারের নেতৃত্বে বুয়র সেনানী এই যুদ্ধে আশ্চর্য্য রণকৌশল প্রদর্শন করে। ক্রুগার পূর্ব্বেই বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। কাজেই ব্রিটিশ বাহিনীগুলিকে প্রথম প্রথম হারিয়ে দিতে বুয়রদের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে ইংরেজদের সাহায্য করেন। দু' বছর অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর ব্রিটিশের জয়লাভ ঘটল বটে, কিন্তু পরে কিছুকাল বুয়ররা গরিলাযুদ্ধে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। প্রবাসী ভারতীয়দের উপর বুয়রদের ব্যবহার ছিল খুবই নির্ম্মম। বুয়রদের বিরুদ্ধে যে ইংরেজরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তার একটি প্রধান কারণ ছিল এই। ইংরেজ ও বুয়রদের মধ্যে বিবাদ মিটল। দক্ষিণ আফ্রিকা ১৯০৮ সালে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে। প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দ্দশার কিন্তু অবসান হ'ল না।

কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হ'ল গুজরাটের আহ্মদাবাদ শহরে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে একটি শিল্প প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হ'ল। এর উদ্বোধন করলেন বরোদার গাইকবাড়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর আম্বালাল সরাভাই বলেন, "গুজরাট এক সময়ে ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এখন দারিদ্র্য তার চির সহচর। গুজরাটের অধিবাসী মাত্র এক কোটি, এর মধ্যে অন্যূন পঁচিশ লক্ষ বিগত দুটি দুভিক্ষে মারা গেছে! আজ বহু লোক অন্নাভাবে দেশান্তরিত। গুজরাটে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু ট্যাক্সের তাড়নায় তার উন্নতি পদে পদে ব্যাহত। শাসন-ক্ষমতা আয়ত্ত না হলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি যে অসম্ভব একথা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি।"

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় একটি বিষয়ে কংগ্রেসের দৃষ্টি বিশেষভাবে

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আকর্ষণ করলেন। উচ্চ শিক্ষার উপর আমলাতন্ত্র বহুকাল ধরেই বিরূপ। সার জর্জ্জ ক্যাম্‌বেল এক সময়ে উচ্চ শিক্ষার সংকোচ সাধনে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। লর্ড রিপন শিক্ষা কমিশন বসিয়ে এইরূপ মনো-বৃত্তির লাঘব ঘটাতে প্রয়াস পান। জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা উভয়েরই দ্রুত প্রসারের তিনি ব্যবস্থা করেন। কমিশনের মন্তব্য গ্রহণ করে তিনি জনশিক্ষার ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের হাতে দিলেন ও উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেশবাসীকে উৎসাহিত করলেন। কলকাতায় ও মফঃস্বলে অতঃপর বহু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড কার্জ্জন ১৯০২ সালে শিমলায় ইউরোপীয় শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে গোপনে একটি সভা করেন। এর অব্যবহিত পরেই বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপিত হয়। এতে প্রথমে একজনও হিন্দু সভ্য গৃহীত হয় নি। পরে এ নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হলে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদস্য নিয়োজিত করা হ'ল।

লর্ড কার্জ্জনের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের সঙ্গে শিক্ষিতমাত্রেই কমবেশী পরিচিত। কাজেই কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে নানারূপ আশঙ্কার উদ্রেক হ'ল। পাঁচ মাস পরে কমিশনের রিপোর্ট যখন বার হ'ল তখন তারা বুঝতে পারলে, উচ্চশিক্ষার মূলে আঘাত করাই লর্ড কার্জ্জনের উদ্দেশ্য। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধ মন্তব্য রিপোর্ট-ভুক্ত হ'ল বটে, কিন্তু সরকার তা আদৌ গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। সুরেন্দ্রনাথ সভাপতির অভিভাষণে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্কোচ-সাধনই যে লর্ড কার্জ্জনের এরূপ কমিশন স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য তা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। কংগ্রেসের একটী প্রস্তাবে কমিশনের মন্তব্যগুলির কথা এরূপ উল্লিখিত হয়—(১) যে সব দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হতে অক্ষম তাদের তুলে

দেওয়া ও নূতন দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপনে অনুমতি দান বন্ধ করা, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-বেতনের নিম্নতম হার বেঁধে দেওয়া, (৩) সমগ্র দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ধরণের শিক্ষা প্রবর্ত্তন, (৪) প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটি মাত্র কেন্দ্রীয় আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা, (৫) শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন বেসরকারী স্কুলকে মঞ্জুরি দান না করা, (৬) নির্ব্বাচনের বদলে সেনেটের অধিকাংশ সভ্যের সরকার কর্ত্তৃক মনোনয়ন ও এভাবে সেনেট ও সিণ্ডিকেটকে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অঙ্গীভূত করা।

কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, বিশেষ আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজগুলি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে অতঃপর ভারতব্যাপী তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। ভারত-গবর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলিকে এই মর্ম্মে এক আদেশপত্র পাঠাতে বাধ্য হলেন যে, আইন কলেজ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ যেন তুলে দেওয়া না হয়। কমিশনের সিদ্ধান্তের নিরিখে ১৯০৪ সালে 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস্ এ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটেরও বেশীর ভাগ সদস্যই সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হবেন স্থির হ'ল। বিচারপতি স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৮-১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি আইনের সীমা লঙ্ঘন না করেও এমন ভাবে সেনেট ও সিণ্ডিকেট গঠনে সরকারকে সাহায্য করলেন যাতে অন্ততঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেসরকারী মত অনুযায়ী সকল কাজ নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়েছে। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করবার প্রস্তাব বহু পূর্ব্বেই করেছিলেন। মনীষীশ্রেষ্ঠ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি

বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেন। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও এ আদর্শ পরে গ্রহণ করেছেন।

কি স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান, কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি অন্যান্য বিষয়—লর্ড কার্জ্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির জন্য ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর মূল অভিভাষণে ও উপসংহার-বক্তৃতায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি একান্ত ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে যুবকসমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিঃস্বার্থ দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিলেন। তিনি মূল অভিভাষণে বললেন, "স্বাধীনতার জয়পতাকা কেউ একদিনেই ওড়াতে পারে নি। স্বাধীনতা-দেবী বড়ই ঈর্ষ্যাপরায়ণা, তিনি তাঁর ভক্তমণ্ডলীর নিকট থেকে দীর্ঘকালের অবিশ্রান্ত সাধনা দাবি করেন। ইতিহাস পাঠ করুন। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাবার জন্য কিরূপ অফুরন্ত ধৈর্য্য, তিতিক্ষা ও নিঃস্বার্থ সাধনা প্রয়োজন এর কাছ থেকে তা জেনে নিন।" জাপান তখন প্রাচ্যের নবোদিত সূর্য্য। তার কথা উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "জাপানের দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে। তার ইতিহাস পাঠ করলে জাপানীদের আশ্চর্য্য আত্মত্যাগ, অদ্ভুত নিজস্ব-করণ ক্ষমতা. ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, অদম্য উৎসাহ ও লেগে-থাকা শক্তির কথা জান্‌তে পারবেন। কি ভাবে সংরক্ষণশীল প্রাচীর সঙ্গে প্রগতিশীল প্রতীচীর সংযোগ সাধন করা সম্ভব এশিয়ার সর্ব্বপ্রাচীন দেশ সর্ব্বনবীন দেশের নিকট থেকে তা শিক্ষা করুক।" এসব সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সম্পর্কের স্থায়িত্বই কামনা করলেন। তবে বর্ত্তমান স্বৈরাচার দূর করেই যে তা সম্ভব এ কথাও উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারেও কংগ্রেসে নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নবাব সৈয়দ মহম্মদ সাহেব বাহাদুর দেশসেবায় হিন্দু-মুসলমানের

সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন। মূল সভাপতি প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ অভিভাষণে স্বৈরাচারী শাসন-নীতির প্রতি ভারতবাসীর তীব্র মনোভাব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু, অন্যদিকে ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত দিল্লী দরবারে জলের মত অজস্র অর্থব্যয়—তিনি এই মর্ম্মান্তিক তামাসার কঠোর সমালোচনা করলেন। ব্রিটিশ আমলে ভারতে গৃহ-যুদ্ধ প্রশমিত হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর মতে "গৃহ-যুদ্ধ ও অরাজকতার ফলে যেমন একসময় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘট্‌ত, এখনও তেমনি দুর্ভিক্ষে ও অনশনে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘট্‌ছে; কাজেই ভারতবাসীর কাছে এ দুটোর ভিতরে তেমন কোনই প্রভেদ নেই।" কংগ্রেসের মধ্যে যে এক নূতন দলের সৃষ্টি হয়েছে লালমোহন অভিভাষণে তা স্বীকার করলেন, এবং গণতন্ত্রমূলক আদর্শে কার্য্য করতে গিয়ে যাতে আমরা স্বৈরাচারী না হই এজন্য সকলকে অনুরোধ জানালেন। তিনি ইউনিভার্সিটি বিল, অফিসিয়াল সিক্রেট্‌স্ বিল, মাদ্রাজ মিউনিসিপাল বিল, প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইনগুলির বিষয় ও ব্রিটিশের নির্ম্মম অবাধ-বাণিজ্যনীতির ফলে দেশীয় শিল্পের ধ্বংসের কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। বঙ্গবিচ্ছেদের যে চেষ্টা সুরু হয়েছে তারও তিনি আভাষ দেন। এ বক্তৃতাটি কংগ্রেসের প্রবীন নেতাদের মনঃপুত না হলেও নবীন দল এ দ্বারা বিশেষ উৎসাহিত হন। তিনিই এই অভিভাষণে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীর অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

সরকারী নীতি ক্রমশঃ কঠোর হতে কঠোরতর হলেও কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি পূর্ব্ববৎ মামুলি ধরণেরই রইল। লর্ড কার্জ্জন ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনের ঘোর বিরোধী। শাসকবর্গের

স্বৈরাচার অটুট রাখ্‌বার জন্য তিনি 'অফিসিয়াল সিক্রেট্‌স্' আইন ব্যবস্থা পরিষদে পাস করিয়ে নেন্। এ আইন বলে তিনি সরকারী নীতি ও কার্য্যগুলির অধিকাংশকেই গোপনীয় ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এসব বিষয় প্রকাশ বে-আইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হ'ল। এর প্রতিবাদেও কংগ্রেসে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পর বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় বোম্বাইয়ে। কার্জ্জনী আমলের স্বৈরাচার শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে এক আশ্চর্য্য প্রেরণা জাগায়। তাই এবারে কংগ্রেসের প্রতিনিধি-সংখ্যা হাজারের উপরে গিয়ে পৌঁছে। ১৮৯৫ সালের পরে প্রতিনিধি-সংখ্যা এত বেশী আর কখনও হয় নি। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ফিরোজ শা মেহ্‌তা ও মূল সভাপতি সার হেন্‌রি কটন। সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণ ও পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ স্যামুয়েল স্মিথ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। ফিরোজ শা মেহ্‌তা কংগ্রেসের ভিতরে দুটি দলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ও বলেন যে, যতদিন ভারতবাসীর অভিযোগসমূহ নিরাকৃত না হবে ততদিন দু'দল থাক্‌বেই। কংগ্রেস উইলিয়ম ডিগ্‌বী ও জামশেঠজী নাজিরবানজী টাটার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন।

মূল সভাপতি সার হেন্‌রি কটনের বিষয় আমরা আগেই কিছু কিছু জান্‌তে পেরেছি। তাঁর উর্দ্ধতন ও অধস্তন চার পুরুষ কোম্পানীর ও ব্রিটিশ-রাজের আমলে ভারতবর্ষে সিবিলিয়ানী চাকরী করেন। সার হেনরী ছিলেন প্রকৃত ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষ। তিনি ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলনের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করায় স্বজাতীয়দের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তিনি চাকরি-জীবনের শেষ দিকে আসামের চীফ কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে চা-বাগানের শ্রমিকদের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের প্রতিবন্ধকতায় তাতে সাফল্য

লাভ করেন নি। কটন সাহেবের বঙ্গের ছোটলাট হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ায় তাঁর পদোন্নতিতে বিঘ্ন ঘটে। তিনি ১৯০৩ সালে কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে বিলাত যান ও পর বছর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান কমিটির প্রেসিডেণ্ট হন। ভারতবাসীরা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ কটন সাহেবকে কংগ্রেসের বিংশতি অধিবেশনে সভাপতি পদে অভিষিক্ত করলে।

কটন তাঁর উদ্বোধন বক্তৃতায় ভারতবর্ষের ভাবী শাসনপ্রণালী সম্পর্কে বলেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শেই ভারত-রাষ্ট্র গঠিত হবে। প্রত্যেকটি প্রদেশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে একটি ফেডারেশনে সম্মিলিত হবে। ("a Federation of free and separate States, the United States of India")। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ সম্পর্কে তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করেন। পরে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে যে ভাবে নূতন প্রদেশ গঠিত ও শাসন ব্যবস্থা নির্ণাত হয় তা তাঁরই প্রস্তাবের অনুগ। তিনি বলেন, একজন ছোটলাটের পক্ষে বঙ্গের মত বড় প্রদেশ (তখন বিহার-উড়িষ্যা এর অন্তর্গত ছিল) শাসন দুঃসাধ্য হলে হয় বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত বাংলার শাসনভার সকৌন্সিল গবর্ণরের উপর প্রত্যর্পণ করা হোক্, নতুবা অ-বঙ্গভাষী বিহারকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হোক্। কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু তখন এর কোনটিই না করে প্রথমে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে মিলিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে চেয়েছিলেন! পরে অবশ্য তাঁদের উদ্দেশ্য আরও ব্যাপক হয় অর্থাৎ ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে নূতন প্রদেশ গঠন করা হয়।

১৯০৪ সালে লর্ড কার্জ্জনের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চরমে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ করে তিনি ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির

স্বাধীনতা হরণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্যগণ সরকার মনোনীত হলেও এযাবৎ তাঁরা ছিলেন আজীবন সদস্য। অতঃপর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সরকার এই সব সদস্য মনোনীত করবেন স্থির হ'ল।

লর্ড কার্জ্জন একটি সরকারী প্রস্তাবে স্থির করেন যে, শাসনকার্য্য সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত করতে হলে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিকসংখ্যক ইউরোপীয় নিযুক্ত করা আবশ্যক। তিনি এই প্রসঙ্গে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ভারতীয়েরা উচ্চ দায়িত্বশীল পদের অযোগ্য! তিনি ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টীয় বিধি ও ১৮৫৮ সালের মহারাণীর ঘোষণা উভয়ের গুরুত্বই অস্বীকার করতে প্রয়াস পেলেন। এবারকার অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি হিসাব করে দেখালেন যে, যে-সব পদের বেতন হাজার টাকা ও তার উপর, সে-সব পদে শতকরা মাত্র চৌদ্দ জন, আর পাঁচ শ' টাকার পদগুলিতে শতকরা মাত্র সতর জন ভারতবাসী নিয়োজিত!

কার্জ্জনী আমলে ভারতীয় অর্থে সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতি পূর্ণোদ্যমে অনুসৃত হতে থাকে। তিনি ১৯০৩-০৪ সালে তিব্বতে 'ব্রিটিশ মিশন' নামে একটি বিজয় অভিযান প্রেরণ করেন। এর প্রতিবাদে প্রস্তাব উত্থাপন করে এন এ ওয়াদিয়া বলেন, "তিব্বতের কৃষকগণ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য শক্তিমান্ শত্রুর বিরুদ্ধে এমন ভাবে লড়েছে যাতে তাদের পবিত্র স্বদেশপ্রেম, অদম্য-স্বাধীনতা-প্রীতি ও বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করবার প্রশংসনীয় উদ্যম প্রকাশ পেয়েছে।" সার্ বলচন্দ্র কৃষ্ণ একটি প্রস্তাবে ভারত-সচিবের বেতন ও তাঁর কৌন্সিলের ব্যয়ভার ভারত-সরকারের বদলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বহন করতে অনুরোধ জানান। ভারত-সচিবের স্বৈরাচারী হবার একটি প্রধান কারণ—তাঁর বেতনের জন্য কি ব্রিটেন

কি ভারতবর্ষ কারও নিকট তাঁকে জবাবদিহি করতে হয় না। বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

বিলাতে এই সময় সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন হয়। ভারত-বন্ধু সার উইলিয়ম ওয়েডারবর্ণের প্রস্তাবে ও বালগঙ্গাধর তিলকের সমর্থনে স্থির হ'ল যে, ভারতের অবস্থা ব্রিটিশ জনসাধারণকে বুঝাবার জন্য কংগ্রেস থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। তিলক এই প্রসঙ্গে বলেন, ভারত-সরকার যখন তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন না তখন বিলাতের জনমতই একমাত্র ভরসা। এই প্রস্তাব অনুসারেই লালা লজপৎ রায় ও গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে বিলাতে প্রেরিত হয়েছিলেন। লালা লজপৎ রায় এ সময়ে একবার আমেরিকায়ও গমন করেন। লালাজী বিলাত থেকে ফিরে এসে এই মত প্রকাশ করলেন যে, বিলাতের লোকেরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, সেখানে জনমত গঠনের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় বৃথা। স্বদেশে বসেই ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গোখ্‌লে মহোদয় এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে 'সার্ভেণ্ট অফ্‌ দি ইণ্ডিয়া সোসাইটী' বা ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশের অধীন থেকে ভারতবাসীর নৈতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন এই সমিতির লক্ষ্য। লালা লজপৎ রায়ও বহু বছর পরে 'সার্ভেণ্ট অফ্‌ দি পিপ্‌ল্‌ সোসাইটি' নামে অনুরূপ একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন।

———

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী-ব্রত উদ্‌যাপন

লর্ড কার্জ্জন ১৯০৫ সালের শেষে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে বিলাত চলে যান। লর্ড কিচেনারের সঙ্গে মতদ্বৈধতাই তাঁর এই পদত্যাগের একমাত্র কারণ। জঙ্গীলাট বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য এবং দেশরক্ষা-বিভাগের কর্ত্তা। কিন্তু এ বিষয়ে বড়লাটের পরামর্শদাতা ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বড়লাটকে কোন কথা জানাতে হলে এঁর মারফতই জানাতে হ'ত। লর্ড কিচেনারের এ ব্যবস্থা মোটেই পছন্দসই ছিল না। এ ব্যবস্থা রদ করে জঙ্গীলাটকেই আইনতঃ বড়লাটের পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ভারত-সচিবকে তিনি এক পত্র লেখেন। লর্ড কার্জ্জন পূর্ব্ব ব্যবস্থারই পক্ষপাতী। কাজেই, ভারত-সচিব যখন লর্ড কিচেনারের মতেই সায় দিলেন তখন তাঁর পদত্যাগ করা ছাড়া উপায়ন্তর রইল না।

লর্ড কার্জ্জনের স্বৈর-শাসনের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি। তাঁর আমলে পুলিশ কমিটি নিয়োজিত হয়। এ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী তিনি পুলিশ আইন বিধিবদ্ধ করান। গোয়েন্দা বিভাগ এই সময়েরই সৃষ্টি। পাঁচ শ' টাকার বদলে হাজার টাকার উপরে আয়কর নির্দ্ধারণ, লবণ কর হ্রাস, পুরাতন মন্দির রক্ষা, সমবায় সমিতি প্রভৃতি আইন দ্বারা ভারতবাসী কম উপকৃত হয় নি, কিন্তু তিনি ভারতবাসীদের নিম্ন-স্তরের জীব বলেই মনে করতেন ও ইংরেজের সমান মর্য্যাদা দিতে বরাবরই কুণ্ঠিত ছিলেন। ১৯০৫ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে লর্ড কার্জ্জন চ্যান্সেলার রূপে একটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সমগ্র এশিয়াবাসীকে মিথ্যাবাদী, অসাধু ও কপটতাপ্রিয় বলে

আখ্যা দেন। ভগিনী নিবেদিতা এ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। নিবেদিতা-রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সম্প্রদায় ভুক্তা বিদুষী ও মহীয়সী মহিলা। তাঁর পূর্ব্ব নাম মিস্ মারগারেট নোবেল। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সংস্কৃত ও ললিত কলার ব্যাখ্যায় তিনি সর্ব্বদা নিরত ছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের ঐরূপ দাম্ভিক নির্লজ্জ মিথ্যা উক্তিতে নিবেদিতা হৃদয়ে খুবই ব্যথা পান ও কার্জ্জনের 'প্রব্লেম্স্ অফ্ দি ফার ঈষ্ট'—গ্রন্থ থেকে এক উক্তি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দেন, লর্ড কার্জ্জন নিজেই কিরূপ অনৃতবাদী! কার্জ্জনের উক্তির প্রতিবাদে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে পরবর্ত্তী ১০ই মার্চ্চ কল্‌কাতা টাউন হলে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। রাসবিহারী তাঁর অভিভাষণে কার্জ্জনের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন।

দীর্ঘ সাত বছরের স্বৈর-শাসনে ভারতবাসী উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল খুবই, কিন্তু যাবার বেলা লর্ড কার্জ্জন বাঙালীকে এমন এক আঘাত দিয়ে যান যার ফলে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল আন্দোলিত হতে থাকে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে জল্পনা বহুদিন পূর্ব্বেই স্নুরু হয়। কংগ্রেস এর প্রতিবাদে ১৯০৩ ও ৪ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লর্ড কার্জ্জনের নির্দ্দেশে বঙ্গের ছোটলাট নূতন প্রতিষ্ঠিত ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন বা জমীদার সভা আহ্বান করে তাদের এর মর্ম্ম বুঝিয়ে দিলেন। স্বয়ং পূর্ব্ব বাংলা ভ্রমন করে জমীদার ও প্রজাদের এ সম্পর্কে অনেক কথা বল্‌লেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় মুসলমান ছাড়া কেউই তাঁর এ প্রস্তাবে রাজি হননি। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমীদার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁকে মুখের উপরই বলেছিলেন, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ হলে বাঙালীরা সেজন্য প্রাণপণে লড়তেও দ্বিধা করবে না। এর পর কিছুকাল সব চুপচাপ থাকে। অকস্মাৎ একদিন শোনা গেল, বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কার্য্যে ভারত-সচিব

সম্মতি দান করেছেন! সে দিন ছিল ২০শে জুলাই, ১৯০৫। রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং বাকী অংশ—প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বর্দ্ধমান বিভাগ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলাদেশ নামে পরিচিত হ'ল! তিনি বঙ্গ ভঙ্গ করে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিলেন। বাঙালী জাতি রাজনীতিতে ও শিক্ষায় অগ্রসর ও সমগ্র ভারতে নেতৃস্থানীয়। এই জাতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তার নেতৃত্ব ক্ষমতাও ঘুচে যাবে, ভারতবাসীর প্রগতিমূলক আন্দোলনেও ভাটা পড়বে। অন্য উদ্দেশ্য ছিল আরও মারাত্মক – হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদ্রেক। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ সফরকালে মুসলমানদের বুঝিয়েছিলেন, নূতন প্রদেশ গঠিত হলে পূর্ব্ববঙ্গে তাদেরই প্রাধান্য হবে। পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত থাক্‌লে সরকারে প্রতিপত্তি লাভে তাদের কোনই সুবিধা হবে না। ঢাকার নবাব ও অন্যান্য মুসলমান প্রধানেরা কেউ কেউ প্রথমে বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে আপত্তি করলেও শেষ পর্য্যন্ত কার্জ্জনের কথায় ভুলে তাঁরই মতানুবর্ত্তী হয়েছিলেন। নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট সার্ ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার কার্জ্জনের এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করতে সবিশেষ তৎপর হন। তিনি প্রকাশ্যে বহু স্থলে বলেছিলেন, তাঁর হিন্দু মুসলমান দুই স্ত্রী—হিন্দু দুয়ো রাণী —অবহেলিতা ও নিন্দিতা, আর মুসলমান সুয়ো রাণী—প্রণয়াস্পদা ও সবিশেষ অনুরাগিনী!

বঙ্গভঙ্গের বার্ত্তা শুনে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বত্র বাঙালী-প্রাণ ভীষণ উদ্বেলিত হয়ে উঠে, ফলে যে আন্দোলন উপস্থিত হ'ল বাঙলার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কার্জ্জনের তীব্র কঁশাঘাতে বাঙালীর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল ও সমগ্র শক্তি বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে নিয়োজিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ নব পর্য্যায় বঙ্গদর্শনে লিখ্‌লেন:

"বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আমরা সচেতন ভাবে অনুভব করিব যে, বাঙ্গালার পূর্ব্ব পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহু পাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব্ব পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে। জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে। আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। বিধাতার রুদ্র মূর্ত্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার এক মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও অভাব ; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।"

কল্‌কাতায় ও মফস্বলস্থ বিভিন্ন শহরে বাঙালীরা সভা-সমিতি করে প্রতিজ্ঞা করলেন, এ ব্যবস্থার প্রতিকার করতেই হবে। কিন্তু হীনবল জাতির পক্ষে কি উপায় অবলম্বন সম্ভব! স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় দেশের জনসাধারণকে একটি উপায় এইরূপ বাৎলে দিলেন। তারা যেন সকলে প্রতিজ্ঞা করে—"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোনও বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য্য করিতে যদি কোন আর্থিক বা অন্য কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না, বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের এই শুভ সঙ্কল্পে সহায় হউন।"

তড়িৎ গতিতে এই বাণী বাংলার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হ'ল। জনগণ সভা-সমিতি করে বিলাতী দ্রব্য 'বয়কট' বা বর্জ্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলে। এই 'বয়কট' কথাটির কিন্তু একটী চমৎকার ইতিহাস আছে। এ কথাটি প্রথম আয়ার্লণ্ডে ব্যবহৃত হয়। ক্যাপ্টেন চার্লস কানিংহাম বয়কট (১৮৩২-৯৭) আয়ার্লণ্ডের এক ইংরেজ জমিদারের প্রতিনিধি রূপে কাজ করতেন। ১৮৮০ সালে প্রজারা যে হিসাবে খাজনা দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। এর ফলে ক্যাপ্টেন বয়কটকে তারা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করে। ভৃত্যরা তাঁকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা পত্র আদান প্রদান ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে, তাঁর গৃহ প্রাচীরও ভেঙ্গে দেয়। বয়কটের যখন এইরূপে জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত তখন ব্রিটিশ সরকার সৈন্যদল পাঠিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। 'বয়কট' কথাটির পরে বহুল প্রচার হয়েছে। বিদেশী দ্রব্যাদি বর্জ্জনকেও এই বয়কট আখ্যা দেওয়া হয়। চীনে এসময়ের কিছু পূর্ব্বে মার্কিনী দ্রব্যাদি সার্থক ভাবে বয়কট করা হয়েছিল।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্বদেশভক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথায়" লিখলেন, "মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। শাঁখা থাক্‌তে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পরশীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক।"

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন সঙ্কীর্ত্তনপ্রিয় বাঙালীকে সঙ্কীর্ত্তন শুনালেন।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়,
মাথায় তুলে নেরে ভাই!

দীন দুখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।
সেই মোটা সুতার সঙ্গে,
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা এম্‌নি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।
ওই, দুঃখী মায়ের ঘরে,
তোদের সবার প্রচুর অন্ন নাই;
তবু, তাই বেচে কাচ সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয়রে আমরা মায়ের নামে,
এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই,
পরের জিনিষ কিন্‌ব না,
যদি মায়ের ঘরের জিনিষ পাই।"

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ, সর্ব্বত্র অন্ততঃ হাজার জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল ও সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রস্তাব করা হ'ল। ৭ই আগষ্ট তারিখে কল্‌কাতা টাউন হলে এক বিরাট্‌ জনসভায় মফস্বলের বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হয় যে, ভারত-শাসনের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের ঔদাসীন্য ও জনমতের প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের উপেক্ষা তাদের এই পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছে। প্রস্তাব উত্থাপন করেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক বয়োবৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেন।

বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে বিলাতা বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হতে লাগ্‌ল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কান্তকবি রজনীকান্ত

সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির রচিত সঙ্গীত; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রবন্ধ ও যশস্বী গায়ক [illegible]কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতবিশারদ হেমচন্দ্র সেন, প্রভৃতির গানে বাঙালী উদ্বোধিত হ'ল। কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রেমতোষ বসু, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতায় বঙ্গসন্তান মেতে উঠ্‌ল। সরকার হিন্দু সমাজ থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। তথাপি বহু বিশিষ্ট মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে মনে প্রাণে যোগ দিলেন। ঢাকার নবাব শলিমুল্লার ভ্রাতা আকাতুল্লা বাহাদুর স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণ সমর্থন করেন। ব্যারিষ্টার আব্‌দুল রসুল, মৌলবী আবুল কাসেম, আবুল হোসেন, দেদার বক্স, দীন মহম্মদ, আবদুল গফুর সিদ্দিকী, লিয়াকৎ হোসেন, ইস্‌মাইল সিরাজী, আবদুল হালিম গজনবী প্রভৃতি বিখ্যাত মুসলমানগণ দিকে দিকে স্বদেশীর বার্ত্তা প্রচার করতে লাগলেন। দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজ, জমিদার সমাজ ও নারী সমাজ স্বদেশীর প্রেরণায় একেবারে মাতোয়ারা হলেন। বিলাতী বর্জ্জনকে সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য নানা সমিতি ও সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার ব্রতী সমিতি, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় ও ভবানীপুর-কালীঘাট অঞ্চলের সন্তান সম্প্রদায়, চিত্তরঞ্জন দাশের ভবনে স্থাপিত স্বদেশী মণ্ডলী এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত কল্‌কাতার ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবও স্বদেশী মন্ত্র প্রচারে অগ্রণী হলেন। মফস্বলের সমিতিগুলির মধ্যে বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি ও ময়মনসিংহের সুহৃৎ সমিতি স্বদেশী প্রচারে বিশেষ অবহিত হন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ডন সোসাইটি ও তার মুখপত্র

'ডন' পত্রিকার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। বাঙালী যুবকদের মনে স্বদেশী ভাব জাগাতে, বঙ্গভঙ্গের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব থেকেই এ বিশেষ সাহায্য করছিল।

সরকার ঘোষণা করলেন, ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্য সমাধা হবে। অমনি দিকে দিকে এই দিনটিকে ক্ষোভ ও দুঃখের প্রতীক করে তোল্‌বার জন্য নেতৃবর্গ আয়োজন স্থুরু করলেন। এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ 'রাখী-বন্ধন' ও রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশের জন্য 'অরন্ধন' পালন করবার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হ'ল। সুরেন্দ্রনাথ 'অখণ্ড বঙ্গভবন' প্রতিষ্ঠার আয়োজন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তিনি পূর্ব্বে প্যারিসের 'হোটেল দ্য ইন্‌ভ্যালিড'-এ ফ্রান্সের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতীক স্বরূপ এক একটি মূর্ত্তি দেখেছিলেন। আল্‌সেস লোরেন ওসময়ে ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে তার প্রতীককে বস্ত্রাবৃত করে রাখা হয়েছিল। কল্‌কাতায় এরূপ একটি ভবনে প্রতিটি জেলার প্রতীক স্বরূপ এক একটি মূর্ত্তি থাক্‌বে ও যতদিন বিচ্ছিন্ন জেলাগুলি আবার বঙ্গের সঙ্গে যুক্ত না হবে ততদিন সে-সবের প্রতীক বস্ত্রাচ্ছাদিত করে রাখা হবে। সুরেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাব ভগিনী নিবেদিতা ও ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত সাগ্রহে সমর্থন করেছিলেন। ঐ দিনেই এই ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল।

বঙ্গভঙ্গ কার্য্য বাঙালীর হৃদয়তন্ত্রীতে কত গভীর আঘাত দিয়েছিল এদিনের প্রতিপাল্য কর্ম্মপদ্ধতিতে তা সুপ্রকট। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন,—শোকচিহ্ন স্বরূপ ৩০শে আশ্বিন শিশু ও রোগী ব্যতীত, কেউই অন্নজল গ্রহণ করবেন না এবং সকলেই সেদিন খালি পায়ে থাক্‌বেন। কোন বাঙালীর ঘরে চুলি জ্বল্‌বে না। ব্যবসা

বাণিজ্য সব বন্ধ থাক্‌বে, রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ী চল্‌বে না। দোকান পাট ও বাজারও বন্ধ রাখার কথা হয়। আরও কথা থাকে যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব থেকে কল্‌কাতার উত্তর হতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে যুবকগণ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত করতে করতে গঙ্গার ধারে সমবেত হয়ে তথায় স্নান করে বীডন স্কোয়ার ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সমবেত হবে। প্রথমত, সেখানে রাখী বন্ধন ও বঙ্গবিচ্ছেদ জনিত প্রাণের ক্লেদ ও সঙ্কল্প প্রকাশ, দ্বিতীয়ত, অপার সার্কুলার রোডে অপরাহ্ন কালে এক বিরাট্ সভার অনুষ্ঠান এবং গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীদের যে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি তার চিহ্ন স্বরূপ ঐ সভাস্থল ক্রয় ও তদুপরি অখণ্ড বঙ্গভবন নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা, তৃতীয়ত, বাগবাজার ষ্ট্রীটে পশুপতি বসুর বাটীতে সন্ধ্যাকালে আর একটি জনসভা হবে। শেষোক্ত স্থলে স্বদেশী বস্ত্র উৎপাদনের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করার কথাও হয়।

এই কার্য্যক্রম কল্‌কাতার বাঙালী সমাজ নীরবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেদিন সর্ব্বত্র হরতাল—কাজ কর্ম্ম, গাড়ী চলাচল সবই বন্ধ। 'রাখী বন্ধন' এর মিলন মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ রচিত এই 'রাখী সঙ্গীতে' সহস্র কণ্ঠে গীত হ'ল,

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পুণ্য হউক্ পুণ্য হউক্
পুণ্য হউক্ হে ভগবান—
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক্ পূর্ণ হউক্
পূর্ণ হউক্ হে ভগবান—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক্ সত্য হউক্
সত্য হউক্ হে ভগবান—
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক্ এক হউক্
এক হউক্ হে ভগবান।

এই গানটিও সঙ্গে সঙ্গে গীত হ'ল,

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
ততই বাঁধন টুট্‌বে—
মোদের ততই বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে—
ততই মোদের আঁখি ফুট্‌বে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই,
স্বপ্ন দেখার সময় ত নাই ;
এখন ওরা যতই গজ্জাবে ভাই,
তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে—
মোদের তন্দ্রা ততই ছুট্‌বে।

* * *

গঙ্গাস্নানান্তে বীডন উদ্যানে ও সেণ্ট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে রাখী উৎসব সম্পন্ন হ'ল। অপরাহ্ণে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে অখণ্ড বঙ্গভবন স্থাপন উদ্দেশ্যে

সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। স্বদেশগত-প্রাণ, সর্ব্বজনপ্রিয় নেতা আনন্দমোহন বসু তখন রোগশয্যায়। অল্পকাল মধ্যেই এই রোগশয্যা মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়েছিল। তিনি একরকম মৃত্যুশয্যা থেকে এসে এই সভার সভাপতিত্ব করলেন। আরাম কেদারায় করে তাঁকে সভাস্থলে আনা হ'ল। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারপতি কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস্‌চ্যান্সেলার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সার্‌ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দমোহনকে সভাপতির আসন গ্রহণের প্রস্তাব করে বঙ্গভঙ্গের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, বঙ্গভঙ্গ কার্য্য বাঙালী মাত্রেরই মর্ম্মস্থলে যে ভীষণ আঘাত করেছিল সার্‌ গুরুদাসের বক্তৃতাই তাঁর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পঞ্চাশ হাজার লোকের বিপুল 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ আনন্দ-মোহনের অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণ পাঠের পর আনন্দমোহন বসু স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র পঠিত হয়। ঘোষণা পত্রটি ইংরেজীতে পাঠ করেন ব্যারিষ্টার ও পরবর্ত্তী কালে কল্‌কাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সার্‌ আশুতোষ চৌধুরী ও বাংলায় পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঘোষণা পত্রটি এই—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengalee Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power, to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us." A. M. Bose.

বাংলা—

"যেহেতু বাঙালী জাতির সর্ব্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেণ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করা সঙ্গত বোধ করিয়াছেন, সেহেতু আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙালী জাতি, আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব। বিধাতা আমাদের সহায় হউন।"

পশুপতি বসুর গৃহ-প্রাঙ্গনে সন্ধ্যায় সভা হ'ল। প্রায় এক লক্ষ লোক সভায় যোগদান করে। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত কল্পে একটি ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য সভাস্থলে অর্থ যাচ্ঞা করা হয়। জনগণ মুদ্রা বৃষ্টি করতে থাকে ও অল্পকাল মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা উঠে। এর পরে আরও কুড়ি হাজার টাকা আদায় হয়েছিল। এ অর্থ থেকে ২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কয়েক শ' চরকাও কেনা হ'ল। এ বিদ্যালয় কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। উক্ত টাকার একটা মোটা অংশ ব্যয়ের পর বিদ্যালয় তুলে দেওয়া হয়। ভারত-সভার কর্তৃত্বাধীনে অবশিষ্ট টাকা থেকে বিভিন্ন বয়ন-বিদ্যালয়ে এখনও অর্থ সাহায্য করা হয়।

প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলেও স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গে ব্যবসায় ও শিল্পে এক নবযুগের সূচনা করলে। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল, বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্ক, নেশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরী, ষ্টীল ট্রাঙ্ক ফ্যাক্টরী, ট্যানারী ফ্যাক্টরী, হিন্দুস্থান ও নেশন্যাল বীমা কোম্পানী প্রভৃতি বহু শিল্প-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই উদ্ভূত। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল নামক ঔষধ প্রস্তুতির কারখানা স্বদেশী যুগে বাঙালীকে 'স্বদেশী' করতে কম সাহায্য করে নি।

স্বদেশীর ভাব-বন্যায় শহর পল্লী কখন যে প্লাবিত হয়ে গেল কেউ তা টেরও পেলে না। বাঙালীর এই আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা আত্ম-বিশ্বাসের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মনস্বীরা নিজেদের ভিতরেই শক্তির সন্ধান করতে লাগলেন। সাধারণের নিকট এই নব ভাব প্রচারের পক্ষে সংবাদপত্রই উৎকৃষ্ট বাহন। ইংরেজী অমৃতবাজার পত্রিকা ও বেঙ্গলী আর বাংলা সঞ্জীবনী ও হিতবাদী এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেন বটে, কিন্তু আরও কয়েকটি প্রধান পত্রিকা নব ভাবের বাহন হয়ে পর পর প্রকাশিত হ'ল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা 'নবশক্তি'তে ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'য় নব ভাব প্রচার করতে সুরু করেন। ব্রহ্মবান্ধব সর্ব্ব প্রথম ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে খ্রীষ্টান হন, কিন্তু ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের দিকেই তাঁর মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। তাঁর জাতীয়তার ভিত্তিও ছিল এই হিন্দুত্ব। তিনি ইংরেজী দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'সোফিয়া' নামে ইংরেজী পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভেই তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা 'সন্ধ্যা' সম্পাদনে নিয়োজিত করলেন। তাঁর শিক্ষায় বাঙালী আত্মস্থ হ'ল। ব্রহ্মবান্ধব বাংলাদেশে আত্মশক্তি উন্মেষের নায়ক। ভারতবর্ষের উন্নতি ভারতবাসীরই সাধ্য—এই কথা তিনি অতি সহজ ভাষায় সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে সর্ব্বসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও যে ভিক্ষাবৃত্তি নিষ্ফল এই কথাও তিনি সকলকে শোনান। ব্রহ্মবান্ধব বঙ্গের চরমপন্থী দলের অন্যতম স্রষ্টা। তিনি ইংরেজের শাসন স্বীকার করতেন না। ব্রহ্মবান্ধব রাজদ্রোহের দায়ে ১৯০৭ সালে সরকার কর্ত্তৃক ধৃত হলেন। আদালতে তাঁর বিচার আরম্ভ হলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন। এদিক দিয়ে তিনিই ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম অসহযোগী।

উপাধ্যায় বলেছিলেন, তাঁকে কারাবদ্ধ করা ব্রিটিশের সাধ্যাতীত। বস্তুতঃ তিনি হাজতবাস কালেই মারা যান।

স্বদেশী আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—বঙ্গের দিকে দিকে এর স্বাভাবিক অতি-বিস্তৃতি। বঙ্গের এমন জেলা নেই, এমন জনপদ নেই যেখানে স্বদেশীর ভাবে লোক অনুপ্রাণিত হয় নি। রাজসাহী, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম সকল অঞ্চল স্বদেশী ভাবে প্লাবিত ও পরিশোধিত হ'ল। ছাত্র ও যুবক সমাজ মেতে উঠল সকলের চেয়ে বেশী। একান্ত করে তাদের চেষ্টাতেই সর্ব্বত্র বিলাতী বর্জ্জন সার্থক হয়ে উঠ্‌ল। শাসকবর্গের সজাগ দৃষ্টি এদিকে পড়তে মোটেই বিলম্ব হ'ল না। তাঁরা নানাস্থানে, বিশেষ করে রংপুর, ঢাকা ও মাদারিপুরে ছাত্র দলন আরম্ভ করলেন। স্বদেশী আন্দোলন থেকে ছাত্র সমাজকে সরিয়ে রাখ্‌বার জন্য ভারত-সরকার রিজ্‌লি সার্কুলার, বাংলা সরকার কার্লাইল সার্কুলার ও পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম সরকার লায়ন সার্কুলার প্রচার করেন। এতেও যখন বিশেষ ফল হ'ল না তখন ছাত্র দলন সুরু হ'ল। রংপুর ও ঢাকার বহু ছাত্রকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কাউকে কাউকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। এদিকে কল্‌কাতায় এত সব সার্কুলারের ছড়াছড়ি দেখে যুবক সমাজ এন্টি-সার্কুলার সোটাইটি গঠন করলেন। এর সভাপতি হলেন প্রবীণ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও সম্পাদক নবীন শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। এ সোসাইটির সভ্য ছাত্রগণ বিলাতী বর্জ্জন আন্দোলন প্রবলভাবে চালাতে লাগ্‌লেন। এঁরাই প্রথমে বড়বাজারে বিলাতী বস্ত্রের দোকানে 'পিকেটিং' বা ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেন। যাহোক্, মফস্বলের ও কল্‌কাতার নির্যাতিত ও বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য শীঘ্রই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা সুরু হ'ল। ১৯০৫, ৯ই নবেম্বর তারিখে পান্তির পাঠে (অধুনা এখানে

বিদ্যাসাগর কলেজ হোষ্টেল অবস্থিত) যে সভা হয় তাতে সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এক লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। তাঁর এই মহৎ দানের জন্য মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিলেন। ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী ও মুক্তাগাছার জমিদার মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন।

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন এত প্রবল ও তীব্র হয়ে উঠে যে সরকার একে একটি 'প্রোক্লেম্‌ড্‌ ডিষ্ট্রীক্ট বা 'আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী' অঞ্চল বলে ঘোষণা করলেন। বস্তুতঃ বরিশালবাসীর একনিষ্ঠ কর্ম্ম-তৎপরতায় স্বদেশী আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে। বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের কথা আগে আমরা বহুবার পেয়েছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৮০ সাল থেকে নিজ জেলা বরিশালকেই তিনি কর্ম্মকেন্দ্র করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে 'ভারত-গীতি' রচনা করে দেশবাসীর মনে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বাবলম্বন শক্তি জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন। বরিশালে ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। এখানে অধ্যাপনার ভিতর দিয়ে ছাত্র-সমাজে তিনি ঐ মন্ত্রই বিশেষ করে প্রচার করেন। কাজেই প্রথম আহ্বানেই একদল নিষ্ঠাবান্, ত্যাগী, সাহসী কর্ম্মী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকবৃন্দও তাঁর কার্য্যে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করলেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র ও ছাত্রদের অভিভাবকদের মনে স্বদেশী কিরূপ দৃঢ়নিবদ্ধ হয়েছিল একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই তা সম্যক্ উপলব্ধি হবে। বাখরগঞ্জ জেলার মত ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুল সরকার কর্ত্তৃক 'চিহ্নিত' হয়েছিল। শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রবেশিকা

পরীক্ষায় ও কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু উভয় বারেই তিনি সরকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন। অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায় স্বদেশ বান্ধব সমিতি নিয়মিতভাবে স্বদেশী প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন। মুকুন্দ দাস স্বদেশী গানে বরিশালবাসীকে মাতিয়ে তুললেন। অশ্বিনীকুমারের অন্যতম সহযোগী মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এই গানটি রচনা করে এই সময় গাইলেন,

"ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী, বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর প'রো না।
জাগ গো ভগিনী! ও জননী!
মোহের ঘোরে আর থেকো না।
কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে মেখো না;
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্ম্ম সাক্ষী,
জগৎ ভরে আছে জানা।
চটকদার কাচের বালা ফুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে সাজে না!
নাই বা থাক্ মনের মতন—স্বর্ণভূষণ,
তাতে ত দুঃখ দেখি না।
সিঁথিতে সিন্দুর ধরি, বঙ্গনারী,
জগতে সতী-শোভনা!
বলিতে লজ্জা করে—প্রাণ বিদরে
বার লাখের কম হবে না—
পুঁতির কাচ ঝুঠা মুক্তায় এই বাঙ্গালায়
দেয় বিদেশে, কেউ জানে না।

ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা—
"উঠ আমার যত কন্যা !
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।
আমি যে অভাগিনী—কাঙ্গালীনি,
দুই বেলা অন্ন জুটে না ;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম—
মা যে তোরা ভাবিলি না !"

কবির আহ্বানে নারী সমাজ আশ্চর্য্য সাড়া দিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রমুখ পাঁচ জন নেতা বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের জন্য এক অনুরোধ-পত্র প্রচার করলেন। বরিশালের কোথাও এক কাঁচ্চা মূল্যেরও বিদেশী দ্রব্য বিকোল না। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার বরিশালবাসীর এই প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে দেবার উদ্যোগ আয়োজন করলেন। বরিশাল শহরে, বানরিপাড়া কেন্দ্রে ও অন্যান্য স্থানে গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করা হ'ল। বানরিপাড়ায় নারীর উপর গুর্খা সৈন্যের অহিত আচরণে একদল যুবক কিরূপে ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রাণ নাশে উদ্যত হয় ও সুরেন্দ্রনাথ কিরূপে তাদের নিরস্ত করেন—সুরেন্দ্রনাথের জীবনী-গ্রন্থে তা পরিষ্কার বর্ণিত আছে। বিলাতী দ্রব্যের আমদানী করে ম্যাজিষ্ট্রেট বুলার সাহেব বরিশালে এক বাজার খুল্‌লেন, কিন্তু ক্রেতা নেই। একমাত্র দোকানী 'হৃদয়' বুলারকে বিদ্রূপ করে গান গাইল, "এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।" সরকার প্রমাদ গন্‌লেন। ছোটলাট ফুলার বরিশালে গেলেন ও অশ্বিনীকুমার ও অন্যান্য জননেতাদের নিজ নিজ লঞ্চে ডেকে নিয়ে অপমানিত করলেন। এর ফলে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন

দ্বিগুণতর উৎসাহে চল্‌তে থাকে। অনাচার অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করার অ[illegible]ক্ত ও সাহস সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর প্রাণের কথা গানে ব্যক্ত করলেন,

আমি ভয় কর্‌ব না, ভয় কর্‌ব না।
দু'বেলা মরার আগে
মর্‌ব না ভাই মর্‌ব না।
তরিখানা বইতে গেলে,
মাঝে মাঝে তুফান মেলে,
তাই বলে, হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে ;
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে,
পাঁকের 'পরে পড়ব না।
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ্ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সর্‌ব না।

স্বদেশী আন্দোলন ও কংগ্রেস

(১৯০৫-১৯০৬)

এই সময় বারাণসী-ধামে কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। এর সভাপতিত্ব করলেন পুণ্যশ্লোক গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে। গোখ্‌লে মহোদয় লর্ড কার্জ্জনের স্বৈর-শাসন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই, ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্যই ভারতবর্ষ শাসন করতে হবে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে তা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সরকার তা-ই উপেক্ষা করছেন। আমাদের অবস্থা যদি বর্ত্তমানে এতই হীন হয়ে থাকে, আমরা যদি বর্ত্তমান শাসনে নিজেদের এতই অসহায় বোধ করি তা হলে বলা আবশ্যক যে, জনস্বার্থের খাতিরে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। গোখ্‌লে এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে বঙ্গদেশের এই বিপুল জনজাগরণ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে। ব্রিটিশ রাজত্বে এই প্রথম জাতি ও ধর্ম্মের বৈষম্য ভুলে বাঙালী জাতি বাইরের কোন সাহায্যের অপেক্ষা না রেখে স্বাভাবিক প্রেরণার বশে অন্যায়ের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়েছে। প্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে, জনসেবার আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে নীত হয়েছে, আর সমগ্র ভারতবর্ষ এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলা দেশের নিকটই ঋণী।" গোখ্‌লে স্বদেশীর পূর্ণ সমর্থন করলেন, কিন্তু 'বয়কট' সম্বন্ধে বললেন যে, এ কথাটির সঙ্গে দ্বেষ ও হিংসার ভাব বিজড়িত থাকায় পারত পক্ষে এ কারও বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে বাংলার অবস্থা বিবেচনা

করতে হতে হয়, সেখানে এমন চরম অবস্থা উপস্থিত হয়েছে যখন 'বয়কট' অস্ত্র প্রয়োগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। স্বদেশী যুগের বহু পূর্ব্বেও বাঙালী মনীষীরা স্বদেশজাত শিল্পদ্রব্যের উন্নতির জন্য বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে এই অনুভূতি কর্ম্মস্তরে গিয়ে পৌঁছায়। গোখ্‌লে মহাশয় স্বদেশী শিল্প, বিশেষ বস্ত্র শিল্পের প্রসার কিরূপে সম্ভব সে সম্বন্ধেও অভিভাষণে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি করতে হলে ভারত-বাসীকেই মূলধন জোগাতে হবে, বিদেশী মূলধন বিদেশজাত দ্রব্যের মতই দেশকে সমানে শ্রীহীন করে তোলে।

পূর্ব্ব বারের মত এ অধিবেশনেও শাসন সংস্কার ও শাসন অধিকারমূলক নানা দাবি গৃহীত হয়। এবারকার সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল স্বভাবতঃই বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গের বয়কট আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে প্রস্তাব করা হয় তাতে কোনই আপত্তি হ'ল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রস্তাব উত্থাপন করে তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় বঙ্গের উপর সরকারের দমন-নীতির বহর সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। সভা, শোভাযাত্রা, সঙ্কীর্ত্তনের মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা, 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীতের জন্য শাস্তিবিধান, বালকদের দণ্ডদান ও কারাগারে প্রেরণ, পিটুনি পুলিশ ও গুর্খাবাহিনী স্থাপন—সরকারী দমননীতির এই বিশেষ অঙ্গগুলি তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি। 'বয়কট' প্রস্তাব নিয়ে কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হ'ল। বস্তুত বয়কট সম্পর্কে সাক্ষাৎভাবে কোন প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল না। বয়কট আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে যে দমন-নীতি অনুসৃত হয় তার প্রতিবাদে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, 'বয়কট'ই সম্ভবতঃ একমাত্র আইনসঙ্গত ও কার্য্যকর উপায় যা দ্বারা বঙ্গবাসীর পক্ষে বঙ্গভঙ্গের দিকে ব্রিটিশ জনসাধারণের মনোযোগ

আকর্ষণ করা সম্ভব। পঞ্জাব-কেশরী লালা লজপৎ রায় এই প্রস্তাবের সমর্থনে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন ও বাংলার রাজনীতির এই নব পদ্ধতির প্রশংসা করে বাঙালীকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, "আমি স্বদেশী আন্দোলনকে অতি মহৎ জিনিষ বলে গ্রহণ করেছি। আমি একে আমাদের দেশের দুঃখদৈন্য মোচনের একমাত্র উপায় বলে মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, এ-ই আমাদের দেশের মুক্তির পথ। এই 'স্বদেশী'ব্রত আমাদের ত্যাগী, আত্মবিশ্বাসী, আত্মসম্মান-পরায়ণ এবং সর্ব্বোপরি মানুষ করে তুলবে। আমার মতে, এই স্বদেশীই সমগ্র ভারতের সর্ব্বজনগ্রাহ্য ধর্ম্ম হওয়া উচিত।"

পঞ্চম জর্জ্জ প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স রূপে এ সময় ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে চরমপন্থীরা প্রথমে অপত্তি করলেও শেষ পর্য্যন্ত এতে পরোক্ষ সম্মতি দেন। ব্যবস্থা-পরিষদগুলিকে অধিকতর প্রতিনিধিমূলক করা, আবগারী নীতি, উচ্চপদে ভারতীয় নিয়োগ, রাজস্ব, সৈন্যব্যয়, অস্ত্র আইন, প্রবাসী ভারতীয়, পুলিশ, শিক্ষা, ভারতের দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। ভারতের দাবিসমূহ বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার জন্য বিজয়রাঘব আচার্য্য সভাপতি গোখ্‌লেকে বিলাতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন যে, শতাব্দী পূর্ব্বে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য নীতির প্রতিবাদেই ইউরোপে বিভিন্ন স্বাধীন জাতির উদ্ভব হয়েছে। এখন আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অধীন দেশগুলিকে স্বাধীন বলে স্বীকার না করলে অতি দ্রুতই জাতীয়তাবাদের প্রসার লাভ ঘটবে।

১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাতে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় ও উদারনৈতিক দল জয়লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এর একমাস

পূর্ব্বে লর্ড মিণ্টো ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন কানাডায় রাজপ্রতিনিধি রূপে কার্য্য করেছেন। কাজেই রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হলেও তিনি ভারতের শাসন ব্যাপারে উদার নীতি পোষণ করবেন—সকলে এরূপ অনুমান করেছিলেন। ওদিকে উদারনৈতিক মন্ত্রীসভায় ভারত-সচিব হলেন মিঃ (পরে লর্ড) জন মর্লি। তিনি কব্‌ডেন-ব্রাইটের শিষ্য ও গ্লাডষ্টোনের সহকর্ম্মী। সুতরাং তাঁর ভারত-সচিবের পদ গ্রহণে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ, বিশেষ করে প্রাচীনগণ অনেকটা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু বাঙালীকে অবিলম্বে নিরাশ হতে হ'ল। মর্লি পার্লামেণ্টে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের নিন্দা করলেও একে একটি 'সেটেল্‌ড্‌ ফ্যাক্ট্‌' বা স্থায়ী ব্যাপার বলে উল্লেখ করলেন! এর পরে বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠে। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনে বঙ্গবাসী অধিকতর দৃঢ়তা প্রকাশ করে। শহরে পল্লীতে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হতে থাকে। বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-কর্ত্তাদের মূর্ত্তিও উগ্র হয়ে উঠ্‌ল, ধরপাকড় ও দণ্ডদান স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়াল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য। ১৮৮৮ সালে এ সুরু হয় বটে, কিন্তু ১৮৯৫ সাল থেকেই প্রতি বছর এর অধিবেশন হতে থাকে। মফঃস্বল শহরে এক একবার এক এক স্থলে এই সম্মেলন হ'ত। মফঃস্বলে প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হ'ল বহরমপুরে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আগ্রহাতিশয়ে। কৃষ্ণনগর, চুচুঁড়া, চট্টগ্রাম, নাটোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানা স্থানে এর অধিবেশন হয় ও আনন্দমোহন বসু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষীরা বিভিন্ন সময়ে সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল অধিবেশন হবার কথা হয় স্বদেশীর পীঠস্থান বরিশাল শহরে। স্বদেশী

আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল সভাপতিত্ব করিবেন স্থির হয়। বরিশালের নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, শরৎকুমার রায় প্রমুখ সহকর্ম্মীদের সঙ্গে বাখরগঞ্জ জেলার নানা স্থানে ভ্রমণ করেন ও স্বদেশীপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এ সময়ে বরিশালে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। কিন্তু অর্থাভাব ও অন্নকষ্ট সত্ত্বেও অধিবাসীরা স্বদেশী নেতাদের আহ্বানে আশ্চর্য্য সাড়া দিলে ও যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করলে।

ইতিপূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গে প্রকাশ্য রাস্তায় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা বে-আইনী ঘোষিত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে বহু যুবক বেত্রদণ্ডে ও অন্যবিধ দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। বরিশালেও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা বে-আইনী। অভ্যর্থনা সমিতি জেলার শাসকবর্গের নিকট এই শর্ত্তে আবদ্ধ হলেন যে, প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে তাঁরা ষ্টেশনে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করবেন না। সম্মেলনের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় কল্‌কাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহু প্রতিনিধি ষ্টীমারযোগে বরিশাল পৌছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, টাকীর জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও এন্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, আনন্দচন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ, যাত্রামোহন সেন প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৩ই এপ্রিল বরিশালে উপস্থিত হলেন। অভ্যর্থনা-সমিতি শাসনকর্ত্তাদের যে শর্ত্ত দিয়েছিলেন তা যথারীতি প্রতিপালিত হ'ল—ষ্টেশনে কেউই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করলেন না। কৃষ্ণকুমার মিত্রের নেতৃত্বে এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে না পেরে অভ্যর্থনা সমিতির আতিথ্য স্বীকার

করেন নি। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ স্বদেশীর অন্যতম উদ্যোক্তা রজনীকান্ত গুহের ভবনে তাঁরা গেলেন। অবশেষে স্থির হ'ল, সম্মেলনের প্রথম দিন রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে প্রতিনিধিগণ সমবেত হয়ে 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি করবেন ও শোভাযাত্রা করে সভামণ্ডপে গমন করবেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে যথাসময়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করবার পর শোভাযাত্রা বার হ'ল। প্রথম গাড়ীতে চল্‌লেন সভাপতি আবদুল রসুল ও তাঁর পত্নী (ইউরোপীয় মহিলা), পেছনেই পদব্রজে চল্‌লেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। এইরূপে পর পর সারিবদ্ধ ভাবে শোভাযাত্রা অগ্রসর হতে লাগল। পশ্চাতে রইলেন 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ পরিহিত এন্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ। সর্ব্বপশ্চাতে ছিলেন সোসাটির সভাপতি কৃষ্ণকুমার মিত্র, রজনীকান্ত গুহ ও গীষ্পতি কাব্যতীর্থ। আশে-পাশে ঢের পুলিশ মোতায়েন ছিল। 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ পরিহিত সভ্যগণ যেমনি হাবেলী থেকে রাস্তায় বের হলেন (তখন তাঁরা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করেন নি), অমনি পুলিশ তাঁদের উপর দীর্ঘ যষ্টি দ্বারা প্রহার সুরু করলে। বহু জন আহত হলেন, কিন্তু ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেচারাম লাহিড়ী, ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার আঘাতই হ'ল গুরুতর! চিত্তরঞ্জন লাঠির ঘায়ে পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণীতে ছিট্‌কে পড়লেন। জলের মধ্যেও তাঁর উপর চার্জ্জ করা হয়। লাঠির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যগণ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন। চিত্তরঞ্জন তখনও পর্য্যন্ত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। অপর একজন পুলিশ এসে তাঁকে না তুললে তাঁর হয়ত জীয়ন্তে সমাধি হ'ত।

শোভাযাত্রার প্রথম অংশ কিছু দূরে চলে গিয়েছিল। নেতৃবৃন্দ এ সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প একমাত্র

বিনায়ক দামোদর সবরকার

মহম্মদ আলি জিন্না

সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করলেন। সুরেন্দ্রনাথকে মেজিষ্ট্রেট এমার্সনের ভবনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিহারীলাল রায় ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁর সঙ্গে গেলেন। মেজিষ্ট্রেট সরাসরি বিচারে ১৮৮ ধারা মতে বে-আইনি শোভাযাত্রা পরিচালনার দায়ে সুরেন্দ্রনাথকে দু'শ টাকা জরিমানা করেন। সুরেন্দ্রনাথ একখানা চেয়ারে বস্‌তে উদ্যত হওয়ায় আদালত অবমাননার জন্য তাঁর আরও দু'শ টাকা জরিমানা হ'ল! জরিমানার টাকা দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির সঙ্গে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

গ্রেপ্তারের সময় সুরেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে সম্মেলনের কার্য্য চালাতে বলেছিলেন। সম্মেলনের কার্য্য সুরু হয়ে গিয়েছিল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা একদিকে পুত্র চিত্তরঞ্জন ও অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পুলিশের নির্ম্মম অত্যাচারের কাহিনী বিশদ রূপে বর্ণনা করলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মত ধীরপন্থী লোকও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বল্‌লেন, "আজ ইংরেজ রাজত্বের আসান হ'ল।" অশ্বিনীকুমারের অনুপস্থিতিতেই তাঁর অভিভাষণ পঠিত হয়। অশ্বিনীকুমার অভিভাষণে বাঙালীকে আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে অনুরোধ করেন। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন, সালিশী আদালত গঠন, স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা এই তিনটি গঠনমূলক কার্য্যের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। অশ্বিনীকুমার বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্পর্কে বলেন,

"ভারত-সচিব বলিয়াছেন বঙ্গবিভাগ আন্দোলন হ্রাস হইয়াছে, এ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'। আমি মিঃ জন মর্লিকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি মনে করেন এইরূপ একটা ব্যাপারের কারণ বিদূরিত না হইলে সভ্য জগতের কুত্রাপি আন্দোলন হ্রাস হইতে পারে? এরূপ ব্যাপারে ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড বা আয়ার্লণ্ড কোন স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া

তিনি কি বিশ্বাস করিতে পারেন? আত্মম্ভরী ও অত্যাচারী এক দল ব্যক্তি কোন এক বৃহৎ জাতির প্রাণে বেদনা দিয়া, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নির্লজ্জের ন্যায় জাতীয় প্রতিবাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। বঙ্গবাসীর ধৈর্য্য অপরিসীম, তথাপি বাঙালীর এই বোধ আছে যে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। যে দিন লর্ড কার্জ্জনের তরবারি বঙ্গ-জননীর হৃদয় দ্বিধা-বিভক্ত করিয়াছে সেই চিরস্মরণীয় ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গবাসী কি ভগবানের নামে শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, বঙ্গবিভাগের কুফল নাশ ও বাঙ্গালী জাতির একতা রক্ষা করিতে বঙ্গবাসী যথাশক্তি চেষ্টা করিবে? জাতীয় শক্তির বলে এই প্রতিজ্ঞা বৎসরের পর বৎসর দৃঢ়তর হইবে।”

অশ্বিনীকুমার দমন-নীতি সম্পর্কে বলেন,

“বঙ্গবিভাগ হেতু যে অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে? সার্ ব্যাম্ফিল্ড ফুলার কঠোর অত্যাচারমূলক শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; তাহাতে অত্যাচরিত ব্যক্তি ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর শাসন করিলে তাহার হৃদয়ের বেদনা দূর করা যায় কি? কিন্তু সার্ ব্যামফিল্ড ফুলার এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। ‘কোন জাতিই আইন দ্বারা শাসিত হয় না, পাশবিক শক্তি দ্বারা ত নয়ই’—লাট ফুলার তাঁহার দেশবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম সূত্রই বিস্মৃত হইয়াছেন। যখন বঙ্গদেশ গভীর শোকাচ্ছন্ন তখন তিনি গুর্খা সৈন্য ও পিটুনি পুলিশ স্থাপন, স্পেশ্যাল কনষ্টেবল গঠন, প্রকাশ্য স্থানে পবিত্র

'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে ও সাধারণ সভা-সমিতিতে যোগদান বে-আইনী করিয়া বিস্তর আইন জারি করিয়াছেন। যাহার ধমনীতে এক বিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে? আমাদের দুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেহ নাই, ভারতবাসীর স্বার্থ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ উদাসীন।"

সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ধর্ম্মে বিভিন্ন হলেও "রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের সহযাত্রী।" 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক মতিলাল ঘোষ এর পরেই প্রস্তাব করেন,

"অদ্য দিবালোকে সমস্ত শহরের লোকের সম্মুখে, ডিষ্ট্রীক্ট ও আসিষ্ট্যাণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশে সভাপতি রসুল সাহেবের অর্ভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর পুলিশের লাঠি চালনায় এবং দেশের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনা কারণে গ্রেপ্তার করায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বরিশাল জেলায় আইনসঙ্গত শাসন লুপ্ত হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের নানা স্থানে লোক স্বদেশ-সেবার জন্য প্রহৃত ও নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে, এদেশে আর বৈধ শাসন প্রণালী প্রচলিত নাই। যে সকল কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান দায়িত্বশূন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী, এই বর্ষের সম্মেলন তৎসমুদয়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া, যে সমস্ত কার্য্য দেশবাসীর আত্মসাধ্য সে সকল বিষয়েরই আলোচনা করিবে।"

'সন্ধ্যা' সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও 'হাওড়া হিতৈষী' সম্পাদক গীষ্পতি কাব্যতীর্থের দ্বারা সমর্থিত হলে এ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নেতৃবর্গ আত্মশক্তির উপর পূর্ণ নির্ভর করতে অতঃপর

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই সময় অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে মণ্ডপে প্রবেশ করলে তুমুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। অতঃপর সভার কার্য্য পরদিনের জন্য মূলতুবী থাকে।

পর দিবস অধিবেশন আরম্ভ হলে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সভাস্থলে আগমন করেন এবং সভাপতিকে বলেন যে, 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা হবে না, এই শর্ত্তে রাজি না হলে তিনি মেজিষ্ট্রেটের আদেশ বলে সভা বন্ধ করে দিবেন। এই হীন শর্ত্তে রাজী না হওয়ায় সম্মেলনের অধিবেশন এখানেই শেষ হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই বে-আইনী আদেশ অমান্য করে সম্মেলনের কার্য্য চালাবার জন্য কৃষ্ণকুমার মিত্র শেষ পর্য্যন্ত মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। বরিশালে সম্মেলন অসমাপ্ত রইল বটে, কিন্তু নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ স্বদেশী আন্দোলন চালাতে অধিকতর দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন। বঙ্গের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ কল্‌কাতায় বরিশালের পুলিশী অনাচারের প্রতিবাদে বহু জনসভা হ'ল। যুবক মনে এর প্রতিক্রিয়াও হ'ল খুব।

এ বছরের পরবর্ত্তী স্মরণীয় ঘটনা—শিবাজী উৎসব। মারাঠা কেশরী বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবের উদ্গাতা, পূর্ব্বে আমরা এ কথা বলেছি। বাঙালী নেতাদের মধ্যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী একদল লোকের উদ্ভব হ'ল। প্রাচীনপন্থীরা আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদের পক্ষপাতী। কিন্তু এই দল ঘোষণা করলেন, 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে নি, তাঁরাও পারবেন না। আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসী দল শিবাজী উৎসবের আয়োজন করে সাধারণের ভিতর এই জাতীয়তা প্রচারের আয়োজন করলেন। স্বদেশী মণ্ডলীর ও বিশেষ করে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের উদ্যোগে ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ক্লাবের নিকট পান্তীর মাঠে শিবাজী উৎসব সুসম্পন্ন হ'ল। উৎসবের অঙ্গস্বরূপ একটি স্বদেশী মেলার আয়োজন হয় ও এর ভার পড়ে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ

ঘোষের উপর। উৎসবের প্রধান হোতা হলেন বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়।

বালগঙ্গাধর তিলক বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও নূতন ভাবধারার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তাই শিবাজী উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েই তিনি গণেশশ্রীকৃষ্ণ খাপার্দ্দে ও ডাক্তার বি এস মুঞ্জেকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্ত্তী ৪ঠা জুন সোমবার কল্‌কাতায় আগমন করলেন। কল্‌কাতাবাসীরা তিলককে বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত করে। ঐদিন অপরাহ্নে মতিলাল ঘোষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিলক মেলার উদ্বোধন করেন। উৎসবে ভবানী-পূজারও ব্যবস্থা হয়। শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিবাজী' শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করেন। তিলক মহাশয় মেলাকে 'Political festival' বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব বলে আখ্যা দেন।

পরদিন মূল উৎসবের সভাপতিত্ব করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। এদিন তিলক, খাপার্দ্দে ও মুঞ্জে তিন জনেই হিন্দিতে বক্তৃতা করলেন। উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে সুরেন্দ্রনাথও একদিন উৎসবের পৌরোহিত্য করেছিলেন। ১০ই জুন রবিবার প্রাতঃকালে ত্রিশ হাজার কল্‌কাতাবাসী তিলককে নিয়ে শোভাযাত্রা করে ভাগীরথী বক্ষে অবগাহন করলে। উৎসবের স্বেচ্ছা-সেবকগণকে সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক ১১ই জুন এক ভোজে আপ্যায়িত করেন। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যুবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তিলক ও খাপার্দ্দে তাঁদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করেন। খাপার্দ্দে বললেন, 'আজ তোমরা স্বেচ্ছাসৈনিক; অদূর ভবিষ্যতে এদেশের যুবকেরা সত্যিকার সৈনিক হতে পারবে'।

এই সময়ে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রভৃতি মধ্যযুগের বঙ্গবীর-গণেরও উৎসব অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই সব বীরের জীবনী নিয়ে নূতন নাটকও রচিত হতে লাগ্‌ল। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী

স্বর্ণকুমারী দুহিতা সরলা দেবী শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপন করলেন। সর্ব্বত্র বীর পূজার সাড়া পড়ে গেল। সরলা দেবী যুবকদের মধ্যে শারীর চর্চ্চা, অসি-খেলা প্রভৃতির প্রচলনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বদেশী যুগের পূর্ব্বেই কংগ্রেসেও তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন। পঞ্জাব-হাঙ্গামার সময়ে পতি রামভুজ দত্ত চৌধুরীর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তিনি অশেষ কষ্ট ভোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। সরলা দেবী নারী-কল্যাণকর বিবিধ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। গত ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ দিবসে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন।

এবছরের তৃতীয় স্মরণীয় ঘটনা 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর প্রকাশ'। 'সন্ধ্যা' নূতন ভাবধারা সুষ্ঠুরূপেই প্রচার করতেন, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর নিকট এই ভাবধারা পৌছতে হলে ইংরেজী পত্রিকা আবশ্যক। এজন্য সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতির অর্থে ১৯০৬ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হ'ল। এ কাগজখানির 'মটো' বা শিরোভূষণ ছিল "India for Indians", 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ'। পুরাতনপন্থীরা এর ভিতরে নিজেদের আদর্শ-বিচ্যুতির আভাস পেলেন। কারণ তাঁরা এতদিন ব্রিটিশের সহযোগেই ভারতবর্ষ শাসনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। 'ভারতবাসীর জন্য ভারতবর্ষ' একথা তাঁদের প্রাণে আনন্দের পরিবর্ত্তে উদ্বেগেরই সৃষ্টি করলে। আর ইংরেজ-পরিচালিত আধা-সরকারী কাগজগুলো এর ভিতরে একেবারে কাঁচা 'সিডিশন' বা রাজদ্রোহই দেখ্‌তে পেলে। ভারতবাসীরা তো ভারতবর্ষে প্রবাসী, তারা আবার কোন্ সাহসে এর অধিকারী হতে চায়! এ পত্রিকাখানির উপর তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। 'বন্দেমাতরম্-এর সম্পাদক-মণ্ডলীতে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। অরবিন্দ ঘোষ কিছুকাল পরে সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন।

অরবিন্দ ঘোষের কথা না শুনেছেন এমন লোক ভারতবর্ষে বিরল। অরবিন্দ বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। তিনি বিলাতে আশৈশব শিক্ষালাভ করেন। আই-সি-এস পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ে কৃতিত্ব দেখালেও তিনি অশ্বারোহণে অপারগ হন। এজন্য অকৃতকার্য্য হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন ও বড়োদা কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে অরবিন্দ উক্ত পদ ত্যাগ করে বাংলায় আগমন করেন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম আচার্য্য পদে ব্রতী হন। এর অল্পকাল পরেই তিনি 'বন্দেমাতরম্'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। তিনি এর প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' কাগজে কংগ্রেসের তখনকার কর্ম্মপদ্ধতির অর্থাৎ আবেদন-নিবেদন নীতির ব্যর্থতার দিকে স্বদেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্'-এ তিনি 'নিউ স্পিরিট' বা 'নব ভাব' ও 'নিউ পাথ' বা 'নূতন পথ' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে বাঙালী তথা ভারতবাসীর সম্মুখে নূতন আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি উপস্থিত করলেন। বাঙালী কৃতজ্ঞচিত্তে অবিলম্বে তাঁকে নেতার আসনে বসালে।

সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'—কি সংবাদপত্র পরিচালনে, কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-পদ্ধতি বিশ্লেষণে বাংলাদেশে যুগান্তর সৃষ্টি করে। এর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, দেবব্রত বসু (পরলোকগত প্রজ্ঞানন্দ স্বামী), অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ ছিলেন যুগান্তরের লেখক। যুগান্তর তরুণ দলের মুখপত্র। যুগান্তর-পক্ষীয়দের আদর্শ ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। বাহুবলকে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভাণ্ডার' নামক একখানি মাসিক পত্রের মধ্য

দিয়ে স্বদেশীর নিগূঢ় অর্থ স্বদেশবাসীকে বুঝাইয়া দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী জাতিকে স্বাবলম্বী হ'তে উদ্বুদ্ধ করা।

'নেশনাল কৌন্সিল অফ্ এডুকেশন' বা জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনে নির্যাতিত ও বিদ্যালয়-বিতাড়িত ছেলেদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন কল্পে সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রভৃতির দানের কথা উল্লেখ করেছি। এই উপলক্ষে সার্ তারকনাথ পালিত ও ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের নিকট থেকেও প্রচুর অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা হয়। সুতরাং এ সময় বাঙালী সন্তানদের মধ্যে জাতীয়তার আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চল্‌ল। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীবৃন্দ ছিলেন এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। তাঁদেরই চেষ্টা-যত্নে ১৯০৬ সালের ১৫ই আগষ্ট কল্‌কাতার টাউন হলে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বিরাট্ জন-সভায় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষ-ত্রুটি মুক্ত জাতীয় শিক্ষারই তাঁরা ব্যবস্থা করবেন, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরোধিতা তাঁরা করবেন না। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ হলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ইতিপূর্ব্বে 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডন ম্যাগাজিন এই সোসাইটির মুখপত্র। এ দুয়ের দ্বারা স্বাদেশিকতা প্রচার আগেই সুরু হয়। একদল বাঙালী যুবক তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে একার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির সুষ্ঠু আলোচনার দ্বারা বাঙালীদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা

করেছিলেন। যুবক সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। নূতন ভাবধারা স্বষ্টিতে নিবেদিতার কৃতিত্ব কখনও ভোলবার নয়।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। সার্ ব্যামফিল্ড ফুলার ছাত্র সম্প্রদায়ের উপর ছিলেন খুবই চটা। যে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রেরা স্বদেশীর পক্ষপাতী সেই সব প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে শাস্তি দানের তিনি ব্যবস্থা করেন। সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত কোন ছাত্র ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি হতে পারত না। আবার এখান থেকে কোন ছাত্র সরকারী বৃত্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হলেও বৃত্তি পেত না। সিরাজগঞ্জের ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা স্বদেশী ব্যাপারে অভিযুক্ত হওয়ায় ফুলার গবর্ণমেণ্ট কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এর মঞ্জুরী বাতিল করে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বিশ্ববিদ্যালয় ফুলার গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হয়ে চ্যান্সেলার বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপর এ বিষয়টির মীমাংসার ভার দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শিমলায় গিয়ে বড়লাটকে সব বিষয় বুঝিয়ে দিলেন। এর ফলে লর্ড মিণ্টো অনুরোধ-পত্র প্রত্যাহারের নির্দ্দেশ দিয়ে ফুলার সাহেবকে 'তার' করলেন। ফুলার কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত না হলে পদত্যাগ করবেন এরূপ জিদ ধরেন। লর্ড মিণ্টো ভারত-সচিব মর্লিকে এসব কথা জানালে মর্লি সাহেব অগত্যা তাঁর পদত্যাগই গ্রহণ করেন! মর্লির 'রেকলেক্‌শন্‌স্' বা স্মৃতিকথা দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।

সার্ ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-নীতি প্রচার করতেন। উচ্চতর শাসনকার্য্যেও এ সময় এই নীতি দ্বারা খুবই প্রভাবিত হ'ল। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে একদল মুসলমান প্রতিনিধি শিমলায় লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করে তাঁর হস্তে একখানা স্মারকলিপি অর্পণ করেন। তাঁরা তাতে সরকারী শাসন-পদ্ধতিতে মুসলমান সমাজের আস্থা জ্ঞাপন করেন। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে যে-সব ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হবে তার প্রত্যেকটিতে মুসলমানদের পৃথক্ ভাবে সদস্য-নির্ব্বাচনের অধিকার ও জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়েও অতিরিক্ত সদস্য-পদ দানের কথাও স্মারকলিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়। এখানে বলে রাখি যে, ১৯০৬ সালের আরম্ভেই ভারত-সচিব মর্লি বড়লাটের নিকট শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করেন ও সঙ্গে সঙ্গে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে,সংস্কৃত শাসন-ব্যবস্থা সত্বর প্রবর্ত্তিত হলে মুসলমান, জমিদার ও দক্ষিণ-পন্থী ("Right Wing") কংগ্রেসীদের স্বমতে আনয়ন করা ও প্রগতিবাদীদের 'একঘরে' করে রাখা সম্ভব হবে! আমলাতন্ত্র মর্লির এই মতবাদের সুযোগ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই প্রথমতঃ ভেদ-নীতি প্রবর্ত্তন করবার ব্যবস্থা করলেন। প্রকাশ, তাঁদের প্ররোচনায়ই উক্ত প্রতিনিধি দল বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লর্ড মিণ্টোও মুসলমান সমাজের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ প্রকাশ করলেন ও তাঁদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে তা পূরণে প্রতিশ্রুত হলেন। এই প্রতিশ্রুতির ফলেই পরবর্ত্তী মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা স্বীকৃত হয়।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নিকটবর্ত্তী হ'ল। কিন্তু সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়ে নূতনপন্থাদের সঙ্গে প্রাচীনদের মতবিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। নূতন দল আত্মশক্তিতে' বিশ্বাসী, তাঁরা স্বদেশীর পূর্ণ সমর্থক ও নূতন ভাবধারার অন্যতম প্রবর্ত্তক বালগঙ্গাধর তিলককে এ বছরে কংগ্রেসের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি পুরাতনপন্থী নেতাদের সঙ্গে এ নিয়ে নূতনপন্থী নেতাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়। তাঁরা গোপনে সর্ব্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজীকে

এ পদ গ্রহণে আহ্বান করেন। দাদাভাইর সম্মতি প্রকাশিত হলে এ সম্বন্ধে নূতন দল আর আপত্তি করলেন না। অভ্যর্থনা সমিতিই তখন পর্য্যন্ত সভাপতি মনোনয়ন করতেন। সুরেন্দ্রনাথ সমিতিকে সহজেই এ প্রস্তাবে সম্মত করান।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। অভিভাষণে তিনি এ সময়কার বঙ্গ-শাসনকে রুশিয়ার জারের নির্ম্মম দেশ-শাসনের সঙ্গে তুলনা করেন। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, বদরুদ্দীন তায়েবজী এবং মাদ্রাজের কংগ্রেসকর্ম্মী বীররাঘব আচার্য্যের মৃত্যুতে কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসে এবারে বিপুল জনসমাগম হয়। ষোল শ'র উপর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। দর্শক সংখ্যাও হয়েছিল প্রায় কুড়ি হাজার। বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন ভারতবাসী মাত্রেরই প্রাণে নূতন সাড়া এনে দেয়। সভাপতি বিরাশী বছরের বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী স্বদেশী আন্দোলন ও বিপুল স্বার্থত্যাগের জন্য বাঙালী জাতিকে অভিনন্দিত করলেন। তাঁর অভিভাষণের মূল বক্তব্য হ'ল, "আন্দোলন কর, আন্দোলন কর, আন্দোলনের তরঙ্গ-হিল্লোলে আসমুদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে তোল। গণতন্ত্রপরায়ণ ব্রিটিশ জাতি আন্দোলনের নিকট যেমন মস্তক অবনত করে এমন আর কিছুরই নিকটে করে না। আন্দোলন সর্ব্বপ্রকারে গণতন্ত্র-সম্মত ও উপদ্রব-বিহীন হওয়া আবশ্যক। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা, ব্রিটিশের সমান অধিকার তার ন্যায্য প্রাপ্য।" দাদাভাই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে বলেন, ভারতবর্ষের লক্ষ্য হবে গ্রেটব্রিটেন বা স্বাধিকারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের অনুরূপ শাসনতন্ত্র লাভ, যাকে এক কথায় বলা যায় 'স্বরাজ'। কংগ্রেস-মঞ্চ থেকে 'স্বরাজ' কথাটি এবারেই প্রথম উচ্চারিত হ'ল।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে প্রস্তাব রচনার সময়ও নূতন ও পুরাতন পন্থীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'ল। পুরাতন দলের নায়ক হলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্‌তা, আর নূতন দলের অগ্রণী হলেন বিপিনচন্দ্র পাল। উভয় দলের ভিতরে খুবই কথা কাটাকাটি হয় এবং নূতন দল বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতি থেকে বার হয়ে আসেন! শেষে দাদাভাই নৌরজীর চেষ্টায় উভয় দলে আপোষ-রফা হ'ল। এ বারেই কিন্তু বুঝা গেল, উভয় দলের বিরোধ বিচ্ছেদে পরিণত হতে বিশেষ বিলম্ব হবে না। পুরাতন পন্থীদের মামুলী প্রস্তাবগুলির সঙ্গে নূতন দলের স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রস্তাবও গৃহীত হ'ল। এ প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম এই,

স্বরাজ—উপনিবেশে যে ধরণের স্বায়ত্ত-শাসন বর্ত্তমান, ভারতবর্ষেও সেই ধরণের স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হোক্, এবং এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে প্রথম ধাপ হিসাবে,

(১) ভারতবর্ষে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য বিলাতে যে-সব প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হয় তা ভারতে ও বিলাতে উভয়ত্রই গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক্, এবং ভারতবর্ষে বসে যে-সব উচ্চ পদে কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে তাতেও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হোক।

(২) ভারত-সচিবের কৌন্সিলে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণরের শাসন-পরিষদে উপযুক্তসংখ্যক ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হোক্।

(৩) ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি এরূপভাবে প্রসারিত করা হোক্, যাতে সত্যকার জন-প্রতিনিধিদের পক্ষে অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হয়ে বজেট আলোচনায় ও শাসন কার্য্য নিয়ন্ত্রণে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব।

(৪) মিউনিসিপালিটি, লোকাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা হোক্। বিলাতের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের উপরে ঐ দেশের

লোক্যাল গবর্ণমেণ্ট বোর্ড যতখানি কর্ত্তৃত্ব করেন এখানকার প্রতিষ্ঠান-গুলির উপর সরকার ঠিক্ ততখানি কর্ত্তৃত্ব করবেন।

বয়কট—শাসনকার্য্যে ভারতবাসীর মতামত গ্রাহ্য নয় এবং সরকারে প্রেরিত আবেদনপত্রও বিবেচিত হওয়ার আশা নেই। এজন্য বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে বঙ্গদেশে উদ্‌যাপিত বয়কট বা বর্জ্জন আন্দোলন আইনসঙ্গত।

বিপিনচন্দ্র পাল বয়কট সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বয়কট আন্দোলন শুধু বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনেই নিবদ্ধ নয়, পূর্ব্ব-বঙ্গ সরকারের সঙ্গে সর্ব্বরকম সহযোগিতা-বর্জ্জনই এর উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব বঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদও নেতৃবর্গ বয়কট করবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এ কথায় আপত্তি করে বলেন, বয়কটের এরূপ ব্যাপক প্রয়োগে কংগ্রেস সম্মত হতে পারেন না। প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়ের জন্যই কংগ্রেস দায়ী, কোন বক্তা বিশেষের বক্তৃতার জন্য দায়ী হতে পারেন না, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে এ কথা বলায় বিতর্ক বন্ধ হয়। পূর্ব্ববঙ্গ কিন্তু বিপিনচন্দ্রের ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছিল।

স্বদেশী—কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন এবং দেশবাসীকে এর সাফল্যের জন্য তৎপর হতে আহ্বান করেন। তাঁরা যেন স্বদেশী শিল্পের উৎপাদন ও উন্নতির জন্য নিয়ত তৎপর থাকেন, এবং কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করেও, বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশজাত দ্রব্যই ক্রয় করে স্বদেশী শিল্পের প্রসারে সহায়তা করেন।

জাতীয় শিক্ষা—কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাতির পক্ষে বালক-বালিকাদের মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হবার সময় উপস্থিত হয়েছে। জাতীয় আদর্শে স্বদেশবাসীর কর্ত্তৃত্বাধীনে দেশের প্রয়োজন অনুরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরি এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন।

এবারকার কংগ্রেসে এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে কতকগুলি নিয়ম গৃহীত হয়। একটি নিয়মে ধার্য্য হ'ল, কংগ্রেস-সভাপতি মনোনয়নে অভ্যর্থনা সমিতির তিন-চতুর্থাংশ সভ্যের সম্মতি প্রয়োজন। এরূপ ভাবে সভাপতি মনোনয়নে অসমর্থ হলে সেণ্ট্রাল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি যাকে সভাপতি মনোনীত করবেন তিনিই সভাপতি হবেন। এই কমিটিতে সভ্য থাক্‌বেন বাংলা, বিহার, আসাম ও ব্রহ্মদেশ থেকে ১২ জন, মাদ্রাজ থেকে ৮ জন, বোম্বাই থেকে ৮, যুক্তপ্রদেশ থেকে ৬, পঞ্জাব ও মধ্য-প্রদেশ প্রত্যেকটি থেকে ৬ ও বেরার থেকে ২ জন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণও এর অতিরিক্ত সদস্য হবেন। আর একটি নিয়মে বিষয়-নির্ব্বাচন কমিটি গঠনের কথা হয় এইরূপ—বাংলা, বিহার, আসাম ও ব্রহ্মদেশ—২৫ জন, মাদ্রাজ—১৫, বোম্বাই—১৫, যুক্তপ্রদেশ—১০, পঞ্জাব—১০, মধ্যপ্রদেশ—৬, বেরার—৪, এবং যে প্রদেশে যে বার কংগ্রেস হবে সে বার সেখানকার প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত আরও ১০ জন সদস্য, সভাপতি, পূর্ব্ব সভাপতিগণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকগণ ও অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকগণ।

কংগ্রেস সপ্তাহে কল্‌কাতায় একটি শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হ'ল। একে প্রথমে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করার কথা হয়, কিন্তু বিদেশী জিনিষ প্রদর্শিত হওয়ায় প্রতিনিধিগণের আপত্তি হেতু এর উপর কংগ্রেসের ছাপ দেওয়া হয় নি। প্রদর্শনী উন্মোচন করেন বড়লাট লর্ড মিণ্টো। তিনি বক্তৃতায় স্বদেশীকে 'সৎ' ও 'অসৎ' দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। তাঁর মতে বর্জ্জন-নীতি মিশ্রিত স্বদেশী ত্যাগ করে শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারেই ভারতবাসীর তৎপর হওয়া উচিত। তাঁর এই উক্তির মধ্যেও ভেদ-নীতির আভাস পাওয়া যায়।

আদর্শ-সংঘাত ও শাসন-নীতি

(১৯০৭—১৯০৯)

কল্‌কাতা কংগ্রেসে নূতন দলের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ফিরোজ শা মেহ্‌তা প্রমুখ প্রাচীনপন্থীরা খুশী হতে পারেন নি। তাঁরা নূতন দলের অগ্রসর নীতিকে দাবিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল ও দুটী স্বতন্ত্র নাম লাভ করলে। নূতন দলের নাম দেওয়া হ'ল এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট বা চরমপন্থী, পুরাতন দল 'মডারেট' বা নরম পন্থী বলে আখ্যাত হ'ল। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবে লালা লজপৎ রায় ও বঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল নব ভাবের প্রধান উদ্গাতা। এজন্য ভারতবাসী আদর করে তিনজনকেই 'লাল-বাল-পাল' এই একটি কথায় অভিহিত করতেন।

অরবিন্দ ঘোষও এ দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। তিনি নূতন ভাব-ধারাকে ধর্ম্মের পর্য্যায়ে উন্নীত করে একে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা দান করেন। তিনি বলেন, "জাতীয়তা-বোধ বা দেশভক্তি একটি ধর্ম্ম, ঈশ্বর হতে উদ্ভূত। জাতীয়তাকে কেউ রোধ করতে পারে না, কেননা ঈশ্বরই একে নিয়ন্ত্রিত করছেন।······শুধু রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করে, জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তন করে বা শুধু বয়কট আন্দোলন চালিয়ে এ দেশকে বাঁচান সম্ভব নয়। স্বদেশী দ্বারা কিঞ্চিৎ আর্থিক সমৃদ্ধি ঘট্‌তে পারে, কিন্তু এর চাক্‌-চিক্যে ভুলে ও একে নিরাপদে রক্ষা করতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী।······দৃশ্যমান্ শক্তিসমূহের চেয়ে স্বদেশের শক্তি অন্যবিধ। দেশমাতৃকার শক্তি নিজস্ব। এর পরিপুষ্টির জন্য তোমার আবশ্যক নেই, আমার আবশ্যক নেই, অন্য কারোরই আবশ্যক নেই।"

স্বরাজের বেদান্ত-সম্মত ব্যাখ্যা করে অরবিন্দ বুঝিয়ে দেন, নিজের চেষ্টায় যেমন নিজের প্রভুত্ব সম্ভবে, জাতিকেও তেমনি প্রভুত্ব অর্জ্জন করতে হয় নিজেকে, পরের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন অসম্ভব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করে যে বক্তৃতা করেন তাতে বলেছিলেন, "অরবিন্দ স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তার ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ও মানব জাতির মহাপ্রেমিক"।

বিপিনচন্দ্র স্বরাজের অর্থ করলেন আত্মকর্ত্তৃত্ব বা 'অটোনমী'। তাঁর মতে "স্বরাজ কেউ কাউকে দান করতে পারে না। এ নিজেকেই অর্জ্জন করতে হয়। আজ যদি ইংরেজ বলে, স্বরাজ লও, আমি ধন্যবাদ দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করব। কারণ আমি নিজে যা অর্জ্জন করতে পারি না তা আমি গ্রহণ করবার অধিকারী নই। আমাদের সকল শক্তি এমনি ভাবে নিয়োজিত করব, ধন ও জন এরূপ ভাবে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করব, যার ফলে আমরা বিরুদ্ধ শক্তিকে স্বমতে আনয়ন করতে সক্ষম হই। বিলাতী পণ্য বর্জ্জন থেকে আরম্ভ করে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পর্য্যন্ত আমাদের অস্ত্র। আমরা গঠনমূলক কার্য্যেও মন দিব। সরকারী ব্যবস্থার অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা আমরা দেশময় প্রতিষ্ঠিত করব।"

অরবিন্দের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বিপিনচন্দ্রের কথায় এবারে অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। রবীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল কথিত স্বদেশী শাসন স্থাপন কল্পে 'পল্লী-সমাজ'-এ একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা বিবৃত করলেন। কিন্তু কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ বালগঙ্গাধর তিলক নূতন দলের আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী আরও বস্তুগত ও সময়োপযোগী করে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন। তিলকও স্বরাজ্যের আদর্শে নিষ্ঠাবান্। কিন্তু সময়ের উপযোগী করে তিনি স্বরাজ্যের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করলেন, "প্রকৃতিপুঞ্জের মতানুসারে পরিচালিত রাজ্য বৈদেশিক রাজার অধীন হলেও স্বরাজ্য নামে অভিহিত হবার যোগ্য।

প্রকৃতিপুঞ্জের মত উপেক্ষিত হলে হিন্দু রাজার রাজ্যও স্বরাজ্য নামে অভিহিত হতে পারে না।" নূতন দলের উদ্দেশ্য এবং নূতন ও পুরাতন ভাবধারার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে তিলক মহোদয় মিঃ নেভিন্সন নামক একজন ইংরেজ সাংবাদিকের নিকট এই মর্ম্মে বলেন,

"আমরা যে চরমপন্থী আখ্যা পেয়েছি তা আমাদের উদ্দেশ্যের বিশিষ্টতার জন্য নয়, আমাদের কর্ম্মপন্থার বৈশিষ্ট্যের জন্য। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ হোক্, ব্রিটিশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক এখনই ছিন্ন হোক—ভারতবর্ষের খুব অল্প লোকই এটি চান। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের শাসনভার যাতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আমাদের হাতে আসে তা-ই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের আশা—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি সম্মিলিত হয়ে প্রাচীতে এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করবে। বর্ত্তমানে আমরা আমাদের কর্ম্ম দ্বারা আমলাতন্ত্রকে জানাতে চাই, তাদের অনুসৃত পদ্ধতি সকলই ভাল নয়। বর্ত্তমান যুগের ইংরেজ রাজনীতিকরা পুরাতন রোম-সাম্রাজ্যকেই সাম্রাজ্য-শাসনের আদর্শ করে নিয়েছেন।

"কিরূপে আমরা আমলাতন্ত্রের চৈতন্যের উদ্রেক করতে পারি আজকের সমস্যা তাই। আর এখানেই তথাকথিত মডারেটদের সঙ্গে আমাদের মতানৈক্য। মডারেটরা এখনও আশা করেন যে, বিলাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তথাকার জনমত গঠন করা সম্ভব। চরমপন্থীরা এ আশা রাখেন না। তাঁদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে, ইংলণ্ডের জনসাধারণও ভারত-শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সেখানে মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া কেউই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ খোঁজ-খবর লওয়া আবশ্যক মনে করে না। অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীরা স্বদেশে গিয়ে ব্রিটিশ জনমতকে ভারতবাসীর বিরোধী করে তোলেন। তাঁরা বরাবরই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। লর্ড ক্রোমার সেদিন পার্লামেণ্টে বলেছেন,

'ভারত-কথা আলোচনা কালে আমাদের দলগত পার্থক্য ভুলে যাওয়া উচিত।' অর্থাৎ তাঁর মতে রক্ষণশীল দলের ন্যায় উদারনৈতিক দলেরও অন্ধভাবে বুরোক্রাসী বা আমলাতন্ত্রের সমর্থন করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ঐরূপ কর্ত্তব্য দুটি দলই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন! হতাশ হয়েই আমরা—ভারতের চরমপন্থীরা অন্য পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের আদর্শ—আত্মনির্ভরতা, ভিক্ষাবৃত্তির তিরোধান। বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমাদের অস্ত্র। কারো উপর বলপ্রয়োগের আমরা পক্ষপাতী নই। কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে যদি দুঃখ বরণ করতে হয় তাতেও আমরা পশ্চাৎপদ হব না।"

নূতন দলের মত যখন এইরূপ তখন পুরাতন দল যে তাদের থেকে দূরে সরে পড়বেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি! গবর্ণমেণ্ট নরম ও চরম পন্থীদের মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখে চরমপন্থীদের দূরে সরিয়ে নরমপন্থীদের কোলে টান্‌বার ব্যবস্থা করলেন। ভারত-সচিব জন মর্লি ত স্পষ্টই বলেছেন, শাসন ব্যাপারে কিছু সুবিধা দিয়ে নরমপন্থীদের সরকারের অনুবর্ত্তী করে নেওয়াই সঙ্গত ("to rally the Moderates")! চরমপন্থীদের উপর সরকারের কোপদৃষ্টি পতিত হতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। পঞ্জাব, বাংলা, বোম্বাই এ তিনটি প্রদেশেই দমন কার্য্য সুরু হয়। রাজদ্রোহকর বিষয় প্রকাশের জন্য পঞ্জাবের 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক ও মুদ্রাকর এবং 'পাঞ্জাবী' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পঞ্জাব সরকারের রাজস্ব-বৃদ্ধি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করায় জাতীয় আন্দোলনের প্রধান হোতা লালা লজপৎ রায় ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী হন ও সরাসরি একেবারে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত হন (৯ই মে, ১৯০৭)। সর্দ্দার অজিত সিংহও এই আইনে কারারুদ্ধ হলেন।

বঙ্গে অনুসৃত নীতির মধ্যে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব ছিল। বাংলার চরমপন্থী নরমপন্থী উভয় দলই বিলাতী পণ্য বর্জ্জনে সমান তৎপর। কারণ বঙ্গভঙ্গ ব্যাপার তাদের প্রাণকে সমানভাবেই উদ্বেলিত করে। গবর্ণমেণ্ট মুসলমানকে হিন্দু থেকে আলাদা করে রাখ্‌তে আগে থেকেই তৎপর হয়েছেন। স্বার্থপর প্রচারকদের প্ররোচনায় অজ্ঞ মুসলমানগণ এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ঢাকা, জামালপুর ও কুমিল্লায় দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ সরকার হাঙ্গামার গুরুত্ব এই বলে লাঘব করতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দু দোকানীরা মুসলমানদের নিকট বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় করতে অস্বীকার করায়ই এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছে! কিন্তু বিচারকালে এসব মিথ্যা বলেই প্রতিপন্ন হ'ল। ভেদ-নীতি বিচার বিভাগকেও তখন অনেকটা আচ্ছন্ন করে ফেলে। কুমিল্লার ইংরেজ দায়রা জজ কোন দাঙ্গাকারীর মোকদ্দমায় হিন্দু ও মুসলমান সাক্ষীদের দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ও হিন্দুদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে মুসলমানদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য বলে রায়ে উল্লেখ করেন! হাইকোর্টে আপীল হলে বিচারপতিরা এরূপ পক্ষপাত-মূলক বিচার-পদ্ধতির অজস্র নিন্দা করলেন ও এই মর্ম্মে মন্তব্য করলেন যে, এরূপ লোক বিচারাসনে বস্‌বার সম্পূর্ণ অযোগ্য!

সরকারের নজর পড়ল অতঃপর বঙ্গের চরমপন্থীদের উপর। 'যুগান্তর' চরমপন্থীদেরও অগ্রণী, কাজেই এর উপরই প্রথম নজর পড়ল সরকারের। সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সর্ব্বপ্রথম ধৃত হলেন ও কল্‌কাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারে ২০শে জুলাই এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুদ্রাকরের দণ্ড হ'ল দু'বছর। বিবেকানন্দ-ভূপেন্দ্রের জননীকে কল্‌কাতার নারীসমাজ প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করলেন। প্রগতিবাদী 'বন্দেমাতরম্' ও 'সন্ধ্যা'র উপরও সরকার সমান চটা। 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকরূপে অরবিন্দ ঘোষ ও 'সন্ধ্যার' সম্পাদক-

রূপে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ধৃত হন। এ দুজনের মোকদ্দমায় বিশেষ নূতনত্ব ছিল। বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। এজন্য আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তিনি ছ' মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বিপিনচন্দ্রের বিচারের দিন আদালতে বিস্তর জনসমাগম হয়েছিল। তখন ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে হাঙ্গামা হয়। মেজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড সুশীল সেন নামক একটি কিশোর ছাত্রকে পনর ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বিপিনচন্দ্র ইতিপূর্ব্বে এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে গিয়ে নূতন ভাবাদর্শ সম্বন্ধে নানা স্থানে বহু বক্তৃতাও করেছিলেন। যাহোক্, মোকদ্দমায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করলেন (২৩শে সেপ্টেম্বর)। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি সন্ন্যাসী, ইংরেজ রাজের সাধ্য নেই যে তাঁকে কারাবদ্ধ করেন। হ'লও তাই। তিনি হাজত থাকা কালে ইহলোক ত্যাগ করলেন। উপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু মামলার শুনানী আরম্ভেই (২৩শে সেপ্টেম্বর) বলেছিলেন, বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট স্বরাজ আন্দোলন সম্পর্কে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের নিকট জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন্! তিনি সরকারের সঙ্গে কার্য্যতঃ অসহযোগের সূচনা করলেন। সকল মোকদ্দমাই মিঃ কিংসফোর্ডের এজলাসে নিষ্পন্ন হয়। তাঁর রূঢ় ব্যবহারে লোকে খুবই উত্যক্ত হয়েছিল। সরকার ১৯০৭, ১লা নবেম্বর সিডিশাস্ মিটিংস্ 'এ্যক্ট' বা রাজদ্রোহকর সভা বন্ধ আইন ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পাস করিয়ে নেন। এর দ্বারা প্রকাশ্য সভায় রাজনীতির আলোচনা বন্ধ করা হ'ল। ছ'মাস পূর্ব্বেই কিন্তু একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে ভারত গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে ও পূর্ব্ববঙ্গে সভা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিলাতে উদারনৈতিক দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় কংগ্রেসের পুরাতন-পন্থী নেতারা যেন মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের সন্ধান পেলেন। লর্ড

কার্জ্জনের স্বৈর-শাসনের প্রকোপে তাঁরা একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বিলাতের জনমত গঠন করে উদারনৈতিকদের সাহায্যে ভারত-ভাগ্য ফেরাতে সক্ষম হবেন এরূপ আশা করতে লাগ্‌লেন। গোখ্‌লে কংগ্রেস প্রতিনিধিরূপে বিলাত গেলেন ও মর্লিকে তাঁদের তরফে সর্ব্ব রকমে সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। স্বদেশবাসী প্রগতিপন্থীদের তাঁরা মনে করলেন দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের শত্রু, সুতরাং তাঁদেরও উদ্দেশ্য পথে বিঘ্ন। তাঁরা প্রগতিবাদীদের কটুকাটব্য করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ নানা সময়ে প্রগতিবাদীদের 'Grasshoppers', 'Cricketers', 'Pestilential demagogues' প্রভৃতি 'মধুর' সম্বোধনে সম্বোধিত করতেও ছাড়েন নি। পুরাতন দলের প্রধান পাণ্ডা ছিলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্‌তা। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর ও কৃষ্ণস্বামী আয়ারও তখন নূতন দলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরে কংগ্রেসে নূতন দলের প্রাধান্য হলে মডারেটগণ কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু মালবীয়জী কংগ্রেসের সঙ্গেই বরাবর যুক্ত রয়েছেন ও বৃদ্ধ বয়সে দেশমাতৃকার সেবায় কারাবরণও করেছেন।

কংগ্রেসে আদর্শ-দ্বন্দ্ব বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়। ১৯০৭ সালের সভাপতি নির্ব্বাচন নিয়েই এই দ্বন্দ্ব ঘোরাল হয়ে উঠ্‌ল। এবারে নাগপুরে কংগ্রেস হবার কথা ছিল। এখানকার জাতীয়তাবাদীরা মহামতি তিলককে সভাপতি পদে বরণ করতে চাইলেন। এ নিয়ে দু'দলে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে নাগপুর থেকে সুরাট শহরে অধিবেশন পরিবর্ত্তিত হয়। স্থান-পরিবর্ত্তনে পুরাতন পন্থী ফিরোজ শা মেহ্‌তার খুবই হাত ছিল। সুরাটের কংগ্রেসীরা প্রায় সকলেই পুরাতন পন্থী ও মেহ্‌তার মতাবলম্বী। কাজেই এই স্থানই নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়। এই সময় লালা লজপৎ রায়ের কারামুক্তি হয়। সুতরাং তিলক লজপৎ রায়কে সভাপতি করার প্রস্তাব

করলেন। সমগ্র ভারতের প্রগতিবাদীরা এ প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করেন। কল্‌কাতায় অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ সাধারণ সভা করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পুরাতন পন্থীরা কিন্তু এতে রাজী হলেন না। লজপৎ রায় সরকারের কুনজরে পড়েছেন, তাঁকে সভাপতি পদ দিলে সরকার কংগ্রেসের উপরে খাপ্পা হয়ে উঠবেন এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। তাঁরা ত স্পষ্টই বলেছেন, কংগ্রেস জনমতের প্রতিভূ নন্, সরকার ও জনসাধারণ উভয়ের মধ্যে কংগ্রেস হ'ল মধ্যস্থ! যেখানে মত ও পথ উভয় দিকেই অনৈক্য সেখানে ঐক্যের আশা করাই ভুল। সুরাটে নানারূপ চেষ্টা সত্ত্বেও যে দু' দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়নি তার কারণও হ'ল এই।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখি। কংগ্রেসের নিয়ম-কানুন তখনও সুষ্ঠু ভাবে স্থিরীকৃত হয় নি। অভ্যর্থনা-সমিতিই এতদিন সভাপতি নির্ব্বাচন বা মনোনয়ন করতেন। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তা সমর্থিত করে নেওয়া হত মাত্র। এতদিন সভাপতি নির্ব্বাচনে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নি, সুতরাং সহজেই সভাপতি নির্ব্বাচন সম্পন্ন হ'ত। কোনরূপ মতানৈক্য উপস্থিত হলে কি উপায়ে তার মীমাংসা হবে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সে কথা কখনও ভাবেন নি। যখন এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা কংগ্রেস নিয়মে নেই তখন উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের অধিকাংশের ভোটেই এ বিষয়ে মীমাংসা হওয়া পার্লামেণ্টীয় রীতি। এজন্য মহামতি তিলক সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উপর মীমাংসার ভার দিয়ে পার্লামেণ্টের রীতি যথাযথ অনুসরণ করেছিলেন।

সুরাট কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য প্রায় ষোল শ' প্রতিনিধি উপস্থিত হলেন। এঁদের মধ্যে ন' শ আন্দাজ ছিলেন পুরাতন পন্থী আর প্রায় সাত শ' নূতন পন্থী বা চরমপন্থী। পুরাতন পন্থীরা কল্‌কাতা কংগ্রেসে

গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব প্রথমে নাকচ করতে চেয়েছিলেন, পরে নূতন দলের চাপে এর কিছু কিছু অদল-বদল করে গ্রহণ করতে রাজী হন। নূতন দল পূর্ব্বেই তাঁদের মনোভাব বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। সুরাটে পূর্ব্বে যে বোম্বাই প্রাদেশিক সম্মেলন হয় তাতে সার্ ফিরোজ শার নির্দ্দেশে এসব প্রস্তাব উত্থাপিতই হতে পারে নি। নাগপুর থেকে সুরাটে কংগ্রেসের স্থান বদলে নূতন দলের সন্দেহ বরং দৃঢ়ই হ'ল। সুরাটে উপস্থিত হয়ে তাঁরা স্থির করলেন যে, কংগ্রেসের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলির ভাষাগত বা ভাবগত পরিবর্ত্তন করা হবে না—এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলে তাঁরাও সভাপতি নির্ব্বাচনে প্রতিবন্ধকতা করবেন না। গোখ্‌লে পরে বলেছেন, প্রকাশ্য কংগ্রেস কি করবেন না করবেন সে সম্বন্ধে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। এ কথার যুক্তি যুক্ততা সকলেই স্বীকার করবেন ; তবে পুরাতন দল যে প্রস্তাবের কিছু অদল-বদল করতে চেয়েছিলেন এটা নিশ্চিত। গোখ্‌লেও এ পরিবর্ত্তনের কথা জান্‌তেন। নূতন দলের নেতা হিসাবে তিলক পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব-গুলি দেখ্‌তে চাইলেন, কিন্তু তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাতও করলেন না। নূতন দল অতঃপর স্থির করলেন, প্রকাশ্য কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচন থেকে আরম্ভ করে সকল কার্য্যেই তাঁরা ভোট গণনার দাবি করবেন। ২৬শে ডিসেম্বর প্রকাশ্য কংগ্রেসে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পঠিত হ'ল। তার পরে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করতে উঠে সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা আরম্ভ করেন। কিন্তু সভায় এরূপ গণ্ডগোল হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ পরদিনের জন্য সভা স্থগিত রাখ্‌তে বাধ্য হন। উভয় দলের মধ্যে মিলন-সূত্র পাওয়ার জন্য এবারে জোর চেষ্টা সুরু হ'ল। লালা লজপৎ রায়, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি এবিষয়ে অগ্রণী হলেন। মহামতি তিলক ও নূতন দল আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত

উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু পুরাতন পন্থীদের জিদের ফলে আপোষ সম্ভব হ'ল না। লালা লজপৎ রায় পরে বলেছিলেন, উভয় দলের বিরোধ এত গভীর যে, স্বতন্ত্র ভাবেই তাঁদের কিছুদিন কাজ করা কর্ত্তব্য।

পরদিন অধিবেশন যথারীতি আরম্ভ হ'ল। সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও মতিলাল নেহেরুর সমর্থনে ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিলক নূতন দলের নেতা হিসাবে সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় কিছু বল্‌বার জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে পূর্ব্বে পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু এর জবাব দেওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নি। সুতরাং তিলক সভাপতির আসন গ্রহণের পরেই মঞ্চে উঠে কিছু বলবার জন্য দাঁড়ান। সভাপতি তাঁর কার্য্য বিধিবহির্ভূত বলে নির্দ্দেশ দেন। তিলক তখন উপস্থিত প্রতিনিধিদের নিকট অনুমতি যাচ্ঞা করেন। পুরাতন পন্থীরা নানাদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন। গোখ্‌লে তিলককে আড়াল করে থাকায় তাঁর গায়ে কারো হাত বা আঘাত পড়ে নি। সভায় তুমুল কোলাহল উপস্থিত হ'ল। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ একখানা মারাঠা চটি সুরেন্দ্রনাথের গাত্র স্পর্শ করে ফিরোজ শা মেহ্‌তার গণ্ডদেশে গিয়ে পড়ল। ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে সভা ভঙ্গ হ'ল।

পুরাতনপন্থী নেতৃবর্গ এতে নিরস্ত হলেন না। তাঁরা ইস্তাহার জারি করে স্বমতানুবর্ত্তীদের নিয়ে পর দিন একটি 'কন্‌ভেনশন' বা সম্মেলন বসালেন। লজপৎ রায়ও এতে যোগদান করলেন। এই কন্‌ভেনশনে কংগ্রেসের আদর্শ নির্ণয় ও নিয়মপত্র রচনার উদ্দেশ্যে একটি সাব্‌-কমিটি গঠিত হ'ল। ১৯০৮ সালের ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল এলাহাবাদে কন্‌ভেনশনের এক অধিবেশন হয় ও কংগ্রেসের গঠন-তন্ত্র গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেস পর্য্যন্ত এই গঠন-তন্ত্র অনুসারেই মোটামুটি

সব কাজ পরিচালিত হয়েছে। সর্ব্বসমেত ত্রিশটি ধারা নিয়ে এই গঠন-তন্ত্র। কংগ্রেসের 'ক্রীড্' বা লক্ষ্য স্থির হ'ল,

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন দেশগুলির ন্যায় ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী অর্জ্জন ও দেশ-শাসনে ভারতের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই এই কংগ্রেস গঠিত। বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী ধীরে ধীরে সংস্কার করে আইনসঙ্গত উপায়ে এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। জাতীয় একতাবৃদ্ধি, জাতীয়তার উন্মেষ এবং দেশের নৈতিক, মানসিক, আর্থিক ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি সাধনও কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য।

"যাঁরা কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করে এর নিয়মাবলী মেনে চল্বার অঙ্গীকার করবেন তাঁরাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হবার যোগ্য।"

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি এইরূপ সদস্য সংখ্যা নিয়ে গঠিত হ'ল—মাদ্রাজ—১৪, বোম্বাই ২০, আসাম ও বঙ্গ ২৫, আগ্রা-অযোধ্যা ২৫, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২০, মধ্যপ্রদেশ ১২, বিহার ও উড়িষ্যা ২০, বেরার ৬, ব্রহ্মদেশ ৫, অন্ধ্র ১১, সিন্ধু ৫, দিল্লী-আজমীর-মাড়োয়ার-রাজপুতানা ৬। কমিটির সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান হওয়া চাই! কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণ ও সাধারণ সম্পাদকগণ বিশেষ প্রতিনিধি বলে গণ্য হবেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকগণই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কার্য্য করবেন।

সভাপতি নির্ব্বাচনে ভবিষ্যতে যাতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয় এজন্য গঠনতন্ত্রের ত্রয়োবিংশ ধারায় এই বিস্তারিত নিয়ম ধার্য্য হ'ল—জুন মাস শেষ হবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট কংগ্রেস সভাপতি পদের যোগ্য লোকের নাম প্রেরণ করবেন। জুলাই মাসের প্রথমেই অভ্যর্থনা-সমিতি শেষ নিয়োগের জন্য নাম নির্ব্বাচন

করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের নিকট প্রেরণ করলে সকলকে নিজ নিজ মত জানাতে হবে। তারপর আগষ্ট মাসের প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতি সব বিষয় বিচার করবেন। যিনি অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়ে অভ্যর্থনা-সমিতির অধিবেশনেও অধিক ভোট পাবেন, তিনই নির্ব্বাচিত হবেন। যদি অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নাম অভ্যর্থনা-সমিতিতে গৃহীত না হয় বা নির্ব্বাচিত সভাপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে পুনরায় নির্ব্বাচন প্রয়োজন হয় তা হলে অভ্যর্থনা-সমিতি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করবেন এবং তাঁদের নির্ব্বাচনই গৃহীত হবে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার পূর্ব্বেই এ কাজ সম্পন্ন করা চাই। যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে সে প্রদেশের লোক কখনও সভাপতি নির্ব্বাচিত হতে পারবেন না। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হবে না, নির্ব্বাচিত সভাপতিকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হবে মাত্র।

এইসব নিয়মে আবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে, ডক্টর রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে। কিন্তু এর পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের আকাশে একখণ্ড কাল মেঘ উত্থিত হ'ল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ প্রবীণ রাজনীতিকগণ বলেছিলেন, বরিশালের অনাচারের ফলে ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের উদ্রেক হওয়া আশ্চর্য্য কিছুই নয়। বাস্তবিক প্রায় দু'বছর ধরে বঙ্গের নানা স্থানে আমলাতন্ত্র যে নীতি অনুসরণ করেন—তাতে সকলেরই মন নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়েছিল।

বিচ্ছিন্ন বঙ্গের পশ্চিম অংশের ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার মধ্যেই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রথম অভিব্যক্তি। কল্‌কাতার ভূতপূর্ব্ব চীফ প্রেসীডেন্সী মেজিষ্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ড ১৯০৮

সালে মজঃফরপুরে দায়রা জজ হয়ে যান। তাঁর প্রাণনাশের জন্য ১৯০৮ এপ্রিল মাসে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দু'জন বিপ্লবী মজঃফরপুরে গমন করেন। তাদের গুলিতে ভ্রমক্রমে ৩০শে এপ্রিল প্রিংলি কেনেডি নামক একজন ইংরেজ ব্যবহারজীবীর পত্নী ও কন্যা নিহত হন। কেনেডি সাহেব ভারতীয়দের বন্ধু ছিলেন, একবার একটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেন। কেনেডি পত্নী ও দুহিতার মৃত্যুতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করে। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ঐ হত্যাকাণ্ডের পরই পুলিশ কল্‌কাতার মাণিকতলায় এক বোমা তৈয়ারীর কারখানা আবিষ্কার করে ও ২রা জুন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে। অরবিন্দ ঘোষকেও ঐ দিন তাঁর গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ভবনে গ্রেপ্তার করা হয়। আলীপুর বোমার মামলা বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলাগুলির মধ্যে একটি। এক বছর ধরে এ মামলা চলেছিল। কিন্তু এই মামলার মধ্যে আরো কয়েকটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কায় রাজ-সাক্ষী নরেন গোসাইকে নিহত করে ও জেলের মধ্যে স্বতন্ত্র বিচারে উভয়েরই ফাঁসি হয়ে যায়। সরকার পক্ষে বোমার মামলা পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাস। তিনিও ১৯০৯, ১০ই ফ্রেব্রুয়ারী বিপ্লবীদের হস্তে প্রাণ দিলেন। দু'মাস পরে একজন দারোগাও নিহত হলেন। সার্ এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর দ্বিতীয় বার আক্রমণ হয় ১৯০৮, ৭ই নবেম্বর।

অরবিন্দের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেছিলেন ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। মামলায় অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ মামলা পরিচালনায় স্বল্প পারিশ্রমিকে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেন,

জেরায় ও ছলজবাবে যেরূপ কৌশল ও কৃতিত্ব দেখান তাতে তাঁর খ্যাতিও এ সময় থেকে চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্যদের মামলা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত গড়ায় ও বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। অন্যান্যদেরও কঠোর শাস্তি হ'ল। হাইকোর্টে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা তদ্বির করতেন পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমসুল আলম; তিনিও গুলির আঘাতে নিহত হয়েছিলেন।

সরকারের দমন নীতি পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। নবশক্তি, যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্—এ চার খানি কাগজের উপর কর্তৃপক্ষের নজর ছিল অত্যধিক। প্রথম দুখানি কাগজের মুদ্রাকরদের যথাক্রমে দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা এবং ছ' মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হ'ল। ইতিমধ্যে এক সংবাদপত্র আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের প্রকোপে সব ক'খানা পত্রিকাই ১৯০৮ সালের মধ্যে উঠে যায়। যে-সব স্থানে স্বদেশীর কেন্দ্র সে-সব স্থানে পিটুনি পুলিশ বসিয়ে অধিবাসীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত টেক্স আদায় করা হয়েছিল। বরিশালে মুকুন্দ দাস তিন বছর ও ভবরঞ্জন মজুমদার দেড় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। এইভাবে বঙ্গের সর্ব্বত্র আরও বহু লোক দণ্ডিত হলেন।

বিপিনচন্দ্র পাল ৮ই মার্চ্চ বক্সার জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। এর পরদিন হাওড়া ষ্টেশনে লক্ষাধিক লোক তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে। পূর্ব্ব বছর মাদ্রাজ সফরের সময় তিনি সেখানে একটি জাতীয় দল গঠন করেছিলেন। এই দলের নেতা চিদম্বরম্ পিলে এই সময় নূতন ভাবধারা ব্যাখ্যা করে নানা স্থানে বক্তৃতা করেন। ১২ই মার্চ্চ তাঁকে ও তাঁর সহকর্ম্মী সুব্রহ্মণ্য শিবকে টিনেভেলী-টুটিকোরিনের কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেন। নিম্ন

আদালতের বিচারে চিদম্বরমের যাবজ্জীবন ও সুব্রহ্মণ্যের দশ বছর কারাবাসের আদেশ হয়! পরে হাইকোর্ট দণ্ডাদেশ কমিয়ে প্রত্যেকেরই ছ' বছর করে শাস্তি দিলেন।

এই সময় ভারত-সচিব লর্ড মর্লি ভারতের আমলাতন্ত্রকে 'চিনভ্‌নিক' নামে অভিহিত করেন। রুশিয়ার অত্যাচারী শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে চিনভ্‌নিক ছিল সেরা। লর্ড মর্লি এই দমন কার্য্যকে বহুবার 'নির্ম্মম', 'বীভৎস' ও 'সমর্থনের অযোগ্য' বলে তাঁর ডেসপ্যাচে ও লর্ড মিণ্টোকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাধারণভাবে এই নিপীড়ন কার্য্যের, বিশেষ উক্ত মোকদ্দমাটির বিষয় উল্লেখ করে বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে (১৯০৮, ১৪ই জুলাই) এই মর্ম্মে লেখেন, "রাজদ্রোহ অপরাধের বিচারে যে রকম ভীষণ দণ্ডদান করা হচ্ছে তাতে আমি বড়ই শঙ্কা অনুভব করছি, একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আজ আমি পাঠ করলাম, বোম্বাইয়ে যারা ঢিল ছুড়েছিল তাদের প্রত্যেকের এক বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে। এ ব্যাপার সত্য সত্যই বীভৎস। টিনেভেলী-টুটিকোরিনে দণ্ডিত দু' ব্যক্তির একজনের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অন্য জনের দশ বছরের কারাবাস—এসব একেবারেই সমর্থন করা যায় না। আমি কোন মতেই এরূপ বীভৎস ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারি না। এরূপ অন্যায় ও নির্ব্বুদ্ধিতা সত্বর প্রতিকারের জন্য আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমরা শান্তি শৃঙ্খলা বাজায় রাখব, কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বিত হলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে এরূপ কঠোরতায় লোককে বেশী করে বোমার দিকেই আকৃষ্ট করবে।"

ভারত সরকার ১৯০৮, ৮ জুন তারিখে একদিনের অধিবেশনেই বিস্ফোরক আইন ও সংবাদপত্র আইন ব্যবস্থা পরিষদে পাশ করিয়ে নেন্।

বিস্ফোরক দ্রব্য কারো কাছে পাওয়া গেলে তার দণ্ডের বিধান হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সংবাদপত্রের লেখার মধ্যে হিংসাত্মক কর্ম্মে প্ররোচনা থাক্‌লে কাগজ প্রকাশের অনুমতি বাতিল ও ছাপাখানা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ছাড়া সম্পাদক মুদ্রাকরেরও কঠোর দণ্ডের বিধান হ'ল। এ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই সংবাদপত্র শাসন সুরু হয়। মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়া' ও 'স্বরাজ্য', মধ্যপ্রদেশের 'হরিকিশোর', আলীগড়ের 'উর্দ্দু ই-মোয়ালা' ও বোম্বাইয়ের 'হিন্দু স্বরাজ্য', 'বিহারী' ও 'অরুণোদয়' প্রমুখ পত্রিকাগুলির কতক সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল, অন্য কয়েকটির সম্পাদকের কারাদণ্ড হ'ল।

কিন্তু 'কেশরী'-সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলকের মোকদ্দমার প্রতি সমগ্র ভারতেরই দৃষ্টি নিপতিত হ'ল বেশী করে! মজঃফরপুরের হত্যাকাণ্ডের পরে তিনি 'কেশরী'তে 'দেশের দুর্দ্দৈব', 'এসকল উপায় স্থায়ী নয়', 'বোমার প্রকৃত অর্থ' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। বলা বাহুল, তিনি এগুলিতে বোমা বর্ষণকারীদের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারের রুশীয় পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করতেও তিনি ভোলেন নি। এই হয়ত ছিল তাঁর উপর আমলাতন্ত্রের কোপের কারণ। তিলক বোম্বাইয়ে বসে ২৪শে জুন রাজদ্রোহের দায়ে ধৃত ও অভিযুক্ত হলেন। হাইকোর্টের দায়রায় একমাস ধরে বিচারের পর ২২শে জুলাই তাঁর ছ' বছর কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হ'ল। জুরীদের মধ্যে ছিলেন সাতজন ইউরোপীয় ও দু' জন পার্শী। পার্শী জুরিদ্বয় তিলককে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। দণ্ডাদেশ প্রাপ্তির পর তিলক বলেছিলেন—"জুরিরা যদিও আমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করেছেন তথাপি আমি নিজেকে নির্দ্দোষ মনে করি। আমি বিশ্বাস করি মানুষের বিচার ক্ষমতার অতীত এক শ্রেষ্ঠ শক্তি দ্বারা জগতের কার্য্য

পরিচালিত হয়ে থাকে। যে পবিত্র কর্ম্ম সাধনের জন্য আমি চেষ্টা-যত্ন করেছি, আমার দুঃখভোগে তা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হবে, হয়ত ভগবানের এ-ই অভিপ্রেত।” তিলকের এবম্বিধ দণ্ডাদেশে ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। বোম্বাই কলগুলির শ্রমিকগণ এতই ব্যথিত হয়েছিল যে, তারা ছ’ দিন পর্য্যন্ত কাজে যাওয়া বন্ধ রেখেছিল। ভারতবাসীরা এরূপ নিষ্ঠাবান্ দেশ-সেবককে এক বাক্যে ‘লোকমান্য’ উপাধি দিলে।

অতঃপর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক দিনের অধিবেশনেই সরকার ফৌজদারী আইন সংশোধন করে হত্যা ও ষড়যন্ত্র অপরাধে ধৃত আসামীদের সরাসরি বিচারে সুবিধা করিয়ে নেন্। এই আইনেরই আর একটি ধারায় তাঁরা যে-কোন সমিতিকে সন্দেহবশে বে-আইনী ঘোষণার অধিকার লাভ করেন। এর পরই বরিশালের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃৎ-সমিতি, কল্‌কাতার অনুশীলন ও অন্যান্য সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অর্দ্ধোদয় যোগ হয়েছিল। কল্‌কাতার বিভিন্ন সমিতির অধীনে স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলী এমন কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করে যে, পুলিশও তখন তাদের অজস্র প্রশংসা করে। কিন্তু অতঃপর সরকারের ধারণা হ’ল, এই সব সমিতিই রাজদ্রোহ প্রচারের প্রধান কেন্দ্র! ১৩ই ডিসেম্বরের মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেশচন্দ্র নাগ প্রমুখ বঙ্গের ন’ জন কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে ধৃত হয়ে বন্দী হলেন। বিক্ষুব্ধ বাংলা যেন শোকে মুহ্যমান হ’ল। বাংলার হৃদয়-তন্ত্রীতে এই ব্যাপার এমন প্রচণ্ড আঘাত করলে যে, তখনকার রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ধর্ম্মপ্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এর প্রতিবাদ

সভায় সভাপতিত্ব করে বাঙালীর মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এরূপ দুর্দ্দিনের মধ্যে ১৯০৮ সালে মাদ্রাজে খণ্ডিত কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে মিলনের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পুরাতনপন্থী ফিরোজ-শা মেহ্‌তার প্রতিবন্ধকতায় সে চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে দূরে রইলেন। সভাপতি ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় অভিভাষণে সরকারী দমন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেও নূতন দলের উপর কটূক্তি বর্ষণ করতে ভোলেন নি। অভিভাষণের শেষে অবশ্য তিনি নবীন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন যে, এমন একদিন হয়ত আস্‌বে যখন অগ্রণী যুবকদল মনে করবেন, পুরাতন পন্থীরা তাঁদের সময়ে সাধ্যমত কর্ম্ম করতে চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করেন নি।

এবারে কংগ্রেসে নানা প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম, সরকারের দমন নীতি, বিশেষতঃ বিনাবিচারে নেতৃবৃন্দের নির্ব্বাসন প্রভৃতি সম্পর্কে নিন্দাসূচক প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেন। জোহানেস্‌বার্গ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রেরিত প্রতিনিধি মুশীর হাসান কিদোয়াই দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দ্দশা কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করলেন। বক্তৃতার শেষে তিনি বল্‌লেন, "একবার আপনারা কল্পনা করুন, চীন সরকার চীন-প্রবাসী ইউরোপীয়দের উপর যদি এরূপ অপমান অত্যাচার করত তা হলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি কি ব্যবস্থাই-না অবলম্বন করত!"

এবারকার প্রধান প্রস্তাব হ'ল ভাবী মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার সম্পর্কে। লর্ড মর্লি ভারত-সচিবের তক্তে বসেই ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারের দিকে মনঃসংযোগ করেন। তিনি ১৯০৭, ২৬শে আগষ্ট ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

মিসেস এনি বেসান্ট

সিভিলিয়ান কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করেন। শাসন-সংস্কার বিষয়ে বড়লাট লর্ড মিণ্টোরও পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। মর্লির অনুমতি নিয়ে তিনিই এদিকে কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি শাসন-পরিষদের কয়েক জন সদস্যের উপর একটি নূতন শাসন-তন্ত্র প্রণয়ণের ভার দেন। তাঁরা পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে শাসন-তন্ত্র প্রণয়ণ করে ভারত-সচিবের নিকট পাঠান। লর্ড মর্লি কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচনে আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে স্থানীয় কর্ত্তাদের আগ্রহ দেখে তিনি সংযুক্ত ও পৃথক্—এর মাঝামাঝি এই নূতন ধরণের নির্ব্বাচন প্রণালী সন্নিবিষ্ট করে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব বড়লাটের নিকট ফের পাঠান। পুরাতন পন্থী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, আর এন্ মুধোলকার, লালা হরকিষণ লাল প্রভৃতি কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে মর্লির ডেস্প্যাস সমর্থন করলেন। কংগ্রেসের উদীয়মান নেতা মহম্মদ আলী জিন্না এই ডেস্প্যাচের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপনের উপায় ও জাতির ভবিষ্যৎ মুক্তির সন্ধান পান।

কিন্তু তখনকার দিনের মুসলমান প্রধানগণ, বিশেষতঃ যাঁরা আমলা-তন্ত্রের পরামর্শে লর্ড মিণ্টোর নিকট পৃথক্ নির্ব্বাচনের আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা কিছুতেই মর্লির প্রস্তাবে রাজী হলেন না। মর্লিকে পৃথক্ নির্ব্বাচনে সম্মত করাবার জন্য তাঁদের এক প্রতিনিধি দল লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এতে ফলোদয় না হওয়ায় বিলাতে ও ভারতবর্ষে এ নিয়ে আন্দোলন সুরু হ'ল। ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় যে মোস্লেম শিক্ষা সম্মেলন হয় তাতে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব হয়েছিল। পর বছর ডিসেম্বর মাসে করাচী অধিবেশনেও এ সম্বন্ধে পরামর্শ হয় ও নেতারা মিলে একটি গঠন-তন্ত্র রচনা করেন। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে

লক্ষ্ণৌ সহরে একটি সভায় গঠন-তন্ত্র গৃহীত হ'ল। প্রকৃত প্রস্তাবে মোস্‌লেম লীগের প্রথম অধিবেশন হ'ল ঐ সনের ডিসেম্বরে অমৃতশহরে; আর এতে সভাপতিত্ব করলেন পূর্ব্বোক্ত স্মারকলিপির অন্যতম রচয়িতা সার্ সৈয়দ আলী ইমাম। মুসলমানদের রাজভক্তি প্রকাশ এবং মুসলমান সমাজ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে উদ্ভূত ভুল ধারণা দূর করে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন মোস্‌লেম লীগের প্রথম উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত হ'ল। উদ্দেশ্যের দ্বিতীয় অংশে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ অধিকার রক্ষা ও তাদের প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগের কথা মোলায়েম ভাবে ব্যক্ত করার কথা হ'ল। তবে এই দুটি উদ্দেশ্য বজায় রেখে আবশ্যকমত ভারতবর্ষের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনও লীগ কর্ত্তব্য বলে গণ্য করলেন। সৈয়দ আলী ইমাম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য (স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ) খুবই প্রগতিশীল ও তৎকালে অনুষ্ঠিত নানারূপ অনাচারের উত্তেজক বলে মুসলমান সমাজের গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তবে তিনি অভিভাষণে কংগ্রেসের বিবিধ দাবি—যেমন শাসনবিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা, সৈন্যব্যয় হ্রাস, উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগ প্রভৃতি সমর্থন করেন। ভাবী শাসন-সংস্কারে পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবি পূরণ করা না হলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান হবে—এরূপ হুম্‌কি দেখাতেও কিন্তু সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভোলেন নি! বড়লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারতগবর্ণমেণ্ট তথা বিরাট্ আমলা-তন্ত্র যখন পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথার পক্ষে, তখন একা লর্ড মর্লির বিরোধিতায় কি আসে যায়? বস্তুতঃ সমবেত সমর্থনের সম্মুখে মর্লির বিরোধিতা বানের জলের মুখে শুক্‌নো পাতার মত কোথায় যেন ভেসে গেল! ১৯০৯ সালের ২৫শে মে তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পৃথক্ নির্ব্বাচন পদ্ধতি সহ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। আর একে কার্য্যকর করার জন্য

নিয়ম রচনার ভার পড়ল ঐ আমলাতন্ত্রেরই উপর। কাজেই পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর যখন ঐ সব প্রকাশিত হ'ল তখন মডারেটরাও ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না।

নির্ব্বাচক মণ্ডলী চার ভাগে বিভক্ত হ'ল—(১) সাধারণ (২) জমিদার (৩) মুসলমান ও (৪) বিশেষ। জমিদার ও মুসলমান ছাড়া হিন্দু জনসাধারণ এবারেও প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের অধিকার পেলে না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, বণিক্ সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়, করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হ'ল। তবে আগের চেয়ে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতিবারেই প্রত্যেক বিভাগের মিউনিসি-প্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডই সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পেলে। জমিদার ও বিশেষ শ্রেণীর নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে হিন্দু ও মুসলমানের ভোটাধিকারের তারতম্য করা হ'ল। একজন হিন্দু বছরে পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব দিলে তবে তার ভোটাধিকার জন্মাত, আর একজন মুসলমান বছরে সাড়ে সাত শ' টাকা দিলেই ভোট দিতে পারত! হিন্দু আয়কর দিলে ভোট-দানের অধিকারী হ'ত না, মুসলমান আয়কর দিলে ভোটদানের অধিকারী হ'ত। অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান রাজকর্ম্মচারী, মুসলমান অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেটরাও ভোটদানের অধিকার পেলেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা আগের চেয়ে কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হ'ল। বজেটের উপর ভোটদানের অধিকার এবারেও স্বীকৃত হয় নি, কিন্তু বজেট আলোচনার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। পরিষদে বজেট উপস্থিত করার পূর্ব্বে রাজস্ব-সচিব রাজস্ব সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করবেন স্থির হ'ল। এই বিবৃতির অংশ-বিশেষের উপর সদস্যগণ প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার পান। প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হলেও সরকার তা গ্রহণ করতে বাধ্য নন্। তবে এ সম্বন্ধে তাঁরা বিবেচনা করবেন এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। অন্যান্য

প্রস্তাব সম্বন্ধেও এই একই ধারা প্রযুজ্য। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও প্রসারিত করা হয়। প্রশ্নের উত্তর অসন্তোষজনক হলে অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অধিকারও প্রশ্নকারী সদস্য লাভ করেন। প্রাদেশিক পরিষদগুলির বেসরকারী সদস্যগণ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বেসরকারী সদস্যদের নির্ব্বাচন করতেন। ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সদস্য সংখ্যা তিন শ্রেণীর—নির্ব্বাচিত, মনোনীত বেসরকারী, মনোনীত সরকারী। প্রত্যেক পরিষদেই স্থানীয় শাসনকর্ত্তা (বড়লাট, ছোটলাট প্রভৃতি) সভাপতিত্ব করবেন স্থির হয়। নির্ব্বাচিত, মনোনীত ও সরকারী সদস্য এবং মোট সংখ্যার ফিরিস্তি এখানে দিলাম,

পরিষদ	নির্ব্বাচিত	মনোনীত	সরকারী	মোট সংখ্যা
ভারতবর্ষ	২৫ (২৭)	৭ (৫)	৩৬	৬৮
মাদ্রাজ	১৯ (২১)	৭ (৫)	২০	৪৬
বোম্বাই	২১	৭	১৮	৪৬
বঙ্গদেশ	২৬ (২৮)	৫ (৪)	২০	৫১ (৫২)
সংযুক্ত প্রদেশ	২০ (২১)	৬	২০	৪৬ (৪৭)
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম	১৮	৫	১৭	৪০
পঞ্জাব	৫ (৮)	৯ (৬)	১০	২৪
ব্রহ্মদেশ	১	৮	৬	১৫
বিহার ও উড়িষ্যা	(২১)	(৪)	(১৮)	(৭৩)
আসাম	(১১)	(৪)	(৯)	(২৪)

বঙ্গবিভাগ রহিত হলে ১৯১২ সালে যে নূতন ব্যবস্থা হয় তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'ল।

এ সময়ে বড়লাট বা গবর্ণরের শাসন-পরিষদেও একাধিক ভারতীয় সদস্য গ্রহণের কথা হয়। এর পূর্ব্বে ১৯০৯, ২৪শে মার্চ্চ বড়লাটের

শাসন-পরিষদে এড্‌ভোকেট জেনারেল সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আইন-সদস্য নিযুক্ত হন। আশ্চর্য্যের বিষয়, লর্ড রিপণ শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের প্রবল বিরোধিতা করেন। সৈয়দ আমীর আলীও এই সময় প্রিভি কৌন্সিলের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের কথা চলেছিল কয়েক বছর ধরেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমন-নীতিও প্রবলভাবে দেখা দেয়। ১৯০৯ সালে যখন শাসন-সংস্কার আসন্ন তখনও দমন-নীতির প্রকোপ প্রশমিত হয় নি। ১৯০৮ সালে মহারাষ্ট্রে গণেশ দামোদর সভারকর 'লঘু অভিনব ভারত-মেলা' নামে একখানা কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করেন। তিনি এজন্য অভিযুক্ত হন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে কবিতাগুলি রাজদ্রোহ-সূচক বিবেচিত হ'ল ও গণেশ দামোদর ১৯০৯, ৯ই জুন যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। গণেশ দামোদর কনিষ্ঠ বিনায়ক দামোদর সভারকরের সঙ্গে ১৮৯৯ সালে গণপতি-উৎসবের সময় 'ভারত-মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সালে ভারত-মেলার নাম দেওয়া হ'ল অভিনব ভারত সোসাইটি। ১৯০৫, জানুয়ারী মাসে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিষ্ট' নামে এক আনা মূল্যের একখানা পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তিনি দু' হাজার টাকা মূল্যের তিনটি বৃত্তি দিয়ে ভারতীয় যুবকদের বিলাতে শিক্ষালাভের সুবিধা করে দেন। বিনায়ক দামোদর সভারকর ১৯০৬ সালে পুণার ফার্গুসন কলেজ থেকে বি-এ পাস করে ঐ বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। তিনি ম্যাট্‌সিনির আত্মজীবনী মারাঠীতে অনুবাদ করেন ও দাদাকে দিয়ে পুণা থেকে প্রকাশিত করান। তিনি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭' নামে ইংরেজীতে একখানা পুস্তকও লেখেন। গণেশ দামোদরের নির্ব্বাসনে শ্যামজীর শিষ্যেরা ক্রুদ্ধ হয়ে এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর

হয়। মদনলাল ধিংরা বিলাতে বসে ১৯০৯, ১লা জুলাই সার্ উইলিয়ম কার্জ্জন ওয়াইলিকে নিহত করে। ওয়াইলিকে বাঁচাতে গিয়ে ডাঃ লাল-কাকা নামে একজন ভারতীয়ও মারা যান। বিচারে ধিংরার মৃত্যুদণ্ড হ'ল। অভিনব ভারত সোসাইটির অন্যান্য সভ্যগণ নাসিকের ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা করে। অভিনব সোসাইটি ও তার শাখাগুলি অতঃপর ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হ'ল ও সভ্যগণ অনেকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। বিনায়ক ধৃত হয়ে বোম্বাইয়ে প্রেরিত হন ও বিচারে তাঁর দণ্ড হয় যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন। আহ্মদাবাদে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উপরেও এই সময় বোমা বর্ষিত হয়।

এই অবস্থার মধ্যে লাহোরে খণ্ডিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল। উপস্থিত প্রতিনিধি সংখ্যা এবারে আড়াইশ'ও হয় নি। এবারকার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন লালা হরকিষণ লাল ও মূল সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। দু' জনেই শাসন-সংস্কারের নিন্দায় পঞ্চমুখ হলেন। সুরেন্দ্রনাথ শাসন সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন, "এ কথা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয় যে, নিয়ম-পত্রে মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারকে একেবারে বধ করা হয়েছে। কারা এরূপ ক্ষতি করেছে? কারাই বা একটি সুন্দর ব্যবস্থাকে এরূপ নির্ম্মমভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে? আমলাতন্ত্রই এজন্য ষোল আনা দায়ী। আমরা এই সামান্য সুযোগ-সুবিধার জন্যও যে কঠোর সাধনা করেছি তার প্রতিশোধ নেবার নিমিত্তই কি তারা এরূপ করলে?"

সৈয়দ আলী ইমামের ভ্রাতা সৈয়দ হাসান ইমাম পৃথক্ নির্ব্বাচনের দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করে বক্তৃতা করলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিমত বিলাতের কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে জ্ঞাপন করবার জন্য সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে প্রেরণের প্রস্তাব করা হ'ল।

আঁধারে আলো

(১৯১০-১৯১৫)

কংগ্রেসের প্রতিবাদে কোন ফল হ'ল না। নূতন নিয়ম সম্বলিত মলি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ১৯১০, ২৫শে ডিসেম্বর ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হ'ল। এর পূর্ব্বদিন কল্‌কাতায় ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলম জনৈক আততায়ীর গুলিতে মারা গেলেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টো ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ উন্মোচন কালে বল্‌লেন, শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হলেও এ প্রকার অনাচার তিনি কঠোর হস্তে দমন করবেন। পরবর্ত্তী ৯ই ফেব্রুয়ারী তিন আইনে বন্দী বঙ্গ-সন্তানগণ মুক্তি পেলেন। কিন্তু ঐ দিনই পরিষদের নিয়মাদি স্থগিত রেখে সরকার প্রেস আইন পাস করিয়ে নেন্। আগেকার আইনগুলির চেয়ে এর ক্ষেত্র হ'ল বহুব্যাপক। এই আইন অনুসারে নূতন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠাকালে মুদ্রাকরকে অন্যূন পাঁচ শ' ও অনধিক দু' হাজার টাকা সরকারে অগ্রিম জমা দিতে হত! সংবাদপত্রে আপত্তিকর জিনিষ প্রকাশিত হলে প্রথমে এক হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে জরিমানা আদায়ের বিধি ছিল। এর পরেও আপত্তিকর ব্যাপার পত্রস্থ করলে কাগজখানি ও মুদ্রাযন্ত্র একেবারে বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত। ১৯১০-১৯১৯, এই দশ বছরের মধ্যে এই আইন বলে ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০ খানা সংবাদ-পত্র ও ৫০০খানা বই বাজেয়াপ্ত হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা, বম্বে ক্রনিকেল, হিন্দু, ট্রিবিউন, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ইংরেজী ও বসুমতী, স্বদেশমিত্রম্, বিজয়া, ভারতমিত্র প্রভৃতি দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি এ আইনের কবলে পড়ে দণ্ডিত হয়েছিল। ডায়ার্কির আমলে এ আইন তুলে দেওয়া হয়।

লোকের সাধারণ সভা-সমিতি করার তো জো নেই, সংবাদপত্রে বা পুস্তক-পুস্তিকায় মনের ক্ষোভ ও বেদনার কথা প্রকাশ করাও আত্মহত্যারই সামিল। এ সময় এক দল তরুণ আবার আঁধারে পথ খুঁজতে লাগ্‌ল। ডাকাতি ও নরহত্যার হিড়িক পড়ে গেল। এ সময় যত রকম ডাকাতি ও নরহত্যা বা তার চেষ্টা হয় প্রায় সকলই রাজনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত বলে সন্দেহ করা হ'ল। হাওড়া ও ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলা এ বছরের দুটি প্রধান রাজনৈতিক মোকদ্দমা। প্রথমটিতে বহু লোক দণ্ডিত হ'ল। দ্বিতীয়টিতে চুয়াল্লিশ জন জড়িয়ে পড়লেও পনের জনের কঠোর কারাদণ্ড হয়। এর ভিতরে ঢাকা অনুশীলন-সমিতির নায়ক, তিন আইনের ভূতপূর্ব্ব বন্দী পুলিনবিহারী দাসও ছিলেন। তাঁর দণ্ড হ'ল সাত বছর। তিনি আন্দামানে প্রেরিত হলেন।

শাসনকাল পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই লর্ড মিণ্টো কার্য্যে ইস্তফা দিয়ে বিলাত চলে যান। বড়লাট ও ভারত-সচিবের মধ্যে ভারত-শাসনে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে মতদ্বৈধতা হেতুই মিণ্টো পদত্যাগ করেন। ১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে বড়লাট হয়ে আসেন। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড এ সময়ে মারা যান।

এবার কংগ্রেস হ'ল এলাহাবাদে। ভারত-বন্ধু সার্ উইলিয়ম ওয়েডার-বর্ণ এবারে সভাপতি পদে বৃত হন। তিনি দুটি প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন—হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরের ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদ দূরীকরণ ও কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা। অভিভাষণেও তিনি একথা ব্যক্ত করলেন। তাঁর মতে কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি ত্রিবিধ হওয়া উচিত—প্রথম, ভারতে জনমত গঠন ও ভারতবাসীকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান, দ্বিতীয়—গবর্ণমেণ্টকে অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন, তৃতীয়—বিলাতে প্রচারকার্য্য। তিনি আরও বল্‌লেন

যে, ইংরেজ ও ভারতবাসী একযোগে কার্য্য করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ("ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ অফ ইণ্ডিয়া") প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘকাল বিলম্ব হবে না। এবারকার অধিবেশনে সর্ব্বসমেত ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, কিন্তু নূতন ভাব-ধারার পরিপোষক কোন নির্দ্দেশই তাতে মিল্‌ল না। সভাবন্ধ আইন, প্রেস আইন প্রভৃতি দ্বারা ভারতবাসীর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। কংগ্রেস এর প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু এর প্রতিষেধ কল্পে কোন আইন-সঙ্গত উপায় তাঁরা বাৎলে দিলেন না। এ সময় আবার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতেও পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের কথা হ'ল। মহম্মদ আলী জিন্না এক প্রস্তাবে এই আত্মঘাতী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করলেন। সভাপতি সার্ উইলিয়মের চেষ্টা সত্ত্বেও চরমপন্থী ও নরম-পন্থীদের মধ্যে মিলন সংঘটিত হ'ল না। তিনি এলাহাবাদে ১৯১১, ১লা জানুয়ারী হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের এক সম্মিলিত বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে উভয়ের মধ্যে বিভেদের কারণগুলিই মাত্র নির্ণীত হ'ল।

১৯১১ সালে আবার বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম নানাদিকে অনুষ্ঠিত হতে লাগ্‌ল। পূর্ব্বেকার সভাবন্ধের আইনের মেয়াদ ছিল মাত্র তিন বছর। ১৯১০, নবেম্বর মাসে মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণ এ আইনটি যাতে একেবারে রদ হয়ে যায় তার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের মতিগতি বিচিত্র। ১৯১১ সালের মার্চ্চ মাসে পূর্ব্ব আইন তুলে দিয়ে আবার কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে সভাবন্ধ আইন পাস করিয়ে নিলে! বলা বাহুল্য, বেসরকারী সদস্যগণ এর ঘোর প্রতিবাদ করেছিলেন।

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে মডারেটরাও খুশী হতে পারেন নি। কাজেই প্রগতিশীল রাজনীতিকগণ, মায় যুবক সমাজ, এ ভুয়ো সংস্কারে সন্তুষ্ট হতে পারবেন না তা তো জানা কথা। দমন-নীতি মূলক আইন প্রণয়নে ও তার ব্যাপক প্রয়োগেও শিক্ষিত জনের অসন্তোষ বেড়ে

গেল। তবে বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম বন্ধ করার জন্যই ঐ সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় বলে সরকার পক্ষে ঘোষিত হয়েছিল। দমনমূলক এতগুলি আইন সত্ত্বেও কিন্তু ১৯১১ সালে ১৮টা, ও ১৯১২ সালে ১৩টা ডাকাতি ও নরহত্যা বা তার চেষ্টা হয়। ১৯১৩-১৬ সালের মধ্যে আবার বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রকোপ বাড়ে।

১৯১১, ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভারত-সচিব লর্ড ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ ও রাণী মেরী ভারতবর্ষে আগমন করেন। রাজা-রাণীর আগমন উপলক্ষে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীতে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জ একটি রাজকীয় ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন এবং পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের বাংলাভাষী অংশসমূহকে এক বঙ্গভুক্ত করার আদেশ দিলেন। ভারতবর্ষের রাজধানী কল্‌কাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের কথাও ঐ ঘোষণায় উল্লিখিত হয়। এবারে প্রাকৃতিক বাংলাকে যে আবার নূতন করে ভঙ্গ করা হ'ল একথা আনন্দের আতিশয্যে তখন কারো চোখে পড়ল না। তবে বাঙালী সাধারণ এতদিনের অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকারে কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। রাজধানী স্থানান্তরিত করায় কিন্তু তারা মোটেই খুশী হতে পারলে না। এ বিষয় এবারকার কল্‌কাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসুও তাঁর অভিভাষণে ব্যক্ত করেন। অত্যগ্রসর দল কিন্তু সরকারের অতিবিলম্বিত ভ্রম-সংশোধনে নিজ কর্ম্মপন্থা থেকে নিরস্ত হ'ল না, তাদের প্রচুর শক্তি অপ্রকাশ্য অলিগলিতে গুপ্ত কর্ম্মে নিয়োজিত হতে লাগল। দমন-নীতিও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চল্‌ল।

কংগ্রেসের কল্‌কাতা অধিবেশনে সভাপতি হওয়ার কথা ছিল শ্রমিক নেতা ও পরবর্ত্তীকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ রামসে ম্যাক্‌ডনাল্ডের। কিন্তু এ সময় তাঁর পত্নী-বিয়োগ হওয়ায় শেষ মুহূর্ত্তে এ ব্যবস্থার বদল

করতে হ'ল ও লক্ষ্ণৌর নেতা পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধরের উপর এ কার্য্য নির্ব্বাহের ভার পড়ল। বিষণনারায়ণ অভিভাষণের প্রথমেই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তিনি একস্থলে বলেন, আমলাতন্ত্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রাখবার জন্য যে-সব নীতি অনুসরণ করে তার ফলেই দেশে অশান্তির সৃষ্টি হয়। তিনি নূতন ভাব-ধারাকে সমর্থন করে বলেন, "আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক করতে হলে সম্প্রদায়গত স্বার্থ রক্ষার বদলে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জাতীয় আদর্শেই চালিত হওয়া উচিত। আগ্রহাতিশয্য, আদর্শবাদ, এমনকি অসম্ভবকে লাভ করার উৎকট আকাঙ্ক্ষাও কখনও কখনও ভাল। আদর্শবাদী, নূতনের পূজারীদের সঙ্গেই আমার অধিকতর সহানুভূতি, কারণ আমি জানি প্রত্যেক সংস্কার প্রয়াসী প্রতিষ্ঠানে একদল চরমপন্থী থাকা আবশ্যক। জগতের প্রত্যেক বড় কার্য্যেই এদের প্রয়োজনীয়তা আছে। ধীর পন্থা অবলম্বনে অনেক সময় অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে ভীরুতা ও ঔদাসীন্য এসে পড়ে। আমার মতে ভারতবর্ষে এখন এমন এক দল সাহসী ও উদ্যমশীল লোকের প্রয়োজন—যাঁরা অল্পেই সন্তুষ্ট হবেন না; এমন লোক চাই যাঁরা দেশের সেবায় একেবারে মরিয়া হয়ে উঠ্‌বেন।"

কিন্তু প্রেস আইন, সভাসমিতি আইন ও অন্যান্য দমন-নীতি মূলক আইনের জন্য ভারতের কর্ম্মশক্তি অবরুদ্ধ। এ আইনগুলির বিরুদ্ধে কংগ্রেসে যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু আমলাতন্ত্র অনড়, তারা এতে কর্ণপাতও করলে না।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পরে ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যুক্তবঙ্গকে একটি সকৌন্সিল গবর্ণরের প্রদেশে পরিণত করেন। বিহার-উড়িষ্যা ও আসামকে দু'টি স্বতন্ত্র প্রদেশ করা হ'ল। রাজধানীও

যথারীতি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। এ সময় ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গে ও পঞ্জাবে যুবকগণ বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে ও স্থানে স্থানে হত্যা-চেষ্টাও চল্‌তে থাকে। লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২, ২৩শে ডিসেম্বর রাজকীয় আড়ম্বরে শোভাযাত্রা করে হস্তীপৃষ্ঠে নূতন রাজধানী দিল্লীতে যখন প্রবেশ করেন ঠিক সেই সময় তাঁর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ও তিনি আহত হন। ১৯১৩, মার্চ্চ মাসেই কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা-পরিষদে ফৌজদারী আইন সংশোধন করান। অতঃপর ষড়যন্ত্রকে একটি বিশেষ ধারাবদ্ধ অপরাধ বলে গণ্য করা হ'ল। লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার অপচেষ্টা হেতু দিল্লীতে এক ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয় ও অপরাধীরা কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বিচারে দু' জনের ফাঁসি ও দু' জনের সাত বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। গবর্ণমেণ্ট রাসবিহারী বসুকে পঞ্জাবে বিপ্লব-কর্ম্মের নায়ক বলে উল্লেখ করেছেন। রাসবিহারী এই মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁকে কেউ ধরতে পারলে না। ছদ্মবেশে নানাস্থান ঘুরে তিনি জাপান চলে যান। রাসবিহারী বসু জাপান-সরকারে একটি উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বদেশে ও বিদেশে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় বিশেষ অবহিত ছিলেন। সরকারী উচ্চ পদগুলিতে ভারতবাসীরা যোগ্য হলেও নিযুক্ত হতেন খুবই কম। এসব পদ ভারতীয়দের অধিগম্য করবার জন্য কংগ্রেস দীর্ঘকাল আন্দোলন করেন। এবারে, লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে এসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও উপায় নির্দ্ধারণের জন্য লর্ড ইস্‌লিংটনের সভাপতিত্বে এগার জন সভ্য নিয়ে একটি রয়্যাল কমিশন গঠিত হ'ল। এতে ভারতীয় সদস্য ছিলেন তিন জন—গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, আব্‌দার রহিম ও চৌবল। রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড ও লর্ড রোনাল্ডশে কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশন দু' বার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ১৯১৫ সালের আগষ্ট মাসে

সরকারে এক রিপোর্ট পেশ করেন। যুদ্ধের জন্য রিপোর্ট প্রকাশ দু' বছর পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে গোখ্‌লে মারা যাওয়ায় কমিশনে তাঁর মতামত যুক্ত হতে পারে নি।

এ সময়ে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের পক্ষে খুবই অনুকূল হ'ল। বঙ্গভঙ্গের সময় সপক্ষে টান্‌বার জন্য মুসলমানদের নানা রকম বিশেষ সুবিধার প্রলোভন দেখান হয়। কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচন বাদে আর কোন সুযোগ-সুবিধা তাদের বরাতে জুট্‌ল না। মহম্মদ আলী জিন্না, হাসান ইমাম, ওয়াজির হাসান, মজহ্‌রুল হক্, মৌলানা মহম্মদ আলী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ পৃথক্ নির্ব্বাচনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। উচ্চ রাজপদেও মুসলমানরা বিশেষ কোনই সুবিধা পেলে না। সরকারী বিভাগগুলি হিন্দু মুসলমান উভয়ের পক্ষেই সমান দুর্ভেদ্য। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় তাদের অতিরিক্ত সুখ-সুবিধার আশাও আর রইল না। ওদিকে তুরস্কের উপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এক যোগে চেপে বস্‌ল। তুরস্কের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইউরোপের রুগ্ন মনুষ্য'। এই রুগ্ন মানুষটিকে ইউরোপ থেকে তাড়ানই ছিল ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য। ১৯১১-১৩ এই তিন বছর প্রথম বল্‌কান, দ্বিতীয় বল্‌কান ও ট্রিপলির যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলি জোট বেঁধে তার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়। এসময় তুরস্কের উপর ইংরেজের ব্যবহার ভারতীয় মুসলমানের নিকট বড়ই নির্ম্মম বলে বোধ হ'ল। কিন্তু এর প্রতীকার-চেষ্টা তাঁদের একার পক্ষে সম্ভব নয়। একারণ কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদানের জন্য তাঁরা, বিশেষ করে প্রগতিবাদী মুসলমানগণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অবশ্য জিন্না, হাসান ইমাম প্রভৃতি আগেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১২, ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় এ উদ্দেশ্যে মাননীয় আগা খাঁর নেতৃত্বে

মুসলমানগণ সম্মিলিত হলেন ও মোসলেম লীগের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে কংগ্রেসের অনুরূপ ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্তির আদর্শ গ্রহণ করা সাব্যস্ত করলেন। পরবর্ত্তী ২২শে মার্চ্চ লক্ষ্ণৌ শহরে সার্ ইব্রাহিম রহিমতুল্লার সভাপতিত্বে মোসলেম লীগ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট আদর্শ গ্রহন করলেন। কংগ্রেস পরবর্ত্তী করাচী অধিবেশনে (১৯১৩) জাতীয়তামূলক আদর্শ গ্রহণের জন্য মোস্‌লেম লীগকে অভিনন্দিত করেন।

বাঁকীপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ১৯১২ সালে। এ বছর কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এলান অক্টেভিয়ান হিউম মারা যান। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মজহ্‌রুল হক্ তাঁর অভিভাষণে এজন্য গভীর শোক প্রকাশ করেন। এবিষয়ে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হ'ল। তিনি তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করলেন। সভাপতি আর এন্ মুধোলকার ভাবী ভারত গবর্ণমেণ্টের আদর্শ ব্যক্ত করেন এইরূপ—ভারতবর্ষ হবে কতকগুলি স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন প্রদেশের সমষ্টি। ভারত-সরকার সহজে এদের উপর হস্তক্ষেপ করবেন না। প্রাদেশিক শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেই তবে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করার অধিকারী হবেন। আন্তর্জাতিক ব্যাপারসমূহের মধ্যে ভারত-সরকারের কর্ত্তব্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ থাক্‌বে।

এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা অতি মাত্রায় ঘোরাল হয়ে উঠে। ১৯০৭ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয়দের লাঞ্ছনা নিরাকরণ জন্য পুনরায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন। প্রতি ভারতবাসীর মাথাপিছু বার্ষিক তিন পাউণ্ড পোল ট্যাক্সের কথা আমরা আগে বলেছি। ঐ বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের ভারতীয়ত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য এমন একটি আইন বিধিবদ্ধ হ'ল, যার ফলে প্রত্যেক ভারতবাসীকেই একটি দলিলে টিপসহি দিতে বাধ্য

করান হয়। মহাত্মা গান্ধী এই অপমানকর ব্যবস্থার ও অন্যবিধ লাঞ্ছনার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। প্রবাসী ভারতবাসীরা তাঁর অনুবর্ত্তী হলেন। আরম্ভেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী জেনারল স্মাট্‌সের সঙ্গে তাঁর আপোষ রফার কথা হয়। কিন্তু স্মাট্‌স্ আপোষের সর্ত্তে রাজি হয়েও শেষ পর্য্যন্ত তা রক্ষা করলেন না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী ভারতবন্ধু এইচ এস এল পোলক ১৯১১ সালে কল্‌কাতা কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন যে এই আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী সমেত সাড়ে তিন হাজার সত্যাগ্রহী কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন ও তাদের প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করা হয় যে, জেল থেকে বের হবার সময় তাদের মুখ চেনা কঠিন হয়েছিল! ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে, এজন্য ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ করে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। গোখ্‌লে মহোদয় ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ভারতের বাইরে শ্রমিক প্রেরণের নিষেধাত্মক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাব গৃহীত না হলেও সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ কার্য্যকর করবার প্রতিশ্রুতি দেন। বস্তুতঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রবাসী ভারতীয় সমস্যার সমাধানে খুবই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাজের মহাজনসভা ও প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিনন্দনের উত্তরে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। গোখ্‌লে বাঁকিপুর অধিবেশনে তাঁর অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

১৯১৩ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হ'ল। এ বছর ১৪ই মার্চ্চ তারিখে এখানে এই মর্ম্মে আর একটি আইন পাস করিয়ে নেওয়া হয় যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্মত বিবাহই শুধু

বৈধ। এর ফলে হিন্দু বিবাহ ও মুসলমান বিবাহ পরোক্ষে অবৈধই প্রতিপন্ন হ'ল। এ নিয়েও খুব আন্দোলন স্থুরু হয়। এবারে গান্ধী-সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবাঈ গান্ধীর নেতৃত্বে নারীগণও সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। নারীদের উপরও নানারূপ উৎপীড়ন হয় ও কস্তুরবাঈ প্রমুখ অনেকে কারাবরণ করেন। গোখ্‌লের নির্দ্দেশে সেবারত চার্ল্‌স্ ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ ও ডব্‌লিউ ডবলিউ পীয়ার্সন দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়ে ভারতীয়দের নানাভাবে সাহায্য করেন। এরূপ আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদী স্মাট্‌সকেও কতকটা অবনমিত হতে হ'ল। পোল ট্যাক্স বা জিজিয়া কর, টিপসহি আইন, বিবাহ আইন প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় নিয়ে গান্ধী ও স্মাট্‌স-এর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। এই আলোচনার ফলে যে-সব সিদ্ধান্ত হয় তা ১৯১৪ সালের স্মাট্‌স-গান্ধী চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুযায়ী এ বছর 'ইণ্ডিয়ান রিলিফ এক্ট নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ দ্বারা জিজিয়া কর ও টিপসহি আইন তুলে দেওয়া হ'ল। সরকার প্রত্যেক ভারতীয়ের একটি স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সন্তান-সন্ততিকে আইনসঙ্গত বলে স্বীকার করে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের অনুমতি দিলেন।

মোসলেম লীগের আদর্শ নির্ণয়ের কথা পূর্ব্বে বলেছি। ১৯১৩ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল করাচীতে। সভাপতি মাননীয় নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর বলেন যে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়কেই একযোগে কর্ম্মে লিপ্ত হতে হবে। মোস্‌লেম লীগ কংগ্রেস নেতৃবর্গের সঙ্গে সম্মিলিত হবার জন্য যে ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন এজন্য সভাপতি মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয়দের সংগ্রাম ও সাফল্যের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এ সময় কংগ্রেসের

পক্ষে পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের কথা জানা সম্ভব ছিল না, তাই নেতৃবর্গ মহাত্মা গান্ধী ও প্রবাসী ভারতীয়দের কার্য্যের সমর্থন করে ও দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ফিজি, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশে প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। এই সময়ে কানাডার প্রিভি কৌন্সিল এক রুল জারি করেন যে, ভারতবর্ষ থেকে একই জাহাজে সোজাসুজি কানাডায় না পৌছলে কোন ভারতবাসীকেই সেখানে অবতরণ করতে দেওয়া হবে না! বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ থেকে কানাডায় যাবার কোন জাহাজ লাইন ছিল না, কোন জাহাজ কোম্পানীই ক্ষতি স্বীকার করে সোজাসুজি কানাডায় জাহাজ চালাতে রাজি নয়। কানাডায় চার হাজার শিখ বাসিন্দা ছিল। কানাডা-প্রবাসী শিখগণ সর্দ্দার নন্দ সিংকে প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেসে প্রেরণ করে। উক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদে কংগ্রেসে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ল তার উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতবাসীদের উপর এরূপ বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তনের কারণ—কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাস, কানাডার স্বাধীন আবহাওয়ায় বিচরণ করলে ভারতবাসীরা ক্রমে নিজেদের ভেদবুদ্ধি ভুলে যাবে ও স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হবে! কানাডার নেতৃবর্গ প্রকাশ্যেই এই কথা বলেছেন!

যা হোক্, এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্য সিঙ্গাপুর ও মালয়ের বিখ্যাত কন্ট্র্যাক্টর বাবা গুরুদিৎ সিং 'কোমাগাটা মারু' নামে একখানা জাপানী জাহাজ ভাড়া করে পঞ্জাবী মুসলমান ও শিখ যাত্রীসহ হংকং থেকে ১৯১৪, ৪ঠা এপ্রিল কানাডায় রওনা হন ও পরবর্ত্তী ২৩শে মে ভাঙ্কুভারে পৌছেন। কানাডা-সরকার সেখানে যাত্রীদের অবতরণ করতে না দেওয়ায় ঠিক দু'মাস পরে ২৩শে জুলাই তাঁরা স্বদেশে ফিরতে বাধ্য

হলেন। পরবর্ত্তী ১৯শে সেপ্টেম্বর এই জাহাজ বজবজ পৌঁছে। গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদলকে বিপ্লবী সন্দেহে পুলিশ হেপাজতে সরাসরি পঞ্জাবে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যাত্রীরা অনেকে গবর্ণমেণ্টের নজরবন্দী হয়ে যেতে অস্বীকার করেন। ফলে পুলিশ ও তাদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা হয় ও কয়েকজন হতাহত হন। বাবা গুরুদিৎ সিং ও অন্যান্য আঠাশ জন যাত্রী পুলিশের নজর এড়িয়ে অন্যত্র চলে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর গোপন ভাবে থেকে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাবা গুরুদিৎ সিং পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

ইতিমধ্যে জুলাই মাসে ইউরোপে মহাসমর আরম্ভ হয়। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুবরাজ ডিউক অফ ফার্ডিনাণ্ড সার্বিয়া ভ্রমণকালে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। মহাযুদ্ধ বাধবার উপলক্ষ্য হ'ল এই। একদিকে জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক আর অন্যদিকে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রুশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল। শেষোক্ত পক্ষকে এক কথায় বলা হয় মিত্রশক্তি। জাপান মিত্রশক্তিদের পক্ষে থেকে প্রাচীতে খবরদারি করতে লাগল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বাধবার তিন বছর পরে ১৯১৭ সালে এক সঙ্কট মুহূর্ত্তে মিত্র-শক্তির পক্ষে এসে যোগ দেয় ও তাদের জয়লাভ সম্ভব করে তোলে। যা হোক্, ব্রিটেন মহাসমরে পক্ষ গ্রহণ করায় স্বভাবতঃই তার সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলিকে তথা ভারতবর্ষকেও তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। ভারত-বাসীদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট দল ইংরেজের উপর বিদ্বিষ্ট। তারা এই সুযোগে ব্রিটিশের শক্তি হানি করে ভারতবর্ষের কিছু সুবিধা করে নিতে চাইলে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে যে নিপীড়ন নীতি আরম্ভ হয় তার ফলে এক শ্রেণীর ভারতীয় (এদের ভিতর যুবকই বেশী) গোপনে গোপনে বিপ্লবী দল গঠন করে। সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় ও পঞ্জাবে, এ দলের কর্ম্ম-ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলার কথা এর আগে কিছু বলেছি। ১৯১৪ থেকে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত এখানে নানারকম বিপ্লবাত্মক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। ডাকাতি ও পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যা বা হত্যার অপচেষ্টা এদের প্রধান কর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়। পঞ্জাবেও এই সময় বিপ্লবাত্মক ব্যাপার ঘট্‌তে থাকে। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ তিন সম্প্রদায়ের লোকই এই বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত ছিল। লালা হরদয়াল, সর্দ্দার অজিৎ সিং, বরকতুল্লা, মৌলবী ওবেদুল্লা সিন্ধি, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, ভাই পরমানন্দ (বর্ত্তমান হিন্দুমহাসভার অন্যতম নেতা) প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিগণ প্রবাসে থেকে বিপ্লবী দল পরিচালনে সহায়তা করতেন। লালা হরদয়াল ছিলেন 'গদর পার্টির' প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়ায় ছিল এর কেন্দ্রস্থল। পরে এর শাখা বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের উদ্যোগে ও ডক্টর তারকনাথ দাসের সহযোগিতায় বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল পার্টি' নামে এক সঙ্ঘ গঠিত হয়। তুরস্কের উপর অস্ত্রাঘাত করায় ওবেদুল্লা সিন্ধী, বরকতুল্লা প্রভৃতি বিশেষ ব্যথিত হয়ে ইস্‌লামের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে বদ্ধপরিকর হলেন। কাবুলে এঁদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল।

ইতিমধ্যে বিস্তর বিপ্লবী বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সহ পঞ্জাবে প্রত্যাগমন করে ও বিপ্লবাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হয়। লাহোর ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য মামলায় বহু বিপ্লবী প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভাই পরমানন্দ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু বড়লাট দয়াপরবশ হয়ে মৃত্যু-দণ্ডের বদলে তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেন।

বঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিপ্লবী দলের নায়ক। জার্ম্মানীর নেশন্যাল পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগসাধন হয়। সাংহাই-এর জার্ম্মান কন্সাল অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে দু'খানা জাহাজ

বাংলায় পাঠান। একখানা সুন্দরবনের রাইমঙ্গলে ও অন্যখানা বালেশ্বরে পৌঁছবার কথা ছিল। ভারত-সরকার আগে থাক্‌তেই টের পেয়ে জাহাজগুলি হস্তগত করেন। বালেশ্বরে বিপ্লবী ও পুলিশের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এ সংঘর্ষে নিহত হন। নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য পুলিশের চোখ এড়িয়ে ছদ্মবেশে বিদেশ চলে যান। মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম্ এন্ রায় নামে তিনি এখন সুপরিচিত।

সপরিষদ পঞ্জাব লাট ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী ও তার প্রশ্রয়কারীদের সরাসরি বিচারের জন্য এক আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে লেখেন। সরকার বাংলা ও পঞ্জাবের বিপ্লববাদ দমনের জন্য একটি আইন প্রণয়নের আলোচনা ইতিপূর্ব্বেই সুরু করেন। এখন একটি প্রাদেশিক সরকারেরও সম্মতি পেয়ে দ্রুত আইন প্রণয়নে অগ্রসর হলেন। তাঁহারা ১৯১৫ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে একদিনের অধিবেশনেই ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এক্ট বা ভারত রক্ষা আইন পাস করিয়ে নিলেন! ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বঙ্গে ও পঞ্জাবে বহু লোক সন্দেহ বশে কারাবদ্ধ হন। 'কম্‌রেড' সম্পাদক মৌলানা মহম্মদ আলী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ 'হামদাদ' সম্পাদক মৌলানা সৌকৎ আলী, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ প্রমুখ বিখ্যাত মুসলমানগণও কারাগারে প্রেরিত হন। 'কম্‌রেড' ইতিপূর্ব্বেই প্রেস আইনের কবলে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়।

ভারতের আকাশ-বাতাস যখন এইরূপে অনুরণিত হয়ে উঠ্‌ল তখন কংগ্রেস কি করেছিলেন আজকের দিনে তা হয়ত অনেকে জিজ্ঞাসা করবেন। পুরাতন কংগ্রেস-নেতৃবর্গ জাতির সম্মুখে এমন কোন চিত্তজয়ী কর্ম্মাদর্শ স্থাপন করতে পারেন নি যাতে মতভেদ ভুলে সকলেই এর পতাকা তলে সম্মিলিত হয়ে জাতীয় আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে পারত। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কংগ্রেসের ভিতরেও

আশু স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মতবাদ প্রবল হয়ে উঠে। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু স্বায়ত্ত-শাসনের দাবির কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই দাবির পশ্চাতে যে সম্মিলিত জনমত প্রয়োজন তারও সম্ভাবনা তখন ভাল করেই দেখা দেয়। মোস্‌লেম লীগের কর্ণধারগণ এখন কংগ্রেসে যোগদানে ইচ্ছুক। আবার চরমপন্থীদের নিয়ে পূর্ব্বে যে বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল তা নিরাকরণের চেষ্টাও এ সময় আরম্ভ হয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক দীর্ঘ ছ' বছর কারাদণ্ড ভোগ করে এবার জুন মাসে নিজ কর্ম্মস্থল পুণায় ফিরে এসেছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিটেনকে সাহায্য করতে সকলকে আহ্বান করলেন ও একটি বিবৃতিতে ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্ত-শাসন লাভেই সম্মতি জানালেন। মডারেট বা নরমপন্থী দলের অনেকে এরূপ ঘোষণার মধ্যে মিলনের সূত্রই খুঁজে পেলেন। মিসেস্ এনি বেসাণ্ট এ বছরই প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন ও দু' দলের ভিতর মিলন সাধনের চেষ্টায় রত হন। কিন্তু এই মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিলেন সার্ ফিরোজ শা মেহ্‌তা। তাঁরই প্রতিবন্ধকতায় ১৯১৪ ও ১৯১৫ সালে কংগ্রেসে উভয় দলের মিলন সম্ভব হয় নি। কিন্তু সকলেই বুঝ্‌তে পারলেন, হাওয়া যেরূপ তাতে উভয়ের মিলন শীঘ্রই সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে।

১৯১৫ সালে কংগ্রেস হ'ল বোম্বাইয়ে। এবারকার সভাপতি হলেন সার্ (তখন লর্ড হন নি) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন যোগ ছিল না। তথাপি সার্ ফিরোজ শার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁকে এ পদ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ফিরোজ শা কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প পূর্ব্বেই মারা গেলেন। গোখ্‌লেও এই বছরের প্রথমে মারা যান। মিসেস্ বেসাণ্ট সমস্ত বছর ধরে দু' দলের মিলন সাধনের

জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমন করে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও সভাসমিতিতে এর আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। কংগ্রেসের এ অধিবেশনেই মিলনের পথ পরিষ্কার করা সম্ভবপর হ'ল। কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের বিংশতিতম নিয়ম পরিবর্ত্তন করে স্থির হ'ল—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন থেকে নিয়মানুগ ভাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভই ভারতবাসীর কাম্য—এই উদ্দেশ্য সম্বলিত অন্যূন দু' বছর বয়সের যে-কোন প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত জনসভা কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে সক্ষম।" সভাপতি সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন তাঁর অভিভাষণে বলেন যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা কিরূপ দেখ্‌তে চান তার একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা উল্লেখ করে বল্‌লেন, "কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত 'জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন' ("government of the people, for the people, and by the people") গবর্ণমেণ্টের সামরিক অসামরিক সকল বিভাগেই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা স্বায়ত্ত-শাসনের মূলগত অর্থ।

বোম্বাইয়ে এবারে মোস্‌লেম লীগেরও অধিবেশন হ'ল। কংগ্রেস সভাপতি প্রতিনিধিবৃন্দ সহ মোসলেম লীগে উপস্থিত হলেন। মোস্‌লেম লীগও তাঁদের বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করলেন। এর পর কয়েক বছর যাবৎ কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের অধিবেশন একই শহরে সম্পন্ন হয়। এর ফলে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের মধ্যে মেলামেশা ও আপোষ-আলোচনারও সুযোগ ঘটে।

এবারকার অধিবেশনে কংগ্রেস স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও মোস্‌লেম লীগ কর্ত্তৃক স্থাপিত কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে একটি শাসন-সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন করতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে নির্দ্দেশ দেন।

স্বায়ত্ত-শাসন প্রচেষ্টায় কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগ

(১৯১৬-১৯১৯)

ভাবী শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে খসড়া প্রণনের জন্য অতঃপর কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের মধ্যে অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ হয়। কয়েক অধিবেশনে আলাপ-আলোচনার পর লীগ-কংগ্রেস যুগ্ম কমিটি ১৯১৬, ১৭ই নবেম্বর তারিখে শাসন-সংস্কারের খসড়া প্রণয়ন সমাপ্ত করেন। অক্টোবর মাসে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দীনশা এদুলজী ওয়াচা, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাদুর সাপ্রু, মজহরুল হক্‌, মহম্মদ আলী জিন্না, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ বড়লাটের ব্যবস্থা-পরিষদের উনিশ জন নির্ব্বাচিত সদস্য যুদ্ধ-পরবর্ত্তী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে একটি স্মারকলিপি সরকারে পেশ করলেন।

কিছুকাল পূর্ব্বেই শাসন-সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনমত গঠন কল্পে বিশেষ চেষ্টা সুরু হয়। গণতন্ত্র-সম্মত শাসন ব্যবস্থায় এর আবশ্যকতা খুবই বেশী। মিসেস্‌ এনি বেসাণ্ট ১৯১৪, ২রা জুন 'কমনউইল' সাপ্তাহিক ও ১৪ই জুলাই 'নিউ ইণ্ডিয়া' দৈনিক এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ দু-খানিতে ভারত-শাসনের ভাবী রূপ এইরূপ ব্যক্ত করলেন—"গ্রাম্য পঞ্চায়েত হতে সুরু করে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ ও নিখিল-ভারতীয় পার্লামেণ্ট সর্ব্বত্র ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার অনুরূপ স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।" নেতৃবৃন্দ ভারতে জনমত গঠনের আবশ্যকতা উপলব্ধি না করায় তিনি এদিকে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। তিনি কংগ্রেসের আদর্শ নিয়েই

১৯১৬, সেপ্টেম্বর মাসে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে পূর্ব্বেই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। প্রেস আইন তখনও বলবৎ। যে-কোন ধরণের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা প্রকাশই বেআইনী বলে গণ্য হতে পারত। জনমত গঠনমূলক কোন আন্দোলনই আমলাতন্ত্রের সমর্থনযোগ্য নয়। কাজেই নানা ওজুহাতে হোমরুল বা স্বরাজ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার চেষ্টায় তাঁরা রত হলেন। ১৯১৬, ২৬শে মে 'নিউ ইণ্ডিয়া' থেকে দু' হাজার টাকা জামিন দাবি করা হ'ল। পরবর্ত্তী ২৮শে আগষ্ট জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁরা নূতন করে আবার দশ হাজার টাকা জামিন চাইলেন, টাকাও অবিলম্বে দেওয়া হ'ল। বেসাণ্ট-মহোদয়া এ আদেশের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে ও বিলাতের প্রিভিকৌন্সিলে আপীল করে ব্যর্থকাম হন।

এদিকে মহারাষ্ট্রে লোকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলকও তাঁর দৈনিক 'কেশরী' ও সাপ্তাহিক 'মরাঠা' দ্বারা 'হোমরুল' বা ভাবী স্বরাজের বার্ত্তা দিকে দিকে প্রচার করতে লাগ্লেন। তিনি কারাদণ্ড ভোগের পর মহারাষ্ট্রে ফিরে জাতীয় সংগঠনে মনোনিবেশ করলেন। বেসাণ্ট-মহোদয়ার পূর্ব্বেই ১৯১৬, এপ্রিল মাসে পুণায় তাঁরই চেষ্টায় 'হোমরুল লীগ' স্থাপিত হয়। এর আনুকূল্যে বহু সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হ'ল এবং তিলক ও তাঁর সহকর্ম্মিগণ বক্তৃতা করতে লাগ্লেন। আমলাতন্ত্র তাঁর প্রভাবে ঈর্ষান্বিত। তাই তাঁরা এক বছর যাবৎ সদাচরণের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ একটি কুড়ি হাজার টাকার ও দুটি দশ হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামিন দিতে তিলককে আদেশ করলেন! বম্বে হাইকোর্টে আপীলে এই জামিনের আদেশ নাকচ হয়ে যায় (১৯১৬, ৯ই নবেম্বর)।

১৯১৫ সালের বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় কংগ্রেসে জাতীয় দলের যোগদানে সুবিধা হ'ল।

তাঁরা পরবর্ত্তী লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে সদলবলে যোগ দিবার জন্য তোড়-জোড় আরম্ভ করলেন। তিলক ও বেসান্টের উপর সরকারের বিষদৃষ্টি তাঁদের দলকে অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হতে উদ্‌বুদ্ধ করলে। যথাসময়ে লক্ষ্ণৌ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎ-নারায়ণ লাল ও মূল সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার জাতীয় দলকে ও বিশেষ করে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক মতিলাল ঘোষকে অভিনন্দন জানালেন। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে জাতীয় দলের প্রতিনিধিরাই সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন।

মোস্‌লেম লীগের অধিবেশনও লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত হ'ল। ভারতের বিশিষ্ট মুসলমানগণ লীগে উপস্থিত হলেন। লীগ-নেতৃবর্গ কংগ্রেসে ও কংগ্রেস-নেতৃবর্গ লীগ-সভায় সাগ্রহে ও সানন্দে যোগদান করেন।

এবারকার লীগ ও কংগ্রেস উভয়েরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তাঁদেরই প্রতিনিধি-সভা-রচিত ভাবী শাসনপ্রণালীর খসড়া। উভয় সম্মেলনেই এই খসড়াটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল। এই খসড়াখানির মূল বিষয়গুলি মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে যথাসম্ভব এড়িয়েই চলার চেষ্টা হয়। এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে, এর মধ্যে ভারত-শাসনে ভারতবাসীর অধিকার লাভের পরিষ্কার নির্দ্দেশ ছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারত গবর্ণমেণ্ট, সকৌন্সিল ভারত-সচিব, ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্য, সামরিক ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে খসড়ায় সুস্পষ্ট ধারা সন্নিবিষ্ট করা হয়। ভারত-সচিবের কৌন্সিলের উচ্ছেদ, বড়লাটের শাসন-পরিষদে অর্দ্ধেক সদস্য পদে ভারতীয় নিয়োগ, দেড় শ' সভ্য নিয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন, তার মধ্যে চার-পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচন, বজেটে সকলেরই ভোটদানের অধিকার, প্রাদেশিক পরিষদগুলির উর্দ্ধতম সোয়া শ' ও নিম্নতম পঞ্চাশ

জন সদস্য নিয়ে গঠন ও এর চার-পঞ্চমাংশ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্ব্বাচন, প্রাদেশিক শাসন-পরিষদে অর্দ্ধেক সদস্য পদে ভারতীয় গ্রহণ, প্রাদেশিক ও নিখিল-ভারতীয় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভোটদাতাদের সংখ্যা প্রসার, সকৌন্সিল বড়লাটের অধিকতর স্বাধীনতা, প্রদেশগুলিকে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য দান, সৈন্যবিভাগে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার, আইন-প্রণয়ন, রাজস্ব-বণ্টন প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খসড়ায় উল্লিখিত হয়। পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচন স্থির হয়। পঞ্জাবে শতকরা ৫০ জন, যুক্তপ্রদেশে ৩০, বঙ্গে ৪০, বিহার-উড়িষ্যায় ২৫, মধ্যপ্রদেশে ১৫, মাদ্রাজে ১৫, বোম্বাইয়ে ⅓ অংশ এবং ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ⅓ মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচিত হবার কথা হয়। এ সব বিষয়ের মধ্যে এই ধারাটিই পরবর্ত্তী শাসন-সংস্কারে হুবহু গৃহীত হয়েছিল।

১৯১৭ সালে কতকগুলি বিষয়ে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইস্‌লিংটন কমিশনের কথা আমরা আগে পেয়েছি। এ বছর গোড়ার দিকে এই কমিশনের রিপোর্ট বার হ'ল। উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগের ব্যবস্থার জন্য এর সৃষ্টি, কিন্তু কমিশনের অধিকাংশ সদস্য ব্রিটিশের স্থায়ী আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষেই মত প্রকাশ করলেন। চৌবল ও আব্‌দার রহিম এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে স্বতন্ত্র মিনিটে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন। এ সময়কার উচ্চপদগুলিতে ভারতীয়ের অনুপাত ছিল এরূপ—দু'শ থেকে পাঁচ শ' টাকা বেতনের ১১,০৬৪টি পদের মধ্যে শতকরা ৪২, পাঁচ শ' টাকা ও তার উপরের ৪,৯৮৪টি পদের মধ্যে শতকরা ১০, আট শ' টাকা ও তার উপরের পদে ভারতবাসী ছিলেন শতকরা মাত্র ১৯ জন। কমিশন আবার সিবিল সার্বিসের বয়স কমিয়ে ২৪ থেকে ১৯ এ করার প্রস্তাব করেন! সিবিল সার্বিস পদের সংখ্যা ছিল ৭৫৫। এর এক চতুর্থাংশ মাত্র ভারতীয়ের বরাতে জুটবার কথা হয়!

পুলিশ বিভাগে মাত্র শতকরা ১০টি পদ তাদের দেওয়া সাব্যস্ত হ'ল! ইস্‌লিংটন কমিশন ব্রিটিশের চির-প্রভুত্ব ও ভারতবাসীর চির-অধীনতার ব্যবস্থা করে সকলের নিকটই নিন্দিত হলেন।

ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশের ঔদাসীন্য ও আমলাতন্ত্রের প্রতিকূল আচরণে ভারতবর্ষে আবার অসন্তোষের সৃষ্টি হ'ল। অথচ ইউরোপে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন পরাধীন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দানের কথা এ সময় ঘোষণা করছিলেন। লোকমান্য তিলক ও মিসেস বেসাণ্টের 'হোমরুল' বা স্বরাজ আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়ল; শিক্ষিত সম্প্রদায় নানাস্থানে শাখা প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের মধ্যে স্বরাজের বার্ত্তা প্রচার করতে লাগলেন। এরূপভাবে স্বরাজের কথা প্রকাশ ও আদর্শ প্রচারেও কিন্তু আমলাতন্ত্রের ঘোরতর আপত্তি। তারা বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ এবং মিসেস্ এনি বেসাণ্টের মধ্যপ্রদেশ ও বেরার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিলে! হোমরুল লীগের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি বা জনসভায় স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ যাতে যোগদান না করে, একমাত্র বাংলা ছাড়া সকল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টই এই মর্ম্মে সর্ব্বত্র আদেশপত্র জারি করলেন! ১৯১৭, ২৪শে মে মাদ্রাজ ব্যবস্থা-পরিষদে গবর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড মিসেস্ বেসাণ্টকে আক্রমণ করে এক বক্তৃতা করেন। বেসাণ্ট 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে তার জবাব দিলেন। পরবর্ত্তী ১৬ই জুন তারিখে সহকর্ম্মী বি পি ওয়াদিয়া ও জি এস্ এরাণ্ডেলের সঙ্গে বেসাণ্ট অন্তরীণ হন। এর ফলে দেশময় আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। জনসাধারণ সর্ব্বত্র সভাসমিতি করে এর প্রতিবাদ জানাতে লাগ্‌ল। তিলকের আগ্রহাতিশয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি বড়লাট ও ভারত-সচিবের নিকট এ ব্যাপারের প্রতিবাদে একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। জুলাই

মাসে কমিটির অধিবেশনে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবারও প্রস্তাব উত্থাপিত হ'ল। আগামী কংগ্রেসে বেসাণ্টকে যাতে একবাক্যে সভাপতি পদে বরণ করা হয় তিলক সেজন্য লেখালেখি সুরু করলেন।

মেসোপটেমিয়ায় ভারতীয় বাহিনীর দুর্দ্দশার চরম হয়েছিল। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন বসে এ বছর জুলাই মাসে তার রিপোর্ট বার হলে আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ পায় ও ইংরেজ ও ভারতীয় উভয় মহলেই তাদের তীব্র সমালোচনা হয়। ভূতপূর্ব্ব সহকারী ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেগু পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, এরূপ লৌহ, কাষ্ঠ বা প্রস্তরবৎ শাসন বর্ত্তমান যুগে একেবারেই অচল। বর্ত্তমানের উপযোগী করে শতাব্দীর পুরাতন এই জটিল শাসন ব্যবস্থার যদি সংস্কার করা না হয় তা হলে ভারত-শাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলেই আমরা বিবেচিত হব। এরূপ সমালোচনা হেতু ভারত-সচিব মিঃ অষ্টেন চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন। এ সময় যুদ্ধেরও ভয়ানক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা। রুশিয়ায় বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় সেখান থেকে সাহায্য পাওয়ার আর আশা রইল না। তবে এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। কিন্তু জার্ম্মানীর সঙ্গে সার্থক ভাবে যুঝ্‌তে হলে ভারতবর্ষের ধনবল জনবল ব্রিটিশের একান্ত আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী সুচতুর মিঃ লয়েড জর্জ্জ এই সময় ভারত-শাসনের তীব্র সমালোচক মিঃ মণ্টেগুকেই ভারত-সচিব পদে নিযুক্ত করলেন।

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কংগ্রেসের অন্যতম প্রবীণ নেতা হোমরুল লীগের সভাপতি সার্ এস সুব্রহ্মণ্য আয়ার এ সময় কর্ত্তৃপক্ষের দমন-নীতির কথা বিবৃত করে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট একখানা পত্র লেখেন (২৪শে জুন, ১৯১৭)। এই পত্র নিয়ে ভারতে ও বিলাতে সরকারী মহলে বেশ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। মণ্টেগু সাহেব তখন

ভারত-সচিব। পার্লামেণ্টে এ প্রসঙ্গে বক্তৃতা কালে তিনি বল্‌লেন যে, আয়ারের পক্ষে এরূপ পত্র লেখা অসঙ্গত ও অযশস্কর ("Disgraceful and improper")। সুব্রহ্মণ্য আয়ার এরূপ অপমানকর উক্তির প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জ্জন করেন।

যাহোক্, ভারত-সচিব পদে অধিষ্ঠিত হয়েই মণ্টেগু সাহেব শাসন-নীতির সংস্কারে কিঞ্চিৎ অবহিত হলেন। সৈন্য-বাহিনীতে 'কিংস-কমিশন' নামে দায়িত্বপূর্ণ ন'টি পদে এবারে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী নিযুক্ত হলেন। মণ্টেগু ১৯১৭, ২০শে আগষ্ট তারিখে একটি ঘোষণায় বলেন যে, শাসন-ব্যবস্থার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের সহযোগিতা করবার সুযোগ দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষকে ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দান করা হবে। পুরাতন-পন্থীরা অত্যধিক উৎফুল্ল হয়ে এ ঘোষণার নাম দিলেন, ভারত-শাসনের 'ম্যাগ্‌না কার্টা' বা অধিকার-দানের সনন্দ। জনসাধারণে যাতে এ ঘোষণার প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করে সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই বেসাণ্ট ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে মুক্তিদান করেন।

সাম্রাজ্য সম্মেলন (ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স) ও সাম্রাজ্য সমর কেবিনেটেও ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হ'ল এ সময়। কংগ্রেস প্রস্তাব করেছিলেন এসব প্রতিনিধি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বেসরকারী সদস্যগণ দ্বারা যেন নির্ব্বাচিত করা হয়। ভারত-সরকার তাঁদের এ প্রস্তাব কিন্তু গ্রহণ করেন নি। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (১৯১৬-১৯২১) গবর্ণমেণ্ট মনোনীত প্রতিনিধির নাম ব্যবস্থা-পরিষদে ১৯১৭, ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করলেন। এঁরা হলেন বিকানীরের মহারাজা, সার্ (পরে লর্ড) জেম্‌স মেষ্টন ও সার্ (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। তাঁরা যথাসময়ে ঐ দুটি সভায়ই যোগদান করেন। ভের্সাই সন্ধি সভায়, রাষ্ট্রসংঘ বৈঠকে ও

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি (অবশ্য সরকার মনোনীত) অতঃপর গৃহীত হতে থাকেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সাম্রাজ্য সম্মেলনের সুযোগ নিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের কিঞ্চিৎ মঙ্গল সাধনে সক্ষম হন। ভারতবাসীদের চুক্তিবদ্ধ কুলি বা শ্রমিকরূপে গ্রহণ সাম্রাজ্যের সকল দেশের পক্ষেই নিষিদ্ধ হ'ল। উপনিবেশে ভ্রমণ, শিক্ষালাভ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সাময়িক ভাবে বসবাস করবার তারা অনুমতি পেলে, কিন্তু স্থির হ'ল নূতন করে কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। আগে যারা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে তারা অবশ্য থাকতে পারবে। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না, সাম্রাজ্য সম্মেলনের এরূপ নির্দ্দেশের ফলে প্রবাসী ভারতীয়দের দুর্দ্দশা কতকটা লাঘব হয়।

চরমপন্থী রাজনীতিকদের অনেকে নির্ভীকতা, স্বার্থত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা, দুঃখবরণে আগ্রহ প্রভৃতি গুণে স্বদেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। তিলক, এনি বেসাণ্টও এসব কারণে দিকে দিকে অভিনন্দিত। কাজেই, সরকারের হস্তে নির্যাতিত কারারুদ্ধ বেসাণ্ট মহোদয়াকে ১৯১৭ সালে কল্‌কাতা অধিবেশনে সভাপতিপদে বরণের জন্য তিলক দেশবাসীর নিকট যে আবেদন জানালেন তাতে সকল দিক থেকেই অদ্ভুত সাড়া পাওয়া গেল। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই এনি বেসাণ্টকে সভাপতি-বরণে সম্মতি জানালে। বেসাণ্ট শীঘ্রই কারামুক্ত হলেন, সুতরাং তাঁর সভাপতি হওয়ার পক্ষে আর কোন বাধাই রইল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবীণ মডারেট রাজনীতিকগণ বেসাণ্টকে এ পদ দানে প্রথমে অসম্মত ছিলেন। এজন্য কল্‌কাতায় চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ এতটা ঘনীভূত হয়ে উঠে যে, দুটি অভ্যর্থনা সমিতিও গঠিত হয়েছিল, পরে অবশ্য নরমপন্থীরা জনমতের নিকট মস্তক অবনত করতে বাধ্য হলেন।

জনমতের নিকট তাদের এই শেষবার নতি স্বীকার। তাঁরা যদি জনমমতকে অগ্রাহ্য করে চল্‌বার এতটা স্পর্দ্ধা না করতেন তা হলে দেশ সেবায় তাঁদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা অধিকতর নিয়োজিত হতে পারত, স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীও বিশেষ ভাবে উপকৃত হ'ত। কল্‌কাতা কংগ্রেসই চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের শেষ সম্মিলিত কংগ্রেস। এবারের প্রতিনিধি সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৯৬৭ জন। কংগ্রেস যে 'জনগণমন অধিনায়ক' হয়েছেন এবারকার এই সংখ্যাধিক্যেই তা সুস্পষ্ট।

এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন বহরমপুরের নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও মূল সভাপতি হলেন সদ্য কারামুক্ত মিসেস এনি বেসাণ্ট। বেসাণ্ট মহাশয়া তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণে বল্‌লেন, শান্তির সময়ে সমৃদ্ধি ও যুদ্ধকালে নিরাপত্তা উভয়ের জন্যই ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপেক্ষা রাখে। বিশেষভাবে নারীজাগরণের কথা উল্লেখ করে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি কেউই অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মৌলবী ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশন থেকে কংগ্রেসের কার্য্য বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

ইতিমধ্যে ১৯১৭, ১০ই নবেম্বর ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু দলবল সহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য—বড়লাট, প্রাদেশিক লাটগণ, আমলাতন্ত্র ও নেতৃবর্গের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা ও পার্লামেণ্টে পেশ করা। ১৯১৮, ২৩শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে অবস্থান করেন ও বিভিন্ন কেন্দ্রে গমন করে নানা প্রতিষ্ঠান, জননেতা ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। মিঃ মণ্টেগু শাসন-সংস্কার সম্বলিত প্রস্তাবের রিপোর্ট অতঃপর পার্লামেণ্টে পেশ করলেন। সাধারণে রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল ১৯১৮,

৮ জুলাই তারিখে। এই রিপোর্ট মিঃ মণ্টেগু ও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড একযোগে রচনা করেন ও উভয়ের স্বাক্ষরে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এজন্য এ রিপোর্টকে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড বা সংক্ষেপে মণ্টফোর্ড রিপোর্ট বলা হয়।

মণ্টেগু সাহেব মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস ভারতবর্ষে ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অদম্য উৎসাহের সঙ্গে আহোরাত্র পরিশ্রম করে আমলা-তন্ত্রের প্রবল বাধা সত্ত্বেও কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন। এজন্য তিনি সকলেরই প্রশংসার্হ। কিন্তু ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্ শেষে আমলা-তন্ত্রের নিকটই তাঁকে নতি জানাতে হয়। তখন ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার বিপক্ষতা করে প্রধানতঃ দু'শ্রেণীর ব্যক্তিরা—প্রথম, ভারতে স্থিত উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্ম্মচারী বা এক কথায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র; দ্বিতীয়, ভারতে স্থিত বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ। বিলাতের কর্তৃপক্ষ, বিশেষ ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু যখন ভারতবসীদের শাসনাধিকার আংশিক ভাবেও স্বীকার করতে চাইলেন তখন এরা খুবই বাদ সাধ্‌তে থাকে। ইল্‌বার্ট বিলের সময় আত্মরক্ষার ওজুহাতে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় ডিফেন্স এসোসিয়েসন ১৯১৩ সালে ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসন নাম গ্রহণ করেছিল। নূতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবেই ১৯১৭ সালে এ আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এই সমিতি ইউরোপীয় সমাজের পক্ষ থেকে ভারত-বাসীর দেশ-শাসনে অযোগ্যতা ও নিজেদের স্বার্থরক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে মণ্টেগু সমীপে স্মারকলিপি পাঠালে।

দক্ষিণ ভারতে 'হোমরুল' আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠে তখন মাদ্রাজে নন্‌-ব্রাহ্মণ পার্টি বা অব্রাহ্মণ দল গঠিত হ'য়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে উন্নত ও সমাজের অধিপতি। সামাজিক রীতি নীতির কড়াকড়ি সেখানে খুব বেশী। মাদ্রাজে 'পঞ্চম' নামে এক অস্পৃশ্য শ্রেণীও বিদ্যমান। এরা ত পতিতই, মাদ্রাজে উচ্চশ্রেণীর অব্রাহ্মণরাও

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়

মৌলানা সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি

ব্রাহ্মণদের অনুরূপ সম্মান ও মর্য্যাদার অনধিকারী। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ—এ দু' শ্রেণীর ভিতরকার বিরোধের সুযোগ নিয়েই এই সমিতির সৃষ্টি। এক কথায় এর নাম দেওয়া হ'ল জাষ্টিস্ পার্টি, মুখপত্র হ'ল দৈনিক 'জাষ্টিস্'। মণ্টেগু সাহেবের নিকট তারা অব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ সুবিধা, এমন কি পৃথক্ নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত দাবি করে বস্‌ল। পঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ও মণ্টেগু সাহেবকে পৃথক্ নির্ব্বাচনের দাবি জানাল।

কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগ এসময় ঐক্যবদ্ধ ভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন। তাঁদের ভারত-শাসনের আদর্শ কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনায় পরিব্যক্ত। ইউরোপীয় মহাসমরে মিত্রশক্তিবর্গ, বিশেষ করে মিঃ লয়েড জর্জ্জ ও প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেরূপ বর্ণনা করেছেন তাতে হিন্দু মুসলমান প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের পক্ষে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে একটি আত্মনিয়ন্ত্রনক্ষম রাষ্ট্ররূপে দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা হওয়াই স্বাভাবিক। কংগ্রেস লীগ উভয়ত্রই এই শ্রেণীর লোকেরই প্রাধান্য। তাই মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে এসেই তাঁর প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারের সমর্থনে নরমপন্থীদের দিয়ে একটি বিশিষ্ট সংঘ গঠনে তৎপর হলেন।

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে চরম ও নরম পন্থী দু' দলের অস্তিত্ব মণ্টেগু সাহেব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের নিকট নরম পন্থীদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। মণ্টেগু সাহেব তাঁর ১৯১৭, ১২ই ডিসেম্বর তারিখের রোজনামচায় এই মর্ম্মে লিখেছেন, "আমরা মডারেট পার্টি গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। তাঁরা (ভূপেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন) খুবই আগ্রহ দেখালেন, সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ও অন্যান্য বিষয়ও তাঁরা বল্‌লেন। আমার বিশ্বাস, কথায় ও কাজে তাঁরা

ঠিক থাক্‌বেন।” মডারেটরা কথায় ও কাজে সত্য সত্যই ঠিক্‌ রইলেন। শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশের পূর্ব্বেই ১৯১৮ সালের গোড়ায় কল্‌কাতায় ‘নেশনাল লিবার‍্যাল লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হ’ল! শাসন-সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশের পরই সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে মডারেটরা সম্মিলিত হয়ে মণ্টেগু সাহেবের অজস্র সাধুবাদ করলেন! বোম্বাইয়ের মডারেটরাও এই মর্ম্মে বিবৃতি প্রকাশ করলেন। শাসন-সংস্কার আলোচনার আরম্ভেই বিলাতে লর্ড সিডেনহামের নেতৃত্বে একদল ভারত-শত্রু ইণ্ডো-ব্রিটিশ এসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে মণ্টেগুর চেষ্টা পণ্ড করবার জন্য নিরতিশয় তৎপর হয়েছিল। ভারতবর্ষের মডারেটগণ মণ্টেগুর প্রচেষ্টা সার্থক করবার জন্যই হয়ত তাঁকে অমনভাবে সমর্থন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু স্বদেশবাসী চরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বদেশের মঙ্গলসাধনে তাঁরা বিশেষ সক্ষম হন নি। শাসন-তন্ত্রে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকৃত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাকে এ থেকে শত হস্ত দূরেই রাখা হ’ল। জনমত ক্রমে নরমপন্থীদের উপর বিরূপ হয়ে উঠ্‌ল।

একদিকে নরমপন্থীরা মণ্টেগুর সাধুবাদ করতে লাগ্‌লেন, অন্যদিকে চরমপন্থীরা তাঁর প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা সুরু করলেন। বোম্বাইয়ে আগষ্ট মাসে মণ্টেগুর প্রস্তাব আলোচনার জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন হ’ল। কংগ্রেসের ইতিহাসে বিশেষ অধিবেশন এই প্রথম। বোম্বাইয়ের চরমপন্থী নেতা বল্লভভাই ঝাভেরী পটেল হলেন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সভাপতিত্ব করলেন পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি কংগ্রেসের প্রগতিশীল নেতা সৈয়দ হাসান ইমাম। এ অধিবেশনে চার হাজার ন’ শ’ আটষট্টি জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। চরমপন্থী, নরমপন্থী, প্রগতিবাদী বিভিন্ন দলের মতের সামঞ্জস্য বিধান

করে কংগ্রেসে মণ্টেগু-প্রস্তাব সম্পর্কে এক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, "এক শ্রেণীর লোক বল্‌ছেন, কংগ্রেস মণ্টেগু প্রস্তাব অগ্রাহ্য না করে ছাড়বেন না। তাঁরা এ দ্বারা কি বোঝাতে চান জানি না। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা এমন একটি যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাব তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি যার ভিতর এক দলের অভিজ্ঞতা, অন্য দলের উগ্রতা ও তৃতীয় দলের ক্ষিপ্রকারিতার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। আমরা আট আনা স্বায়ত্ত-শাসন চেয়েছিলাম, তার বদলে পেয়েছি মাত্র এক আনা দায়িত্বশীল শাসন!" কংগ্রেস এ প্রস্তাব দ্বারা মণ্টেগু রিপোর্টের কতকগুলি বিষয়ের সমর্থন ও প্রশংসা করেন ও অন্য বহু বিষয়ের দোষত্রুটি দেখিয়ে সংশোধনের আভাষ দেন। মডারেট দল বিশেষ অধিবেশনে যোগ না দিয়ে নবেম্বর মাসে স্বতন্ত্র সম্মেলন আহ্বান করলেন। অতঃপর প্রতিবছর তাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রে সমবেত হয়ে কংগ্রেসের পূর্ব্ব রীতি বজায় রেখে বিভিন্ন বিষয়ে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করে চলেছেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ দু' চার জন মডারেট প্রথম দিকে কংগ্রেসেও যোগদান করতেন।

এবারকার বিশেষ অধিবেশনে রৌলট কমিটির রিপোর্টের নিন্দা করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। এই রৌলট কমিটির সুপারিশে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পর বছর রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হয়। আগেকার ভারত-রক্ষা আইন বলে ষোল শ' ভারতবাসীকে অন্তরীন করা হয়। জাষ্টিস্ বীচক্রফ্‌ট্ ও জাষ্টিস্ চন্দাবরকার—এ দু' জনের উপর অন্তরীণদের বিষয় পরীক্ষার ভার দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা আট শ' ছ' জনের বিষয় পরীক্ষা করে মাত্র ছ' জনকে মুক্তি দানের সুপারিশ করেন! ভারত-রক্ষা আইন মাত্র যুদ্ধ কালের জন্যই বলবৎ থাকবে, সকলের এইরূপ ধারণা ছিল। রৌলট কমিটি ১৯১৮, ১৫ই

এপ্রিল তাঁদের রিপোর্টে একে স্থায়ী করবারই নির্দ্দেশ দিলেন! এর পূর্ব্বে ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার জন্য আইন-প্রণয়নের হুমকী দেখান। অথচ এ সময় ভারতবর্ষে—এমনকি বাংলা ও পঞ্জাব বিপ্লবীদের এ দুই পীঠস্থানেও বিপ্লবাত্মক কর্ম্মের প্রায় অবসান হয়েছে। সুতরাং এ সময় ওরূপ আইন প্রণয়নের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। তাই রৌলট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশেই ভারতের সর্ব্বত্র এর প্রতিবাদ উত্থিত হয় ও ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা দমনই এ আইনের উদ্দেশ্য বলে বর্ণিত হয়। কংগ্রেস-প্রস্তাবে জনমতেরই প্রতিধ্বনি করা হ'ল।

একটি গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সরকার এক প্রস্তাব করলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েত বা ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী পরিভাষায় 'লোকাল সেল্‌ফ্‌ গবর্ণমেণ্ট' বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বলা হয়। পূর্ব্বে লর্ড রিপণ জনসাধারণকে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থায় অভ্যস্ত করাবার জন্য নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তনের ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে কার্য্য পরিচালনায় অধিকার দানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে আইন পাস হলেও ঐ সব প্রতিষ্ঠানে জন-প্রতিনিধিদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের আমলে ১৯১৮, ১৪ই মে তারিখে সরকার এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যাতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য নির্ব্বাচিত ও এক চতুর্থাংশ মনোনীত, সভাপতি সদস্যগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত ও সদস্যগণ আয়-ব্যয় নির্দ্ধারণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সে মর্ম্মে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে আইন প্রণয়নে নির্দ্দেশ দেওয়া হবে। নূতন শাসন-সংস্কার বা ডায়ার্কি প্রবর্ত্তিত হলে নানা স্থানে এ উদ্দেশ্যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে।

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন ১৯১৮ সালে দিল্লীতে যথারীতি অনুষ্ঠিত হ'ল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন হাকিম আজমল খাঁ, আর মূল সভাপতি হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। প্রতিনিধি সংখ্যা হ'ল প্রায় পাঁচ হাজার। মডারেটগণ কংগ্রেসে যোগ দিলেন না। মণ্টেগু প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অনাবশ্যক ('disappointing and unnecessary') বলে একটি প্রস্তাবে উল্লিখিত হ'ল। বা'র থেকে চাপান শাসন-সংস্কারের বদলে ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এ প্রস্তাবটিতে বলা হ'ল, "প্রেসিডেণ্ট উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ ও অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল জাতি-সমূহের প্রতি যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগের ঘোষণা করছেন তার নিরিখে কংগ্রেস এই দাবী করেন যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ও শান্তি-সম্মেলন কর্তৃক ভারতবর্ষকে অন্যতম প্রগতিশীল রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হোক্ ও তার প্রতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করা হোক্।" ভারতবাসীদের দ্বারা ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী নির্দ্ধারণ ও রচনার দাবি সর্ব্বপ্রথম আমরা এই প্রস্তাবের মধ্যেই পাই।

অধিবেশন আরম্ভের কয়েক দিন পূর্ব্বেই ১৯১৮, ১১ই ডিসেম্বর মিত্রশক্তি ও শত্রু পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হয় ও শান্তি-সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব চলে। যুদ্ধ কালে ভারতবর্ষ ধন জন ও সম্পদ দিয়ে, ব্রিটেনকে সাহায্য করেছিল। এই সময় পনর লক্ষ ভারতবাসী মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করে ও এক লক্ষের উপর মারা যায়। নগদে ও জিনিষপত্রে হাজার কোটি টাকার উপর আমরা ভারতবাসীরা তখন ব্রিটিশকে দিয়েছি। এ ছাড়া প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্য যত সব আয়োজন হয় তার ব্যয়ভারের এক মোটা অংশ ভারত-সরকারকে বহন করতে হয়। সুতরাং

শান্তি-সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি গ্রহণ খুবই বাঞ্ছনীয়। তাই কংগ্রেস ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী ও সৈয়দ হাসান ইমামকে প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী করেন। ভারত-সরকার কিন্তু মডারেট-প্রবর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকেই শান্তি-সম্মেলনে পাঠান।

পর বছর কংগ্রেস অধিবেশন হ'ল পঞ্জাবের অমৃতশহরে। কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটে গেল যার জের মনুষ্য সমাজ আজও টান্‌তে বাধ্য হয়েছে। মিত্রশক্তি-বর্গ বিজয় মদে মত্ত হয়ে ভের্সাই সন্ধিতে বিজিত শক্তিদের দণ্ড দানে খুবই তৎপর হ'ল। তুরস্কের ভাগ্য সম্বন্ধে মুসলমান জগৎ, বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানরা খুবই সন্দিহান ছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন, মিঃ লয়েড জর্জ্জ প্রভৃতির ঘোষণায়, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে সরল বিশ্বাসী লোকেরা বুঝেছিল, যুদ্ধান্তে এক দিকে পরাধীন রাষ্ট্রগুলি যেমন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের তথা স্বদেশে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের অধিকার লাভ করবে অন্য দিকে তেমনি বিজিত রাষ্ট্রগুলির সার্ব্বভৌমতা স্বীকারেও বাধা হবে না। যুদ্ধ শেষে ভের্সাইএ বসে যেরূপ ভাবে সন্ধিপত্র রচিত হ'ল তাতে বিজিত রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিজয়ীদের বিদ্বিষ্ট মনোভাব স্পষ্ট ফুটে উঠ্‌ল। ইউরোপের 'রুগ্ন মানুষ' তুরস্ককে একেবারে মুছে ফেলার চেষ্টা হ'ল ইউরোপ থেকে। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ তুর্কির প্রতি মিত্রশক্তি, বিশেষ করে ব্রিটেনের ব্যবহারে যারপরনাই বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

যুদ্ধকালে ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ বিদেশে চলে যাওয়ায় দেশে ভীষণ অর্থাভাব উপস্থিত হয়। খাদ্য শস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি হেতু লোকের দুঃখ-কষ্টের অন্ত অবধি রইল না। এর উপর করভার বৃদ্ধিতে জীবন একেবারে দুর্বিসহ হয়ে উঠ্‌ল। এ সময় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে একটি অত্যুজ্জ্বল ঘটনা।

তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় দীর্ঘ কুড়ি বৎসর সত্যাগ্রহ ও নিরুপদ্রব আন্দোলন পরিচালনা করে প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সমাধানে অনেকটা সক্ষম হন ও ১৯১৫ সালে বিলাত হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। প্রথমে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের পরামর্শে কিছুকাল ভারতবর্ষের অবস্থা তিনি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ্য করলেন। ১৯১৬ সাল থেকে প্রতি বছর কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা সম্বন্ধে নেতৃবর্গকে পরামর্শ দিতেন। যুদ্ধের মধ্যে বিহারের চম্পারন জেলার অবশিষ্ট নীলকরদের (কারণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল উৎপাদন আরম্ভ হলে নীল চাষ তখন প্রায় উঠে গিয়েছিল) অত্যাচারে নিঃসম্বল কৃষকদের দুর্দ্দশা চরমে উঠে। আবেদন-নিবেদনে ফল না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই সরকারের সুবুদ্ধি হ'ল। তাঁরা মহাত্মা গান্ধী ও অন্য দু'জন সদস্য নিয়ে একটি কমিশন বসালেন ও তাঁদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আইন করে নীল-করদের অত্যাচার নিবারিত করলেন। পর বছর গুজরাটের খেড়া জেলায় অজন্মা হেতু দুর্ভিক্ষ হয়। সরকার খাজনা মকুব করতে অস্বীকার করায় প্রজাগণ গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করলে আমলাতন্ত্র প্রথম একে দমন করতেই চেষ্টা করলেন কিন্তু অল্প কাল মধ্যেই তাঁদের চৈতন্যের উদয় হ'ল। খাজনা যথাসম্ভব মকুব করে ও আদায় বন্ধ রেখে তাঁরা কৃষকদের দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে নিলেন। আহ্‌মদাবাদের কল-মজুরদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি কল-মালিকদের অবহিত করাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী এ সময় একবার প্রায়োপবেশন করেন। ফলে মালিকগণ তাঁর প্রস্তাব অনেকাংশে গ্রহণ করেন। মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীমতী অনসূয়া বাঈর চেষ্টা-উদ্যোগে আহ্‌মদাবাদে লেবার এসোসিয়েশন বা শ্রমিক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছু আগে বলেছি, সরকার ভারত-রক্ষা আইন স্থলে বিপ্লব ও অরাজকতা দমনের জন্য রৌলট কমিটির সুপারিশে একটি স্থায়ী ব্যাপক আইন প্রণয়ন করতে উদ্যত হন। এ আইনটি 'রৌলট আইন' নামে অভিহিত। মুষ্টিমেয় সন্দিহান বিপ্লবীকে দমন করবার ছলে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার অধিকার খর্ব্ব ও সঙ্কুচিত করার আয়োজন হ'ল এ আইনে। সন্দেহ মাত্রেই গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসন, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে আইন-শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারী বলে ঘোষণা ও অধিবাসীদের প্রতি অনুরূপ আচরণ প্রভৃতি এ আইনের বিষয়-বস্তু। আইনের প্রস্তাবেই ভারতময় ভীষণ প্রতিবাদ উত্থিত হ'ল। কিন্তু সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে কর্তৃপক্ষ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যের জোরে ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ সত্য সত্যই এ আইন পাস করিয়ে নিলেন। আইনটির মেয়াদ অবশ্য শেষে করা হ'ল তিন বছর। এ নিয়ে এত বিক্ষোভ উপস্থিত হ'ল যে, ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল সদস্য পদে ইস্তফা দিলেন।

এ সময় মহাত্মা গান্ধী আশার বর্ত্তিকা হস্তে আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তিনি ১৯১৯, ১লা মার্চ্চ ঘোষণা করলেন, প্রস্তাবিত গর্হিত আইন বিধিবদ্ধ হলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করবেন। আইন বিধিবদ্ধ হ'ল। গান্ধীজী বোম্বাইয়ে সত্যাগ্রহ সভা গঠন করে প্রথম ৩০শে মার্চ্চ, পরে তারিখ পরিবর্ত্তন করে ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহের সূচনা স্বরূপ সর্ব্বত্র 'হরতাল' প্রতিপালনের আবেদন জানান। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীরা তাঁর এ আহ্বানে অদ্ভুত সাড়া দিলে। দিল্লীতে ও পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে কিন্তু প্রথম দিনেও হরতাল প্রতিপালিত হয়েছিল। দিল্লীতে এই দিন জনতার উপর গুলি চালনা করা হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

ক্রুদ্ধ জনতাকে শান্ত করেন। অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদে বক্তৃতাও করেছিলেন। দ্বিতীয় তারিখে পঞ্জাবের সর্ব্বত্র যথারীতি হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। পঞ্জাবের জবরদস্ত লাট সার মাইকেল ওডাওয়ারের আমলে যুদ্ধের সময় পঞ্জাব থেকে ধন ও জন সংগ্রহে যে সব গর্হিত উপায় অবলম্বিত হয়েছিল সেজন্য জনসাধারণ সরকারের উপর খুবই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে। তারা একবাক্যে হরতাল প্রতিপালন করে কর্ত্তৃপক্ষের তাক লাগিয়ে দিল। সার মাইকেল অতঃপর রৌলট আইনের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনই সমূলে বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর হলেন।

ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দিন কিচ্‌লুকে ৯ই এপ্রিল পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পর দিন অমৃতশহরে হরতাল প্রতিপালিত হয়। এই দিন যখন জনগণ সমবেত ভাবে রেল ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য দু'বার গুলি বর্ষণ করে। জনতা এতক্ষণ শান্তই ছিল। তারা অতঃপর ক্ষিপ্ত হয়ে কতকগুলি সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দেয় ও ইংরাজদের উপর চড়াও হয়। ফলে কয়েকজন নিহত হয়। কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে ১১ই এপ্রিল শহরে সৈন্য মোতায়েন হ'ল ও শান্তি রক্ষার ভার জেনারেল ডায়ারের উপর অর্পিত হ'ল। ১২ই তারিখে সভাসমিতি বন্ধ করে এক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এবিষয় সাধারণে যথাসময়ে অবগত হতে পারে নি। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ মত জনপ্রিয় নেতৃদ্বয়ের মুক্তি দাবি করার জন্য ১৩ই এপ্রিল বৈকালে অনূন্য দশ হাজার হিন্দু মুসলমান ও শিখ জালিয়ানওয়ালা বাগের সভায় সমবেত হ'ল। জেনারেল ডায়ার এই সময়ে সৈন্য ও কামান বন্দুক নিয়ে সভাস্থলে উপনীত হলেন ও বাগের ভিতরকার উচ্চ স্থান থেকে জনতাকে গুলি করতে আদেশ দিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগে আগম-

নির্গমের একটি মাত্র প্রশস্ত ফটক। এর প্রায় চারিপার্শ্বই বড় বড় বাড়ী দ্বারা বেষ্টিত। ডায়ারের আদেশে সৈন্যগণ ফটক লক্ষ্য করেই গুলি ছুড়ল! কিছুক্ষণ ধরে জালিয়ানওয়ালাবাগে রক্তগঙ্গা বয়ে চল্‌ল। সরকারী হিসাবে তিনশ উনআশী জন ও বেসরকারী হিসাবে প্রায় হাজার জন গুলির মুখে আত্মাহুতি দেয়। গুরুতর রূপে আহত হয়েছিল সরকারী মতে প্রায় দেড় হাজার। হত্যাকাণ্ডের পর হতাহত ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান করাও ডায়ার উচিত বলে বিবেচনা করলেন না। তিনি বিজয়ী বীরের মত সদর্পে নিজ ছাউনিতে চলে গেলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, জনতা সকলেই নিরস্ত্র ও শান্ত ছিল। পঞ্জাবের অন্যত্রও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ধরপাকড় হ'ল। লাহোর থেকে লালা হরকিষণ লাল ও রামভুজ দত্ত চৌধুরী নির্ব্বাসিত হলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর সার মাইকেল ওডাওয়ার বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের অনুমতি নিয়ে ১৮০৪ সালের এক জরাজীর্ণ আইন বলে পঞ্জাবের লাহোর ও অমৃতশহরে ১৫ই এপ্রিল এবং গুজরান-ওয়ালা ও অন্য কয়েকটি জেলায় ১৬ই, ১৯শে, ও ২৪শে এপ্রিল সামরিক আইন জারি করলেন। এ আইন রেলওয়ে জমি ছাড়া অন্যত্র ১১ই জুন ও এখানেও ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বাহাল থাকে। এতদিন সামরিক আইন বাহাল করায় বড়লাটও শাসন-পরিষদের একমাত্র ভারতীয় সদস্য সার্‌ চিত্তর শঙ্করন নায়ার পদত্যাগ করলেন। সামরিক আইনের সময় বাইরের কোন নেতাকেই পঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। সি এফ এণ্ড্রুজ পঞ্জাবে প্রবেশ করায় ধৃত হন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও পঞ্জাব গমনের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হলেন। সংবাদপত্রে তখন কোনও কথা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন এই সময়কার সরকারী অনাচারের কথা প্রকাশ পেল তখন ভারতবাসী স্তব্ধ হয়ে

গেল। নেতৃবর্গের নির্ব্বাসন, ছাত্র ও শিক্ষকদের নির্ব্বিচারে কারাগারে প্রেরণ, একটি বিশিষ্ট রাস্তায় লোকজনের হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করা, জনগণকে প্রকাশ্য স্থানে বেত্র দ্বারা প্রহার, পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলেদের দিয়ে ব্রিটিশপতাকা অভিবাদন করান, হাতে শিকল ও কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকদের দাঁড় করিয়ে রাখা, একটা বড় খোঁয়াড়ে বন্দীদের বদ্ধ করা প্রভৃতি সামরিক আইনের আমলে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কয়েকটি নমুনা মাত্র। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃপক্ষের এই অনাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ ভুয়ো রাজ সম্মানের নিদর্শন 'নাইট' উপাধি বর্জ্জন করে অনাচারে জর্জ্জরিত দেশবাসীদের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। পঞ্জাবের অনাচার নিয়ে ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপক ও তীব্র আন্দোলন সুরু হ'ল যে, গবর্ণমেণ্ট পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করলেন। ভারত-বাসীরা রয়াল কমিশন চেয়েছিল, কেননা স্বয়ং ভারত গবর্ণমেণ্টও যে এ অনাচারের জন্য দায়ী! কমিটির কার্য্য আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই সরকার ব্যবস্থা-পরিষদে 'ইণ্ডেম্‌নিটি' বা কসুর মাপ আইন পাশ করিয়ে অনাচারে লিপ্ত রাজকর্ম্মচারীদের ক্ষতিপূরণ বা অন্যবিধ দায় থেকে অব্যাহতি দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই আইনের আলোচনার সুযোগে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীর অনাচার সম্পর্কে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় সব বিষয় শুনে লোকে শিউরে উঠ্‌ল। ওদিকে কংগ্রেসও জনমত শিরোধার্য্য করে একটি স্বতন্ত্র অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন।

মহাত্মা গান্ধীর দিল্লী ও পঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। তিনি ইতিপূর্ব্বে দিল্লী রওনা হয়ে পথিমধ্যে সরকার কর্ত্তৃক ধৃত হন। বোম্বাইয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদে দিল্লী, আহ্‌মদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়ে লোকক্ষয় হ'ল। গান্ধীজী স্বয়ং আহ্‌মদাবাদে

গমন করেন ও তাঁর নির্দ্দেশে জনতা সর্ব্বত্র আবার শান্তভাব ধারণ করে। তিনি অতঃপর সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। অক্টোবর মাসে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে গান্ধীজী পঞ্জাব যান ও সব বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। কংগ্রেস যে কমিটি বসালেন তার অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি পঞ্জাবের অত্যাচরিত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। অনুসন্ধান কালে কোন মতামত প্রকাশ অবিধেয় বলে তিনি ঠিক্ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন।

ভারতবর্ষে এইরূপ প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার ১৯১৯, ২৩শে ডিসেম্বর ভারত-সংস্কার আইন নামে বিধিবদ্ধ হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সহকারী ভারত-সচিব রূপে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ হাউস্ অফ্ লর্ডস্‌এ আইন উত্থাপন করেন। সিংহ মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই লর্ড উপাধি লাভ করায় লর্ড সভায় আসন গ্রহণ করেছিলেন। এই শাসন-সংস্কারকে এক কথায় নাম দেওয়া হ'ল ডায়ার্কি। লায়নেল কার্টিস ১৯১৫ সালে বিলাতে বসে সার্ উইলিয়ম ডিউকের সহযোগে ভারত-শাসনের একটি পরিকল্পনা স্থির করেন। সার্ উইলিয়ম মেয়ার এই পরিকল্পনাটির নাম দেন ডায়ার্কি। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু অন্য সব পরিকল্পনা, মায় কংগ্রেস-লীগ স্কীম, অগ্রাহ্য করে উক্ত পরিকল্পনা ও নাম পর্য্যন্ত মূলতঃ গ্রহণ করেন। ডায়ার্কির অর্থ—দ্বৈত-শাসন। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। ভারত-সচিব, ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নির্দ্ধারণ করে দেওয়া হ'ল এ আইনে। ভারত-সচিবের কৌন্সিলের সদস্য সংখ্যা অনূর্দ্ধ বার ও অন্যূন আট ধার্য্য করা হ'ল। তাঁর কর্ত্তব্য ভাগ করে বিলাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সমূহ একজন হাই কমিশনারের উপর প্রদত্ত হ'ল। অর্থ সম্পর্কে

ভারত-গবর্ণমেণ্টের স্বাধীন ভাবে কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা স্বীকৃত হ'ল। ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করলেও গবর্ণমেণ্টের নীতি নিয়ন্ত্রণে তাঁদের কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব স্বীকৃত হ'ল না। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যগণ বজেট আলোচনায় যোগ দানের অধিকার ও বিশেষ বিশেষ দফা (যেমন—সৈন্য ব্যয়, সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি) ছাড়া অন্য সব বিষয়ে ভোটদান ক্ষমতা লাভ করলেন। কিন্তু কোন প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে অগ্রাহ্য হলেও বড়লাট বিশেষ ক্ষমতা বলে তা বাহাল রাখ্‌তে পারবেন স্থির হ'ল। প্রদেশ সম্পর্কেও এই একই ব্যবস্থা। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির উপরে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হল। তাঁরা নিজ দায়িত্বে ছ' মাসের জন্য অর্ডিনান্স বা জরুরী আইন জারি করতে পারবেন। তবে ছ'মাস পরে ব্যবস্থা-পরিষদে তা পেশ করারও কথা হয়। কিন্তু পরিষদ অগ্রাহ্য করলে নিজ দায়িত্বে একে স্থায়ী আইনে পরিণত করার ক্ষমতাও তাঁদের দেওয়া হ'ল। ভারত-বাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এইরূপে কার্য্যতঃ অস্বীকার করা হ'ল।

এ আইন দ্বারা প্রদেশসমূহেই ডায়ার্কি শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। প্রাদেশিক বিভাগগুলিকে দু'ভাগ করে দেশ-শাসনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ (যেমন—রাজস্ব, পুলিস, আইন-আদালত প্রভৃতি) অংশ সরকার নিজ হস্তে রাখ্‌লেন ও এর নাম দিলেন 'রিজার্ভড্‌' বা 'সংরক্ষিত', আর অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ (যেমন—স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) অংশ ছেড়ে দিলেন নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত মন্ত্রীদের হাতে। এ অংশের নামকরণ হ'ল ট্রান্স্‌ফারড্‌ বা হস্তান্তরিত। কিন্তু রাজস্ব সচিবের নিকট, তথা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নিকট মন্ত্রিদের হাত-পা বাঁধা ; কোন নূতন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা রাজস্ব বিভাগ

পরীক্ষা করে অনুমতি না দিলে তা ব্যবস্থা-পরিষদে উত্থাপনের ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হ'ল না। নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির প্রত্যেকের আয়ের পন্থা ধারাক্রমে নির্দ্ধারিত হ'ল। প্রতি বছর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির পক্ষে ভারত-গবর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব মেষ্টন কমিটি নির্ণয় করে দিলেন।

দীর্ঘকাল আন্দোলনের ফলে এবারেই ভারতবাসী সাক্ষাৎভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পেলে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলিতে সদস্য-নির্ব্বাচক ভোটদাতাদের সংখ্যা হ'ল ৫৩ লক্ষ। নারীরা এবারেও ভোটদানে অধিকার পেলেন না, তবে এরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি গঠিত হবার পর তাঁরা ইচ্ছা করলে নিজ নিজ প্রদেশে নারীর ভোটাধিকার দান করতে পারবেন। পরে কোন কোন ব্যবস্থা-পরিষদ নারীদের এ অধিকার দিয়েছিলেন। নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ও কৌন্সিল অফ্ ষ্টেটে (এটি এবারে নূতন গঠিত হয়) নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সদস্য সাক্ষাৎ ভোটেই নির্ব্বাচিত হতেন। তবে দ্বিতীয়টিতে নির্ব্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে গঠিত হয় যে, সরকার অধিকাংশ সদস্যকেই নিজ মতানুবর্ত্তী করে নিতে পারেন।

এখানে বলা আবশ্যক যে, নিখিল-ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেও নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রথমটির ভোটদাতাদের সংখ্যা দশ লক্ষ, ও দ্বিতীয়টির সংখ্যা ১৭,৩৬৪। নূতন আইনে গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতন পদগুলিতে অধিকসংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগের কথা হ'ল। সিবিল সার্বিসের এক তৃতীয়াংশ পদে ভারতবাসী নিয়োগের প্রস্তাব হয় ও প্রতিবছর এ হার বৃদ্ধির নির্দ্দেশ থাকে। বিলাতে ও ভারতবর্ষে একই সময়ে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিও অংশতঃ পূরণের ব্যবস্থা হ'ল। এর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ব্রিটিশ সিবিলিয়ানদের বেতন, পেন্সন, ভাতা, ছুটি প্রভৃতি

বাড়াবারও ব্যবস্থা হ'ল। এশার কমিটি সৈন্য বিভাগ ও লী কমিশন সাধারণ শাসন-বিভাগগুলি সম্বন্ধে শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা করলেন।

এবারকার শাসন-সংস্কারে কিন্তু পূর্ব্বেকার পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা আরও ব্যাপকতর হয়। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগ আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আদর্শ সম্মুখে রেখে স্বরাজের প্রথম ধাপ হিসাবে পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করে একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কারে এই পরিকল্পনার আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতি সবই অগ্রাহ্য হ'ল বটে, কিন্তু পৃথক্ নির্ব্বাচন ও মুসলমান সদস্য সংখ্যার ধারা দুইটি কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করলেন। এর সাহায্যে পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের প্রধান দু'শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ পাকিয়ে তোলা স্বার্থান্বেষীদের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। পঞ্জাবে শিখরা ও ভারতের সর্ব্বত্র ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গি ও ভারতীয় খৃষ্টানরা পৃথক্ নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করলে। জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিক্‌সভা প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলী গঠিত হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলির সভাপতি প্রথম চার বছর সরকার মনোনীত করবেন ও চার বছর অন্তে প্রত্যেকে নিজ নিজ সভাপতি নির্ব্বাচনের অধিকার পাবেন স্থির হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও কৌন্সিল অফ্ ষ্টেটের সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ঠিক হ'ল ১৪৩ ও ৬০, এর ভিতরে নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে ১০৩ ও ৩৪ জন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদগুলিতে মনোনীত ও নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-সংখ্যা নির্ণীত হ'ল এইরূপ,

ব্যবস্থা-পরিষদ	নির্বাচিত সদস্য			সরকার কর্তৃক	
	সাধারণ	পৃথক্	বিশেষ	মনোনীত	মোট
বাংলা	৪৬	৪৬	২১	২৬	১৩৯
মাদ্রাজ	৬৫	২০	১৩	২৯	১২৭
বোম্বাই	৪৬	২৯	১১	২৫	১১১
যুক্ত-প্রদেশ	৬০	৩০	১০	২৩	১২৩
পঞ্জাব	২০	৪৪	৭	২২	৯৩
বিহার-উড়িষ্যা	৪৮	১৯	৯	২৭	১০৩
মধ্যপ্রদেশ	৪০	৭	৭	১৬	৭০
আসাম	২১	১২	৬	১৭	৫৬

এ পর্য্যন্ত ভারতের শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে করদ ও মিত্র রাজাদের জড়িত করার কোন ব্যবস্থা হয় নি। এবারে উক্ত আইনভুক্ত না হলেও ভারতীয় রাজন্যবর্গকে একটি নিয়মিত সঙ্ঘের অধীন করবার জন্য 'চেম্বার অফ্ প্রিন্সেস্' গঠনের প্রস্তাব হ'ল। এ সঙ্ঘের অধিবেশন বছরে একবার হবে ও এর কার্য্যক্রম স্বয়ং বড়লাট নির্দ্ধারিত করবেন স্থির হয়। মণ্টফোর্ড রিপোর্টেই ব্রিটিশ-ভারত ও রাজন্য-ভারতে সম্মেলনে একটি নিখিল-ভারত ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার আভাষ দেওয়া হয়।

শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি রাজকীয় ঘোষণায় রাজবন্দী ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হ'ল। পঞ্জাবে সামরিক আইনে দণ্ডিত ও ধৃত বন্দীরাও মুক্তি পেলেন। এইরূপ আবস্থার মধ্যে এবারে অমৃতশহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। মুক্তবন্দীরা প্রায় সকলেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন, আলীভ্রাতৃদ্বয়ও মুক্তি পেয়ে যথাসময়ে কংগ্রেসে উপস্থিত হন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

কস্তুরবাঈ গান্ধী

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ পঞ্জাবের এই দুর্দ্দিনে মতভেদ ভুলে সকলকে কংগ্রেসে যোগদান করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। মডারেটরা কিন্তু এতে সাড়া দিলেন না। তাঁরা কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় স্বতন্ত্র সম্মেলন করলেন। অবশ্য শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও নরসিংহ শর্ম্মা এবারেও কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। মূল সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রুর অভিভাষণের প্রতি ছত্র পঞ্জাবের অত্যাচরিতদের প্রতি সমবেদনায় ভরপূর। পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অনাচার তদন্তাধীন বিধায় কংগ্রেস মতামত প্রকাশ না করলেও বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ও সার্‌ মাইকেল ওডাওয়ারকেই এসবের জন্য মূলতঃ দায়ী করলেন ও দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালেন। রৌলট আইন, কস্থুর মাপ আইন প্রভৃতির জন্যও গবর্ণমেণ্টের নিন্দাবাদ করা হ'ল। কিন্তু গতবারের মত এবারকার অধিবেশনেরও প্রধান প্রস্তাব হ'ল শাসন-সংস্কার সম্পর্কে। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার ভিত্তি মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কারে একেবারে অগ্রহ্য করা হয়েছে। তাই কংগ্রেস দৃঢ়তার সঙ্গে এই মত প্রকাশ করলেন যে, ভারতবাসীরা পূর্ণ দায়িত্বশীল স্বায়ত্ত-শাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত, সুতরাং নূতন আইনে যেরূপ শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে তা অযথেষ্ট, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক ("inadequate, unsatisfactory and disappointing")। মণ্টেগু সাহেবের চেষ্টা-যত্নের জন্য কংগ্রেস তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে ত্রুটি করেন নি। মোস্‌লেম লীগের অধিবেশনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

যুগসন্ধিক্ষণে মহাত্মা গান্ধী

অমৃতশহর কংগ্রেসে আসন্ন শাসন-সংস্কার সম্পর্কে সুচিন্তিত প্রস্তাব গৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু তুরস্কের ভাবী দুরবস্থার আঁচ পেয়েও কংগ্রেস একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু পঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে তখনও তদন্ত কমিটির রিপোর্ট বের না হওয়ায় ব্যাপকভাবে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা সম্ভব হয় নি। তবে শীঘ্রই যে ভারতের রাজনৈতিক গগনে এক ভীষণ ঝড় উঠ্‌তে পারে তার আভাষ পাওয়া গেল।

১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়। প্রায় শত বর্ষ ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে—মরিসস্, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মালয়, ফিজি দ্বিপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতবর্ষ থেকে ঠিকা মজুর প্রেরণের যে রীতি বলবৎ ছিল ১৯১৯ সালের শেষ ভাগে ভারত-সরকার আইন করে তা বন্ধ করে দিলেন। এজন্য কালবিলম্ব না করে ১লা জানুয়ারী এই উপলক্ষে আনন্দোৎসব করা ধার্য্য হ'ল। আর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বেই এ উৎসব সম্পন্ন হয়। প্রবাসী ভারতীয়দের অকৃত্রিম বন্ধু মহামতি সি এফ এণ্ড্রুজের নাম এ প্রসঙ্গে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তিনি মূলে ছিলেন পাদ্রী, প্রথমে দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্‌স্ কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হন। ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা কার্য্যে যোগদান করেন। এখানে ডব্‌লিউ ডব্‌লিউ পীয়ার্স্‌ন তাঁর সহযোগী হন। ভারতবর্ষে ও বহির্ভারতে ভারতবাসীর সেবায় এণ্ড্রুজ সাহেব সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে আদর করে 'দীনবন্ধু' এণ্ড্রুজ নাম দিয়েছিল। ১৯৪০ সালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। এণ্ড্রুজ ভারতবর্ষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বহু

পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ই স্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে *"Indian Independence—the Immediate Need"* শীর্ষক একখানি পুস্তক লেখেন। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের অন্যতম অকৃত্রিম বন্ধু মিঃ এইচ এস এল পোলকের নামও এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতবাসীর এ আনন্দ কিন্তু অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না। শীঘ্রই তুরস্কের প্রতি মিত্রশক্তিদের, বিশেষ করে, ব্রিটিশের কঠোর মনোভাব প্রকটিত হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে এজন্য ভীষণ বিক্ষোভ উপস্থিত হ'য়। তুরস্কের সুলতান মুসলমান জগতের খলিফা ও পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের রক্ষক। তাঁর রাজ্যচ্যুতি ঘটলে বা তুর্কী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হলে মুসলমান সমাজের ধর্ম্মহানির বিশেষ আশঙ্কা। বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের নিকট ও বিলাতে ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এবং প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরিত হ'ল। কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। বড়লাট তো স্পষ্ট করেই বললেন যে, মিত্রশক্তিদের সমবেত সিদ্ধান্ত ব্রিটেনকে মেনেই নিতে হবে! এর প্রতিকারের জন্য মহাত্মা গান্ধী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করতে উপদেশ দিলেন ও তাঁদের নিকট অহিংসা অসহযোগের প্রস্তাব করলেন।

বস্তুতঃ যখন সেভার্স সন্ধির শর্ত্ত (১৪ই মে, ১৯২০) প্রকাশিত হ'ল তখন মিত্রশক্তি তথা ব্রিটেনের মনোভাব বুঝ্‌তে কারো বাকী রইল না। কন্‌ষ্ট্যাণ্টিনোপ্‌লে তুর্কী সুলতান মিত্রশক্তিবর্গের নজরবন্দী হয়ে রইলেন। তুরস্কের ইউরোপে স্থিত অংশ একটি কমিশনের শাসনাধীন হ'ল, তুর্কী সাম্রাজ্য—আরব, পালেষ্টাইন, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া (বর্ত্তমান নাম

ইরাক) ব্রিটিশ ও ফরাসীরা ম্যাণ্ডেটের আবরণে নিজ নিজ সুবিধা মত আয়ত্ত করে নিলে। মাত্র এশিয়া মাইনরে যেখানে খাঁটি তুর্কীদের বাস সেই অঞ্চলটি সুলতানের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হ'ল। যে পর্য্যন্ত না তুর্কীরা এ সব শর্ত্তে রাজি হয় ততদিন সুলতানকে মিত্রশক্তি বাহিনীর সাহায্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। এরূপ হীন শর্ত্তাবলী প্রকাশে ভারতীয় মুসলমানগণ স্বভাবতঃই ব্রিটেনকেই দায়ী করলে। মহাত্মা গান্ধী তাদের এই বিপদে সহায় হলেন। এলাহাবাদে নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের কৌন্সিল বা কার্য্যকরী সমিতিতে গান্ধীজী অসহযোগের মর্ম্ম ও গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে নেতৃবর্গ এতে তাঁদের সম্মতি জানালেন। ২৮শে মে তারিখে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত খিলাফৎ সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। মুসলমান-গণ হিন্দুসমাজের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করবার প্রয়োজনীয়তা এবারেও বিশেষ করে অনুভব করলে। বাস্তবিক, তুরস্ক এক হিসাবে ভারত-বর্ষের প্রকৃত বন্ধু। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভেদ-নীতির প্রকোপে হিন্দু মুসলমান যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয় তখন এল তুরস্কের বিপদ। ১৯১১-১৩ সাল, এই তিন বছর তুর্কির উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যায় তাতে মুসলমাগণ শাসকজাতির উপর আস্থা রাখ্‌তে না পেরে, হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চল্‌বার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভব করে। ভারতের অসহযোগ আন্দোলন সেভার্স সন্ধি নাকচে এবং মিত্রশক্তি ও তুর্কীর মধ্যে লজান সন্ধি সংসাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে। মহাত্মা গান্ধীর নাম তুর্কী সমাজে আজও বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

পঞ্জাবের অনাচারে ভারতবাসী মাত্রেই বিক্ষুব্ধ। কংগ্রেস সাব-কমিটির রিপোর্ট বের হ'ল ২৫শে মার্চ্চ। এ রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মুকুন্দ রামরাও জয়াকর, ফজলুল্ হক ও আব্বাস তায়েবজী। তাঁদের কার্য্যে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, জবাহরলাল নেহ্রু, সান্তনম্ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। স্বাক্ষরকারিগণ পঞ্জাবে কোনরূপ বিদ্রোহের লক্ষণ দেখ্তে পান নি। এসব অনাচারের জন্য তাঁরা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বড়লাট লর্ড চেম্স্ফোর্ড, সার্ মাইকেল ওডাওয়ার, জেনারেল ডায়ার থেকে আরম্ভ করে বহু উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীকে দায়ী করলেন।

গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট বের হয় পরবর্ত্তী ২৮শে মে। সভ্যগণ একমত হয়ে রিপোর্ট দিতে পারেন নি। কমিটির সদস্য চিমনলাল শীতলবাদ ও পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল স্বতন্ত্র রিপোর্ট দেন। তাঁরা পঞ্জাবে সামরিক আইন জারির যুক্তিযুক্ততা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন ও এর উপর ভিত্তি করে তাঁদের সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হয়। কংগ্রেস তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে তাই মূল বিষয়ে এ দু'জন সভ্য প্রায় একমত ছিলেন। কিন্তু হাণ্টার কমিটির অধিকাংশ সভ্য (ইংরেজ) সামরিক আইনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে মত প্রকাশ করলেন ও অত্যাচারী কর্ম্মচারীদের মৃদু ভর্ৎসনা করেই নিরস্ত রইলেন। তবে তাঁরা একথা স্বীকার না করে পারলেন না যে, পঞ্জাবে ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের আয়োজন বা আফগান যুদ্ধের সঙ্গে এর কোন সংস্রব ছিল না। তাঁরা আরও বল্লেন যে, অতক্ষণ গুলি চালাবার অনুমতি দিয়ে ডায়ার ভাল কাজ করেন নি। অন্য কোন কোন বিষয়েরও তাঁরা সমালোচনা করেন।

হাণ্টার কমিটির অধিকাংশ সভ্য ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অপরাধ লঘু করারই চেষ্টা করেছিলেন। একারণ সাধারণে রিপোর্টের তেমন মূল্য দিলে না, পরন্তু জনমত ক্রমে অধিকতর তীব্র হয়েই উঠ্ল। ভারত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হাণ্টার কমিটির অধিকাংশের মতামতই গ্রহণ করলেন।

হাউস্ অফ্ কমন্সেও অতঃপর, ৮ই জুলাই তারিখে পঞ্জাবের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'ল। ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ডায়ারের গুলি চালনার কথা উল্লেখ করে এইমাত্র বল্‌লেন যে, ডায়ারের ভয়ঙ্কর বিচার বিভ্রম হয়েছিল ("grave error of judgment") ডায়ারকে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অধীন কোন নূতন পদে নিযুক্ত করা হবে না স্থির হ'ল। হাউস্ অফ্ লর্ডস্ কিন্তু অধিকাংশ ভোটেই (১২৯—৮৬) হাউস অফ কমন্সের এই সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ও ডায়ারের গুণপনায় আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন! এই বার্ত্তা যখন ভারতবর্ষে পৌছল তখন ভারতবাসীদের মনোভাব কিরূপ তিক্ত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজ মহিলারা আবার 'বীরত্ব' প্রকাশের জন্য চাঁদা তুলে ডায়ারকে তিন লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন!

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ইতিপূর্ব্বেই ৩০শে মে তারিখে বারাণসী ধামে সমবেত হন এবং খিলাফৎ ও পঞ্জাবের অনাচার সম্পর্কে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন। কল্‌কাতায় অধিবেশন স্থল নির্দ্ধারিত হ'ল।

অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব খিলফৎ সম্মেলনে গৃহীত হবার পর মহাত্মা গান্ধী পরবর্ত্তী ১লা আগষ্ট প্রকাশ্যে আন্দোলন সুরু করা সাব্যস্ত করলেন। এইদিন সর্ব্বত্র হরতালও ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু ভারতের ও ভারতবাসীর এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে এর পূর্ব্বদিন ৩১শে জুলাই রাত্রি ১-৪৫ মিনিটের সময় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাপ্রয়াণ করলেন। কর্ত্তব্যবিমূঢ় জাতি তাঁর নিকট কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ লাভ করবেন সকলে এই আশা করেছিল। একারণ এসময় তাঁর প্রয়াণ ভারতবাসীর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হ'ল। জাতি ধর্ম্ম ও মত বৈষম্য ভুলে ভারতবর্ষের নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ তাঁর প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। ভারতের সর্ব্বত্র তাঁর শোকে

হরতাল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ও স্মৃতি রক্ষার্থ নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকার আয়োজন হয়। কংগ্রেসও তাঁর স্মৃতি-রক্ষার বিশেষ আয়োজন করেন।

মহাত্মা গান্ধী এপর্য্যন্ত যে-সব আন্দোলন চালিয়েছেন তার নাম কখনো দেওয়া হয়েছে 'প্যাসিভ্ রেজিষ্টান্স' বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, কখনো বা দেওয়া হয়েছে সত্যাগ্রহ। অহিংসা ও প্রেম এর মূল উপজীব্য। শত্রুর কর্ম্মগুলির প্রতিরোধে যত রকমের দুঃখই আসুক না কেন সবই সহ্য করব, কিন্তু তার প্রতি কার্য্যে, বাক্যে এমনকি চিন্তায়ও হিংসার ভাব পোষণ করব না, বরং তাকে আত্মীয় জ্ঞানে ভালবাস্‌ব—স্পষ্ট কথায় সত্যাগ্রহের মানে হ'ল এই। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, সত্য ও অহিংসা বা প্রেম একটি টাকার এ-পিঠ ও-পিঠ। তিনি একথাও বলেছেন যে, সত্যাগ্রহ কাপুরুষের ধর্ম্ম নয়। কাপুরুষতা ও হিংসা এ দুটির ভিতর তিনি হিংসাকেই উচ্চতর স্থান দেন। তিনি ভারতবর্ষের পক্ষে অহিংস অসহযোগকেই উৎকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করলেন। তিনি বলেন,

"আমি বিশ্বাস করি অহিংসা হিংসার চেয়ে সহস্র গুণে বড়, দণ্ডের চেয়ে ক্ষমা অধিকতর পুরুষোচিত। ক্ষমা বীরস্য ভূষণম্।

"ক্ষমা সৈনিকেরও ভূষণ। দণ্ড দানে বিরতিকে তখনই ক্ষমা বলি যখন ক্ষমা প্রদর্শকের দণ্ড দানের ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতাহীন লোকের ক্ষমা প্রদর্শন নিরর্থক। ইঁদুর তার ভক্ষক বিড়ালকে কখনই ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু আমি ভারতবর্ষকে তেমন নিঃসহায় বা দুর্ব্বল মনে করি না, আমি নিজেকেও তেমন নিঃসহায় ও দুর্ব্বল মনে করতে অক্ষম।

"আমি কল্পনাবিলাসী নই। আমি নিজেকে আদর্শপ্রিয় কর্ম্মী বলে মনে করি। অহিংসা শুধু মুনি-ঋষিরই পালনীয় নয়। সাধারণ লোকেও অহিংস হ'তে পারে। হিংসা যেমন পশুর ধর্ম্ম অহিংসা তেমনি মনুষ্যের ধর্ম্ম। মনুষ্যত্ব ঐশী শক্তির নিকট আমাদের নতি দাবি করে।

"আমি তাই ভারতবাসীর সম্মুখে সনাতন আত্মোৎসর্গ নীতি উপস্থিত করেছি। কারণ সত্যাগ্রহ ও তার সন্তান অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দুঃখভোগের নূতন নাম মাত্র। যে-সব ঋষি হিংসার প্রাবল্যের ভিতরেও অহিংসার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরা নিউটনের চেয়ে বড় আবিষ্কর্ত্তা, তাঁরা ওয়েলিংটনের চেয়ে বড় যোদ্ধা। নিজেরা অস্ত্র-ব্যবহার জেনেও তাঁরা এর অনাবশ্যকতা বুঝেছিলেন ও পরিশ্রান্ত বিশ্বজগৎকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, এর মুক্তি হিংসার পথে নয়, অহিংসারই মধ্যে।

"আমি সুতরাং ভারতবর্ষ দুর্ব্বল বলে তাকে অহিংসা-নীতি গ্রহণ করতে বলি না। তার শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় জেনেই আমি তাকে অহিংসা নীতি গ্রহণ করতে বলি। আমি চাই যে, ভারতবর্ষ জানুক —তার আত্মা অমর, দৈহিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সে চিরজয়ী।

"সিন-ফিন নীতি থেকে আমার অসহযোগ-নীতি স্বতন্ত্র, কারণ এ এমন ভাবে পরিকল্পিত যে, হিংসার পাশে এর অনুসরণ অসম্ভব। কিন্তু যাঁরা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী তাঁদেরও আমি অহিংস অসহযোগ নীতি পরখ করতে অনুরোধ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জগতের প্রতি ভারতবর্ষের সুনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বা মিশন আছে।"

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম্ম প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। নেতৃবর্গ এ সব গ্রহণে স্বভাবতঃই দ্বিধা প্রকাশ করলেন। জনমত কিন্তু এর বিশেষ পক্ষপাতি হয়ে উঠ্‌ল। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের বিরাট জনসমুদ্র এর দ্বারা যেন অকূলে কূল পেল। সকলেই যে গান্ধীজীর মত অহিংসাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলে গ্রহণ করলেন তা নয়। জবাহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, তখন অনেকের পক্ষে এমনকি নেশনাল কংগ্রেসের পক্ষেও অহিংসা-নীতি আদর্শে পৌছবার প্রকৃষ্ট উপায় বলেই গণ্য হয়।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর কৈশর-ই-হিন্দ্‌ পদক সরকারে ফেরত দিলেন।

প্রস্তাবিত অহিংস অসহযোগ নীতি সম্পর্কে বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ডকে একখানি পত্রে জানিয়ে তবে নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি প্রচার কার্য্য আরম্ভ করলেন। প্রথম থেকেই তাঁর কার্য্যে প্রধান সহায় হলেন মৌলানা সৌকৎ আলী ও মহম্মদ আলী। মহাত্মাজী এই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ প্রদেশ প্রথম সফর করেন। তিনি যেখানেই যান সর্ব্বত্র নরনারী তাঁকে অভিনন্দন জানান ও অহিংস আন্দোলনে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তখন পর্য্যন্ত মাত্র দুটি বিষয়ের প্রতিকার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য করেন—(১) খিলাফৎ ও (২) পঞ্জাবের অনাচার। ওদিকে প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গুলিও অসহযোগ নীতির উপরে তাঁদের নিজ নিজ মতামত নিখিল-ভারতীয় কমিটিতে পেশ করলেন।

৪ঠা থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হ'ল। প্রতিদিন বিশ হাজার লোক প্রতিনিধি ও দর্শকরূপে কংগ্রেসে উপস্থিত। সকলের মুখেই অহিংস অসহযোগের কথা। সকলেরই দৃষ্টি মহাত্মা গান্ধীর দিকে। এবারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন প্রবীণ চরমপন্থী নেতা ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী। সভাপতিত্ব করলেন লালা লজপৎ রায়। লজপৎ রায় মহাসমরের আরম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। সরকার তাঁকে সুনজরে দেখ্‌তেন না, তাই তিনি যুদ্ধের ভিতরে স্বদেশে ফিরবার ছাড়পত্র পান নি। আমেরিকায় স্থিতিকালেও স্বদেশ-সেবা তাঁর প্রধান কার্য্য ছিল। সেখানে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন করেন। ইণ্ডিয়া বুরো নামে একটি প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করেন। লালাজী এ দুটি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ ছ' বছর মার্কিনদের নিকট ভারত কথা প্রচার করেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও পঞ্জাবের অনাচার তাঁর চিত্ত ব্যথিত করে ও ফিরবার অনুমতি পেয়েই প্রথম সুযোগে তিনি স্বদেশে রওনা হন। ১৯২০, ২০শে

ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে পদার্পণ করে সোজা নিজ ভূমি লাহোরে গেলেন। লালাজী তাঁর উর্দ্দূ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় জুন মাসেই ঘোষণা করলেন যে পঞ্জাবের অনাচারের সহিত জড়িত কর্ম্মচারীদের সঙ্গে ব্যবস্থা-পরিষদে এক যোগে কর্ম্ম করা অসম্ভব, সুতরাং তা বর্জ্জনই শ্রেয়। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে লালা লজপৎ রায়কে সভাপতি পদে বরণ করা হ'ল।

লালাজী তাঁর অভিভাষণে স্বভাবতঃই পঞ্জাবে সরকারী অনাচার, জালিয়ালওয়ালা বাগ, খিলাফৎ সমস্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সার্ মাইকেল ওডাওয়ারের পঞ্জাব শাসনের তীব্র সমালোচনা তাঁর অভিভাষণের একটি প্রধান অঙ্গ। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ সম্পর্কে তিনি নিজ অভিমত পূর্ব্বে প্রকাশ না করে এবিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার কংগ্রেসের উপরই ছেড়ে দেন। লজপৎ রায় জাতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে মডারেটদের কংগ্রেসে যোগদান করতে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা এ আহ্বানে সাড়া দেন নি। তাঁরা এসময় থেকে সদলবলে অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণই করেছেন। ডায়ার্কির আমলে সরকারের অঙ্গীভূত হয়ে আন্দোলন দমনেও তাঁরা কম তৎপর হন নি।

কংগ্রেসের ভিতরকার প্রবীণ চরমপন্থী নেতারাও অহিংস অসযোগে সম্পূর্ণ সম্মতি দিতে পারলেন না। এনি বেসাণ্ট এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন। তিনি পূর্ব্বেও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অসহযোগ প্রস্তাবের মূলনীতি গ্রহণ করলেও এর ধারাগুলিতে সম্মত হতে পারলেন না, বিশেষতঃ কৌন্সিল বর্জ্জন করতে তাঁদের খুবই আপত্তি হ'ল। বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে ও প্রকাশ্য কংগ্রেসে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাবের সংশোধনী উত্থাপন করেন বিপিনচন্দ্র পাল ও সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, মহম্মদ আলী জিন্না,

বিজয়রাঘব আচার্য্য প্রভৃতিও উক্ত মতের অনুবর্ত্তী হলেন। কিন্তু চারদিন ধরে আলোচনার পর মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবই অধিকাংশ ভোটে (১৮৮৬-৮৮৪) গৃহীত হ'ল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রবীণ নেতাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু অসহযোগ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বিস্তর মুসলমান প্রতিনিধি এবারে কংগ্রেসে উপস্থিত থেকে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে নিখিল-ভারত মোস্‌লেম লীগেরও বিশেষ অধিবেশন হ'ল ও সেখানেও অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব কংগ্রেসের তথা ভারতের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে যুগান্তর আনায়ন করে। সরকারের আশ্রয় অস্বীকার করে সর্ব্বকর্ম্মে ষোল আনা আত্মশক্তির উপর নির্ভর করাই এ প্রস্তাবের মূল কথা। স্বদেশী যুগে বাঙালীরাও এইরূপ ব্রত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তখন এ একটি বিশেষ অন্যায় প্রতিকার কল্পেই পরিচালিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবও প্রথমে দুটি বিশেষ অন্যায়ের প্রতিকার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়। কিন্তু এই বিশেষ অধিবেশনেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যে স্বরাজ বা দেশ-শাসনে ভারতবাসীর সম্পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা তা-ও অসহযোগের উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য করা হ'ল। প্রবীণ নেতা বিজয়রাঘব আচার্য্যের নির্দ্দেশেই স্বরাজ কথাটি এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'ল। বার বার অনাচার অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে ভারতবাসীরা স্বরাজ লাভই এসব নিবারণের একমাত্র উপায় বলে ভাব্‌তে শিখেছিল। এই যুগান্তকারী প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"যেহেতু ভারত ও ব্রিটিশ সরকার খিলাফৎ সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নি ও প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, এবং প্রত্যেক অমুসলমান ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য

মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম্ম-সঙ্কটে সাহায্য করা ; যেহেতু ১৯১৯ সালের এপ্রিলের ব্যাপারসমূহে উক্ত উভয় সরকার পঞ্জাবের নিরপরাধ অধিবাসীদের রক্ষা করতে মারাত্মক ভাবে অবহেলা করেছেন, বর্ব্বর ও কাপুরুষোচিত ব্যবহার সত্বেও দোষী কর্ম্মচারীদের দণ্ডদানে অক্ষম হয়েছেন এবং যে সার্ মাইকেল ওডাওয়ার রাজকর্ম্মচারীদের অনাচারের জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী ও যাঁকে নিজ শাসনাধীন অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকা সত্ত্বেও সকল দোষ ক্রটি থেকে মুক্তিদান করা হয়েছে, এবং যেহেতু হাউস্ অফ্ কমন্স ও বিশেষ করে হাউস্ অফ্ লর্ডসের বিতর্কে ভারতবাসীর প্রতি অনুকম্পার পূর্ণ অভাব ও পঞ্জাবে যে নিয়মিত-ভাবে ভীতি প্রদর্শিত ও অনাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন প্রকটিত হয়েছে, এবং খিলাফৎ ও পঞ্জাব সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণায় মোটেই অনুশোচনার ভাব পরিলক্ষিত হয়নি সেহেতু এই কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, এ দুটি অন্যায়ের প্রতিকার না হলে ভারতবর্ষে শান্তি ফিরে আস্বে না, এবং জাতির আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠান ও ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি অসম্ভব করার একমাত্র কার্য্যকর উপায় স্বরাজের প্রতিষ্ঠা।

"কংগ্রেসের অভিমত এই যে, যতদিনে উক্ত অন্যায় দুটির প্রতিকার ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন ভারতবাসীদের পক্ষে ক্রম বর্দ্ধমান অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ ও পালন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

"যাঁরা এতদিন জনমত গঠনে ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করায় ব্রতী রয়েছেন সে-সব শিক্ষিত শ্রেণীর এদিকে কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। সরকার লোককে উপাধি ও সম্মান বিতরণ করে এবং বিদ্যালয়, আইন-আদালত ও ব্যবস্থা-পরিষদের মধ্য দিয়ে তাঁদের ক্ষমতার পরিপুষ্টি সাধন করেন। আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা কম দায় গ্রহণ ও

ত্যাগ-স্বীকার বাঞ্ছনীয়, এজন্য কংগ্রেস সাগ্রহে শিক্ষিত শ্রেণীদের মাত্র এ কয়টি কার্য্য করতে পরামর্শ দিচ্ছেন,—

"(ক) উপাধি বর্জ্জন, অবৈতনিক পদ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির মনোনীত সদস্যগণের সদস্যপদ ত্যাগ,

"(খ) গবর্ণমেণ্ট দরবার, লেভী এবং সরকারী বা আধা-সরকারী সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান বর্জ্জন,

"(গ) সরকারী বা সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ ক্রমিক বর্জ্জন ও বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা,

"(ঘ) উকীল ও মক্কেলগণ কর্ত্তৃক সরকারী আদালত বর্জ্জন ও পক্ষ-প্রতিপক্ষের মধ্যে মামলা মেটাবার জন্য সালিশী আদালত গঠন,

"(ঙ) সৈন্য, কেরাণী ও জনমজুরদের মেসোপটেমিয়ায় কর্ম্ম গ্রহণ করায় অস্বীকৃতি,

"(চ) ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য পদ প্রার্থীদের নির্ব্বাচন-পত্র প্রত্যাহার এবং যাঁরা এই নির্দ্দেশে অমান্য করে প্রার্থী হবেন এমন সব প্রার্থীকে ভোটদাতাদের ভোট না দেওয়া,

"(ছ) বিদেশী দ্রব্য বয়কট।

"নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাদের উপর ভিত্তি করে অসহযোগ নীতি পরিকল্পিত, কারণ এ দুটি ছাড়া কোন জাতি সত্যকার উন্নতি লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক নরনারী ও শিশুকে অসহযোগ নাতির প্রথম ধাপ অনুসরণের সুযোগ দেওয়া উচিত। একারণ কংগ্রেস বস্ত্র সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণকে স্বদেশী ব্রত গ্রহণে পরামর্শ দেন। ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীর পর্য্যবেক্ষণে পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি জাতির প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট বস্ত্র ও যথেষ্ট সূতা উৎপন্ন করতে বর্ত্তমানে অসমর্থ ও সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল অসমর্থ থাকবে, এজন্য কংগ্রেস এই পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক

গৃহে চরকায় সূতা কাটা প্রবর্ত্তন করে ও যেসব লক্ষ লক্ষ তাঁতি উৎসাহ অভাবে জাত-ব্যবসা পরিত্যাগ করেছেন তাঁদের বস্ত্র বয়নে উদ্বুদ্ধ করে বেশী পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদনে সাহায্য করা প্রয়োজন।”

আগে বলেছি, লালা লজপৎ রায় অভিভাষণে অসহযোগ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ না করে সিদ্ধান্তের ভার কংগ্রেসের উপড় ছেড়ে দেন। তিনি উপসংহার বক্তৃতায় কংগ্রেস কর্ত্তৃক অসহযোগ নীতি গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দফাওয়ারী ভাবে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেও ত্রুটি করেন নি। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জ্জনের সার্থকতা তিনি মোটেই স্বীকার করলেন না। তাঁর মতে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতিরেকে জাতীয় শিক্ষা অসম্ভব। বঙ্গে স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় এ বিষয় যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে। লালাজী বিদেশে—বিলাতে, মার্কিনে, ফ্রান্সে, জাপানে স্বাধীনভাবে ভারতকথা প্রচারের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেন।

বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মান্য করে বিভিন্ন প্রদেশে বহুজন সদস্যপদপ্রার্থী পত্র প্রত্যাহার করলেন। উপাধিধারীরাও কেউ কেউ উপাধি বর্জ্জন করলেন। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কৌন্সিল বর্জ্জনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা এই বিষয়ে কংগ্রেস নির্দ্দেশ অমান্য করবেন কি-না বিবেচনার জন্য পরামর্শ সভাও আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু বরিশালের নায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের পরামর্শে নেশনাল কংগ্রেসের নির্দ্দেশ পালনই যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অতঃপর বাংলায়ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করা হ'ল। কিন্তু এখন থেকেই বার্ষিক অধিবেশনে অসহযোগ নীতির বিরোধিতা করবার জন্য সর্ব্বত্র তোড়জোড় সুরু হ'ল।

এবারে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হ'ল নাগপুরে। অভ্যর্থনা-

সমিতির সভাপতি হলেন শেঠ যমুনালাল বাজাজ। যমুনালাল ক্রোড়পতি মিল মালিক। তিনি সরকার প্রদত্ত রাও বাহাদুর উপাধি বর্জ্জন করে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন। মূল সভাপতি হলেন প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা বিজয়রাঘব আচার্য্য। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এবারকার কংগ্রেস নানাদিক থেকেই অভিনব। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে অন্যূন চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি ও ততোধিক দর্শক কংগ্রেসে এসে যোগ দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ নীতিতে কতখানি জনমত সায় দিয়েছিল এ তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু প্রতিনিধিদের এত সংখ্যাধিক্য হবার আরও একটি কারণ ছিল। অসহযোগ-বিরোধীরাও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢের প্রতিনিধি নাগপুরে জড় করিয়েছিলেন। একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশই আড়াই শ' প্রতিনিধি নিয়ে নাগপুরে হন।

এবারকার অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল দুটি, (১) নূতন নিয়মতন্ত্র গ্রহণ ও (২) পূর্ব্বেকার অসহযোগ প্রস্তাব অনুমোদন। কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র তৈরীর ভার অমৃতশহর কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর উপর অর্পণ করেছিলেন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর খসড়া পরখ করে প্রকাশ্য অধিবেশনে বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন। পূর্ব্বে কংগ্রেসের তেমন কোন ধরা বাঁধা নিয়মতন্ত্র ছিল না। কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মতন্ত্র না থাকার দরুণই সুরাট কংগ্রেস ভেঙে যায়, কোন কোন বিশিষ্ট লেখক ও কংগ্রেসের নেতা একথা বলেছেন। ১৯০৮ সালেই প্রথম কংগ্রেসের একটি নিয়মতন্ত্র রচিত হয়। এতদিন এই নিয়মতন্ত্র অনুসারেই কাজ চলেছিল। এখন সময়ের পরিবর্ত্তনে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্রও নূতন করে রচনা করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বল্প কথায় এরূপ ব্যক্ত করলেন, "কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সর্ব্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাসীদের দ্বারা স্বরাজ লাভ।" '(The

object of the Congress is the attainment of Swaraj by the people of India by all legitimate and peaceful means)' নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি নূতন করে গঠনের ব্যবস্থা হ'ল। সারা বছর যাতে নিয়মিত ভাবে কংগ্রেসের কার্য্য চলে সেজন্য এবারেই প্রথম কংগ্রেসের অঙ্গরূপে 'ওয়াকিং কমিটি' বা কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হ'ল। প্রত্যেক কংগ্রেস-সদস্যের বার্ষিক চাঁদা চার আনা ধার্য্য হয় ও কংগ্রেসে প্রতিনিধি সংখ্যা নির্ণীত হয় ছ' হাজার। নিয়মতন্ত্রে ভাষা হিসাবে প্রদেশ গঠনের মূল-নীতিও গৃহীত হ'ল। অল্প-স্বল্প সংশোধনের পর কংগ্রেসে গান্ধীজীর রচিত নিয়ম-তন্ত্র গৃহীত হ'ল। উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা নিয়ে কিন্তু ঘোর বিতর্ক হয়েছিল, আর এতে যোগ দিয়েছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও মহম্মদ আলী জিন্না। জিন্না সাহেব এর পর থেকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করলেন। মালবীয়জী কিন্তু ১৯২২ সালে উদ্দেশ্যপত্রে সহি করে পুরাদস্তুর কংগ্রেসের সভ্যই রয়ে গেলেন।

সকলেই কিন্তু আঁচ করেছিল, দ্বিতীয় প্রধান আলোচ্য বিষয় অসহযোগ নীতি অনুমোদন নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ ও বিতর্কের সৃষ্টি হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা কিছুই হ'ল না। চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লজপৎ রায় প্রমুখ বিরুদ্ধবাদীরা সকলেই মহাত্মা গান্ধীর মতে মত দিলেন! এ ব্যাপারে একদিকে যেমন মহাত্মা গান্ধীর ঐশীশক্তির জয় সর্ব্বত্র ঘোষিত হ'ল অন্যদিকে তেমন চিত্তরঞ্জন ও লজপতের উপরও লোকের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পূর্ব্বেকার অসহযোগ প্রস্তাব ব্যাপকতর করে প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপন করলেন স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ ও সমর্থন করলেন লালা লজপৎ রায়। অসহযোগ-আন্দোলন যে বিপুল শক্তি নিয়ে ভারত বক্ষ মথিত করবে তা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না।

ভারতে জন-জাগরণ

(১৯২১—১৯২৩)

কোন কোন সমালোচক নাগপুর কংগ্রেসকে 'গান্ধী কংগ্রেস' আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুতঃ, এই অধিবেশন থেকেই গান্ধীজীর প্রেরণায় কংগ্রেস তথা জাতি এক নূতন আদর্শ ও পথের সন্ধান পায়। এর পরেই ভারতবাসীদের মধ্যে আশ্চর্য্য আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখ-সহন-শক্তির বিকাশ দেখ্‌তে পাই। নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, মোটা মাইনের চাকুরে, সামান্য উপার্জ্জনক্ষম জনমজুর সকলের ভিতরেই এক অভিনব সাড়া এল। বাংলা পঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার, সিন্ধু, ব্রহ্মদেশ, পেশোয়ার ভারতের দিকে দিকে সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্ব্ব স্তরের লোকের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগের বার্ত্তা অবিলম্বে পৌছল। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, চাঁদ মিঞা, মুজিবর রহমান, মৌলানা আক্রাম খাঁ ও মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, বিহারে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজহ্‌রুল হক, কাশীতে ডাঃ ভগবান দাস, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত, যুক্তপ্রদেশে পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, তাসাদ্দক আহমদ খাঁ সেরওয়ানী, রফি আহ্‌মদ কিদোয়াই, দিল্লীতে হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্সারি, পঞ্জাবে লালা লজপৎ রায়, ডাঃ কিচলু, ডাঃ সত্যপাল, ভাই পরমানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, সরলা দেবী চৌধুরাণী, করাচীতে ডাঃ চৈৎরাম গিদ্‌ওয়ানি ও জয়রামদাস দৌলত রাম, বোম্বাইয়ে ওমর শোভানী, শেঠ ছোটানী, গুজারাটে বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, বল্লভভাই ঝাভেরী পটেল, মহারাষ্ট্রে নরসিংহ চিন্তামন কেলকার, শঙ্কররাও দেও, বোপৎকর, বাপাৎ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে নারায়ণ ভাস্কর খারে, মাধবশ্রীহরি আনে, অভয়াঙ্কর,

মাদ্রাজে রাজা গোপালাচার্য্য, ইয়াকুব হাসান, পট্টভি সীতারামিয়া, উড়িষ্যায় গোপবন্ধু দাশ, গোপবন্ধু চৌধুরী, আসামে নবীনচন্দ্র বরদলুই ও তরুণরাম ফুকন প্রভৃতি শত শত ভারত-সন্তানের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে ভারত ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল। মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী ও তাঁদের বৃদ্ধা মাতা বাঈ আম্মা সর্ব্বস্ব পণ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বিপুল আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে দরিদ্রের বেশে সাধারণের পাশে এসে দাঁড়ালেন। জনগণ অমনি তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়ে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানালে। মোটা মাইনের চাক্‌রে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও সদ্য সিবিলিয়ন চাক্‌রি প্রাপ্ত সুভাষচন্দ্র বসু সর্ব্বরকম সুখ-সুবিধা ও রাজসম্মানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কায়মনে দেশসেবায় নিযুক্ত হলেন। মহাত্মা-সহধর্ম্মিনী কস্তুরবাঈ গান্ধী স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের নারী-সমাজকেও মুক্তি-সাধনায় যোগ্য স্থান গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বিদুষীশ্রেষ্ঠা কবি-যশস্বিনী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু থেকে আরম্ভ করে সামান্য কৃষক বধূ শ্রমিক রমণী পর্য্যন্ত অহিংস অসযোগ মন্ত্রে দীক্ষা নিলে।

স্কুল-কলেজ বর্জ্জন নিয়ে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়। প্রত্যেক প্রগতিমূলক আন্দোলনেই তরুণ মন আগে সাড়া দেয়। সুতরাং বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাইলে। একদিকে যেমন স্কুল-কলেজ পরিত্যক্ত হ'ল অন্যদিকে তেমনি ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে জাতীয় শিক্ষায়তনও প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কল্‌কাতায় নেশনাল কলেজ, পাটনায় বিহার বিদ্যাপীঠ, বারাণসী ধামে কাশী বিদ্যাপীঠ, আলীগড়ে নেশনাল মুসলিম ইউনিভার্সিটি, গুজরাটে গুজরাট বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্রে তিলক বিদ্যাপীঠ, অন্ধ্রে জাতীয় বিদ্যায়তন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে প্রতি জেলায়, মহকুমায়, এমন কি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে

পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে স্বরাজের বার্ত্তা প্রচার করলেন, এবং স্বরাজের প্রধান ধাপ স্বরূপ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, চরকা গ্রহণ, মাদক-সেবন নিবারণ ও অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। গান্ধীজী এ কথাও বল্‌লেন যে, এই সব যথারীতি অনুসৃত হলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। ভারতবর্ষ অকস্মাৎ কর্ম্মচঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

আন্দোলনের মুখে ৩১শে মার্চ্চ ও ১লা এপ্রিল এই দুদিন বেজওয়াড়ায় ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। এ অধিবেশনে কার্য্যক্রম স্থির হ'ল এইরূপ (১) তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা অর্থসংগ্রহ, (২) জনসাধারণের মধ্য থেকে কংগ্রেস সভ্য গ্রহণ ও (৩) কুড়ি লক্ষ চরকা প্রবর্ত্তন। পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা ও মাদক দ্রব্য বর্জ্জন আন্দোলন চালাবারও কথা হ'ল। ইতিমধ্যেই শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ওজুহাতে সরকার নানাস্থানে নেতৃবৃন্দের উপর ফৌজদারী আইনের ১৪৪ ও ১০৮ধারা জারি করলেন। এইরূপে ময়মনসিংহে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের, আরায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মজহ্‌রুল হকের, কল্‌কাতায় ইয়াকুব হাসানের ও পেশোয়ারে লালা লজপৎ রায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। বেজওয়াড়া অধিবেশনে কমিটি স্থির করলেন, এসব আদেশ আপাততঃ মান্য করা হবে।

এর পর শহর ও পল্লীতে জোর প্রচারকার্য্য সুরু হ'ল। যে সব লোক কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মান্য করে সরকারের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সংস্রব বর্জ্জন করেছেন তাঁরাই প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত হবার উপযুক্ত বিবেচিত হলেন। পল্লী এতকাল শিক্ষিত জনের নিকট অবজ্ঞাত ছিল। এবারে অসহযোগী প্রচারকগণ পল্লীকেও আন্দোলনের কেন্দ্র করে শহরের সমান মর্য্যাদা দান করলেন। পল্লীবাসীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার

অন্ত নেই। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ এমন কি কিশোর বালকেরাও স্বরাজের কথা আলোচনা সুরু করলে। চরকার গুঞ্জনে পল্লী মুখর! হৃত সন্তান ফিরে পেলে মায়ের প্রাণে যে অনাবিল আনন্দ জন্মে শতবর্ষ পরে হৃত সম্পদ চরকা পেয়ে পল্লীবাসীর মনে আজ সেই আনন্দ! তারা আবার গান ধরলে,

চরকা আমার সোয়ামি পুত, চরকা আমার নাতী ;
চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী।

স্বল্প পূর্ব্বে ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় বস্ত্রাভাব পল্লীবাসীরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছে। প্রতি জোড়া দশ হাতি ধুতির দাম ছ' সাত টাকায় চড়েছিল। তখন কত নারী যে লজ্জা নিবারণে অসমর্থ হয়ে আত্মহত্যা করে তার খবর তারা জান্‌ত। তাই চরকার ভিতরে হৃত সম্পদের সন্ধান পেলে। কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ সময় চরকার গুঞ্জন ছন্দোবদ্ধ করে দেশবাসীকে শোনালেন,

ভোমরায় গান গায় চরকায়, শোন, ভাই!
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই!
ঘর-বার করবার দরকার নেই আর,
মন দাও চরকায় আপনার আপনার!
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর-ঘর!
ঘর-ঘর ক্ষীর-সর,—আপনায় নির্ভর!
পড়শীর কণ্ঠে জাগ্‌ল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

* * *

চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি
সূর্য্যের কাটনায় কাঞ্চন-বৃষ্টি।

ইন্দ্রের চরকায় মেঘজল থান থান !
হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান !
ঘর-ঘর দৌলত ! ইজ্জৎ ঘর-ঘর !
ঘর-ঘর হিম্মৎ,—আপনায় নির্ভর !
গুজরাট—পাঞ্জাব—বাংলায় সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

এপ্রিল মাসেই লর্ড রেডিং বড়লাট রূপে ভারতে এলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের মধ্যস্থতায় গান্ধীজী লর্ড রেডিঙের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেন। কারণ প্রতিপক্ষের নিকট থেকে কোন কিছু গোপন করা সত্যাগ্রহের রীতিবিরুদ্ধ।

এর ভিতরেই যে ধড়পাকড় না হয়েছিল তা নয়। তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৫ই জুন বোম্বাই অধিবেশনে স্থির করলেন যে, অসহযোগিগণ ব্রিটিশ আদালতের বিচারে কোনরূপে যোগদান করবেন না, মাত্র নিজ নিজ কথা বল্‌বার জন্য এক মাত্র বিবৃতি পেশ করতে পারবেন। এর ফলে অসহযোগীরা আত্মপক্ষ সমর্থন না করে বা জরিমানা না দিয়ে হাজারে হাজারে কারাবরণ করেছিলেন।

বেজওয়াড়া অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ যে তিনটি কাজ সংসাধনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন তিন মাসের মধ্যেই তাতে আশ্চর্য্য সাড়া পাওয়া গেল। ২৮—৩০শে জুলাই বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ঘোষণা করেন যে, তিলক স্বরাজ ভাণ্ডারে এক কোটি পনর লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে, এবং ধনকুবের লক্ষপতি কোটিপতি থেকে আরম্ভ করে দিনমজুর পর্য্যন্ত এতে দান করেছেন ! গৃহে গৃহে প্রদত্ত চরকার সংখ্যাও প্রায় কুড়ি লক্ষে পৌছেছে। আর সভ্য সংখ্যা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এরূপ আশাতীত সাফল্যে স্বভাবতঃই

কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হলেন। কংগ্রেস কমিটি এই অধিবেশনেই যুবরাজের অভ্যর্থনার যাবতীয় আয়োজন বর্জ্জন করতে দেশবাসীকে অনুরোধ জানালেন।

ইতিপূর্ব্বেই তুরস্কের মুক্তি-দাতা মুস্তাফা কামাল পাশা আঙ্গোরায় (বর্ত্তমানে, আন্‌কারা) স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তি সেনাবাহিনী প্রেরণের আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌ল। ভারতের আন্দোলনের উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। ৮ই জুলাই করাচীতে মৌলনা মহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী সেনাবাহিনীতে কর্ম্ম করা বা সৈন্য সংগ্রহে সাহায্য করা মুসলমানের পক্ষে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। এই প্রস্তাবের জন্য সম্মেলনের সভাপতি মহম্মদ আলী এবং শৌকৎ আলী, ডাঃ কিচ্‌লু, সারদাপীঠের জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য, মৌলানা নিশার আহম্মদ, পীর গোলাম মুজাদ্দিদ ও মৌলানা হুসেন আহম্মদ অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হলেন। করাচী আদালতে বিচারে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশে পরবর্ত্তী ১৬ই অক্টোবর সহস্র সহস্র জনসভায় উক্ত প্রস্তাব পঠিত ও গৃহীত হ'ল। মহাত্মা গান্ধীও ট্রিচোনোপলির জনসভায় ঐ প্রস্তাব ও মৌলানা মহম্মদ আলীর অভিভাষণ হুবহু পাঠ করলেন।

আন্দোলন যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল অমনি সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে সরকার ১৪৪ ধারার আশ্রয় নিয়ে পাঁচ জনের অধিক জনতা বেআইনি বলে ঘোষণা করতে লাগ্‌লেন। স্থানে স্থানে পুলিশ ও জনতার মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামাও হ'ল। দূর দূর অঞ্চল থেকে আইন অমান্যের আবেদন এলেও ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন অধিবেশনে সকলকে ধৈর্য্য ধারণ করে প্রারম্ভিক কার্য্য যথা—সুরাপান বর্জ্জন, স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ ও বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ,

এবং অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করতে অনুরোধ জানালেন। ৩০শে সেপ্টম্বরের মধ্যে যাতে সকলে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করে—এই মর্ম্মে একটি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর বহু স্থলে স্তূপীকৃত বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব করা হ'ল।

পরবর্ত্তী ৫ই নবেম্বর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী অধিবেশনে স্থির হয় যে, যে-সব অঞ্চলে আইন অমান্য অনুসৃত হবে সেখানকার অধিবাসীদের হাতে সুতা কাটা, খদ্দর পরিধান করা, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য স্থাপন করা অবশ্যক। তাদের সম্পূর্ণরূপে অহিংসায় বিশ্বাস থাকা চাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গুজরাটের বারডৌলী তালুক ও অন্ধ্রের গুণ্টুর জেলা আইন অমান্যের জন্য খুবই প্রস্তুত হয়েছিল।

যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমন কাল ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হ'ল। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে বিভিন্ন প্রদেশে সেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হতে লাগ্‌ল। একদিকে যেমন নিজ নিজ অঞ্চলকে সম্পূর্ণ অহিংস রেখে ভাবী দুঃখভোগের জন্য সকলকে প্রস্তুত করা এই বাহিনীর কাজ, অন্যদিকে যুবরাজের বিভিন্ন কেন্দ্রে পদার্পণে হরতালের অনুষ্ঠান করাও তাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হ'ল।

কিন্তু এর পূর্ব্বে আরও কয়েকটি ব্যাপারের উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন। সম্পূর্ণ অহিংস থেকে অন্যায়, অবিচার, অনাচারের প্রতিবাদে জনসাধারণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এসময়কার বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। সকল ব্যাপারের সঙ্গেই যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তা নয়, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও দুঃখ-সহন-শক্তির শিক্ষা এ থেকেই লোকে লাভ করেছিল। এসময় আসাম চা-বাগানের বহু সহস্র শ্রমিক ধর্ম্মঘট করে একযোগে পদব্রজে দেশের অভিমুখে রওনা হয় ও চাঁদপুরে এসে বাধা পায়। তাদের উপর গুলি-বর্ষণ পর্য্যন্ত হয়েছিল। এর প্রতিবাদ স্বরূপ আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্ম্মঘট ও ষ্টীমার কোম্পানীর

কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট আজও লোকে ভোলে নি। বিনা বাক্য-ব্যয়ে দুঃখ-সহন-শক্তির এমন দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে খুব কমই দেখা গিয়েছে। ধর্ম্মঘটিদের সাহায্যের জন্য দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দীনবন্ধু সি এফ্ এণ্ড্রুজ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু ও গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থীর নেতৃত্বে আগ্রা-অযোধ্যার কৃষক-আন্দোলন ও স্থানে স্থানে পুলিশের গুলিবর্ষণ, পঞ্জাবে নান্কানা হত্যাকাণ্ড, শিখ মহান্তদের দুর্নীতি নিবারণের জন্য শিরোমণি গুরুদ্বার কমিটির চেষ্টা ও অকালী শিখদের দীর্ঘকাল ব্যাপী সত্যাগ্রহ, নাভা-রাজের অপসারণে জাইটোতে শিখ জাঠা প্রেরণ, অন্ধ্রপ্রদেশের চিরলা গ্রামে অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিউনিসিপালিটি স্থাপন ও তাদের গ্রাম ত্যাগ, মেদিনীপুর জেলার কাঁথী অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অসহযোগী ব্যারিষ্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের আন্দোলন প্রভৃতির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মালাবারের মুসলমান মোপ্লাদের বিদ্রোহ এ সময়কার একটি বিশেষ শোচনীয় ঘটনা। প্রথমে ইংরেজ ও পরে হিন্দুদের উপর তারা অত্যাচার করে। বিদ্রোহ প্রশমনের জন্য হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দকে সেখানে যেতে না দিয়ে সরকার সামরিক আইন প্রয়োগে বিদ্রোহ দমন করলেন। সত্তর জন মোপ্লা বিদ্রোহী রেলে চালান দেওয়ার সময় গাড়ীর মধ্যে হাওয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়!

একটু আগে বলেছি, যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েল্সের অভ্যর্থনায় হরতাল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। যুবরাজ ২১শে নবেম্বর বোম্বাই পদার্পণ করলেন। এ দিন ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। মহাত্মা গান্ধী তখন বোম্বাইয়ে। এখানে হরতালের দিন ভীষণ দাঙ্গা হ'ল। দাঙ্গা পরবর্ত্তী কয়েক দিন পর্য্যন্ত চলে। মহাত্মা গান্ধী শত চেষ্টা করেও

দাঙ্গা থামতে না পেরে উপবাস আরম্ভ করেন। এর ফলে দাঙ্গা থেমে যায় এবং পাঁচ দিন উপবাসের পর গান্ধীজী অন্নজল গ্রহণ করেন।

সরকার অতঃপর এই সুযোগে সর্ব্বত্র অর্ডিনান্স জারি করে স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী বে-আইনি ঘোষণা করলেন। কল্‌কাতার রাস্তায় খদ্দর ফেরী করার সময় চিত্তরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, ভগিনী শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী সুনীতি দেবী ৭ই ডিসেম্বর ধৃত হলেন। তাঁদের ঐ দিন রাত্রেই আবার ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ হ'ল ব্যাপক ধরপাকড়ের পূর্ব্বাভাষ। কল্‌কাতায় চিত্তরঞ্জন দাশ, আবুলকালাম আজাদ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান ষোল হাজার সেচ্ছাসেবক অবিলম্বে কারারুদ্ধ হলেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রুও ধৃত হলেন। পঞ্জাবে লালা লজপৎ রায় ইতিমধ্যেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। এত করেও কিন্তু বড়লাট লর্ড রেডিং মনে সোয়াস্তি পেলেন না। কারণ যেখানেই যুবরাজ গমন করেন সেখানেই পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। তিনি প্রকাশ্যে বল্‌লেন—এসব দেখে শুনে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন ও হতভম্ব হয়েছেন (purplexed and puzzled)। কল্‌কাতায়ও যাতে এরূপ হরতাল অনুষ্ঠিত না হয় সেজন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। মহম্মদ আলী জিন্না ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় লর্ড রেডিং ও দেশবন্ধুর মধ্যে দূতের কার্য্য করে একটা আপোষ-রফার আয়োজন করেন। অর্ডিনান্স তুলে নিয়ে কারাবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে মুক্তি দিলেই আপোষের কথাবার্ত্তা সুরু হতে পারে, দেশবন্ধু এ মর্ম্মে কথা দিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি এ কথাও বল্‌লেন যে, পূর্ব্বাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর সম্মতি লাভ করা চাই। মহাত্মা গান্ধী আলীভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে করাচী প্রস্তাবে বন্দী নেতাদেরও মুক্তি দাবী করায় ও বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য

কল্‌কাতা থেকে চলে যাওয়ায় আপোষ-আলোচনা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নি। দেশবন্ধু পরে বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী তখন রাজী না হয়ে ভ্রম করেছেন। জবাহরলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কিন্তু বলেন, সমূহ বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে আমলাতন্ত্র নিশ্চয়ই আবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতেন। কল্‌কাতায় হরতাল সবচেয়ে বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয়। এদিন এখানে ট্রাম চলাচল বন্ধ ছিল, রজনীতে অমানিশার অন্ধকার বিরাজ করে।

আহ্‌মদাবাদ কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে অন্যূন ত্রিশ হাজার ভারতবাসী কারাবরণ করে। নির্ব্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কারারুদ্ধ। তাঁর অনুপস্থিতিতে হাকিম আজমল খাঁ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন। চিত্তরঞ্জনের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু। পূর্ব্ব বছরের নিরিখে আগামী বছরের করণীয় নির্ণীত করে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। বলা বাহুল্য এটিই এবারকার অধিবেশনের প্রধান প্রস্তাব। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এতে বলা হ'ল যে, সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী অপূর্ব্ব নির্ভীকতা, স্বার্থত্যাগ ও অহিংসার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। গবর্ণমেণ্ট খিলাফৎ সমস্যা, পঞ্জাবের অনাচার ও স্বরাজ এ তিনটি বিষয়ে দেশবাসীর মনোভাব ক্রমাগত উপেক্ষা করেই চলেছেন এবং অর্ডিন্যান্স জারি করে ও ফৌজদারী আইনের বিবিধ ধারা প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে ও সভা-সমিতি অনুষ্ঠানে ভয়ানক বিঘ্ন ঘটিয়েছেন—নেতা ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে কারারুদ্ধ করে দেশ-সেবায় বাদ সেধেছেন। এজন্য কংগ্রেস আঠার বছরের ঊর্দ্ধ প্রত্যেক নরনারীকে স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণী ভুক্ত হতে নির্দ্দেশ দেন। স্বেচ্ছাসেবকের পক্ষে কথায়, কার্য্যে, চিন্তায় অহিংস থাকা ও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় খিলাফৎ ও পঞ্জাব সমস্যা সমাধান ও স্বরাজ

লাভের উপায় স্বরূপ অহিংস অসহযোগে এবং হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী খ্রীষ্টান, ইহুদীর মিলনে বিশ্বাসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বদেশী গ্রহণ, খদ্দর পরিধান, হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-ভোগ স্বেচ্ছা-সেবকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। সভা-সমিতি অনুষ্ঠান সম্পর্কেও নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের ডিক্টেটর বা সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

আর একটি প্রস্তাবে এই অনুরোধ জানান হ'ল যে যাঁরা অসহযোগের মূল নীতিতে বা এর কর্ম্ম পদ্ধতিতে বিশ্বাস নন্ তাঁরাও যেন দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য খদ্দর ব্যবহার করেন ও খদ্দর ও সূতা উৎপাদনে সাহায্য করেন এবং সুরাপান বর্জ্জন আন্দোলন ও হিন্দু হলে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে অবহিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আচার্য্য সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় অসহযোগী না হলেও কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য, বিশেষ করে খদ্দর প্রচারে তৎপর হয়েছিলেন। তাঁরই সাহায্যে ও বিখ্যাত অসহযোগী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের উদ্যোগে খাদি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

এবারকার মোস্‌লেম-লীগ অধিবেশনের সভাপতি হলেন মৌলানা হস্‌রৎ মোহানী। অভিভাষণে হিংসার প্ররোচনার ওজুহাতে সরকার তাঁকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কংগ্রেস ও লীগের আদর্শ ও লক্ষ্য এক, এজন্য লীগ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে কংগ্রেসের ভিতরই লীন হলেন।

মৌলানা হসরৎ মোহানী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এর 'ক্রীড' বা মূল নীতি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করলেন। 'স্বরাজ' কথাটির বদলে 'সর্ব্বপ্রকার বিদেশী কর্ত্তৃত্ব বিমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা' ("Complete Independence free from all foreign control")—মূল নীতি তিনি এইরূপ পরিবর্ত্তিত করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর বিরোধিতায় তখন এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অতঃপর

কংগ্রেসের মূল নীতিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার এড্‌ভোকেট-জেনারেল পদ ও সি-আই-ই উপাধি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে স্পষ্ট প্রতীত হ'ল, কংগ্রেস শ্রেণীবিশেষ বা দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়, ভারতবর্ষের বিশাল জনসমষ্টিরই মুখপাত্র হয়েছে।

অতঃপর ১৪-১৬ই জানুয়ারী বোম্বাইয়ে প্রথমে সার্ শঙ্করণ নায়ার ও পরে সার্ বিশ্বেশ্বরায়ার সভাপতিত্বে কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির উপায় নির্ণয়ের জন্য একটি সর্ব্বদল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। সম্মেলনের আপোষ প্রস্তাবে সরকার কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন নি। গান্ধীজীও ব্যাপকভাবে কর-বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করবার আয়োজন করলেন। বারডৌলী তালুক এর উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হ'ল। সত্যাগ্রহীর নিয়ম অনুসারে মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড রেডিংকে ১লা ফেব্রুয়ারী পত্র লিখে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন।

কিন্তু সত্যাগ্রহে সাফল্য লাভ করার পক্ষে দেশবাসীর যতখানি অহিংস হওয়া প্রয়োজন তা হয় নি। এর প্রমাণ চৌরী-চৌরার হত্যাকাণ্ড। যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত গোরক্ষপুর জেলায় চৌরী-চৌরা থানার একজন দারোগা ও একুশ জন কনেষ্টবলকে ৫ই ফেব্রুয়ারী জনতা ক্ষেপে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ করে। মহাত্মা গান্ধী এই সংবাদ পেয়ে অতিমাত্র বিচলিত হন ও তাঁর আইন-অমান্য আন্দোলন প্রচেষ্টাকে একটি 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' ("Himalayan Blunder") বলে স্বীকার করেন। পরবর্ত্তী ১২ই ফেব্রুয়ারী বারডৌলীতে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করে আইন অমান্য আন্দোলন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিলেন। বোম্বাইয়ের দাঙ্গা ও চৌরী-চৌরায় জনতার অনাচার—আন্দোলন

বন্ধের জন্য মহাত্মাজী এ দু'টিকেই যথেষ্ট কারণ বলে উল্লেখ করেন। অতঃপর গান্ধীজী জাতির সম্মুখে কতকগুলি গঠন-মূলক কর্ম্মপদ্ধতি উপস্থাপিত করলেন। আইন অমান্য স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্ম্মতালিকা অনুসরণের প্রস্তাব 'বারডৌলী প্রস্তাব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এক কোটি কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহ, চরকা প্রচার, জাতীয় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা, সুরাপান নিবারণ, পঞ্চায়েৎ প্রবর্ত্তন, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এই কর্ম্মপদ্ধতির অঙ্গীভূত হ'ল।

ভারতের সর্ব্বত্র অসহযোগীদের উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। গান্ধীজী কিন্তু অটল। পরবর্ত্তী ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হ'ল ও ব্যক্তিগত আইন অমান্যের অনুমতি বাদে মোটামুটি ভাবে বারডৌলী প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল।

গবর্ণমেণ্ট এতদিনে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তারের সুযোগ খুঁজছিলেন। বারডৌলী প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁরা ভাবলেন তাঁর জনপ্রিয়তা তখন খুবই হ্রাস পেয়েছে, সুতরাং তাঁকে গ্রেপ্তারের এই উপযুক্ত সময়। ১৩ই মার্চ্চ গান্ধীজী শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের সঙ্গে ধৃত হলেন। ১৮ই মার্চ্চ তারিখে আহ্‌মদাবাদ শহরে গান্ধীজীর বিচার হ'ল। তাঁর বিরুদ্ধে ১২৪ (ক) ধারামতে রাজদ্রোহজনক অপরাধ সাব্যস্ত করার জন্য তাঁরই 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ বাছাই করে নেওয়া হয় ("Tampering with Loyalty", "The Puzzle and its Solution, ও Shaking the Manes")। মহাত্মাজী বোম্বাই, মাদ্রাজ ও চৌরী-চৌরার দাঙ্গার সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন ও অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপ্রণালীর কথা ব্যক্ত করে একটি বিবৃতি দান করেন। তিনি নিজ অপরাধ স্বীকার করে বিচারপতি মহোদয়কে বলেন যে, মুক্ত হলে তিনি ঐরূপ অপরাধেই পুনরায় লিপ্ত হবেন, সুতরাং তাঁকে যেন আইনে বিহিত সর্ব্বোচ্চ দণ্ডই

দেওয়া হয়। বিচারপতি গান্ধীজীকে তিনটী অপরাধের জন্য দু'বছর করে ছ'বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। মহাত্মাজীর কারাদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে আবার ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অতঃপর তিন মাস পর্য্যন্ত শেঠ যমুনালাল বাজাজের নেতৃত্বে কংগ্রেস-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। জুন মাসের ভিতরেই কংগ্রেসের পদস্থ নেতারা মুক্ত হলেন। এ সময় বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে কৌন্সিলের মধ্যে থেকে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার কথা উঠে। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী কৌন্সিল-প্রবেশ সম্বন্ধে দেশবন্ধুর অনুকূল মত প্রকাশ করলেন। মধ্য-প্রদেশেও অনুরূপ মতবাদ প্রকাশিত হ'ল। অতঃপর ৭-৯ই জুন লক্ষ্ণৌ শহরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। মুক্তিলাভ করেই পণ্ডিত মোতিলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অধিবেশনে যোগদান করলেন। এ অধিবেশনে বর্ত্তমানের নিরিখে কর্ম্মপদ্ধতির রদ-বদল আবশ্যক কি-না সেজন্য ভারতের সর্ব্বত্র মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভ্য হলেন পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু, ডাঃ আন্‌সারী, বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার, শেঠ ছোটানি, রাজা-গোপালাচার্য্য ও হাকিম আজমল খাঁ (সভাপতি)।

কমিটি ভারতের প্রধান প্রধান অসহযোগ কেন্দ্রে স্বাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তাঁরা যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে মাত্র দুটি বিষয়ে নূতনত্ব ছিল—(১) নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ ও (২) মিউনিসিপালিটি, লোকালবোর্ড ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে সদস্য প্রেরণ। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যপদ গ্রহণে সকলে একমত হলেন, কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু ও বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল কৌন্সিল প্রবেশের অনুকূলে ও ডাঃ মহম্মদ

আলী আন্‌সারী, রাজাগোপালাচার্য্য ও কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার কৌন্সিল প্রবেশের প্রতিকূলে মত দিলেন। ২০-২৪শে নবেম্বর কল্‌কাতায় কমিটির অধিবেশন হ'ল। কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে এতই মতানৈক্য প্রকটিত হ'ল যে, তদন্ত কমিটির সকল সিদ্ধান্তই পরবর্ত্তী গয়া কংগ্রেস পর্য্যন্ত স্থগিত রইল। নিখিল-ভারত খিলাফৎ কমিটিও কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন।

এ বছরে ২৩শে মার্চ্চ মিঃ মণ্টেগু পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁর পদত্যাগের কারণ, ভারতীয় মুসলমানদের সন্তুষ্টির জন্য বড়লাট লর্ড রেডিং ও তাঁর মধ্যে সেভার্স সন্ধির রদ-বদলের প্রস্তাব সম্পৃক্ত পত্রাদি মন্ত্রীসভার অনুমতি না নিয়ে প্রকাশ! গবর্ণমেণ্টের সিবিল-সার্বিসে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ সম্ভব কি-না এ বিষয় বিবেচনার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-গুলির নিকট ও'ডনল সার্কুলার প্রচারিত হয়। সিবিলিয়ানরা এর বিরুদ্ধে বিলাতে জোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জ তাঁদের বিশেষ ভাবে আশ্বাস দেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সিবিল-সার্বিসকে ভারত-শাসনের 'ষ্টীল ফ্রেম' বা ইস্পাত কাঠামো আখ্যা দিলেন।

কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল গয়া তীর্থে (১৯২২)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি পদে বৃত হলেন। তখন কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক মিত্রশক্তিদের অনুচর গ্রীকদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য এশিয়াবাসীর মত সভাপতি চিত্তরঞ্জনও এতে খুবই আশান্বিত ও উৎফুল্ল হন, ও সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এক এশিয়াটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। জাতির মুক্তি সংগ্রামে সময়ে সময়ে যে কর্ম্মপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাও তিনি বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কীয় আলোচনায় গোঁড়া গান্ধীপন্থীরা একথা স্বীকার করলেন

না। রাজাগোপালাচার্য্যের নেতৃত্বে তাঁরা এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে পূর্ব্ব অহিংস অসহযোগই হুবহু বাহাল রাখতে চাইলেন ও সংখ্যাধিক্যের জোরে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। চিত্তরঞ্জন গণতন্ত্র রীতি অনুযায়ী পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। এ দু'দলের মধ্যে মত-বিরোধ ক্রমে খুবই তীব্র হয়ে উঠ্‌ল ও এঁরা 'নো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী ও 'প্রো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বাদী নামে অতঃপর পরিচিত হলেন।

যা একবার কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন চিত্তরঞ্জন তা ছাড়বার পাত্র নন্। তিনি ঐ তারিখেই কংগ্রেসের নিয়মাধীন থেকে স্বরাজ্য দল নামে এক নূতন দল গঠন করলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু, বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল, হাকিম আজমল খাঁ, নরসিংহ চিন্তামন্ কেলকার, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রমুখ নেতৃবর্গ ছিলেন কৌন্সিল প্রবেশ-প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক। তাঁরা স্বরাজ্যদলে অবিলম্বে যোগ দিলেন। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল স্বরাজ্য দলের প্রধান নেতা বলে গণ্য হন।

অতঃপর স্বরাজ্য দলের কার্য্য হ'ল দ্বিবিধ—প্রথম, সমগ্র দেশের পরিবর্ত্তন-বাদীদের সংঘবদ্ধ করা ও দ্বিতীয়, কংগ্রেস কর্ত্তৃক কৌন্সিল-প্রবেশ নীতি স্বীকার করিয়ে নেওয়া। নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে (২৭ শে ফেব্রুয়ারী) স্থির হ'ল যে, পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধী উভয় দলেরই কৌন্সিল প্রবেশের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রচারকার্য্য ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বন্ধ থাকবে। বোম্বাই অধিবেশনে (২৫-২৭শে মে) কিন্তু কমিটি ভোটদাতাদের মধ্যে নিষেধাত্মক প্রচার স্থগিত রাখাই সাব্যস্ত করলেন।

নাগপুরে ইতিপূর্ব্বে পতাকা সত্যাগ্রহ সুরু হয় ও শেঠ যমুনালাল বাজাজ কারাবরণ করেন। এই নাগপুরেই কমিটির পুনরায় অধিবেশন

পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু

লালা লজপৎ রায়

হ'ল, (৮-১০ই জুলাই)। কৌন্সিল-প্রবেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করবার জন্য কমিটি পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। আবুল কালাম কয়েক মাস পূর্ব্বেই কারামুক্ত হন। হঠাৎ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করায় পরিবর্ত্তন-বিরোধীরা কিন্তু আবার বেঁকে বস্‌লেন। তাঁরা শীঘ্রই মিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির আর একটি অধিবেশন আহ্বান করলেন। নাগপুর অধিবেশনের অল্প পরেই লালা লজপৎ রায়, মৌলানা মহম্মদ আলী, ডক্টর কিচলু, ইয়াকুব হাসান প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ কারামুক্ত হন। কৌন্সিল-প্রবেশ নীতির দিকে এঁদের অনেকেই ঝুঁকে পড়লেন। কমিটির পরবর্ত্তী বিশাখাপত্তম্ অধিবেশনে (৩রা আগষ্ট) আহ্বানকারীরা তাঁদের প্রতিকূল প্রস্তাব আর উত্থাপন করলেন না। সভাপতির সুবিধা অনুসারে সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে বিশেষ অধিবেশন করা ঠিক হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু পর পর দু'বার কারাদণ্ড ভোগ করে ১৯২৩ সালের প্রথমে মুক্তিলাভ করেন ও কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দেন।

পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের বাদ-প্রতিবাদে ও শক্তি পরীক্ষায় যখন কংগ্রেসের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হতে থাকে তখন অন্তর্জগতে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘট্‌ল যার প্রতিক্রিয়া ভারতভূমির উপরও কম পতিত হ'ল না। কামালপাশা প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টকে মিত্রশক্তিবর্গ স্বীকার করে নিয়ে তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে ১৯২২, নবেম্বর লজান শহরে সন্ধির কথাবার্ত্তা সুরু করেন। দীর্ঘকাল আলোচনার পর ১৯২৩, জুলাই মাসে তুরস্কের স্বাধীনতা যোল আনা স্বীকৃত হয়। কামাল পাশার আধিপত্য ভয়ে পরহস্তক্রীড়নক তুর্কী সুলতান ব্রিটিশ জাহাজে মাণ্টায় পালিয়ে যান। তুরস্ক একটি 'রিপাব্লিক' বা গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল। কামাল সুলতানের এক নিকট আত্মীয়কে খলিফা পদ দান করলেন। তিনি পরে এপদটিও তুলে দেন।

এইরূপে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হওয়ায় স্বার্থপর লোকেরা আবার হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করল। অসহযোগ আন্দোলনের মরশুমে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় স্বার্থপর লোকেরা এর সুযোগ নিয়ে উভয়ের মধ্যে প্রথমে বিরোধ ও পরে দাঙ্গার সৃষ্টি করতে লাগ্‌ল। ১৯২২ সালেই মহরমের সময় মুলতানে প্রথম হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়। পর বছর বঙ্গে ও পঞ্জাবে দাঙ্গা সুরু হয় ও উভয় পক্ষের বিস্তর লোকের প্রাণহানি ঘটে।

এ বছর কেনিয়ায় ভারতীয় সমস্যা নিরতিশয় জটিল হয়ে উঠে। তিনটি অর্ডিন্যান্স পাস করিয়ে কেনিয়া সরকার প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ও রাষ্ট্রীয় অধিকার বিলোপের চেষ্টা করে। প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্যের জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক এণ্ড্রুজ সাহেব প্রেরিত হন। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ২৬শে আগষ্ট ভারতের সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়। মডারেটরাও এ হরতালে যোগদান করেছিলেন।

কৌন্সিল-প্রবেশ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দিল্লীতে যথারীতি কংগ্রেসের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে সর্ব্বত্র সুপরিচিত ও সম্মানিত। কংগ্রেসের উভয় দলই তাঁর উপর সমান আস্থাবান্। কাজেই তাঁর নেতৃত্বে বিরোধের সমাধান হবে সকলেরই এরূপ আশা করে-ছিলেন। হ'লও তাই। কংগ্রেসে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, অন্য কোনরূপ আপত্তি না থাক্‌লে কংগ্রেস-সেবীরা ভাবী নির্ব্বাচনে কৌন্সিলে সদস্য পদপ্রার্থী হতে পারবেন।

এর পরই স্বরাজ্য দল বিভিন্ন প্রদেশে নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুত হলেন। বঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রধান সহযোগী হলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁরা দল সংগঠনে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। ডিসেম্বর মাসের প্রথমে নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হ'ল। সে কি উৎসাহ উদ্দীপনা! অসহযোগ ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার কিরূপ প্লাবন এনেছে এবারে তা সম্যক্ প্রতীত হ'ল। বঙ্গে নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদল সকল দলের মধ্যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হলেন। এবারকার নির্ব্বাচনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়। সুরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। চৌষট্টি হাজার টাকা মাসিক বেতনে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত থেকে সরকারী দমন-নীতিতে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে দেশবাসীর আস্থা হারিয়েছেন। তিন বছরে তিনি যেসব সৎকার্য্য করেছেন তার প্রতি লোকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। চিত্তরঞ্জন মুসলমান সদস্যের সঙ্গে প্যাক্ট করে কৌন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে স্বরাজ্য দল অন্যদলের সমবেত শক্তির চেয়েও সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। অন্যান্য প্রদেশে অবশ্য স্বরাজ্য দলের এতটা জয়লাভ ঘটে নি।

কংগ্রেসের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হ'ল কোকনদে মৌলানা মহম্মদ আলীর সভাপতিত্বে। তিনি কৌন্সিল-প্রবেশে সম্মতি দিলেন। পরিবর্ত্তন-বিরোধী দল কিন্তু কৌন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। মূল প্রস্তাব এমনভাবে তৈরী করা হ'ল যে, কৌন্সিল-প্রবেশে সাময়িক ভাবে অনুমতি দেওয়া হলেও কংগ্রেস ষোল আনা অসহযোগে তথা কৌন্সিল-বর্জ্জনেও বিশ্বাসী! বঙ্গের অন্যতম কংগ্রেস নেতা, পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের অগ্রণী, সর্ব্বত্যাগী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রকাশ্য অধিবেশনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

১৯২১—১৯২৩, এই তিন বছর যেমন বাস্তবিক পক্ষে অহিংস অসহযোগের স্থিতিকাল তেমনি এ সময় ভারতের সর্ব্বত্র ডায়ার্কি চালু হয় ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হতে থাকে। মিঃ মণ্টেগু যে উদ্দেশ্যে চরমপন্থী দল থেকে মডারেটদের সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়েছিলেন, অসহযোগের মরশুমে তা বাস্তবিকই সুফল দান করে। ভারত-সচিবের কৌন্সিল থেকে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের শাসন-পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীপদ গ্রহণে মডারেটরা বিশেষ অগ্রণী হন। এ সময় বড়লাটের শাসন-পরিষদে সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু আইন-সদস্য হলেন। অবশ্য কোথাও কোথাও যে এর ব্যতিক্রম না হ'ল তা নয়। পঞ্জাবে সামরিক আইনে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত নেতা লালা হরকিষণ লাল ও মধ্যপ্রদেশের তিলক-সহযোগী খাপার্দে মহাশয় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। লর্ড সিংহ বিহার-উড়িষ্যার গবর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হন। মডারেট মন্ত্রী ও সদস্যগণ দমন-নীতির সমর্থন করলেও কোন কোন দিকে দেশের উপকারও করেছিলেন। স্বদেশী যুগে বিধিবদ্ধ প্রেস আইন ও রাজদ্রোহাত্মক সভা-বন্ধ আইন এ সময়ের মধ্যে তুলে দেওয়া হয়। সংশোধিত ফৌজদারী আইন কিন্তু পূর্ব্ববৎই বাহাল রইল। ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বিচার-বৈষম্য (ইল্‌বার্ট বিলের কথা স্মরণ করুন) এবারে বিদূরিত হ'ল। বিচারে ইউরোপীয়দের অনুরূপ ভারতীয়দেরও সুবিধা-সুযোগ দেওয়া হ'ল। ভারতীয় বিচারকরা ইউরোপীয় আসামীদেরও বিচার ক্ষমতা লাভ করলেন। ১৯২২ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশে শিক্ষার্থী যুবকদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে টেরিটোরিয়াল ফোর্স গঠিত হয়।

প্রদেশসমূহে মডারেট মন্ত্রীরাও প্রথম দিকে কিছু কিছু গঠনমূলক কার্য্য করতে সমর্থ হলেন। বঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্‌কাতা

করপোরেশনকে একটি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগেও গণতন্ত্র নীতি অনুসৃত হ'ল। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে মনোনীত সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা হ্রাস করা হ'ল। তাঁর সময়ে ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের চেয়ারম্যান বা সভাপতি পদে বেসরকারী সদস্যরা নির্ব্বাচিত হবার অধিকার লাভ করেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই মর্ম্মে আইন বিধিবদ্ধ হ'ল।

যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবল ছিল তখনই মডারেটগণ এই সব কার্য্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অসহযোগে ভাটা পড়লে আমলাতন্ত্র আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠে এবং সিবিলিয়ান সেক্রেটারীগণ মন্ত্রীদের অনুমতি না নিয়েই তাঁদের মাথার উপরে গবর্ণরকে সব কথা জানাতে তৎপর হন। সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীদের এরূপ করার আইনতঃ কোন বাধা ছিল না। মন্ত্রিগণের কেউ কেউ এজন্য পদত্যাগ করেন। পঞ্জাবের মন্ত্রী লালা হরকিষণ লাল, যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী সি ওয়াই চিন্তামণি ও জগৎনারায়ণ লাল প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ তিন বছরের মধ্যে বিলাতে ১৯২১ সালে ও ১৯২৩ সালে সাম্রাজ্য-সম্মেলন হয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অন্যান্য উপনিবেশবাসীদের মত ভারতবাসীদেরও সমান অধিকার থাকবে—উভয় অধিবেশনেই একথা স্বীকৃত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে ১৯২২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করেন। ১৯২৩ সালে সাম্রাজ্য-সম্মেলনে ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও আলোয়ারের মহারাজা। এ সময় রাষ্ট্রসঙ্ঘেও সরকার মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হয়।

স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম

(১৯২৪-১৯২৬)

কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ১৯২৪ সালের গোড়াতেই মহাত্মা গান্ধীর দেহে অস্ত্রোপচার হ'ল। ৫ই ফেব্রুয়ারী দু'বছর পূর্ণ না হতেই তিনি মুক্তিলাভ করলেন। অতঃপর সম্পূর্ণ নিরাময় ও বিশ্রাম লাভের জন্য বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে জুহু স্বাস্থ্য-নিবাসে তিনি কিছুদিন অবস্থান করেন। জুহু শীঘ্রই রাজনীতিকদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। সহযোগী-অসহযোগী পরিবর্ত্তনবাদী-পরিবর্ত্তনবিরোধী সকলেই, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য জুহুতে ভিড় করতে লাগলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দও সেখানে সত্বর উপনীত হলেন। একদিকে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের মধ্যে কৌন্সিল-প্রবেশ ও স্বরাজ্য দলের কার্য্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্ত্তা চলে। ভারতের পরবর্ত্তী রাজনৈতিক আন্দোলনকে এই আলাপ-আলোচনা খুবই প্রভাবিত করেছে।

জানুয়ারী মাসের মধ্যেই নব-গঠিত নিখিল-ভারত ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির অধিবেশন আরম্ভ হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাজ্য-দলপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু প্রথমেই ভারতবর্ষের জাতীয় দাবির আকারে একটি প্রস্তাব ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করেন। এ দাবির মর্ম্ম হ'ল—অবিলম্বে 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' দলের সহযোগে—ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের অনুরূপ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক পরিকল্পনা স্থির করার উদ্দেশ্যে গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বান। নেশান্যালিষ্ট ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নামে অন্য জাতীয়তাবাদী দলের সহযোগে স্বরাজ্য দল প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। গবর্ণমেণ্ট এ দাবি সম্পূর্ণ নূতন-বলে গ্রহণে অসম্মত হন। কিন্তু জনমত প্রবল দেখে

তাঁরা ডায়ার্কি কতটা কার্য্যকরী হয়েছে ও তার সংস্কার আবশ্যক কি-না এ-সব বিষয় বিবেচনার জন্য সার্ আলেকজাণ্ডার মাডিম্যানের সভাপতিত্বে সরকারী ও বেসরকারী সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বন্দীদের (মায় ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী) মুক্তিদান, দক্ষিণ-আফ্রিকার কয়লার উপরে শুল্ক স্থাপন, অকালী শিখদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে তদন্ত কমিটি গঠন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব-বিলের প্রথম চার দফাও নাকচ করা হ'ল। মধ্য-প্রদেশের ও বঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদ ভোটাধিক্যে মন্ত্রী-নিয়োগ বাতিল করে দিলেন।

আবার বঙ্গে স্বরাজ্য দল করপোরেশন নির্ব্বাচনে আশাতীত জয়লাভ করলেন। পূর্ব্ববছর বিধিবদ্ধ আইনে কল্‌কাতা করপোরেশন—নির্ব্বাচিত ৭৫, মনোনীত ১০ ও অল্‌ডারম্যান ৫—মোট এই নব্বইজন সদস্য নিয়ে গঠিত হওয়ার প্রস্তাব হয়। মুসলমানদের জন্য প্রথম ন' বছর পৃথক্ নির্ব্বাচনের কথা থাকে, কিন্তু পরে আসন সংরক্ষিত রেখে সকলেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাধারণ ভোটে নির্ব্বাচিত হওয়া স্থির হয়। প্রথম বারেই এইসব নির্ব্বাচিত সদস্যের মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ জন স্বরাজ্য দলভুক্ত হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বাচিত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ করপোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর অন্যতম সহকর্ম্মী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু হলেন চীফ একসিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান কর্ম্মসচিব। করপোরেশনের বিভিন্ন কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ কমিটি দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এসব কমিটিতেও স্বরাজ্যদল প্রাধান্য লাভ করলেন। সকল কার্য্যই অতঃপর তাঁদের মতানুযায়ী চল্‌তে লাগ্‌ল। দেশবন্ধু মেয়ররূপে প্রথম বক্তৃতায়েই বল্‌লেন, করপোরেশনে স্বরাজ্য দলের আদর্শ দরিদ্র নারায়ণের

সেবা। এই উদ্দেশ্যে রচিত একটি কর্ম্মতালিকাও সভায় উপস্থাপিত করা হয়।

কোকনদ কংগ্রেসে পরিবর্ত্তন-বাদী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের বিরোধ মেটে নি। মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন-বিরোধী গোঁড়া অসহযোগীরা আবার পূর্ণ অহিংস অসহযোগ নীতি বাহাল রাখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌লেন। মহাত্মা গান্ধীও পূর্ণ অসহযোগে বিশ্বাসী। চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের সঙ্গে আলোচনার পরেও তিনি স্বমতেই দৃঢ় রইলেন। পূর্ব্বোক্ত আলাপ-আলোচনার পরে একপক্ষে গান্ধী ও অপর পক্ষে মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জন নিজ নিজ মতামত সম্বলিত স্বতন্ত্র বিবৃতি প্রচার করেন। এই আলোচনায় মত বৈষম্য প্রকট হলেও এ ভবিষ্যতের পক্ষে শুভই হয়েছিল। সরকারের সকল প্রকার কার্য্যে বাধা দানের বাসনা নিয়ে স্বরাজ্য দল ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন। অতঃপর তাঁরা গান্ধীজীর পরামর্শে সরকারের প্রগতিবিরোধী আইন কানুনের বিপক্ষতা করার সঙ্গে সঙ্গে গঠনমূলক কার্য্যের (যেমন, খদ্দর প্রচলন, বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক স্থাপন, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, সামরিক ব্যয় হ্রাস প্রভৃতি) প্রস্তাব পাস করিয়ে নিতেও সম্মত হন। ইতিমধ্যে একটি ব্যাপার কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে মত-বিরোধ আবার প্রকট হয়ে উঠে।

১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে গোপীনাথ সাহা কল্‌কাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট ভ্রমে মিঃ আর্ণেষ্ট ডে নামে এক ইউরোপীয়কে হত্যা করে। এ বছরে সিরাজগঞ্জে মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গের প্রাদেশিক সম্মেলন উক্ত গর্হিত হত্যা কার্য্যের নিন্দা করলেন ও সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করলেন। মহাত্মা গান্ধী এর তীব্র সমালোচনা করে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী ২৭-২৯শে জুন আহ্‌মদাবাদে যে নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস

কমিটির অধিবেশন হ'ল তাতে তিনি একটি প্রস্তাবে গোপীনাথের দেশ-প্রেমের কথা স্বীকার করেও এরূপ হত্যাকার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন ও বলেন যে, এরূপ কার্য্য অহিংস অসহযোগ নীতির ঘোর বিরোধী এবং দেশকে আইন-অমান্যের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে ভীষণ বিঘ্ন। চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর প্রস্তাবের এক সংশোধনী উত্থাপন করলেন। চিত্তরঞ্জনও অহিংসারই পক্ষপাতী, কিন্তু এসব অকার্য্যের মূলেও যে গভীর দেশপ্রেম নিহিত তা তিনি স্পষ্ট করে বল্‌তে চাইলেন। মাত্র কয়েক ভোটের আধিক্যে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী এতে মোটেই খুশী হতে পারেন নি। তিনি পুনরায় অসহযোগের পাঁচটি ধাপ—বিদেশী বস্ত্র, আইন আদালত, স্কুল-কলেজ, উপাধি ও ব্যবস্থা-পরিষদ বর্জ্জন—কোকনদ প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কমিটি দ্বারা স্বীকার করিয়ে নিলেন। মহাত্মা গান্ধী আর একটি প্রস্তাব এই করলেন যে, যে কোন কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচিত সদস্যকে প্রতিমাসে অন্ততঃ দু'হাজার গজ চরকায় কাটা উৎকৃষ্ট সূতা জমা দিতে হবে। এ পরিমান সূতা জমা না দিলে সভ্যপদ আপনা আপনিই খারিজ হয়ে যাবে। শাস্তি দানের এ ধারাটি শেষ পর্য্যন্ত টেকে নি।

এর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দল থেকে সমস্ত বাধা নিষেধ তুলে নিয়ে এক কংগ্রেসের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু এর পূর্ব্বে আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ বছরে আবার নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানে মারাত্মক দাঙ্গা উপস্থিত হয়। কিন্তু কোহাটে যে দাঙ্গা হয় তার তুলনা মেলা ভার। প্রত্যেক স্থানেই দাঙ্গার ফলে সেই সেই স্থানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরই অত্যাচার হ'ল বেশী, কোহাটেও তাই হ'ল। মহাত্মা গান্ধী এরূপ আত্মঘাতী দাঙ্গার অবসান কল্পে দিল্লীতে

মৌলানা মহম্মদ আলীর ভবনে একুশ দিন ব্যাপী উপবাস আরম্ভ করেন (২২শে সেপ্টেম্বর)। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দ দিল্লীতে ঐক্য সম্মেলনে সমবেত হলেন ও প্রত্যেকের ধর্ম্মকর্ম্ম যাতে নির্বিরোধে প্রতিপালন করতে দেওয়া হয় সেজন্য সকলকে অনুরোধ জানালেন। এই সম্মেলনে কল্‌কাতার খ্রীষ্টান যাজকশ্রেষ্ঠ মেট্রোপলিটানও যোগ দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, মহাত্মা গান্ধীর উপবাস ও সম্মেলনের নির্দ্দেশ সত্ত্বেও পরে বহুবার দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়েছে।

বাংলা সরকার অক্টোবর মাসে অকস্মাৎ এক অর্ডিন্যান্স জারি করে হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত থাকার সন্দেহে বহু বঙ্গ সন্তানকে বন্দী করলেন। কল্‌কাতা করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মসচিব, চিত্তরঞ্জনের সহযোগী ও স্বরাজ্য দলের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীসুভাসচন্দ্র বসু, এবং স্বরাজ্য দলভুক্ত কৌন্সিল সদস্য শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅনিলবরণ রায়কে অক্টোবর মাসে ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী করে মান্দালয়ে পাঠালেন। এই নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র আবার তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। অনেকেরই বিশ্বাস হ'ল, স্বরাজ্য দলকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যেই সরকার পুনরায় দমন নীতির আশ্রয় নিয়েছেন। দমননীতির প্রতিবাদ করবার জন্য ২১শে ও ২২শে নবেম্বর বোম্বাইয়ে একটি সর্ব্বদল সম্মেলন হ'ল। সম্মেলন সাম্প্রদায়িক মীমাংসা সমেত স্বরাজের একটি পরিকল্পনা রচনার বিষয় আলোচনা করেন ও এর ভার একটি কমিটির উপর অর্পণ করেন।

সর্ব্বদল সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই ২৩শে ও ২৪শে নবেম্বর কল্‌কাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। ইতিপূর্ব্বেই মহাত্মা গান্ধী মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জনের সহযোগে কৌন্সিল-প্রবেশ সমর্থক

এক বিবৃতি প্রচার করেছিলেন। কমিটি বিবৃতির মর্ম্ম সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এবং সর্ব্বদল সম্মেলনের কার্য্য যাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় এজন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখা সাব্যস্ত করেন। কিন্তু গান্ধীজীর নির্দ্দেশে এই মর্ম্মেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, অতঃপর কংগ্রেসের প্রত্যেক সভ্যকেই বার্ষিক চার আনা চাঁদার পরিবর্ত্তে প্রতি মাসে দু' হাজার গজ চরকায় কাটা সূতা প্রতি অঞ্চলের কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সরকারের দমন-নীতির ফলে একদিকে মহাত্মা গান্ধী তথা গোঁড়া অসহযোগী ও স্বরাজ্য দল এবং অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে একই উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সুরু হয়। আর এর মূলে ছিল মহাত্মা গান্ধীর মহানুভবতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি। কাজেই কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনের জন্য তিনিই সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। মিসেস্ এনি বেসাণ্ট অহিংস অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য প্রভৃতির ঘোরতর বিরোধী। এজন্য গত চার বছর তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন নি। অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনিও পুনরায় এসে কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

গান্ধীজী অভিভাষণে সম্পূর্ণরূপে হিংসা নীতি বর্জ্জনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' প্রস্তাব আহ্‌মদাবাদ অধিবেশন থেকে প্রতিবারেই কংগ্রেসে উত্থাপিত হ'ত। গান্ধীজী প্রথম বারে এতে বিশেষ আপত্তি জানিয়েছিলেন। এবারে কিন্তু তিনি বল্‌লেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকেই স্বরাজ লাভ সম্ভব। তবে যদি ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হয় তবে তা করতেও আমরা দ্বিধাবোধ করব না। স্বরাজ লাভের জন্য গান্ধীজী তিনটি পন্থার উপর বিশেষ জোর দিলেন —(১) চরকা, (২) হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও (৩) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। তাঁর

মতে ভাবী স্বরাজ্যের ভিত্তি হবে এইরূপ, 'যারা হাতে কলমে কাজ করে তাদের ভোট দানের অধিকার, সৈন্য ব্যয় ও বিচার ব্যয় হ্রাস, উত্তেজক মাদক দ্রব্যের ও এ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের উচ্ছেদ, সামরিক ও বেসামরিক কর্ম্মচারীদের বেতন কমান, ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন, বিদেশীদের একচেটিয়া ব্যবসাধিকারে সঙ্কোচ, রাজন্যবর্গের অধিকার স্বীকার, স্বেচ্ছাচারমূলক আইন প্রত্যাহার, সরকারী কর্ম্মে বর্ণ-ভেদ বিলোপ, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দান, দেশভাষার মারফত শাসন কার্য্য পরিচালনা ও হিন্দিকে জাতীয় ভাষা বলে স্বীকার।

মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বরাজ্যের এই সর্ব্বনিম্ন দাবী নিয়ে আমরা ১৯২৫ সালে উপনীত হলাম। বস্তুতঃ এবছর কংগ্রেসের ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের, এমন কি ব্যবস্থা-পরিষদের ভিতরেও এই নিয়ে বিশেষ আলোচনা চল্‌ল। এই উদ্দেশ্যে জানুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্ব্বদল সম্মেলন কমিটির অধিবেশন হয়। মিসেস্ এনি বেসাণ্টকে সভাপতি করে একটি সাব কমিটি গঠিত হ'ল। দু' বছর পূর্ব্বে মিসেস্ বেসাণ্ট ও সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু স্বরাজ 'স্কীম' বা শাসন-তন্ত্র রচনার জন্য একটি নেশন্যাল কন্‌ভেন্‌শন আহ্বান করেছিলেন। তদবধি এতদিন বেসাণ্ট মহোদয়া শাসন-তন্ত্র রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর স্বরাজ স্কীমের নাম হ'ল 'কমনওয়েল্‌থ্ অফ্ ইণ্ডিয়া বিল'। তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা না হওয়ায় সর্ব্বদল সম্মেলনের কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর হতে পারে নি।

পূর্ব্ব বছরের মত এবারেও স্বরাজ্য দল ভারতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে লাগ্‌লেন। বঙ্গে ও মধ্যপ্রদেশে ডায়ার্কি অচল হ'ল। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাজ্যদল অন্যান্য দলের সহযোগে ভোটাধিক্যে জাতীয় উন্নতির অনুকূলে নানা প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। বিলাতে শ্রমিক মন্ত্রীসভা ন' মাস মাত্র স্থায়ী ছিল।

১৯২৪ সালের শেষেই আবার রক্ষণশীল দল মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এবার ভারত-সচিব হলেন লর্ড বার্কেনহেড। তিনি পার্লামেণ্টে স্বরাজ্য দলকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দল বলে আখ্যা দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে এই অনুরোধ জানালেন, তাঁরা যেন দেশ শাসনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে ডায়ার্কি সফল করতে সাহায্য করেন ও এর ভিতরকার দোষ-ত্রুটীগুলি দেখাতে সচেষ্ট হন।

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সভাপতি রূপে দক্ষিণ ভারতে পরিভ্রমণ করে মে মাসে বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি পূর্ব্বে ১৯২১ সালে অসহযোগের মরশুমে আলী-ভ্রাতৃদ্বয় ও আলী-জননী বাঈ আম্মা সহ বাংলা প্রদক্ষিণ করেছিলেন। এবারেও তিনি বঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯২৪ সালের শেষ ভাগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসেবার জন্য এক অছিমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করেন। এর ফলে তাঁর উপর সাধারণের শ্রদ্ধাপ্রীতি আরও বেড়ে গেল। ডক্টর পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর 'কংগ্রেস ইতিহাস' পুস্তকে এই মর্ম্মে লিখেছেন যে, ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন সকলের চিত্তই জয় করে ফেলেছিলেন! চিত্তরঞ্জন মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ফরিদপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অভিভাষণে তিনি যে-সব প্রস্তাব করেন তা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। কংগ্রেস তথা স্বরাজ্য দলের রাজনীতিও কিছুকাল এ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন অভিভাষণে স্বরাজের মানে করলেন, ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের ভিতরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন একটি রাষ্ট্র। তিনি লর্ড বার্কেনহেডের আন্তরিকতা মেনে নিয়ে মাত্র দুটি শর্ত্ত সাপক্ষে ডায়ার্কি চালু করতে সম্মতি জানালেন। এ শর্ত্ত দুটি হ'ল—(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দান, (২) ব্রিটিশ

কমন্‌ওয়েল্‌থের অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার, এবং স্বরাজ প্রাপ্তির পূর্ব্বে এর যথাযোগ্য ভিত্তি অবিলম্বে নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠা। তিনি ভারতবাসীদের পক্ষে এই প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হন যে, তাঁরা বাক্যে, কর্ম্মে বা ইঙ্গিতে কোন প্রকারেই বিপ্লব আন্দোলনের উৎসাহ দিবেন না এবং এরূপ আন্দোলন উচ্ছেদ করতে সকল শক্তি প্রয়োগ করবেন। মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে এ সময় লর্ড রেডিং আলোচনা করবার জন্য বিলাত যান। কাজেই স্বরাজের দাবী সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলা চিত্তরঞ্জন আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন।

এর পরেই চিত্তরঞ্জনের শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তিনি স্বাস্থ্য লাভের আশায় দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে গমন করেন। এখানে অবস্থিতি কালে মহাত্মা গান্ধী ও মিসেস্ বেসাণ্ট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি আর নিরাময় হলেন না, ১৬ই জুন তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন। বাল-গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুর মত চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুও জাতির পক্ষে এই সময়ে খুবই মর্ম্মান্তিক হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে আসমুদ্র হিমাচল উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ল। সকলেই চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে মনোবেদনা জ্ঞাপন করতে লাগ্‌ল। রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জনের অনন্যতুল্য দানের কথা অমর ছন্দে রূপ দিলেন।

'সাথে করে এনেছিলে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জনের গুণ-মুগ্ধ। তিনি দীর্ঘ তিন মাস কাল বাংলায় থেকে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি রক্ষার্থ দশ লক্ষ টাকা তুললেন। সমগ্র টাকা চিত্তরঞ্জনের দানের সঙ্গে মিলিত করে তাঁর বিস্তৃত বাস ভবনের উপর তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মভার তাঁর যোগ্য সহচর ও একনিষ্ঠ ত্যাগী দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর অর্পণ করলেন। যতীন্দ্রমোহন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, কৌন্সিল স্বরাজ্য দলের নেতা ও করপোরেশনের মেয়র পদে অভিষিক্ত হলেন।

ডায়ার্কির নিদ্ধারণ অনুসারে প্রথম চার বছর অন্তে এ সময় বিভিন্ন কৌন্সিলে সভাপতি নির্ব্বাচন হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার কৌন্সিলে স্বরাজ্য দলভুক্ত শ্রীপদ বলবন্ত তাম্বে ও ভারতীয় এসেম্বলী বা ব্যবস্থা পরিষদে বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল (২২শে আগষ্ট) সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন। পূর্ব্ব বছর নিযুক্ত মাডিম্যান কমিটির রিপোর্ট গ্রহণের জন্য স্বরাষ্ট্র-সচিব সার আলেকজাণ্ডার মাডিম্যান ৭ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা-পরিষদে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কমিটির সুপারিশ ভারতের স্বরাজ-দাবির কাছ ঘেঁষেও গেল না, বরং মন্ত্রীরা যাতে নিরঙ্কুশ হয়ে গদিতে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন সেজন্য এতে বেতন বজেট-ভুক্ত না করারও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল। স্বরাজ্য-দলপতি মোতিলাল সুতরাং মাডিম্যানের প্রস্তাবের এই মর্ম্মে এক সংশোধনী উত্থাপন করলেন যে, ভারত-গবর্ণমেণ্টকে পূর্ণ দায়িত্বশীল করবার জন্য গঠন-তন্ত্রে ও শাসন-বিভাগ গুলিতে মূলগত পরিবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়ে পার্লামেণ্টে এক ঘোষণা করা হোক্ এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় প্রতিনিধি নিয়ে সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপরোক্ত আদর্শে একটি বিস্তারিত শাসন-তন্ত্র প্রণয়নের জন্য গোলটেবিল বৈঠক বা অনুরূপ কোন বৈঠক আহ্বান করা হোক্। মোতিলালের প্রস্তাব ৭২ — ৪৫ ভোটে গৃহীত হ'ল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাজ্য দলের কার্য্য-কলাপ হ'ল গঠন-তন্ত্রমূলক ও পার্লামেণ্টের বিরোধী দলেরই মত। যে-সব আইন ভারতের কল্যাণকর তার সমর্থন স্বরাজ্য দল তো করলেনই, এর উপরে

সরকারের বিভিন্ন কমিটিতেও তাঁরা সহযোগিতা করতে লাগ্‌লেন। এ বছরের বজেটে ভারতবাসীদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ন' লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য করা হয়। এ উদ্দেশ্যে সার্ এণ্ড্রুস্কীনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হ'ল ও স্বরাজ্য দল থেকে মোতিলাল নেহ্‌রু এর অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হলেন।

২১শে ও ২২শে সেপ্টেম্বর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্য দলের হস্তেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যভার তুলে দিলেন। লর্ড বার্কেনহেড ও লর্ড রেডিং স্বরাজ্যের দাবি অগ্রাহ্য করায়ই গান্ধীজী স্বরাজ্য দলের হস্তে কংগ্রেসের কার্য্যভার সঁপে দিতে বেশী করে উদ্‌বুদ্ধ হন। স্বরাজ্য দল অতঃপর ষোল আনা কংগ্রেস-ভুক্ত হয়ে পরিষদে কংগ্রেসী দল বলে পরিগণিত হলেন। খদ্দরের প্রাধান্য চলে গেল। মাসে দু'হাজার গজ সূতা বা বছরে চার আনা চাঁদা দিলেই যে কেউ কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবেন স্থির হ'ল। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য প্রদত্ত অর্থ ছাড়া কংগ্রেসের যাবতীয় টাকা-কড়ি স্বরাজ্য দল ব্যবহারের অনুমতি পেলেন। মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে চরকা ও খদ্দর বিভাগ নব-প্রতিষ্ঠিত নিখিল-ভারত চরকা সমিতি গ্রহণ করলেন। গোঁড়া অসহযোগীরা গান্ধীজীর নির্দ্দেশ অনুসারে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যে মন দিলেন।

পরিবর্ত্তন-বাদী, পরিবর্ত্তন-বিরোধী নির্ব্বিশেষে কংগ্রেসের সকল দলই অক্টোবর মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান মিউনিসিপালিটির নির্ব্বাচনে যোগ দিয়ে সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। পাটনায় বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, এলাহাবাদে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, আহ্‌মদাবাদে বল্লভ ভাই পটেল, বোম্বাইয়ে বিঠলভাই পটেল ও মাদ্রাজে শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার মিউনিসিপাল করপোরেশনগুলির কর্ণধার হলেন। দেশ সেবার নূতন

ক্ষেত্র কংগ্রেসীদের সম্মুখে উন্মোচিত হ'ল। কল্‌কাতা করপোরেশনের কথা আগেই আমরা জেনেছি।

এইরূপ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আবার স্বরাজ্য দলে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে ক্রমাগত বাধা-দান নীতির উপর এক শ্রেণীর সভ্য বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ফরিদপুর বক্তৃতার মধ্যেও সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা এতাদৃশ বীতশ্রদ্ধার আভাস পেয়েছিলেন। মধ্য-প্রদেশের কৌন্সিল সভাপতি শ্রীপদ বলবন্ত তাম্বে দলের অনুমতি না নিয়ে অকস্মাৎ গবর্ণরের শাসন-পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করলেন! পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু ১লা নবেম্বর এক বিবৃতিতে এর তীব্র সমালোচনা করে বল্‌লেন, কিছুদিন পূর্ব্ব থেকেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য একদল যে পীড়াপীড়ি করছিলেন এ তারই পরিণতি। স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রধান সদস্য কেলকার, জয়াকর ও মুঞ্জে স্বরাজ্য দলের কৌন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন ও বললেন যে, ব্যর্থ বাধা-দান নীতি বর্জ্জন করে দেশের মঙ্গলার্থ ডায়ার্কি চালু করাই কর্ত্তব্য। তাঁরা পারস্পরিক সহযোগিতারই পক্ষপাতী হলেন।

এই বাদ-বিসম্বাদের মধ্যে কাণপুরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের চত্বারিংশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। নাইডু মহোদয়া নিজে সুকবি। অসহযোগ আন্দোলনে ও প্রবাসী ভারতীয়দের সেবায় তিনি কায়মনে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সুললিত ছন্দে, ভাষায় স্বদেশবাসীদের সর্ব্বাগ্রে নির্ভীক ও আত্মনির্ভরশীল হতে আবেদন জানালেন। তাঁর মতে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভয় অমার্জ্জনীয়—বিশ্বাসঘাতকতা আর নৈরাশ্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ'। কংগ্রেস প্রথমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। স্বরাজের দাবী ও স্বরাজ্য

দলের কর্ত্তব্য সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আর একটি প্রস্তাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকার যদি পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ১৯২৪ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে গৃহীত স্বরাজের নিম্নতম দাবি স্বীকার না করেন তাহলে স্বরাজ্য দল নিখিল-ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি থেকে পদত্যাগ করবেন এবং যে-পর্য্যন্ত না এই দাবি স্বীকৃত হয় সে পর্য্যন্ত কোনমতেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা চল্‌বে না।

১৯২৬ সালের আরম্ভেই গোঁড়া স্বরাজ্য দল ও পারস্পরিক সহযোগিতা পন্থীদের মধ্যে মতবিরোধ ঘনিয়ে উঠ্‌ল। বোম্বাই কৌন্সিলের স্বরাজ্য দল শেষোক্ত দলের পূর্ণ সমর্থন করলেন। পরবর্ত্তী ৬ই ও ৭ই মার্চ্চ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কাণপুরের মূল রাজনৈতিক প্রস্তাব সমর্থিত হ'ল ও বজেট আলোচনার প্রাক্কালে স্বরাজ্য দল ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলি থেকে বের হয়ে আসেন। পারস্পরিক সহযোগিতাবাদীদের এ ব্যাপার মোটেই পছন্দসই ছিল না। তাঁরা পূর্ব্বেই দলের সদস্য পদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে কৌন্সিল-গুলির স্বদস্য পদও ত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর বোম্বাইয়ে অন্যান্য জাতীয় দলের সঙ্গে তাঁরা একযোগে ৩রা এপ্রিল তারিখে 'ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল পার্টি' গঠন করলেন। উভয় দলের মধ্যে বিরোধ যাতে অধিক দূর অগ্রসর না হয় সেজন্য ২১শে এপ্রিল সবরমতী আশ্রমে উভয় দলের মিলন-সূত্র উদ্ভাবনের জন্য মহাত্মা গান্ধী এক বৈঠক আহ্বান করেন। মোতিলাল নেহ্‌রু, সরোজিনী নাইডু, লালা লজপৎ রায়, নরসিংহ চিন্তামন্‌ কেলকার, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর ও মাধবশ্রীহরি আনে এবং ডক্টর বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জের উপস্থিতিতে এই মর্ম্মে একটি আপোষ রফা হ'ল যে, ১৯২৪ সালের জাতীয় দাবির প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব তখনই সন্তোষজনক বিবেচিত হবে যখনই তাঁরা মন্ত্রীদের যথাযোগ্য-

ভাবে কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য আবশ্যক দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্বীকার করে নেবেন। কর্ত্তৃপক্ষের স্বীকৃতি সন্তোষজনক কি-না প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসী কৌন্সিল-সদস্যগণের সিদ্ধান্তই, মোতিলাল ও জয়াকরের সম্মতি সাপক্ষে, চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এরূপ রফা হওয়ার পর মাদ্রাজের প্রকাশম্, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এর তীব্র সমালোচনা করেন। মোতিলাল নেহ্‌রু ও জয়াকর পরে আপোষ-রফার যে ব্যাখ্যা করলেন তাতে বিরোধ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। সুতরাং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে (৫ই মে) আপোষ-রফা গৃহীত না হয়ে বাতিলই হয়ে গেল।

একদিকে যেমন দু' দলের ভিতর বিচ্ছেদ ঘট্‌ল অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ এসময় খুবই প্রকট হয়ে উঠ্‌ল। বঙ্গে পূর্ব্ব বছরই মুসলমান সদস্যগণ স্বরাজ্য দল ত্যাগ করেছেন। এ বছর স্বরাজ্য দলের হিন্দু সদস্যগণের মধ্যেও মতান্তর উপস্থিত হ'ল। এবার এপ্রিল ও মে মাসে কল্‌কাতায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ভীষণ দাঙ্গা হয় তাতে উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে। এই দাঙ্গার মধ্যেই ৬ই এপ্রিল লর্ড আরুইন বড়লাট হয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনিও এই আত্মঘাতী হাঙ্গামায় বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

ডায়ার্কিতে প্রতি তিন বছরে সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা। কাজেই এবারে নবেম্বর মাসে আবার সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল। ইতিপূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে লালা লজপৎ রায় ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রুর মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দেয়। লালাজী ব্যবস্থা-পরিষদ থেকে বেরিয়ে আস্বার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়, এরূপ হলে ব্যবস্থা-পরিষদে জাতীয়তার পরিপোষক কোন কার্য্যই করা সম্ভব হবে না। তিনিও তাই স্বরাজ্য দল ত্যাগ করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লালা লজপৎ রায় ও

পারস্পরিক সহযোগিতা পন্থীরা মিলে অতঃপর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কংগ্রেস পার্টি' বা স্বতন্ত্র কংগ্রেস দল গঠন করলেন। সাধারণ নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য দল মাদ্রাজে সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। অন্যান্য স্থানে, বিশেষতঃ মধ্য-প্রদেশে ও যুক্ত প্রদেশে এবার তেমন সুবিধা করে উঠ্‌তে পারলেন না। মধ্য প্রদেশে পারস্পরিক সহযোগিতাপন্থীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন।

এবারকার কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হ'ল গৌহাটীতে। গোঁড়া স্বরাজ্য দলের নূতন নেতা শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার সভাপতি হলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হন। শ্রদ্ধানন্দ হিন্দুদের ভিতর শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন, বহু বিধর্ম্মীকে হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, হিন্দু ধর্ম্ম বর্জ্জনকারীকে পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়ে আনেন। এজন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। উক্ত আন্দোলন পরিচালনাই তাঁর মৃত্যুর কারণ। শ্রদ্ধানন্দ আর্য্যসমাজভুক্ত সন্ন্যাসী। তাঁর পূর্ব্বনাম মুন্সীরাম। তিনি কাংড়া গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। জনসেবা ও আত্মত্যাগের জন্য সাধারণের নিকট পূর্ব্বাশ্রমেই তিনি মহাত্মা মুন্সীরাম নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী স্বামীজীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মৌলানা মহম্মদ আলী এর সমর্থনে প্রাণস্পর্শী ভাষায় একটি বক্তৃতা করেন।

আয়াঙ্গার মহাশয় অভিভাষণে স্বরাজ্য দলের নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রশংসা করেন। ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড জিদ ধরেন, স্বরাজ্য দল ডায়ার্কি চালু করতে অগ্রে সাহায্য করুন, পশ্চাৎ তাঁদের দাবির কথা বিবেচিত হবে। আর স্বরাজ্য-দল চান, অগ্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হোক্, ও এর প্রথম ধাপ স্বরূপ মন্ত্রীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হোক্। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানও তাঁদের একটি প্রধান শর্ত্ত। দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন দাশ এই মর্ম্মেই আপোষের কথা বলেছিলেন। আয়াঙ্গার মহাশয় জাতীয় দাবির পূরণ না হলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কথা মনে আনাও অন্যায় এইরূপ মত ব্যক্ত করলেন। কাজেই এবারেও এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল যে, জাতীয় দাবি পূরণ না হলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা সরকারের অধীনে কোন চাকুরি গ্রহণ অসম্ভব ; অন্যান্য দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেও কংগ্রেসী দল তার বিরোধিতা করবেন। আয়াঙ্গার মহাশয়ের নিজ প্রদেশ মাদ্রাজেই কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে। সেখানকার কংগ্রেসী দলেরই সাহায্যে 'স্বতন্ত্র দল' মন্ত্রী সভা গঠন করিতে সমর্থ হয়েছিলেন !

আমরা এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের বিষয়ের কথাই বলেছি। এ তিন বছরের মধ্যে তারকেশ্বর, ভাইকম প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানে অনাচার নিবারণ ও ধর্ম্মকর্ম্মে সাধারণের সুবিধা দানের ব্যবস্থার জন্য সত্যাগ্রহ অবলম্বিত হয়। প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সমাধানেরও এ সময় চেষ্টা হয়। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেনিয়া গমন করেন। প্রবাসী ভারতীয়দের সেবা-কার্য্যে পণ্ডিত বেণাসীদাস চতুর্বেদীর নামও স্মরণীয়। ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এক প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষে আগমন করেন ও সরকারের আতিথ্য স্বীকার করে মাদ্রাজ থেকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। পর বছর উভয় সরকারের মধ্যে প্রবাসী ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

স্বরাজ্য বনাম পূর্ণ স্বাধীনতা

(১৯২৭—১৯২৯)

দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধি দল স্বদেশে ফিরে গবর্ণমেণ্টকে সব বিষয় জানালেন। অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও ভারত-গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯২৬, ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯২৭, ১৩ জানুয়ারী পর্য্যন্ত একটি গোল-টেবিল বৈঠক বসে। ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন সার্ মহম্মদ হবিবুল্লা। বৈঠকের আলোচনায় স্থির হ'ল যে, (১) জীবনযাপনে প্রতীচ্য মান বা ধরণ স্বীকার করে নিলে প্রবাসী ভারতবাসীরা দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে স্থায়ী বাসিন্দা রূপে বসবাস করতে পারবে, (২) যারা এ ব্যবস্থায় সম্মত নয়, ইউনিয়ন সরকার নিজ খরচায় তাদের ভারতে পাঠিয়ে দিবেন, (৩) একাদিক্রমে ইউনিয়ন থেকে তিন বছর অনুপস্থিত রইলে সেখানে বসবাসের অধিকার লোপ পাবে, (৪) প্রত্যেক ভারতীয় স্থায়ী বাসিন্দাকেই ১৯১৮ সালে সাম্রাজ্য-সম্মেলনের নির্দ্ধারণ মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের আইনতঃ এক স্ত্রী ও তাঁর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি ইউনিয়নে বসবাস করার অনুমতি লাভ করবে। দক্ষিণ-আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন কল্পে ইউনিয়নে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফে একজন এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়ও বৈঠকে স্থিরীকৃত হয়। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলিকে সম্মানজনক আপোষ বলে মত প্রকাশ করলেন। তিনি প্রথম এজেণ্ট রূপে শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নাম প্রস্তাব করেন। ভারত-সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হন ও শাস্ত্রী মহাশয়কেই দক্ষিণ-আফ্রিকায় পাঠালেন। এতদিন পরে দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয় সমস্যার কতকটা সমাধান হ'ল।

সাধারণ নির্ব্বাচনে স্বরাজ্য দল আশানুরূপ সাফল্যলাভ না করায় এবারে সকল প্রদেশেই ডায়ার্কি চালু হয়। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেসভুক্ত স্বরাজ্য দল, স্বরাজ্য দল ত্যাগী লজপৎ রায়, মুকুন্দরাম রাও জয়াকর এবং মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি দ্বারা গঠিত নেশন্যালিষ্ট বা জাতীয় দল, জিন্নার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা স্বতন্ত্র দল একযোগে কার্য্য করে কোন কোন বিষয়ে ভোটে সরকারকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হন। তবে একটি গুরুতর বিষয়ে কিন্তু সরকার পক্ষেরই জয় হ'ল। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যাদি পরিচালনার জন্য প্রত্যেক দেশই নিজের সুবিধামত বিনিময়ের হার নির্ণয় করে থাকে। ভারতবর্ষের বিনিময় হার এতকাল ব্রিটিশের সুবিধানুসারেই নির্ণীত হয়ে এসেছে। মণ্টফোর্ড শাসন-সংস্কারে ভারতের ফিস্‌ক্যাল অটোনেমি বা অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। তার বিনিময় হারও ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ণীত হওয়া উচিত। ভারতীয় নেতৃবর্গ আগেকার বিনিময় হার এখন ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল দেখে তার সমর্থন করতে লাগ্‌লেন। সরকার কিন্তু এ হার পরিবর্ত্তন করতে তৎপর হলেন। ব্রিটেনের পাউণ্ডের নিরিখে ভারতবর্ষের টাকার মূল্য ধার্য্য হয়। টাকার মূল্য ছিল দীর্ঘকাল যাবৎ ১ শিলিং ৪ পেনি, এবারে তা করা হ'ল ১ শিলিং ৬ পেনি! অর্থাৎ পূর্ব্বে এক পাউণ্ড বা ২০ শিলিংএর বিনিময়ে পাওয়া যেত ১৫ টাকা পরিমাণ বিদেশী জিনিষ। অতঃপর এর বিনিময়ে পাওয়া গেল ১৩-৫-৪ পাই পরিমাণ জিনিষ। এর ফলে বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে কম মূল্যে বেশী মাল আমদানী, আর ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে কম মূল্যে বেশী মাল রপ্তানির ব্যবস্থা হ'ল! ভারতবর্ষের আমদানীর চেয়ে রপ্তানি-বাণিজ্য বেশী। সুতরাং এ ব্যবস্থায় তার লোকসান হ'ল দু'দিক দিয়ে, (১) বিদেশী মাল কম মূল্যে বেশী

আমদানী হওয়ায় স্বদেশী-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল, (২) কাঁচা মাল কম মূল্যে বেশী রপ্তানি হওয়ায় ভারতবাসীরা মূল্য পেল কম। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্য ও বাণিজ্যাতিরিক্ত নানা ব্যাপারে টাকার আদান-প্রদান হয় বেশী। কাজেই সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, ব্রিটেনের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের এইরূপ অসুবিধা ঘটান হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে অল্প ভোটাধিক্যে সরকার পক্ষের অভিপ্রায় অনুসারেই আইন পাস হ'ল।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস তথা জাতির পক্ষ থেকে স্বরাজের যে নিম্নতম দাবি বার বার পেশ করা হয় সে সম্বন্ধে তখনও ব্রিটিশ ও ভারত-সরকার উদাসীন। স্বরাজ্য দলের সংহতি বজায় থাক্‌লেও প্রত্যেকটি কৌন্সিলেই তাঁরা সংখ্যান্যূন। কাজেই তাঁদের প্রস্তাব এখন আর প্রায়ই কৌন্সিলে গৃহীত হয় না। স্বরাজ্য দল বিচ্ছিন্ন হয়ে কেলকার-জয়াকর-মুঞ্জে ও লালা লজপৎ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ভিন্ন দল গঠন করেছেন। মাদ্রাজে স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও মন্ত্রী সভা গঠনের বিরোধিতা না করে প্রকারান্তরে সাহায্যই করলেন!

হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি স্থাপনের জন্য এ বছর দুটি ঐক্য সম্মেলন বসে। প্রথমটি আহূত হয় সরকারী আনুকূল্যে। কংগ্রেস কমিটির আহ্বানে দ্বিতীয়টি ২৭শে অক্টোবর কল্‌কাতায় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতারা সম্মিলিত হয়ে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মে বিঘ্ন না জন্মাতে সকলকে অনুরোধ করেন। মস্‌জিদের সম্মুখে গীতবাদ্যসহ শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় ও গো-কোরবানির স্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেক প্রদেশে এই প্রস্তাব যাতে কার্য্যকরী হয় সেজন্য প্রাদেশিক কমিটি গঠনের ভার নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে দেওয়া হ'ল। দুঃখের বিষয়, এতেও বিশেষ ফলোদয় হয় নি।

ঐক্য সম্মেলনের অব্যবহিত পরে ২৮শে থেকে ৩০শে অক্টোবর কলকাতায় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। কমিটি ঐক্য সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য ১৭ই মে কারামুক্ত হন। কিন্তু তখনও বিস্তর বাঙালী যুবক বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। তাঁদের মুক্তি দাবি করে কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নাভার গদিচ্যুত রাজার প্রতি সুবিচারের দাবিও একটি প্রস্তাবে করা হ'ল। সভাপতি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এ অধিবেশনে আর বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নি।

ব্রিটেনে সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন হওয়ায় রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে এ সময় কিছু তৎপর হয়ে উঠেন। কিন্তু তাঁদের কার্য্য ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের মোটেই অনুকূল হ'ল না। যতটুকু স্বায়ত্ত-শাসন ইতিপূর্ব্বে ভারতবাসীকে দেওয়া হয়েছে তার বেশী দেওয়া সম্ভব কি-না অথবা স্বায়ত্ত-শাসনে অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে কতটুকুই বা খাটো করা যাবে, এই সব বিষয় অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা একটি কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন। বড়লাট লর্ড আরুইন বিশিষ্ট নেতাদের দিল্লীতে আহ্বান করেন ও কমিশন প্রেরণের সিদ্ধান্তের কথা তাঁদের জানান। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এসময় মাঙ্গালোরে। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যের ভার স্বরাজ্য দলের উপর অর্পণ করে খদ্দর ও চরকা প্রচারে মন দেন ও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এ উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে সুরু করেন। তাঁকেও দিল্লীতে ডেকে নিয়ে এই সংবাদ দেওয়া হ'ল। এর পরেই ৮ই নবেম্বর সার্ জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন প্রেরণের কথা বড়লাট বাহাদুর প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন।

ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও শিক্ষা এখন আর অনুসন্ধানের

বিষয় নয়। তাদের দেশ-শাসনের আদর্শ যুগধর্ম্মের সঙ্গে তাল রেখে দিন দিনই উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে চলেছে। নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করা তাদের অভিপ্রায়। তবে একার্য্য বর্ত্তমানে একেবারেই অসম্ভব বিবেচিত হলে ইংরেজের সহযোগেই তারা নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু সাইমন কমিশন গঠনকালে স্বরাজের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র নির্ণয়ের তো কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি, পরন্তু ভারত-বাসীদের স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা বিচারের জন্যই সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হ'ল! এ নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র তীব্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল। সার্ দীনশা এডুলজী ওয়াচা প্রমুখ প্রবীণ মডারেট নেতারাও এরূপ কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করা আত্মমর্য্যাদা হানিকর বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন! দিকে দিকে কমিশন বর্জ্জনের প্রস্তাব হতে লাগ্‌ল, আর এতে কংগ্রেস, মোসলেম লীগ ও উদারনৈতিক সঙ্ঘ, নরমপন্থী-চরমপন্থী, হিন্দু-মুসলমান সকল দলই যোগ দিলেন।

এখানে মোসলেম লীগ সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯২১ সালের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেস ও লীগ এক হয়ে যায়। ১৯২৬ সালে মোস্‌লেম লীগের অধিবেশন আবার রীতিমত আরম্ভ হয়। লীগ অতঃপর দু'ভাগে বিভক্ত হ'ল। এক অংশ মহম্মদ আলী জিন্না ও অন্য অংশ পঞ্জাবের সার্ মহম্মদ সফী পরিচালনা করতে লাগলেন। জিন্নার দলেই অধিকাংশ সদস্য ছিলেন। সফী দল সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। মাননীয় আগা খাঁ ও সার্ ফজ্‌লী হোসেনের নেতৃত্বে নিখিল-ভারত মুসলমান সম্মেলন ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এবারে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল মাদ্রাজে। সভাপতি হলেন মহম্মদ আলী আন্সারি। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। ১৯১২

সালে বল্‌কান ও যুদ্ধের সময় তুরস্কের আহত সৈন্যদের চিকিৎসার জন্য একটি রেড ক্রস নিয়ে তিনি সেখানে যান। অসহযোগ আন্দোলনেও আন্সারি সাহেব মনে প্রাণে যোগ দিয়েছিলেন। এ অধিবেশনে তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। প্রথম, কংগ্রেস সাইমন কমিশন বর্জ্জনের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করলেন। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা কমিশনের ভারতবর্ষে পদার্পণের দিন সর্ব্ব শ্রেণী ও সকল দলের লোককে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে ও ব্যবস্থা-পরিষদে বেসরকারী সদস্যদের কমিশনের কার্য্যে সহযোগিতা না করতে অনুরোধ জানান। দ্বিতীয়, ওয়ার্কিং কমিটিতে অন্যান্য রাজনৈতিক সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বরাজের ভিত্তিতে একটি গঠন-তন্ত্র প্রণয়নের নির্দ্দেশ দেন। তৃতীয়টী, সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এত দিন কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য 'স্বরাজ' কথাটির দ্বারা বুঝান হ'ত। এর অর্থ করা হ'ত, সম্ভব হলে সাম্রাজ্যের অধীন ডোমিনিয়নের অনুরূপ স্বায়ত্ত-শাসন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ফরিদপুর বক্তৃতায় স্পষ্টই বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা তাঁর (সুতরাং কংগ্রেসের) কাম্য। এ অধিবেশনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু—'পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা' (complete national independence) স্বরাজের এইরূপ ব্যাখ্যা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মিসেস্ এনি বেসাণ্ট এ প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন করেন। কংগ্রেসে এ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'ল।

সাইমন কমিশন ১৯২৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলেন। এই দিন সর্ব্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হ'ল। প্রাথমিক অনুসন্ধান সেরে তাঁরা ৩১শে মার্চ্চ বিলাত চলে যান। কয়েক মাস পরে আবার তাঁরা ভারতবর্ষে আসেন। এবার সর্ব্বত্র গমন করে অনুসন্ধান কার্য্য চালাতে

থাকেন। কিন্তু কমিশন যেখানেই গেলেন সেখানেই এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হ'ল। সরকার বিক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা না করে এর দমন কার্য্যেই লেগে গেলেন। পুলিশের লাঠির আঘাতে নানা স্থানে বিস্তর লোক—নেতৃবর্গ ও জনসাধারণ জখম হলেন। তাই কেউ কেউ সাইমন কমিশনকে বিদ্রূপ করে 'লাঠি কমিশন' আখ্যা দিয়েছেন। কমিশন লাহোরে পৌঁছেন ৩০শে অক্টোবর। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও লালা লজপৎ রায় বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন। জনতার উপরে লাঠি বর্ষিত হতে অধিক বিলম্ব হ'ল না। লালা লজপৎ রায়ের আঘাত হয়েছিল মর্ম্মান্তিক। লজপতের বক্ষস্থলে বহু বার লাঠির আঘাত পড়ে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস এই আঘাত তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এনেছিল। বস্তুতঃ এর অল্প দিন পরেই ১৭ই নবেম্বর হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

লালাজীর মৃত্যুতে জনসাধারণ বিশেষ ভাবে বিচলিত ও ব্যথিত হ'ল। একদল লোক তাঁর প্রতি অত্যাচারে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত হয়। এ বিষয় পরে জানতে পারব। বাস্তবিক লালা লজপৎ রায় ত্যাগ ও সেবা দ্বারা শত্রু-মিত্র যুবক-বৃদ্ধ সকলের শ্রাদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করেছিলেন। দেশবন্ধুর ন্যায় তিনিও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসেবায় দান করেন। লজপৎ একজন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থকার ও সাংবাদিক। তিনি বহু পুস্তকের প্রণেতা। তাঁর শেষ পুস্তক ভারতের 'ড্রেন ইন্‌স্পেক্টর' মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া'র জবাবে লিখিত *Unhappy India* বা 'অসুখী ভারতবর্ষ'। তিনি উর্দ্দু 'বন্দেমাতরম্' ও ইংরেজী 'পিপ্‌ল্' পত্র সম্পাদনা করতেন। তিনি জনসেবার আদর্শে 'সার্ভেণ্ট অফ্ দি পিপ্‌ল্ সোসাইটি' স্থাপন করেন। তাঁর আগ্রহাতিশয়ে ও আনুকূল্যে লাহোরে যুবকদের রাজনৈতিক শিক্ষা দানের জন্য তিলক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাইমন কমিশনের উপর জনমত বিরূপ দেখে সরকার কমিশনের সাহায্যকারক একটি কেন্দ্রীয় ভারতীয় কমিটি ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠনে তৎপর হয়েছিলেন। ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ১৬ই ফেব্রুয়ারী লালা লজপৎ রায় কমিশনের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা না করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রগতিশীল দলগুলির সমর্থনে ৬৮-৬২ ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সরকার অতঃপর তিন জন সদস্যকে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য মনোনয়ন করতে বাধ্য হন।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাব মত ওয়ার্কিং কমিটি কমিশন বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গঠন-তন্ত্র রচনার জন্য দিল্লীতে একটি সর্ব্বদল সম্মেলন আহ্বান করলেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান ও সংখ্যানুপাত নির্দ্ধারণ স্বভাবতঃই আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত হ'ল। ১৯শে মে তারিখে সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয় ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর শাসনতন্ত্র রচনার ভার অর্পিত হয়। ঊনত্রিশটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এ প্রস্তাবের সপক্ষে ছিলেন। এই কমিটি পরে নেহ্রু কমিটি নামে পরিচিত হয় ও এর প্রদত্ত রিপোর্টের নাম হয় নেহরু রিপোর্ট। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু, সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু, সার্ আলী ইমাম, মাধবশ্রীহরি আনে, সৈয়দ কোরেসি, সুভাষচন্দ্র বসু, ও জি আর প্রধান কমিটির সভ্য ছিলেন ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করেন।

লক্ষ্ণৌ শহরে ২৮শে-৩০শে আগষ্ট পুনরায় সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশন হ'ল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে মামুদাবাদের রাজা, রাজা রামপাল সিংহ, সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু, সার্ আলি ইমাম, সার্ চিত্তুর শঙ্করণ

নায়ার, সার্ সি, পি, রামস্বামী আয়ার, সচ্চিদানন্দ সিংহ প্রভৃতি অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। কমিটি ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র রচনা করেন, কিন্তু সামরিক ব্যবস্থা ও অন্য কোন কোন বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের নিম্নতর পন্থা অবলম্বনের পক্ষে মত দেন। সম্মেলনে নেহ্রু রিপোর্ট গৃহীত হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ প্রগতিপন্থী কংগ্রেস নেতারা ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের ভিত্তিমূলক কোন শাসনতন্ত্র গ্রহণে রাজী হলেন না। মাদ্রাজ কংগ্রেসের গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবেই তাঁরা দৃঢ় রইলেন ও সম্মেলনের অধিবেশন কালেই লক্ষ্ণৌয়ে বসে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ্ ইণ্ডিয়া লীগ' বা ভারতের স্বাধীনতা সঙ্ঘ নামে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। এর পরেই ৫ই ও ৬ই নবেম্বর দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় আদর্শ বলে স্বীকার করলেও নেহ্রু কমিটির কার্য্যের প্রশংসা করেন ও রিপোর্টখানিকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির একটি বড় ধাপ বলে গণ্য করলেন। রিপোর্টের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এ বছরে আর কয়েকটি বিষয়ও উল্লেখ করবার মত। বারদোলী কৃষক সত্যাগ্রহ আজ ইতিহাসের কাহিনী। এবারে বারডোলী ও বোরসাদ তালুকের রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করা হয়। গুজরাটে ভূমির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নেই। সকল জমি খাস গবর্ণমেণ্টের অধীন ও প্রত্যেক পঁচিশ কি ত্রিশ বছর অন্তর অন্তর রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত হয়। আর প্রতি বারেই অন্যূন এক চতুর্থাংশ খাজনা বেড়ে যায়। পূর্ব্বে কংগ্রেসে এরূপ অত্যধিক খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষ আলোচনা হ'ত ও বঙ্গের ন্যায় অন্যত্রও যাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হ'ত। বারডোলী তালুকের প্রজারা এবারে বললেন যে, জমি থেকে

আয় মোটেই বাড়ে নি, কাজেই খাজনা বৃদ্ধি অবৈধ! তাঁরা সরকারের আদেশ অমান্য করে সত্যাগ্রহ করলেন। বল্লভভাই পটেল প্রজাদের দাবি ন্যায্য বিবেচনায় তাঁদের নেতৃত্ব করতে স্বীকৃত হন। প্রথমে তাঁরা সরকারকে নূতন বন্দোবস্ত স্থগিত রাখ্‌তে অনুরোধ জানালেন। সরকার অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত হলে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হ'ল। আন্দোলন কয়েক মাস চল্‌বার পর বেগতিক দেখে সরকার বারডৌলীর অধিবাসীদের সঙ্গে আপোষ-রফা করতে সম্মত হন। প্রথমে শতকরা সোয়া ছ' টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব হলেও শেষ পর্য্যন্ত জমির খাজনা প্রায় পূর্ব্ববৎই বাহাল রয়ে গেল।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের দুটি বিষয়ও এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিল বা আইনের খসড়া পরিষদে উপস্থিত করেন। বিভিন্ন দলের মতৈক্য হেতু সরকারকে বেসরকারী সংশোধনী গ্রহণ করে কোন কোন ধারা বর্জ্জন বা সংশোধন করতে হয়। সরকার তাই এ বিল পরিত্যাগ করে আর একটি নূতন খসড়া উপস্থিত করতে চাইলেন। প্রিসিডেণ্ট পটেল তাতে সম্মতি দান করলেন না। তাঁরা অগত্যা পুরাতন বিলেরই আলোচনা চালাতে থাকেন। কিন্তু সরকার শেষ পর্য্যন্ত এ বিল তুলে নেওয়াই সাব্যস্ত করেন!

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল কল্‌কাতায়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মূল সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু। মোতিলাল কংগ্রেসের ভিতরে প্রগতিশীল স্বাধীনতা-পন্থীদের বিরোধিতার আঁচ করেছিলেন। আর এই বিরোধিতা যে কংগ্রেসে প্রবলভাবে দেখা দেবে তাও বুঝ্‌তে তাঁর বাকী ছিল না, কারণ তাঁর পুত্র পণ্ডিত জবাহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রই এই বিরোধী দলের অগ্রণী। তাই কংগ্রেস তাঁর মতানুবর্ত্তী না হলে সভাপতিত্ব করা অসম্ভব তিনি এরূপ

ভাব ব্যক্ত করলেন। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর ডাক পড়ে। গান্ধীজী গত দু'বছর কংগ্রেসে উপস্থিত রইলেও এর কাজকর্ম্মে তেমন ভাবে যোগদান করেন নি, খদ্দর প্রচারেই নিজের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করেছেন। এবারে তিনি কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে উপনীত হলেন ও নেহ্রু কমিটি সম্পর্কে মূল প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করলেন।

বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত জবাহরলাল ও সুভাষচন্দ্র একই ধরণের সংশোধনী উত্থাপন করেন। গান্ধীজী ও এ দু'জনের মধ্যে আপোষের ফলে মূল প্রস্তাবের কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্জ্জিত হয়। কিন্তু পর দিন গান্ধীজী কর্তৃক মূল প্রস্তাব উত্থাপনের পরই এ আপোষ না মেনে সুভাষচন্দ্র বসু সংশোধনী উত্থাপন করেন ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু তা সমর্থন করেন। মহাত্মাজী এইরূপ চুক্তিভঙ্গ হেতু তাঁদের ভর্ৎসনা করতে ছাড়েন নি। যাহোক্ বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হ'ল। এই বিখ্যাত প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"সর্ব্বদল কমিটি রিপোর্ট (নেহ্রু রিপোর্ট নামে পরিচিত) যেরূপ গঠনতন্ত্র সুপারিশ করেছেন তা বিবেচনা করে এই কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে একে একটি উৎকৃষ্ট দান হিসাবে অভিনন্দিত করেন এবং সকল সভ্য একমত হয়ে প্রায় সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আনন্দ প্রকাশ করেন। মাদ্রাজ অধিবেশনের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবে দৃঢ় থেকেও কংগ্রেস কমিটি গঠন-তন্ত্র এই বলে অনুমোদন করেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির পথে এ একটি শ্রেষ্ঠ ধাপ, বিশেষতঃ যখন এর মধ্যে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বড় রকমের একটা সামঞ্জস্য সাধন করা হয়েছে।

'রাষ্ট্রিক অবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি ১৯২৯, ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই গঠন-তন্ত্রে ষোল আনা সম্মতি দান

সরোজিনী নাইডু
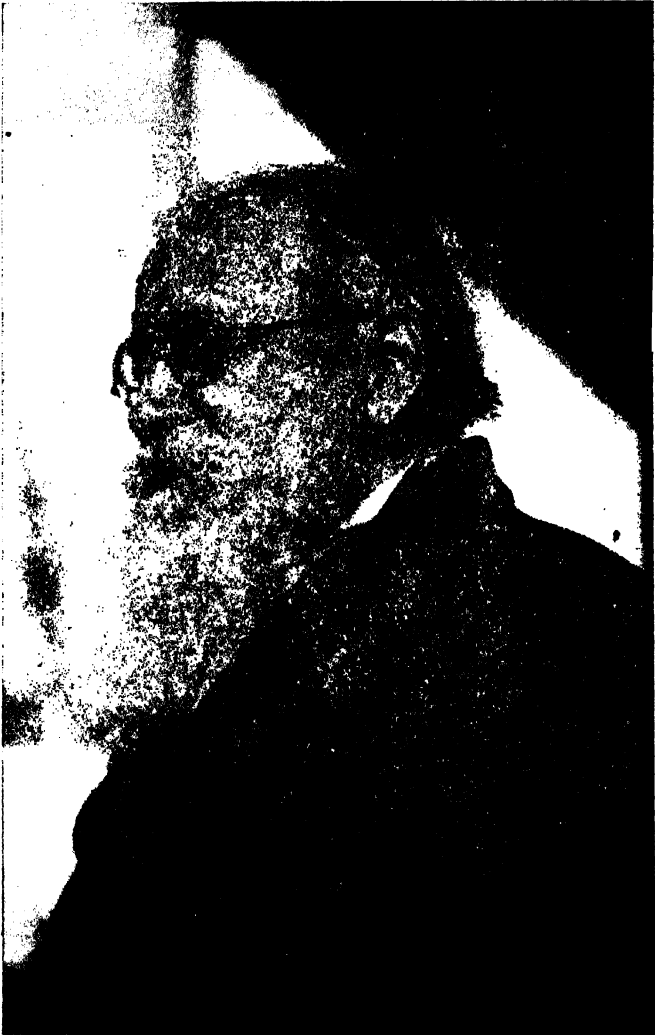
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

করেন তা হলে কংগ্রেস একে গ্রহণযোগ্য মনে করবেন। কিন্তু যদি এই তারিখে বা এর পূর্ব্বে এই গঠন-তন্ত্র অগ্রাহ্য করা হয় তা হলে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করতে বা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করতে নির্দ্দেশ দিবেন।

"উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রচারকার্য্য চালাবার পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি করা হবে না।"

পর বছরের করণীয় কার্য্য আর একটি প্রস্তাবে এইরূপ নির্ণীত হ'ল,—মাদক-দ্রব্য বর্জ্জন, খদ্দর প্রচলন ও বিদেশী বস্ত্র ত্যাগ, পরিষদ-সদস্যদের গঠনমূলক কার্য্যে অধিকতর মনোযোগ, সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন, হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদানে নারীজাতিকে উৎসাহ দান, কার্য্য পরিচালনের জন্য কংগ্রেস-সেবীদের নিকট থেকে বছরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি।

কংগ্রেস এই অধিবেশন থেকে আর একটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন। একটি প্রস্তাবে করদ ও মিত্র রাজন্যদের এই অনুরোধ জানান হ'ল যে, তাঁরা যেন নিজ নিজ রাজ্যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিমূলক শাসন প্রবর্ত্তন করেন ও প্রজাদের মৌলিক অধিকারসমূহ (যেমন সভা-সমিতি স্থাপন, বক্তৃতা দান, সংবাদপত্র পরিচালন প্রভৃতি) মেনে নেন।

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে কল্‌কাতায় সর্ব্বদল সম্মেলনের শেষ অধিবেশন হয়। অধিবেশনে নেহরু রিপোর্ট গৃহীত হ'ল বটে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বিশেষ করে মুসলমান ও শিখদের মধ্যে যেরূপ মতদ্বৈধতা প্রকাশ পায় তাতে এর ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হন।

গত দু' তিন বছরে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিস্তর ছাত্র ও যুব সমিতি গঠিত হয়েছিল। এবারে কংগ্রেসের সময় নিখিল-ভারত যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত

হ'ল। এর সভাপতিত্ব করেন বোম্বাইয়ের জননেতা কে এফ্ নরীমান মহাশয়। সুভাষচন্দ্র বসু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হন। যুব সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়।

আমরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ১৯২৯ সালে এসে উপনীত হ'লাম। বছরের প্রথম দিকে কয়েকটি সরকারী কমিটি ও কমিশন বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখায়। সাইমন কমিশন ১৪ই এপ্রিল তারিখে ভারতে অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করেন। সার্ ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা-কমিটি ভারতের সর্ব্বত্র জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য পরিভ্রমণ করেন ও পরবর্ত্তী নবেম্বর মাসে রিপোর্ট দাখিল করেন। ভারতীয় রাজন্যদের সম্পর্কে গঠিত ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স কমিটির রিপোর্ট এপ্রিল মাসেই পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। এই সময়, মে মাসে বিলাতে সাধারণ নির্ব্বাচন হ'ল ও শ্রমিকদল সংখ্যাধিক্য লাভ করে মন্ত্রী-সভা গঠন করলেন। মিঃ রাম্‌সে ম্যাকডনাল্ড হলেন প্রধান মন্ত্রী ও মিঃ ওয়েজ্‌উড বেন ভারত-সচিব। ম্যাকডনাল্ড পূর্ব্বে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন ও *Awakening of India* বা 'ভারতের জাগরণ' সম্পর্কে বই লিখেছিলেন। একবার তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি করাও সাব্যস্ত হয়েছিল। এবারে শ্রমিক মন্ত্রীসভায় তিনিই প্রধান মন্ত্রী। কাজেই, তাঁর মন্ত্রিত্বকালে ভারতবর্ষের কিছু সুবিধা হওয়া সম্ভব—কেউ কেউ এরূপ আশা পোষণ করতে লাগলেন। আবার বড়লাট লর্ড আরুইন ভারতের অবস্থা শ্রমিক মন্ত্রী-সভাকে জ্ঞাপন করবার জন্য জুন মাসের শেষেই চার মাসের ছুটি নিয়ে বিলাত যান। এতেও সাধারণের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়েছিল।

জনসাধারণের মধ্যে রাষ্টীয় চেতনা জাগ্রত হতে আরম্ভ হয়

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে। রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিক উভয়েরই বরাত ফিরে যাবে, এ ধারণাও সাধারণে পোষণ করতে লাগ্‌ল। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৭ সালে আহ্‌মদাবাদে শ্রমিক-সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন। কিন্তু অসহযোগের সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় নেতারা নিজ নিজ অঞ্চলে তাদের সংঘবদ্ধ করতে বিশেষভাবে চেষ্টিত হন। ভারতের শ্রমিকদের নিয়ে ১৯২১ সালে অল্‌-ইণ্ডিয়া বা নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাইয়ে এর প্রথম অধিবেশন হ'ল। ঝরিয়ায় দ্বিতীয় ও লাহোরে তৃতীয় অধিবেশন হয়। তৃতীয় অধিবেশনে (১৯২৩) সভাপতি হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। আহ্‌মদাবাদ শ্রমিক সংঘের মত বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের শ্রমিক সংঘ—গিরনাই কামগড় ইউনিয়ান ও জি, আই, পি, রেলওয়ে ইউনিয়ন অতঃপর খুবই প্রবল হয়ে উঠে। এবারে বোম্বাইয়ে, জামশেদপুরে ও কল্‌কাতার উপকণ্ঠের কলগুলিতে কয়েকটি শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয়। শ্রমিক নেতাদের মধ্যেও নরমপন্থী ও চরমপন্থী—দু' দল দেখা দিল। এক দল শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি প্রয়াসী, অন্য দল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হলে শ্রমিক সমাজের উন্নতি অসম্ভব এই নীতিতে আস্থাবান্ ও এই উদ্দেশ্যে কার্য্য করতে চান্। এক কথায় রুশিয়ার কমুনিষ্ট তন্ত্র তাঁদের আদর্শ। ভারত-ভৃত্য সমিতির নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী শ্রমিক-দরদী এন এম জোষী প্রথম এই দলে যোগ দেন। বছরের শেষে উভয় দলে বিরোধ ঘোরাল হয়ে উঠে। দ্বিতীয় দল অবিলম্বে সরকারের কুনজরে পড়লেন। পঞ্জাব, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে বহু শত গৃহ ১৯২৯, ২০শে মার্চ্চ তারিখে খানাতল্লাসী হয় ও অনেক লোক ধৃত হন। এর ভিতর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিরই আট জন সদস্য ছিলেন। এই সব বন্দী নিয়ে বিখ্যাত মীরাট মোকদ্দমা রুজু হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—ভারতে কম্যুনিজম প্রচার ও সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্ব্ব বছর পরিত্যক্ত পাব্লিক সেফ্‌টি বিল জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট আবার ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করেন। ১১ই এপ্রিল তারিখে সভাপতি পটেল মীরাট মামলা বিচারাধীন থাকায় বিল সম্পর্কে আলোচনা বেআইনী—এই অভিমত ব্যক্ত করেন ও এর উত্থাপনে অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন। পরদিনই গবর্ণমেণ্ট অর্ডিন্যান্স জারী করে উত্থাপিত বিলের মর্ম্মে একটি আইন প্রবর্ত্তিত করলেন।

এই সময় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু হয়। এ মামলা নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। লাহোরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সণ্ডার্স ১৯২৮ সালে ১৭ই সেপ্টেম্বর গুলির আঘাতে নিহত হন। তাঁর হত্যাকারী সন্দেহে বহু যুবক ধৃত হয়। ভগৎ সিংহ, বি. কে. দত্ত, শুকদেব, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি এই মামলায় অভিযুক্ত আসামী। হাজতে ও বিচারালয়ে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়—এই অভিযোগ করে ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীরা অনশন আরম্ভ করে। যতীন্দ্রনাথ দাসের অনশনই মারাত্মক হ'ল। একাদিক্রমে চৌষট্টি দিন অনশনের পর ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ মারা গেলেন। এর মাত্র ছ'দিন পরে ব্রহ্মদেশে ফুঙ্গী বিজয় ১৬৪ দিন অনশন ব্রত করে মারা যান। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ভারতবর্ষে ও বিশেষ করে বাংলাদেশে খুব বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীসাম্বমূর্ত্তি এবং সর্দ্দার মঙ্গল সিং, মৌলানা জাফর আলী খাঁ, মাষ্টার মোতা সিং, ডাক্তার সত্যপাল প্রভৃতিও একে একে নানা কারণে ধৃত ও দণ্ডিত হন।

এ বছর এপ্রিল মাসে ভারত-বন্ধু ডক্টর জাবেজ টি সাণ্ডারলণ্ডের ,ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ' বা 'শৃঙ্খলিত-ভারত' বইখানি সরকার বাজেয়াপ্ত

করেন। প্রকাশক 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রবীণ সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মুদ্রাকর ও কবি ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস বিচারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এর পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের মরশুমেও জাতীয় ভাবোদ্দীপক বহু পুস্তক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

এ সময়ে কংগ্রেসের কার্য্য কিরূপ চল্‌তে থাকে তা একবার দেখা যাক্। কল্‌কাতা কংগ্রেসে কর্ম্মপদ্ধতি যেরূপ নির্ণীত হয়েছিল তদনুসারে বিভিন্ন কমিটির উপর কার্য্যভার অর্পিত হয়। কংগ্রেসের একটি বৈদেশিক বিভাগ খোলা হ'ল। এই বিভাগের কার্য্য হ'ল, বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগ সাধন। লেবার রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্ট নামে একটি শ্রমিক বিভাগও এ সময় স্থাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধী কল্‌কাতা কংগ্রেসে বিশেষভাবে যোগ দিলেও পরে আবার খদ্দর প্রচার কার্য্যেই তাঁর সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করেন। এ বছরেও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মধ্যে পরিভ্রমণে রত থাকেন।

এবৎসর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল দু'বার। মে মাসের অধিবেশনে কমিটি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য দেড় হাজার টাকা মঞ্জুর করেন ও একটি স্বতন্ত্র কমিটির উপর মামলা পরিচালনার ভার দেন। এ অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। আর এর কৃতিত্ব পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রুর। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ভারতে সোশ্যালিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তনে তিনিই অগ্রণী; এ সময় কংগ্রেসকে দিয়ে এর মূল নীতি মানিয়ে নিতে তিনি সক্ষম হন। এ প্রস্তাবে এই সর্ব্বপ্রথম বলা হ'ল যে, বর্ত্তমান আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক এবং দুঃখ দৈন্য দূর করে জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে বর্ত্তমানে যে-সব ঘোর বৈষম্য তা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির

দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল ২৮শে সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌ শহরে। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে জবাহরলাল সভাপতিপদে মনোনীত হন। কমিটি যতীন্দ্রনাথ দাস ও ফুঙ্গী বিজয়ের আত্মত্যাগের প্রশংসা করেন, কিন্তু খুব গুরুতর কারণ ব্যতীত অনশন ব্রত অবলম্বনে সকলকে নিষেধ করেন।

পরবর্ত্তী তিন মাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বড়লাট লর্ড আরুইন ২৬শে অক্টোবর বিলাত থেকে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পাঁচ দিন পরে ৩১শে অক্টোবর তিনি এক বিবৃতি মারফত ভারতের ভাবী শাসন-তন্ত্র গঠন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। ভারত-শাসনের আদর্শ ডোমিনিয়ন ষ্টেটস, ভাবী শাসন-তন্ত্রে ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য-ভারতের মধ্যে সংযোগ সাধনের আবশ্যকতা এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান প্রভৃতি বিষয় বিবৃতিতে উল্লিখিত হয়। বিবৃতি প্রকাশের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লীতে উপস্থিত কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ বড়লাটের সদিচ্ছায় আনন্দ প্রকাশ করে একটি যুগ্ম বিবৃতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একটি বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দাবি করেন। ডোমিনিয়ন ষ্টেটস-এর অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচনার জন্যই সম্মেলন আহ্বান করা হবে কি-না তাঁরা স্পষ্ট জান্‌তে চান। তবে তাঁরা অবশ্য মনে করেন, বড়লাটের বিবৃতি প্রথমটিরই নির্দ্দেশক। মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহ্‌রু, মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাদুর সাপ্রু, মহম্মদ আলী জিন্না প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। এর অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয় ও বিবৃতি সমর্থিত হয়। এই সময় সুভাষচন্দ্র বসু আদর্শ-বিচ্যুতির আশঙ্কায় কমিটির সদস্য-পদে ইস্তফা দেন।

যাহোক্, বড়লাটের বিবৃতি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে খুবই আন্দোলন উপস্থিত হ'ল। ভারত-সচিব ওয়েজউড বেন বল্‌লেন যে, ভারত-শাসন

নীতির কোনই পরিবর্ত্তন হয় নি, বরং ১৯১৭ সালে যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল তাই বলবৎ রয়েছে। ভারতবর্ষকে ধাপে ধাপে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দেওয়া হবে, আর পার্লামেণ্টই নির্ণয় করবেন এই ধাপ। নেতৃবৃন্দ বড়লাটের বিবৃতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভের আঁচ পেয়েছিলেন। এবারে সে সম্ভাবনা সুদূরে চলে গেল। বেন সাহেব ভারতবাসীদের প্রবোধ দেওয়ার ছলে পুনরায় পার্লামেণ্টে এই মর্ম্মে বললেন,—'ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ ডোমিনিয়ন ষ্টেটসই ভোগ করছে। রাষ্ট্রসংঘে ভারতীয় সদস্য প্রেরণ, সাম্রাজ্য-সম্মেলনে ভারতীয় সদস্যের যোগদান, লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার নিয়োগ—এতেও যদি ডোমিনিয়ন ষ্টেটস না হয় ত কিসে হবে?' ভারতবর্ষের শিক্ষিত-সাধারণ বেনের এবম্বিধ ভাষণে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল। তাঁরা বল্‌তে লাগ্‌লেন, ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তিকে এরূপ ভাবে অপমানিত করা বেন সাহেবের মোটেই উচিত হয় নি! কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্নে ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আরুইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, মোতিলাল নেহ্‌রু, মহম্মদ আলী জিন্না, মদনমোহন মালবীয় ও প্রেসিডেণ্ট পটেলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। লর্ড আরুইন ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের অনুরূপ শাসন-তন্ত্র রচনার জন্যই ভাবী সম্মেলন আহূত হবে এইরূপ কোন কথা দিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি ঐ দিনই দিল্লীতে ফিরে আসেন। দিল্লী থেকে একমাইলের মধ্যে তাঁর ট্রেণে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু বড়লাট বাহাদুর অক্ষতদেহে অব্যাহতি পান।

দশ বছর পূর্ব্বেকার কল্‌কাতা ও নাগপুর অধিবেশনের মত এবারকার লাহোর অধিবেশনও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল। নব্যতন্ত্রের নায়ক পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু সভাপতির অভিভাষণে ভারতবাসীর শক্তি-সামর্থ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করলেন। তিনি নিজে

সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে পথে হিংসার স্থান নেই। ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় হিংসার পথ মোটেই অবলম্বনীয় নয়। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষ হিংসার পথ অবলম্বন করে বটে, কিন্তু তা হতাশারই দ্যোতক। গণ-আন্দোলনে হিংসার কোন স্থান নেই। তাঁর মতে জাতীয় প্রচেষ্টার প্রকৃত লক্ষ্য হ'ল, "সত্যকার ক্ষমতা অধিকার। আমি মনে করি না—ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের মত কোন শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা সত্যকার ক্ষমতা লাভ করতে পারব। সত্যকার ক্ষমতা যে পাওয়া গিয়েছে তা পরীক্ষা হবে ঠিক্ তখনই, যখন ভারতে স্থিত বিদেশী সৈন্য ও ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থায় বিদেশীয় কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হবে। সুতরাং আমাদের সকল শক্তি এই দিকেই নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। বাকী সব আপনা হতেই আমাদের আয়ত্তে আস্‌বে।"

প্রথমেই বড়লাটের ট্রেন আক্রমণের অপচেষ্টার নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। ডিসেম্বর মাসে অধিবেশন হলে শীতাধিক্য বশতঃ সাধারণের বিশেষ কষ্ট হয়, এজন্য একটি প্রস্তাবে অতঃপর ফেব্রুয়ারি কি মার্চ্চ মাসে কংগ্রেস অধিবেশন করা স্থির হয়। মিত্ররাজ্য, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, জাতীয় ঋণ-প্রভৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। কিন্তু এবছরটি আর এক কারণে বিশেষভাবে স্মরণীয়। এবারকার কংগ্রেসের মূল বিষয় হ'ল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"ডোমিনিয়ন ষ্টেটস সম্পৃক্ত বড়লাটের ঘোষণার উপর কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন দলের নেতাদের বিবৃতি সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্য কংগ্রেস অনুমোদন করেন এবং স্বরাজমূলক জাতীয় প্রচেষ্টার মীমাংসার জন্য বড়লাটের চেষ্টা-উদ্যোগের তারিফ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে

যে সব ঘটনা ঘটেছে তা, আর মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং বড়লাটের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ফলাফল বিবেচনা করে কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস-প্রতিনিধির যোগদানে কোনই ফলোদয় হবে না। সুতরাং গত বছর কল্‌কাতা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে কংগ্রেস ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস গঠন-তন্ত্রের প্রথম দফায় 'স্বরাজ' শব্দটি দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) সূচিত হবে এবং আরও ঘোষণা করেন যে, নেহ্‌রু রিপোর্টের শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে গণ্য হবে। কংগ্রেস আশা করেন, সকল কংগ্রেস-সেবীই আজ থেকে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে মনঃসংযোগ করবেন। স্বাধীনতা প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ স্বরূপ এবং এই আদর্শের সঙ্গে কংগ্রেস নীতির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কংগ্রেস সকল কংগ্রেস-সেবী ও জাতীয় প্রচেষ্টায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিকে ভাবী নির্ব্বাচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন ভাবেই যোগদান না করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন, আর বর্ত্তমানে যাঁরা ব্যবস্থা-পরিষদগুলিতে ও ব্যবস্থা-পরিষদের কমিটিসমূহে সদস্য রয়েছেন তাঁদের সেগুলি থেকে পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেন। কংগ্রেস জাতিকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতি আন্তরিকতার সহিত অনুসরণ করবার আবেদন জানান এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এরূপ ক্ষমতা অর্পণ করেন যে, তাঁরা যখনই উপযুক্ত মনে করবেন তখনই ট্যাক্স বন্ধ সমেত আইন-অমান্য প্রচেষ্টা নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বা ব্যাপকভাবে আরম্ভ করতে পারবেন।"

কংগ্রেস ও "গোলটেবিল" বৈঠক

(১৯৩০-১৯৩১)

সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ নববর্ষের আরম্ভেই স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা সাব্যস্ত হ'ল। স্থির হ'ল, ঐ দিন বিশেষ ভাবে রচিত একটি প্রতিজ্ঞা-পত্র সর্ব্বত্র পড়া হবে। এখন প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হয়। ভারতের সর্ব্বত্র ২৬শে জানুয়ারী এই প্রথম প্রতিজ্ঞা-পত্র পঠিত হ'ল। এতে মূলতঃ বলা হ'ল যে, যে-কোন জাতির মত ভারতবাসীরও স্বাধীনতা লাভের অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। ভারতবর্ষের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক—এই চতুর্বিধ অধঃপতনের জন্য প্রতিজ্ঞা-পত্রে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকেই দায়ী করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন যে, তিনি সবরমতী আশ্রমের অধিবাসীদের নিয়ে সর্ব্ব প্রথম লবণ আইন ভঙ্গ করবেন। ১৪ই, ১৫ই, ও ১৬ই এপ্রিল সবরমতী আশ্রমে কমিটির অধিবেশন হয়। সত্যাগ্রহের উদ্ভাবক গান্ধীজী,—তাই তাঁরা গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুমোদন করতে দ্বিধা করলেন না।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ থেকে ১৭২ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য নন্, তথাপি তিনিও এসময় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দেন। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের শৈশব অবস্থায়ই গবর্ণমেণ্ট এর উপর কর বসান, এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু, দীন্‌শা এডুলজী ওয়াচা প্রমুখ নেতৃবর্গ কংগ্রেস মঞ্চ থেকে বহুবার এর বিরুদ্ধে তীব্র

প্রতিবাদ করেন। ১৯২৫ সালে এ বিষম ব্যবস্থার প্রতিকার হয়। তখন দেশী বস্ত্রের উপর ট্যাক্স উঠে যায়, ও বিদেশী বস্ত্রের উপর শুল্ক কিছু বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ১৯২৭ সালে বাট্টার হার যে ভাবে নিয়মিত হয় তার ফলে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য শতকরা সাড়ে বার টাকা কমে গেল! অতঃপর ভারতব্যাপী আন্দোলনের ফলে এর কিছু সুরাহা করা সরকার সমীচীন বিবেচনা করলেন, কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় ব্রিটেনের উপর শুল্ক ২০:১৫ এই অনুপাতে কম করে বসান হ'ল। এতে ভারতবাসীর সমূহ ক্ষতি, কারণ বিলাত থেকেই বেশী বস্ত্র ভারতে আমদানী হয়। এসময় মিশর ও মার্কিনী তুলার উপর নূতন করে শুল্ক বসান হয়। এই তুলার সূতা দ্বারাই বিলাতের লাঙ্কাশায়ারের অনুরূপ বস্ত্র এখানে তৈরী হতে পারত। সরকার কংগ্রেস দল পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় পরিষদে অল্পায়াসেই উক্ত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন। মালবীয়জী এর প্রতিবাদেই সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

মহাত্মা গান্ধী ২রা মার্চ্চ বড়লাট লর্ড আরুইনকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে একখানা পত্র লিখ্‌লেন। পরবর্ত্তী ১২ই মার্চ্চ উন-আশী জন আশ্রমিক সহ সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি পদব্রজে দণ্ডী রওনা হলেন। দণ্ডী সবরমতী থেকে দু' শ' মাইল দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। তিনি এই দীর্ঘ পথ বক্তৃতা করতে করতে গেলেন। লবণ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এ জিনিষ উৎপাদনের অধিকার সকলেরই সমান। সমুদ্র জলে লবণ প্রচুর। অথচ এই অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার থেকে ভারতবাসী দীর্ঘকাল বঞ্চিত। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে তাই কারও এতটুকুও কষ্ট হ'ল না। জনগণ মনে প্রাণে গান্ধীজীর জয় কামনা করতে লাগ্‌ল।

আহ্‌মদাবাদে ২১শে মার্চ্চ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

হ'ল। গান্ধীজী কর্ত্তৃক লবণ আইন ভঙ্গের পরই যাতে ভারতের সর্ব্বত্র লবণ প্রস্তুতের আয়োজন হয় কমিটি এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিলেন। মহাত্মা গান্ধী ৫ই এপ্রিল দণ্ডী পৌছেন। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর সঙ্গিগণ সহ তিনি ঐ দিন লবণ আইন ভঙ্গ করেন। গান্ধীজীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। জনসাধারণ এতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগ্‌ল। সর্ব্বত্র যাতে লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব হয় তার আয়োজন চল্‌ল খুবই। ৬ই থেকে ১৩ই এপ্রিল ভারতের জাতীয় সপ্তাহ। জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনেই সর্ব্বত্র লবণ আইন ভঙ্গের দিন ধার্য্য হয়। ঐ দিনে জনগণ লবণ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করলে। বঙ্গে প্রসিদ্ধ অসহযোগী সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত সেচ্ছাসেবক দল সহ কল্‌কাতার অদূরবর্ত্তী মহিষবাথানে লবণ তৈরী সুরু করলেন। মহিষবাথান বাঙালীর নিকট তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল।

গবর্ণমেণ্ট কখনও আইন লঙ্ঘন বরদাস্ত করতে পারেন না, তা সে যেরূপ আইনই হোক্ না কেন। সরকারের দমন কার্য্য বহু দিন পূর্ব্ব থেকেই সুরু হয়েছে। মীরাট মামলার আসামীরা (একজন বাদে) দায়রায় সোপর্দ্দ, কল্‌কাতায় সুভাষচন্দ্র বসু এগার জন সঙ্গীসহ ন' মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত (২৩শে জানুয়ারী)। আইন অমান্য সুরু হলে নানা স্থানে নূতন করে ধর পাকড় আরম্ভ হ'ল। কল্‌কাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও এলাহাবাদে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহে্রু ধৃত ও দণ্ডিত হলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল গান্ধীজীর দণ্ডী যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে ধৃত হয়ে তিন মাসের জন্য দণ্ডিত হন।

মহাত্মা গান্ধী লবণ আইন ভঙ্গ করে ধরশনার লবণের গোলা, অধিকার করতে মনস্থ করলেন। কিন্তু সত্যাগ্রহীর রীতি অনুসারে তিনি পূর্ব্বে এক পত্রে বড়লাটকে এ কথাও জ্ঞাপন করেন। তাই সরকার গান্ধীজীকে

ধরশনা গোলা অধিকার করতে দিলেন না, ৫ই মে মধ্যরাত্রে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে আটক করলেন। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে সর্ব্বত্র জনগণের মধ্যে আবার নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি হ'ল। সর্ব্বত্র হরতাল তো প্রতিপালিত হ'লই, আইন অমান্যেও জনসাধারণ অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। গান্ধীজীর পরে ধরশনার ভার বৃদ্ধ নেতা আব্বাস তায়েবজী গ্রহণ করেন। তাঁকেও ১২ই মে আটক করা হয়। তাঁর পরে এলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনিও অবিলম্বে ধৃত হলেন। প্রতিদিন স্বেচ্ছাসেবকগণ দলে দলে লবণের গোলার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। সরকার প্রথম প্রথম তাদের গ্রেপ্তার করলেন। পরে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে 'মৃদু' যষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। জনগণের উপর যষ্টির বেদম প্রহারের কাহিনী 'ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার' পত্রের সম্পাদক কে নটরাজন ও ভারত-ভৃত্য সমিতির সভাপতি দেবধর প্রত্যক্ষ করে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করলেন।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটি আইন-অমান্যের ক্ষেত্র ব্যাপকতর করার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যে সব স্থলে জমির রায়তওয়ারী ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রজা সাক্ষাৎ ভাবে গবর্ণমেণ্টকে ভূমি-কর প্রদান করে (যেমন, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিল নাড়ু ও পঞ্জাব) সেখানে ভূমিকর দান বন্ধ করতে ও যে সব স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিদ্যমান, (যেমন, বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা , সে সব স্থলে এর বদলে চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ করতে কমিটি দেশবাসীকে নির্দ্দেশ দেন। বন আইন ভঙ্গও তাঁরা অনুমোদন করেন। মাদক দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনের উদ্দেশ্যেও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটি একটি প্রস্তাবে প্রেস অর্ডিনান্স বা জরুরী মুদ্রাযন্ত্র আইনের তীব্র নিন্দা করেন। এ বিষয় ও অন্যান্য অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে একটু পরেই বলা হবে।

শুধু বিদেশী বস্ত্র কেন, সিগারেট প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যও বিক্রয় প্রায় বন্ধ হ'ল। দেখতে দেখতে বিড়ি সিগারেটের স্থান অধিকার করলে। বিদেশী বস্ত্র সর্ব্বত্র গুদাম জাত হয়ে রইল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থল বোম্বাই ও আহ্মদাবাদের দেশী কল-মালিকদের এই মর্ম্মে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়ে নিলেন যে, তাঁদের কলগুলি অতঃপর নকল খদ্দর উৎপাদনে ও বিদেশী সূতা ব্যবহারে বিরত থেকে স্বদেশ জাত সূতা দ্বারাই বস্ত্র উৎপাদন করবে। অঙ্গীকারবদ্ধ কলগুলিকে তিনি স্বদেশী ছাপ দিলেন। যে সব কাপড়ের কলের মালিক বা অধিকাংশ অংশীদার বিদেশী, কয়েকটি শর্ত্তে তাদের কলগুলিকে স্বদেশী ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বিদেশী ও বিলাতী বস্ত্র এসময় কিরূপ বর্জ্জিত হয়—বিনা বাক্যব্যয়ে কল-মালিকদের কংগ্রেসের অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষরে তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিভিন্ন প্রদেশের নারীসমাজ বিশেষভাবে যোগ দান করলেন। শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান, সুরা-বিপণী ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করা বা ধর্ণা দেওয়া তাঁদের দৈনন্দিন কার্য্য মধ্যে গণ্য হ'ল। জরুরী আইন বলে এসব কাজ যখন বে-আইনী ঘোষিত হ'ল তখন তাঁরা আইন ভঙ্গের অপরাধে দলে দলে কারাগারে গমন করলেন। ব্যাপক ধরপাকড়ের ফলে পুরুষ নেতা যখন প্রায় সব কারাবদ্ধ তখন নারীই এসে সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁদের শূন্য স্থান পূরণ করলেন। বিভিন্ন স্থানে নারীরা আলাদা সত্যাগ্রহ সমিতি স্থাপন করেও আন্দোলনে শক্তি ও রসদ জোগালেন।

প্রেস অর্ডিন্যান্স বা মুদ্রাযন্ত্র সম্পৃক্ত জরুরী আইনের উল্লেখ একটু আগে করেছি। ১৯১০ সালের মুদ্রাযন্ত্র আইনকেই বস্তুতঃ এ দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করা হ'ল। এ বছর ২৩শে এপ্রিল তারিখে এ অর্ডিন্যান্স

জারী হয় ও আইন-অমান্য ঘটিত সংবাদ পত্রস্থ করা নিষিদ্ধ হয়। এ আইনের প্রতিবাদে ভারতের সাংবাদিক মহলে প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয় ও সকলে দু' দিন কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাখেন। কংগ্রেস কিন্তু সকলকেই জরুরী আইন বলবৎ থাকা কালে কাগজ প্রকাশ বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করা অধিকাংশ সংবাদপত্রের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। জরুরী আইন অনুসারে ১৩১ খানা সংবাদপত্রের নিকট থেকে ২,৪০,০০০ টাকা জামিন আদায় করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র ভারতে ন'খানি কাগজ জরুরী আইন মেনে নিতে অস্বীকার করে প্রকাশ বন্ধ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে নবজীবন প্রেস টাকা জমা না দিয়ে সরকারে বাজেয়াপ্ত হ'ল। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা অতঃপর সাইক্লোষ্টাইলে মুদ্রিত হয়ে প্রতি সপ্তাহে বের হতে থাকে। জরুরী আইনের মেয়াদ ছ' মাস। বঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকা' ছ মাস কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাখেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন কালে এ পত্রিকাখানি বের হয় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে অহিংস অসহযোগ-নীতি সমর্থন করে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন কালে পত্রিকাখানির এতাদৃশ ত্যাগ স্বীকারে দেশবাসী আশ্চর্য্য হয়ে যায়! একারণ আনন্দবাজার পত্রিকা দেশবাসীর প্রীতিশ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়। এর প্রচার-সংখ্যা তখন ভারতে ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষার যে কোন সংবাদপত্রের চেয়ে বেশী হয়েছিল।

সরকার বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স জারি করে সর্ব্ব রকমে আন্দোলন থামিয়ে দিতে প্রয়াস পেলেন। প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপলক্ষ্যে স্থাপিত অন্যান্য কমিটিও একে একে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। এমন কি, জুন মাসের শেষে ওয়ার্কিং কমিটিও বে-আইনী সাব্যস্ত হ'ল ও পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু কারারুদ্ধ হলেন।

ইতিপূর্ব্বেকার একটি অধিবেশনে ওয়াকিং কমিটি এই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে, বে-আইনী ঘোষিত হলেও কমিটি যথারীতি কর্ম্ম করে যাবেন। সুতরাং বিভিন্ন স্থানে অধ্যক্ষ (বা ডিক্টেটর) নিযুক্ত করে কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহ করতে হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ একে একে কারারুদ্ধ হলেন। নূতন নূতন সদস্য নিয়ে কমিটি কিন্তু কার্য্য পরিচালনা করতে লাগ্‌লেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু নেতা ওয়াকিং কমিটির সদস্য হয়ে কারাবরণ করেন।

এপ্রিল, মে, জুন এই তিম মাসে ভারতবর্ষের বহু স্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ গোলা বর্ষণ করে। এই সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে ব্যবস্থা-পরিষদে সরকার ১৪ই জুলাই তারিখে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তা থেকে জানা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেইশ বার গোলাগুলি বর্ষিত হয় ও এর ফলে ১০৩ জন হত ও ৪০০ জন আহত হয়। পেশোয়ারে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে এরূপ উদ্বুদ্ধ হয়েছিল যে, তারা ২৩শে এপ্রিল গোলাবর্ষণের সময় সম্পূর্ণ অহিংস থাকে ও ত্রিশ জন নির্ভীকচিত্তে আত্মাহুতি দেয়। বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুরে সামরিক আইন জারি হয় ও সবশুদ্ধ ছ' বার গোলা বর্ষণ হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শান্ত জনতার উপর গুলী বর্ষণে অস্বীকার করায় একদল গাড়োআলী সেনার 'কোর্ট মার্শাল' হয়েছিল।

কর-বন্ধ আন্দোলন সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে সাধারণভাবে আইন-অমান্যের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ১৪৪ ধারা অমান্য করা একটি বিশেষ কাজ হয়ে দাঁড়াল। কল্‌কাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে এ আইন ভঙ্গ করে বহু জনসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই পুলিশের লাঠিবর্ষণে বহু লোক জখম হয়। এলাহাবাদে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
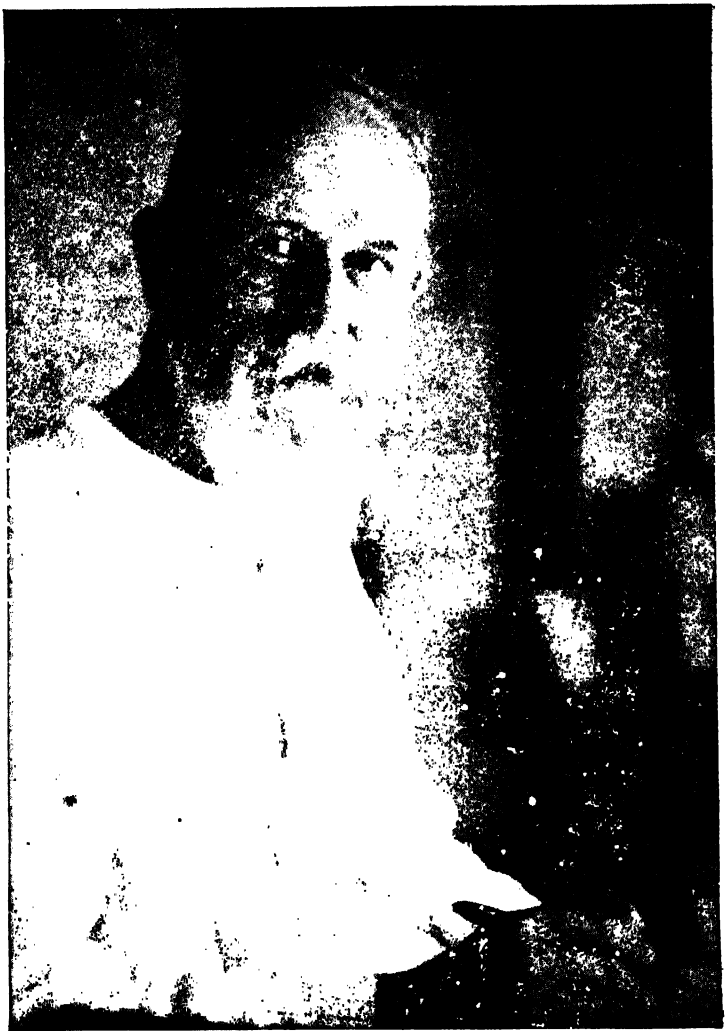
চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ

মোতিলাল-গৃহিণী স্বরূপরাণী নেহ্‌রুর উপরও লাঠি বর্ষিত হ'ল। বোম্বাইবাসী নরনারী আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করেন। সেখানে কত সভা ও শোভাযাত্রা যে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয় তার ইয়ত্তা নেই। তিলকের মৃত্যু-দিবস স্মরণে বোম্বাইয়ের ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষ শ্রীমতী হংসা মেহ্‌তার নেতৃত্বে একটি বিরাট্‌ শোভাযাত্রা বের হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, বল্লভভাই পটেল, জয়রাম দাস দৌলতরাম ও শ্রীমতী কমলা নেহ্‌রু—ওয়ার্কিং কমিটির এই কয়জন সদস্য শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। পুলিশ গতিরোধ করায় শোভাযাত্রাকারীরা একরাত্রি পথিমধ্যে যাপন করেন। পরদিন নেতৃবর্গকে ও নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার করে যষ্টির প্রহারে জনতা ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হ'ল! পেশোয়ারে খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁ ও তাঁর খোদাই খিদমতগার নামীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সর্ব্বত্র অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন। রণপ্রিয় পাঠানগণ পেশোয়ারে যে ভাবে অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখান তার উল্লেখ খানিক আগে করেছি। খোদাই খিদমতগার বাহিনী কিন্তু তখনও কংগ্রেসভুক্ত হয় নি।

কর-বন্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে গুজরাট, কর্ণাটক এবং বঙ্গের কাঁথি ও বিক্রমপুরের কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। গুজরাটের হাজার হাজার অধিবাসী মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কর দান বন্ধ করে নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে নিকটবর্ত্তী বরোদা রাজ্যে আশ্রয় নেয় ও অশেষ দুঃখভোগ করে। ইংরেজ সাংবাদিক মিঃ এইচ এন ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড গুজরাটের গ্রাম অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখেন তার বিস্তৃত কাহিনী সংবাদপত্রে ও পুস্তকে বিবৃত করেছেন। বঙ্গে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধিবাসীরা চৌকীদারী টেক্স দেওয়া বন্ধ করে। নানারূপ অত্যাচার-উৎপীড়নে ও অশেষ দুঃখভোগেও তারা সঙ্কল্পচ্যুত

হয় নি। এ সময় কোথাও কোথাও হিংসাত্মক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু মোটের উপর কাঁথিবাসীরা অহিংস থেকে সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করে। আইন অমান্যের আরম্ভে লবণ প্রস্তুতকালেও তাদের উপর কম পীড়ন হয় নি। বহু স্থলে কর আদায়কালে লোকের জিনিষপত্র বিনষ্ট করা হয়, কোথাও কোথাও ধানের গোলাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

সত্যাগ্রহের মরশুমে গবর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য প্রথমে লণ্ডন 'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের ভারতীয় সংবাদ-দাতা মিঃ স্লোকোম্ব ও পরে সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মুকুন্দ রামরাও জয়াকর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। সরকারের দ্বৈত-নীতি সুবিদিত। শাসন-সংস্কার কার্য্য ও দমন-নীতির অনুসরণ লর্ড মিণ্টোর সময়েই প্রথম সুরু হয়। এবারেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। কর্ত্তৃপক্ষ একদিকে যেমন সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা করলেন অন্যদিকে তেমনি তাঁদেরই মনোনীত ব্রিটিশ ও ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে ভাবী শাসন-তন্ত্র স্থির করার জন্য বিলাতে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনকে অতিরিক্ত সম্মান দিয়ে গোলটেবিল বৈঠক নাম দেওয়া হয়েছে। ১২ই নবেম্বর তারিখে লণ্ডনে এই তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাজন্যবর্গের তরফে ১৬ জন, ব্রিটিশ ভারত থেকে ৫৬ জন ও বিলাতের ১৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই বৈঠক গঠিত হ'ল। মডারেটগণ ঠিক এক বছর পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্রু প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একযোগে এই দাবি জানিয়েছিলেন যে, যদি ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের ভিত্তিতে শাসন-তন্ত্র রচনা করার ব্যবস্থা হয় তবেই তাঁদের সমর্থন লাভ সম্ভব। তাঁরা কিন্তু এবার এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি না পেয়েই কংগ্রেসী স্বাক্ষরকারীদের পশ্চাতে কারাগারে আবদ্ধ রেখে কর্ত্তৃপক্ষের মনোনীত হয়ে বৈঠকে

যোগ দিতে মোটেই কিন্তু বোধ করলেন না! সাড়ম্বরে তথাকথিত গোলটেবিল সম্মেলন আরম্ভ হল, কিন্তু একে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে কংগ্রেসের সহযোগিতা যে একান্ত আবশ্যক তা কর্ত্তারা অবিলম্বে বুঝ্‌তে পারলেন। তাই তাঁরা যে-কোন উপায়ে কংগ্রেসকে বৈঠকে স্থান দিতে তৎপর হলেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড বৈঠক সমাপ্তির দিনে উপসংহার বক্তৃতায় একদিকে যেমন স্বীকার করলেন যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনে, সাময়িকভাবে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি রক্ষাকবচ সাপক্ষে, ভারতবাসীর দায়িত্ব স্বীকার করা হবে তেমনি অন্যদিকে এ আশাও ব্যক্ত করলেন যে, যাঁরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে লিপ্ত পরবর্ত্তী বৈঠকে তাঁদেরও সহযোগিতা লাভে তাঁরা চেষ্টা করবেন।

শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে বড়লাট লর্ড আরুইন ২৫শে জানুয়ারী তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যালোচনার সুযোগ দানের জন্য ১৯৩০, ১লা জানুয়ারী থেকে নিযুক্ত ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী অস্থায়ী সকল সদস্যকে মুক্তি দান করলেন। ওদিকে লণ্ডন থেকে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু তাঁদের বক্তব্য শোনবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালেন। ওয়ার্কিং কমিটির স্থায়ী ও অস্থায়ী সব সদস্য ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে আনন্দ-ভবনে মিলিত হন ও আগেকার নির্দ্দেশ স্থগিত রেখে অপেক্ষা করতে থাকেন। আইন-অমান্য ও দমন-নীতি কিন্তু তখনও পুরা দমে চল্‌ল। কলকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু ২৬শে জানুয়ারী শোভাযাত্রা বের করে আহত ও ধৃত হলেন। পণ্ডিত মোতিলাল নেহ্‌রু এই সময় ৬ই ফেব্রুয়ারী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবাসীরা অত্যন্ত শোকমগ্ন হ'ল। দেশ-মাতৃকা—লোকমান্য তিলক ও দেশবন্ধু দাশের মত তাঁকেও এক সঙ্কটকালে হারাতে বাধ্য হন।

মোতিলাল প্রথমে নরম পন্থী ছিলেন। কিন্তু অসহযোগের সময় থেকে দীর্ঘকালের মত ও অভ্যাস ত্যাগ করে দেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন। এজন্য নানারূপ দুঃখভোগেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতা পুত্রবধূ সকলকে নিয়েই তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বরাজ-প্রচেষ্টায় মোতিলালের দান অনন্যতুল্য। প্রাসাদোপম আনন্দ-ভবন এ বৎসর এপ্রিল মাসে তিনি কংগ্রেসে দান করেন ও এর নামকরণ হয় স্বরাজ-ভবন। এলাহাবাদের স্বরাজ-ভবনেই এখন কংগ্রেসের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত।

বিলাত-প্রত্যাগত নেতাদের মুখে সব কথা শুনে মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন। দিল্লীতে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ সমবেত হলেন। প্রথম গান্ধী-আরুইন সাক্ষাৎকার হ'ল ১৭ই ফেব্রুয়ারী। এর পর দীর্ঘ পনর দিন যাবৎ মহাত্মা গান্ধী ও লর্ড আরুইনের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চল্‌ল। শেষে ৪ঠা মার্চ্চ উভয়ের মধ্যে এক চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। কোন কোন সভ্য কোন কোন শর্ত্তে আপত্তি জানালেও ওয়ার্কিং কমিটি চুক্তি গ্রহণ করেন। ৫ই মার্চ্চ একটি বিশেষ বিবৃতিতে সরকার এই চুক্তির কথা প্রকাশিত করেন। চুক্তির শর্ত্ত অনুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হ'ল ও যারা হিংসাত্মক কর্ম্মের অপরাধে বন্দী নয় এমন সব সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা হ'ল। যে সমস্ত স্থানে লবণ উৎপাদন করা সম্ভব সে সব স্থানের অধিবাসীরা বিনা বাধায় নিজ নিজ প্রয়োজন মত লবণ উৎপাদনের অধিকার পেল, মদের ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণ ধর্ণা-দানও আইনসঙ্গত বলে বিবেচিত হ'ল। কর-বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করা হ'ল, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে কর বন্ধ করার অধিকার গান্ধীজী প্রতিপাদন করলেন। বাজেয়াপ্ত টাকা বা সম্পত্তি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হ'ল না। হিংসাত্মক

কর্ম্মে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড হ্রাসে, বিশেষ করে ভগৎ সিংহ ও তার সঙ্গীদ্বয়ের মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করতে গান্ধীজী চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনটিতেই সফলকাম হন নি। গান্ধী-আরুইন চুক্তিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে সুবিধা করে দেওয়ার কথা হ'ল। কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষ স্বীকার করলেন যে, ফেডারেশন বা রাজন্য-ভারত ও ব্রিটিশ ভারতের সম্মিলিত রাষ্ট্র ভাবী শাসন-সংস্কারের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল ভারতীয় দায়িত্ব ও অন্য কতকগুলি বিষয়, যেমন—দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় ও জাতীয় ঋণ সম্পর্কে রক্ষাকবচ এর অপরিহার্য্য অঙ্গ। নিরপেক্ষদের মতে, শর্ত্তগুলি বিশেষ করে সরকারেরই অনুকূল করে নিষ্পন্ন হয়। আমলাতন্ত্র কিন্তু এতে মোটেই খুশী হতে পারলে না। বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজও কর্ত্তৃপক্ষের উপর গালিবর্ষণ সুরু করলে। তারা গোলটেবিল বৈঠকের মধ্যেই সরকারকে অযাচিতভাবে কংগ্রেস দমনের নানা ফন্দি-ফিকির বাৎলে দিতে লাগ্‌ল।

মার্চ্চ মাসের শেষে করাচীতে সর্দ্দার বল্লভভাই পটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সরকার সত্যাগ্রহী বন্দীদের অনেককে এই সময়ের মধ্যে মুক্তি দেন। এবারকার অধিবেশনে মুক্ত বন্দীদের ভিতর থেকে অর্দ্ধেক প্রতিনিধি গৃহীত হলেন। সুভাষচন্দ্র বসুও ৮ই মার্চ্চ মুক্তিলাভ করে করাচী কংগ্রেসে যোগদান করেন। নওযোয়ান বা নবযুবক সম্মেলনের তিনি সভাপতি হন। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই পটেলও যথাসময়ে করাচীতে উপনীত হলেন। কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিংহের ফাঁসী হয়। যুবক সমাজ এজন্য চঞ্চল হয়ে উঠে। তাদের একদল এই সর্ব্বপ্রথম গান্ধীজীকে কৃষ্ণপতাকা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করে।

কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল গান্ধী-আরুইন চুক্তি ও

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান। জবাহরলাল এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির মর্ম্ম এই,

"ওয়ার্কিং কমিটির ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে নিষ্পন্ন আপোষের বিষয় বিবেচনা করে কংগ্রেস তা সমর্থন করেন ও পরিষ্কার করে বল্‌তে চান যে, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজের (পূর্ণ স্বাধীনতা) আদর্শই বলবৎ আছে। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটে, তা হলে কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ ঐ লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই কার্য্য করবেন। বিশেষতঃ দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব, আথিক ও বাণিজ্য ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, এবং নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অর্থনীতি বিষয়ক কার্য্যা-কার্য্যের অনুসন্ধান, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে জাতীয় ঋণ পরীক্ষা ও নির্দ্ধারণ, স্বেচ্ছায় পরস্পরের বিচ্ছেদ হবার অধিকার, ভারতীয় স্বার্থের অনুগ যে-সব বিলি-বন্দোবস্ত করা আবশ্যক স্বাধীনভাবে তা তাকে করতে দেওয়া—এই সকল ব্যাপারের প্রকৃত ক্ষমতা যাতে জাতির হাতে আসে সে দিকে দৃষ্টি রেখেই আলোচনা চালান আবশ্যক।

"এই কংগ্রেস বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার সম্পূর্ণ অধিকার ও ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীকে অর্পণ করেন। আবশ্যক হলে, তাঁর নেতৃত্বাধীনে এক প্রতিনিধি-মণ্ডলীও কংগ্রেস নিয়োগ করতে পারেন।"

এবারকার অধিবেশনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব--জনগণের মৌলিক অধিকারের বিবৃতি। স্বরাজ বল্‌তে সাধারণের মনে কি ধারণা হওয়া উচিত তার স্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য একটি ব্যাপক প্রস্তাব রচিত ও গৃহীত হ'ল। পরে এ প্রস্তাবটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়। কংগ্রেসের কর্ম্ম প্রণালী বর্ত্তমানে এ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হয়ে থাকে। সংশোধিত প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এই,

মৌলিক অধিকার

১। (ক) প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের, সমিতি বা সঙ্ঘে যোগদানের এবং নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্মিলিত হওয়ার অধিকার। (খ) সমাজে শান্তি ও নীতি বজায় রেখে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম্ম পালনের বা মত অনুসারে চলার স্বাধীনতা। (গ) সংখ্যা-গরিষ্ঠদের এবং পৃথক ভাষা ভাষী অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা ও হরফ সংরক্ষণ। (ঘ) বর্ণ, ধর্ম্ম ও নর-নারী নির্বিশেষে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। (ঙ) সরকারী কর্ম্মে নিয়োগে, দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদ লাভে বা কোন ব্যবসা বা জীবিকা অবলম্বনে ধর্ম্ম, বর্ণ বা নর-নারী ভেদে তারতম্য না করা। (চ) সরকারের, ব্যক্তি-বিশেষের বা সঙ্ঘ-বিশেষের অর্থে সৃষ্ট বা প্রদত্ত দীর্ঘিকা, জলাশয়, রাস্তা, স্কুল বা সাধারণগম্য স্থানের উপর সকলেরই সমান কর্ত্তব্য ও অধিকার। (ছ) নিয়মাধীন থেকে প্রত্যেকেরই অস্ত্রশস্ত্র বহনে ও রক্ষণে সমান অধিকার। (জ) আইনসঙ্গত উপায় ব্যতিরেকে কোন লোকেরই স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হওয়া ও তার বাসস্থানে বা সম্পত্তিতে প্রবেশ করতে, তা দখল করতে বা বাজেয়াপ্ত করতে না দেওয়া। (ঝ) ধর্ম্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা। (ঞ) সর্ব্বত্র সাবালকদের ভোটদানের অধিকার। (ট) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা দান। (ঠ) রাষ্ট্রের তরফে উপাধি দান না করা। (ড) মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদ। (ঢ) ভারতের সর্ব্বত্র বসবাসে, গমনাগমনে সম্পত্তি ক্রয়ে, ব্যবসা-পরিচালনায় সকল ভারতবাসীর সমান অধিকার।

শিল্প-কারখানার শ্রমিক

২। (১) জীবন-যাপনের চলনসই মান নিরূপণ। (২) শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা। উপযুক্ত আইন করে ও অন্যান্য উপায়ে

শ্রমিকদের জীবন-ধারণোপযোগী মজুরী, স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উপায়, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি বা বেকারের সময় তাদের রক্ষা—-এসব বিষয়ের ব্যবস্থা। (৩) দাসত্ব বা দাসত্বের কাছাকাছি অবস্থা থেকে শ্রসিকদের মুক্তিদান। (৪) নারী শ্রমিকদের রক্ষা, বিশেষতঃ মাতৃত্বকালে তাদের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা। (৫) স্কুলে-পড়া বয়সের বালক-বালিকাকে খনিতে বা কারখানায় শ্রমিকরূপে না গ্রহণ। (৬) কৃষক ও শ্রমিকদের নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘ গঠনের অধিকার।

রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

(৭) ভূমি-স্বত্ব, ভূমি-কর ও রাজস্বের সংস্কার ও নির্দ্ধারণ। কৃষকদের দেয় খাজনা যেখানে অত্যধিক সেখানে তা বহুলাংশে হ্রাস করা। একটি নির্দ্দিষ্ট নিম্নতম মান থেকে জমির আয়ের উপর কর স্থাপন। (৮) মৃত্যু কর নির্দ্ধারণ। (৯) অর্দ্ধেকের মত সৈন্য-ব্যয় হ্রাস। (১০) সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের, বিশেষজ্ঞদের বেতন বাদে, উচ্চতম হার মাসে পাঁচ শ' টাকা। (১১) ভারতবর্ষে উৎপন্ন লবণের উপর কোনরূপ কর স্থাপন না করা।

আর্থিক ও সামাজিক কর্ম্ম-ব্যবস্থা

(১২) রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বদেশী বস্ত্র রক্ষা ; এজন্য দেশে বিদেশী বস্ত্র ও বিদেশী সূতা আমদানীর পথ বন্ধ করা। প্রয়োজন হলেই, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদেশীদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশী শিল্প রক্ষার ব্যবস্থা। (১৩) ঔষধ ছাড়া উত্তেজক পানীয় ও ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। (১৪) জাতীয় স্বার্থের অনুকূল বাট্টা ও বিনিময় হার নির্ণয়। (১৫) খনিজ সম্পদ, রেলপথ, জলপথ, জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনার

ভার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গ্রহণ। (১৬) কৃষকদের ঋণ মুক্তি। (১৭) ভারতবাসীদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা। সরকারী দেশরক্ষা-বাহিনীর সঙ্গে তারাও দেশরক্ষায় সাহায্য করবে।

করাচী অধিবেশনের পর সকলে নিজ নিজ অঞ্চলে গমন করলেন ও কংগ্রেস কমিটি গঠন করে সংগঠন কার্য্যে মন দিলেন। বিদেশী বস্ত্র ও মদের দোকানে পিকেটিং করা গঠনমূলক কার্য্যের অঙ্গ। যে সব স্থলে করবন্ধ আন্দোলনের জন্য সরকারে কর দেওয়া বন্ধ ছিল, সে সব স্থলে যথারীতি কর দেওয়া আরম্ভ হ'ল। কংগ্রেস এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিলেন যে, প্রজারা সাধ্যমত কর দানে যেন কোনরূপ ত্রুটি না করে। অনেক স্থলে, যেমন—গুজরাটে ও যুক্তপ্রদেশে, কংগ্রেস কর্ম্মীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর আদায়ে আমলাতন্ত্রকে সাহায্য করলেন। কিন্তু এসব কার্য্য আমলাতন্ত্র ভাল চোখে দেখে নি। কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব ও মর্য্যাদা বাড়ে, তাদের তা মোটেই কাম্য নয়। তাই যে সব প্রজা অভাব ও অক্ষমতা হেতু খাজনার বক্রী টাকা কিয়দংশ মাত্রও দিতে অসমর্থ হ'ল তাদের উপর জোরজুলুম সুরু হ'ল। বোম্বাই, বাংলা, দিল্লী, আজমীর-মারওয়াড় ও মাদ্রাজে পিকেটিং করার উপরও সরকার কড়া নজর দিলেন। ১৮ই এপ্রিল লর্ড আরুইন ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। এর পূর্ব্বদিন লর্ড উইলিংডন কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। লর্ড উইলিংডন একজন জবরদস্ত শাসক। আমলাতন্ত্র তাঁকে পেয়ে যেন খুবই আশ্বস্ত হ'ল। বিলাতেও একদল লোক গান্ধী-আরুইন চুক্তির নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'ল। যখন নানা স্থানে চুক্তি ভঙ্গ হতে থাকে এবং ১০৭ ও ১৪৪ ধারা মতে স্বাধীনতা সঙ্কোচ ও ধরপাকড় সুরু হয়, তখন মহাত্মা গান্ধী এ সব বিষয় উল্লেখ করে সরকারে পত্র লেখেন। সরকার সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে পাল্টা অভিযোগের ফিরিস্তি দেন। গান্ধীজী অতঃপর চুক্তির শর্ত্ত ব্যাখার জন্য একটি সালিশী

আদালত গঠনের প্রস্তাব করেন। কর্তৃপক্ষ এতেও অসম্মত হন। বারডোলীতে অক্ষম লোকদের নিকট থেকে কর আদায়ের জন্য খুবই জোর-জুলুম হয়। মহাত্মাজী প্রতিকারের উপায় না দেখে তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আশা ছেড়ে দিলেন। ১৩ই আগষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হ'ল। কমিটির মত নিয়ে তিনি বৈঠকে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডনকে জ্ঞাপন করেন। অতঃপর আবার আপোষ-রফার কথা হয়। মহাত্মা গান্ধী শিমলায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বড়লাট বারডোলী ব্যাপারের তদন্তে সম্মত হলেন। গান্ধীজী অতঃপর বৈঠকে যোগদান করা যুক্তিযুক্ত ভেবে কাল বিলম্ব না করে ২৯শে আগষ্ট লণ্ডন রওনা হলেন।

কংগ্রেস তরফে একমাত্র মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে যোগদান করেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও বৈঠকে যোগ দিলেন। ভারতীয় নারী সমাজের মুখপাত্র হলেন নাইডু মহোদয়া, মালবীয়জী হিন্দু স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখ্‌বার জন্যই বিশেষ করে নিযুক্ত হলেন। যথারীতি বৈঠক আরম্ভ হ'ল। এবারে কংগ্রেস যোগদান করায় এর মর্য্যাদাও ঢের বেড়ে গেল। পূর্ব্ব বৈঠকে সাধারণ আলোচনা হয়ে গেছে। এবারকার বৈঠক পৃথক্ পৃথক্ কমিটিতে বিভক্ত হয়ে শাসন-বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। গান্ধীজী প্রত্যেক কমিটিতেই ভারতের শাসন-সমস্যা সম্পর্কে কংগ্রেসের অভিমত সুন্দর ও সহজ ভাষায় ব্যক্ত করলেন। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, রাজস্ব, বাণিজ্য, জাতীয় ঋণ প্রভৃতি নানা বিষয় তাঁর বক্তৃতার বিষয়ীভূত হ'ল। তাঁর বক্তৃতা ইউরোপ ও আমেরিকায় সর্ব্বত্র সবিস্তারে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের আবহাওয়া অন্যরূপ। বারবার

অনুরোধ সত্ত্বেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের মূল দাবি সম্পর্কে কোন মত প্রকাশ করলেন না। সব বিষয় বিবেচনা করে দেখবেন—এইরূপ আশ্বাস দিলেন মাত্র। যে সব ভারতবাসী বৈঠকে যোগদান করেছিলেন তাঁরাও একমত হয়ে কাজ করতে পারলেন না। পূর্ব্বেই বলেছি, সরকার বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্ম্ম সম্প্রদায় থেকে তাঁদের মন মত এমন সব লোক বাছাই করেন যাঁরা নিজ স্বার্থ, শ্রেণী বা সম্প্রদায় স্বার্থ ছাড়া জাতীয় স্বার্থের কথা কখন চিন্তাও করেন নি। তাই তাঁরা গান্ধীজীর শর্ত্তে (তিনি বলেছিলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠদের, বিশেষতঃ মুসলমানদের তিনি সব দাবি মেনে নেবেন যদি তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করেন) রাজী না হয়ে ইউরোপীয় ও অন্যান্যদের সঙ্গে মিলে 'মাইনারটিজ্ প্যাক্ট' বা সংখ্যালঘিষ্ঠদের চুক্তি করে বস্‌লেন! ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষও মূল দাবির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা নিয়েই বেশী বিব্রত হয়ে পড়লেন।

ওদিকে বিলাতে এ সময় শাসন-সঙ্কট উপস্থিত হয়। স্বর্ণাভাব হেতু ব্রিটিশ সরকার স্বর্ণমান পরিত্যাগ করেন। অতঃপর শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পতন হ'ল ও সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দল সংখ্যাধিক্য লাভ করলে। কিন্তু সঙ্কটকালে সকল দল নিয়ে নেশন্যাল বা জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল। শ্রমিক দলের মুষ্টিমেয় লোকই এতে যোগ দিলেন। উদারনীতিকদেরও অধিকাংশ রইলেন বাইরে। মিঃ রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড এবারেও প্রধানমন্ত্রী রইলেন বটে, কিন্তু পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল দলের প্রাধান্য হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ষণশীলই হ'ল। অন্যতম রক্ষণশীল সার্ স্যামুয়েল হোর ভারতসচিব নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট বদল হওয়াতে গোলটেবিল বৈঠকের উপরও প্রতিক্রিয়া হ'ল খুবই। ১৮ই নবেম্বর নূতন ভারতসচিব সার্ স্যামুয়েল হোর জানান যে,

সাধারণ বৈঠকের আর প্রয়োজন নেই! বৈঠকের শেষ অধিবেশন হ'ল ১লা ডিসেম্বর। এদিন প্রত্যেকে প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। গান্ধীজীর মিলন চেষ্টা ব্যর্থ করে কিঞ্চিৎ শাসন কর্ত্তৃত্বের আশ্বাস দিয়েই কৌশল করে কিরূপে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সপক্ষে টেনে নেওয়া হয় এবং বাণিজ্য সম্পর্কে কংগ্রেস, হিন্দুসভা ও ভারতীয় বণিক্ সমাজের বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজ নিজ মন মত সব ব্যবস্থা করা হয়—এ সব কথা কল্‌কাতার ইউরোপীয় বণিক্ সমাজের প্রতিভূ সার্ এডওয়ার্ড বেন্থল একটি গোপন সার্কুলার বা প্রচার-পত্রে সবিশেষ ব্যক্ত করেন। বেন্থল সাহেব একথাও স্পষ্ট করে বলেন যে, সাপ্রু, জয়াকর, পাত্র প্রমুখ হিন্দুরা অতঃপর কংগ্রেসকে যে কোনরূপ সাহায্য করবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বৈঠকের শতকরা নিরানব্বই জন প্রতিনিধিকেই গান্ধী তথা কংগ্রেস-বিরোধী করা হয়! সাধারণ নির্ব্বাচনের পরই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দক্ষিণ পন্থীরা বৈঠক ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়তে মনস্থ করেন।

বাস্তবিক, গোলটেবিল বৈঠক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে দমন-নীতি পুনরায় ব্যাপকভাবে সুরু হ'ল। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপরই সরকারের নজর পড়ল বেশী করে। বঙ্গে বিপ্লবী দল ১৯৩০ সালেই কর্ম্ম সুরু করে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে তাদের কার্য্য আরম্ভ হয়। এজন্য এখানে এক অর্ডিন্যান্সও পাস হয় ও বিস্তর লোক আসামী বা আসামীদের সাহায্যকারী বলে কারাবদ্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধীর বিলাত রওনা হবার পরদিনই চট্টগ্রামে ভীষণ দাঙ্গা উপস্থিত হয়। এর পূর্ব্ব দিন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ আসানুল্লা জনৈক বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হওয়ায়ই এই দাঙ্গার সূত্রপাত। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে লোকের মনে এই সন্দেহ

জন্মে যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা এরূপ দাঙ্গায় ইন্ধন জুগিয়েছেন। পরবর্ত্তী ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী-শালায় গুলিবর্ষণের ফলে দু' জন রাজবন্দী নিহত হয়। সন্ত্রাসনবাদ দমনের জন্য সরকার বঙ্গে ২৯শে অক্টোবর একটি ও ৩০শে নবেম্বর আর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠে। তথাপি গান্ধী-আরুইন চুক্তি সম্পাদনের পর সাধ্যমত তারা খাজনা দিয়েছিল। শেষ সম্বলটি পর্য্যন্ত দেওয়া হলে অবশিষ্ট খাজনা মকুবের জন্য নেতৃবৃন্দ সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্ত্তৃপক্ষ নেতৃবর্গের প্রস্তাবে সম্মত হন নি। কর বন্ধ হবার আশঙ্কা করে গবর্ণমেণ্ট কৃষক সমিতি ও কৃষক সম্মেলন দমনে বদ্ধ-পরিকর হলেন ও পণ্ডিত জবাহরলাল ও মিঃ সেরওয়ানীকে এলাহাবাদের ভিতরে আবদ্ধ থাক্‌তে হুকুম দিলেন। ১৪ই ডিসেম্বর এক অর্ডিন্যান্স জারি করে কৃষক আন্দোলন ও করবন্ধ প্রচেষ্টা বে-আইনী ঘোষণা করা হ'ল। জবাহরলাল ও সেরওয়ানী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বোম্বাই রওনা হলে পথিমধ্যে ধৃত হন ও যথাক্রমে দু'বছর ছ'মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আবদুল গফ্‌ফর খাঁর খোদাই খিদমতগার বাহিনীকে (লাল জামা পরিধান করায় লাল-কোর্ত্তা বলেও পরিচিত) ওয়ার্কিং কমিটি ১৩ই আগষ্টের অধিবেশনে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত বলে গণ্য করেন। রাজনৈতিক প্রচার কার্য্যের জন্য উভয়ের উপরই সীমান্তের কর্ত্তৃপক্ষ বিরূপ। আবদুল গফ্‌ফর ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেবের সঙ্গে শীঘ্রই কারারুদ্ধ হলেন। একটি অর্ডিন্যান্সে খোদাই খিদমতগার বাহিনীও বে-আইনী ঘোষিত হ'ল।

এই অবস্থার মধ্যে ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গান্ধীজী বোম্বাইয়ে পদার্পণ করলেন।

সত্যাগ্রহ ও দ্বৈত নীতি

(১৯৩২—১৯৩৫)

গান্ধীজীকে নিজ নিজ প্রদেশের অবস্থা জানাবার জন্য নেতৃবর্গ একে একে বোম্বাইতে উপনীত হলেন। ওয়ার্কিং কমিটিও ২৯শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে অধিবেশন দিন ধার্য্য করেন। ওয়ার্কিং কমিটি ও নেতৃবর্গের মুখে সব কথা অবগত হয়ে মহাত্মা গান্ধী কাল বিলম্ব না করে ২৯শে তারিখেই বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তারে আবেদন জানালেন। উত্তর যা এল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তে যে সব অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে সে সব সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে কোন আলোচনা করতে বড়লাট রাজী নন্। এ ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে তিনি বড়লাটের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজীর সাক্ষাৎ-প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল ঐ তিনটি প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা। সুতরাং যাতে বিনা শর্ত্তে তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় সেজন্য আবার ১লা জানুয়ারী গান্ধীজী তার করেন। ইতিমধ্যে ওয়ার্কিং কমিটিও সিদ্ধান্ত করে নিয়েছেন। বড়লাট বাহাদুর যদি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সব বিষয় আলোচনা করতে অস্বীকার করেন তবে তাঁরা মনে করবেন গান্ধী-আরুইন চুক্তির অবসান হয়েছে। তাঁরা আবার সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবিত করতে বাধ্য হবেন। কি কি ভাবে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হবে প্রস্তাবে তারও একটা নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল। এ প্রস্তাবও গান্ধীজী ঐদিন তারে বড়লাটকে জানান। ২রা তারিখ জবাব এল, গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করা হবে না। তিনি ৩রা শেষ বার বড়লাট বাহাদুরকে তার করেও কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না।

কর্তৃপক্ষের কার্য্যক্রম চল্‌ল ঠিক্ ঘড়ির কাঁটার মত। মহাত্মা গান্ধী ও সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল ৪ঠা জানুয়ারী কারারুদ্ধ হলেন। সুভাষচন্দ্র বসু বাংলায় ফিরবার পথে বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ ষ্টেশনে ধৃত হন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অতি দ্রুত কারাবদ্ধ হলেন। দেশ-প্রিয় যতীন্দ্রমোহর সেনগুপ্ত ১৯৩১, অক্টোবর মাসে শারীরিক অসুস্থতা হেতু ডাক্তারদের পরামর্শে বিলাত গমন করেন। পরবর্ত্তী ২০শে জানুয়ারী বোম্বাইয়ে পৌছবা মাত্র ১৮১৮ সালের তিন আইনে বন্দী হলেন। তাঁর স্বাস্থ্য তখনও ভাল হয় নি। বন্দীবাস তাঁর পক্ষে কাল হ'ল ও তিনি ২২শে জুলাই মারা গেলেন।

৪ঠা জানুয়ারী কর্ত্তৃপক্ষ নূতন করে এই চারটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন,—(১) ইমার্জেন্সি পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্স বা হঠাৎ বিপদ উপস্থিত হলে তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা মূলক জরুরী আইন, (২) আন্‌লফুল ইন্‌ষ্টিগেশন অর্ডিন্যান্স বা বে-আইনী কর্ম্মে প্ররোচনা-দানের বিরুদ্ধে জরুরী আইন, (৩) আন্‌লফুল এসোসিয়েশন অর্ডিন্যান্স বা বে-আইনী সভাসমিতি বিষয়ক জরুরী আইন ও (৪) প্রিভেন্‌শন অফ মলেষ্টেশন এণ্ড বয়কট অর্ডিন্যান্স বা লোককে উত্ত্যক্ত করা ও বর্জ্জন কার্য্য বন্ধ করার জন্য জরুরী আইন। এ ছাড়া প্রেস আইন কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে এক মোক্ষম অস্ত্র। ১৯৩০ সালে যে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি হয় ১৯৩১ সালে তা আইনে পরিণত করা হয়। এবারে ফৌজদারী আইন সংশোধন করে প্রেস আইনকে এর অঙ্গীভূত করা হ'ল। কর-বন্ধ আন্দোলন ব্যাহত করার জন্য বোম্বাই সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। সব অর্ডিন্যান্সই পরে আইনে পরিণত হয়।

আগেকার এবং বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্স দ্বারা প্রকাশ্য আন্দোলন সর্ব্বরকমে বন্ধ করার আয়োজন হ'ল। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কিং

কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, জেলা, মহকুমা, তালুক, থানা ও গ্রামের কংগ্রেস কমিটি, জাতীয় বিদ্যালয়, কংগ্রেসের অন্তর্গত অন্য সমুদয় প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। যে সব গৃহে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত, সে সবই সরকার অধিকার করলেন। কংগ্রেস ফণ্ড ও সমুদয় টাকাকড়ি সরকারের হস্তগত হ'ল। পাইকারী জরিমানা, পিটুনি পুলিশ ও সৈন্য স্থাপনের ব্যয় প্রজার কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা হ'ল। কর বন্ধের প্ররোচনা দান দণ্ডনীয়। প্ররোচক নাবালক হলে পিতামাতা বা অভিভাবককেই শাস্তি দেওয়ার কথা হয়। সরকার যে-কোন লোককে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী করার ক্ষমতা লাভ করলেন। কোন কোন স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে গৃহের বাইরে বের হতে হলে বিভিন্ন রঙের আইডেন্টিফিকেশন কার্ড বা পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা হ'ল। যেখানে সন্ত্রাসনবাদ প্রবল সেখানেই বিশেষ করে এইরূপ করা হয়। এ সময়কার সন্ত্রাসনবাদ ও সত্যাগ্রহ বা আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য করা হ'ল না। উভয়ই সমানে দমন করার চেষ্টা হ'ল। ২৬শে মার্চ্চ তারিখে সার্ স্যামুয়েল হোর পার্লামেণ্টে স্বীকার করেন যে, অর্ডিন্যান্সগুলি বাস্তবিকই ভীষণ। মানুষের সর্ব্বরকম দৈনন্দিন কর্ম্মের উপরই এ প্রযুজ্য। কিন্তু যেখানে গবর্ণমেণ্টের ভিত্তিই বিপন্ন সেখানে এরূপ উপায় অবলম্বন ছাড়া উপায় নেই! অর্ডিন্যান্স শাসনের প্রকোপ দু'বছর পর্য্যন্ত খুবই ছিল। এর জের ১৯৩৫ সালের পরেও চলেছিল। এই সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসনবাদের সন্দেহে অন্তরীণ হয় সাতাশ শ' বাঙালী যুবক। সন্ত্রাসনবাদীরা লাট সাহেব থেকে আরম্ভ করে জজ মেজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য পদস্থ কর্ম্মচারীদের উপর গুলি চালায় ও কাউকে কাউকে হত্যাও করে। অন্যান্য প্রদেশেও সন্ত্রাসনবাদীদের আবির্ভাব হয়, কিন্তু বঙ্গের তুলনায় তা খুবই কম।

অর্ডিন্যান্স শাসনের ফলে ভারতের সর্ব্বত্র সত্যাগ্রহীরাও প্রকাশ্য পথ ছেড়ে গোপনে কর্ম্ম চালাতে থাকেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন এ সময় কিরূপ বহু বিস্তৃত ও বহু ব্যাপক হয়েছিল তা কারাদণ্ড-ভোগীদের সংখ্যা দৃষ্টেই বুঝা যায়। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ত্রিশ হাজার, ১৯৩০-৩১ সালে প্রথম সত্যাগ্রহের সময় নব্বই হাজার ও ১৯৩২-৩৪ সালের মধ্যে দ্বিতীয় বারে প্রায় দু'লক্ষ অহিংস কংগ্রেসকর্ম্মী কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহ কালে সকল কর্ম্মই ছিল বে-আইনী। বুলেটিন, পত্রী, পুস্তিকা ও রিপোর্ট টাইপ করে সাইক্লোষ্টাইলে লিখে, কখনও-বা মুদ্রিত করে সর্ব্বত্র প্রচার করা হত। এজন্য কত লোক যে কারাবরণ করেন তার ইয়ত্তা নেই। ডাক ও তার বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকার সেন্সর বসালেন। ডাকে ঐ সব চলাচল নিষিদ্ধ। ডাক ও তার বিভাগেরও সুবিধা থেকে কংগ্রেস কর্ম্মীরা এইরূপে বঞ্চিত হ'ল! লবণ আইন ও বন আইন ভঙ্গ, চৌকিদারী টেক্স ও ভূমি কর দান বন্ধ করা বা তার প্ররোচনার অপরাধে বিভিন্ন প্রদেশে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করে। ১৯৩২, এপ্রিল মাসে কংগ্রেস দিল্লীতে হবার কথা ছিল। অধিবেশনের জন্য গঠিত অভ্যর্থনা-সমিতিও বে-আইনী ঘোষিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিগণ দিল্লী রওনা হন। কিন্তু পথি মধ্যে তাঁদের প্রায় সবাইকে আটক করা হ'ল। নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ও দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার হলেন। দিল্লীর ক্লক টাওয়ারে পুলিশের চোখ এড়িয়ে শেঠ রণছোড়লালের সভাপতিত্বে এবারে কোন রকমে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল।

এইরূপে কয়েক মাস অতীত হয়। ইতিমধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন কত ঘটনা ঘটতে লাগল যা নিয়ে শীঘ্রই চার দিকে তোলপাড় উপস্থিত হ'ল। তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনেই মহাত্মা

গান্ধী এ সবের আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি বৈঠকেই বলেছিলেন যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার অছিলায় হিন্দুদের মধ্যে পৃথক্ নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হলে জীবন দিয়েও তা প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করবেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাম্‌সে ম্যাক্‌ডনাল্ড ১৯৩২, ১৭ই আগষ্ট ভাবী ব্যবস্থা-পরিষদ-গুলিতে ভারতবাসীদের নির্ব্বাচন প্রথা ও সদস্য-সংখ্যার একটী ফিরিস্তি প্রকাশ করেন। অ-বর্ণ ও স-বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেও পৃথক্ নির্ব্বাচনেরই ব্যবস্থা হ'ল! মহাত্মা গান্ধী ১৮ই আগষ্ট তারিখে এ ব্যবস্থার প্রতিকার না হলে অনশন ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করলেন। এই সঙ্কল্পের কথা তিনি অবিলম্বে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট মারফত প্রধানমন্ত্রী ও ভারত-সচিবকে জ্ঞাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী গান্ধীজীর পত্রের জবাব দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দৃঢ়তা তখনও তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি।

মহাত্মা গান্ধী পরবর্ত্তী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে অনশন ব্রত আরম্ভ করলেন। ইতিপূর্ব্বে ১২ই সেপ্টেম্বর ভারত-সচিব, প্রধানমন্ত্রী ও গান্ধীজীর মধ্যে লিখিত পত্রাদি প্রকাশিত হ'ল। এসব পাঠে সাধারণে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জান্‌তে পারে। অমনি ভারতময় চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অনশন ব্রত আরম্ভের দিন বোম্বাইয়ে একটি হিন্দু-নেতৃবর্গ সম্মেলন আহ্বান করেন। পরে এই বৈঠক পুণায় স্থানান্তরিত হয়। কারণ মহাত্মা গান্ধী পুণার যারবেদা জেলে বন্দী অবস্থায়ই অনশন ব্রত আরম্ভ করেছিলেন। এম সি রাজা, বি আর আম্বেদকার, শ্রীনিবাসন্, বি এন্ রাজভোজ প্রমুখ অ-বর্ণ হিন্দু নেতা ও মলবীয়, সাপ্রু, জয়াকর, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ স-বর্ণ হিন্দু নেতা মিলিত হয়ে ২৪শে তারিখে নির্ব্বাচন প্রথা ও সদস্য সংখ্যার একটি সর্ব্বসম্মত মীমাংসা করেন। পৃথক্ নির্ব্বাচনের প্রথা রদ হ'ল ও অ-বর্ণদের জন্য আসন সংরক্ষিত করে যুক্ত নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হ'ল। গান্ধীজী

এ মীমাংসায় সম্মতি দিলেন। এর নিরিখে ম্যাক্‌ডনাল্ড সাহেব তাঁর সিদ্ধান্ত সংশোধন করে নিলে ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজী কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মুখে অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করেন।

গান্ধীজী অ-বর্ণ হিন্দুদের নূতন নাম দিলেন 'হরিজন'। হরিজন উন্নয়ন কার্য্যে সর্ব্বত্র বিশেষ সাড়া পড়ে গেল। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীঘনশ্যাম দাস বিরলার সভাপতিত্বে হরিজন সেবক সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। গান্ধীজীর নির্দ্দেশে ভারত-ভৃত্য সমিতির একনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীঅমৃতলাল ঠক্কর সঙ্ঘের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। সংশোধিত সিদ্ধান্তে ব্যবস্থা হ'ল এইরূপ—ভাবী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে হিন্দু সদস্যদের মধ্যে শতকরা আঠারটী আসন হরিজন বা অ-বর্ণ হিন্দুর জন্য সংরক্ষিত থাক্‌বে। নির্ব্বাচিত হিন্দু সদস্যদের মধ্যে মাদ্রাজে ৩০ জন, সিন্দুসহ বোম্বাইয়ে ১৫, পঞ্জাবে ৮, বিহার-উড়িষ্যায় ১৮, মধ্যপ্রদেশে ২০, আসামে ৭, বঙ্গে ৩০, ও যুক্তপ্রদেশে ২০, মোট ১৪৮ জন অ-বর্ণ হিন্দু হবেন। নির্ব্বাচন ব্যবস্থা হ'ল এরূপ—প্রথমে অ-বর্ণ হিন্দুরা প্রতিটি সদস্য পদের জন্য চার জন নির্ব্বাচন করবেন, পরে স-বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দুদের যুগ্ম ভোটে চার জনের ভিতর একজন নির্ব্বাচিত হবেন। মহাত্মাজী জেলের ভিতর থেকে হরিজন কাজ চালাবার জন্য সরকারের নিকট কতকগুলি সুবিধা যাচ্ঞা করেন। বহু লেখালেখির পর ৭ই নবেম্বর গবর্ণমেণ্ট এই সব সুবিধা দিলেন। পুণা থেকে অতঃপর 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অর্ডিন্যান্স শাসনের প্রথম বছর এইরূপে অতিবাহিত হ'ল। ১৯৩২ সালের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আন্‌সারী, গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, কিচলু, রাজাগোপালাচার্য্য একে একে কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে কারারুদ্ধ হন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কারামুক্ত হয়ে আবার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। তাঁর নির্দ্দেশে ১৯৩৩, ৪ঠা জানুয়ারী নানা স্থানে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত

হয়। ফলে বিস্তর ধরপাকড় হ'ল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেও কারারুদ্ধ হলেন। তাঁর স্থলে মাধবশ্রীহরি আনে অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন।

অতঃপর এপ্রিল মাসে কল্‌কাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন করার আয়োজন হয়। সরকার এবারেও অভ্যর্থনা-সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করলেন। মালবীয়জী কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নানা দিকে নূতন করে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিল ও ভারতের দিগ্‌দিগন্ত থেকে অন্যূন বাইশ শ' প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে অধিকাংশই নির্দ্দিষ্ট দিনে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য রওনা হলেন। পথিমধ্যে অনেকে গ্রেপ্তার হন। নির্ব্বাচিত সভাপতি মালবীয়জী, স্বরূপরাণী নেহ্‌রু, দেবীদাস গান্ধী, আনে সকলকেই পথিমধ্যে আটক করা হ'ল। কল্‌কাতার সকল পার্ক পুলিশ অধিকার করে বস্‌ল। চৌরঙ্গীতে ও ধর্ম্মতলার মোড়ে উন্মুক্ত স্থানে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল ও দ্রুত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। একটি প্রস্তাবে হোয়াইট পেপারের তীব্র নিন্দাবাদ করা হয়।

এখানে সরকারের শাসন-সংস্কার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে একটু বলা প্রয়োজন। গোলটেবিল বৈঠক থেকে এসেই মহাত্মা গান্ধী কারাবদ্ধ হন। এর অত্যল্প কাল মধ্যে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গও একে একে ধৃত ও কারারুদ্ধ হলেন। কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই শাসন-সংস্কার কার্য্যে অগ্রসর হন। বিলাতে ১৯৩২ সালে তৃতীয় বার কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতবাসীকে নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক করা হয়। এইরূপ তিন বারে যে-সব আলাপ-আলোচনা হ'ল তার দৃষ্টে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভাবী শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করে ১৯৩৩, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি 'হোয়াইট পেপার' (বা শ্বেতপত্র) প্রকাশ করেন। এ প্রস্তাব সমূহের খুবই বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'ল। হিন্দু-মুসলমান নরমপন্থী-চরমপন্থী

নির্বিশেষে সকলেই এতে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ, কাজেই তাঁদের মতামত পাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে তাঁরা যে এসব প্রস্তাব সমর্থন করতেন না তা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর ১লা মে মহাত্মা গান্ধী যারবেদা জেল থেকে ঘোষণা করলেন যে, তিনি 'হরিজন' উন্নয়ন সম্পর্কে একুশ দিন উপবাস করবেন। ৮ই মে তিনি উপবাস আরম্ভ করেন। ঐ দিনই কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দেন। পরবর্ত্তী ২৯শে মে তিনি যথারীতি ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই একুশ দিনের ভিতর ভারতের দিকে দিকে হরিজন উন্নয়ন কার্য্যে খুবই সাড়া পড়ে যায়। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেব-মন্দিরসমূহ হরিজনদের নিকট উন্মুক্ত হয়। স-বর্ণ ও অ-বর্ণ হিন্দুদের ভিতর পঙ্‌ক্তি ভোজনও নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হ'ল।

গান্ধীজী কারামুক্ত হয়েই সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছ' সপ্তাহের জন্য বন্ধ করেন। তাঁর এ কার্য্যে কোন কোন নেতা মোটেই খুশী হন নি। অসুস্থতা নিবন্ধন বিঠলভাই ঝাভেরী পটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু তখন ভিয়েনায় অবস্থিতি করছিলেন। সেখান থেকে তাঁরা উভয়েই রয়টারের নিকট গান্ধীজীর এ কার্য্যের তীব্র নিন্দা করে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তাঁরা একথাও বলেন যে,গান্ধীজী সঙ্কটকালে দেশকে পরিচালিত করতে অক্ষম, এখন নূতন করে কারো নেতৃত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক। কর্তৃপক্ষও কিন্তু গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ভিন্ন রূপ ভাবলেন।

যা হোক্, গান্ধীজীর উপবাস কাল অন্তে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি আনে মহাশয় আরও ছ' সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য স্থগিত রাখেন। এই সময়ের মধ্যে ১২ই জুলাই থেকে আনে মহোদয় পুণায় কারাগারের বাইরে স্থিত নেতাদের এক সম্মেলনে আহ্বান করেন। পুণার তিলক মন্দিরে ১২ই-১৪ই জুলাই এই সম্মেলনের অধিবেশন হয় ও ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশ থেকে দেড় শ' নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এতে যোগদান করেন। মহাত্মা গান্ধী, সভাপতি আনে ও উপস্থিত নেতৃবর্গ আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, গণ-সত্যাগ্রহ বা আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা অতঃপর বন্ধ থাক্‌বে, তবে যোগ্য লোক নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করতে পারবেন। কংগ্রেসের কার্য্যে গোপন রীতি পরিত্যাগের নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল।

সম্মেলনের পর মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন করেন, কিন্তু আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হওয়ায় এবারেও বড়লাট দেখা করতে সম্মত হলেন না। গান্ধীজীও অতঃপর ব্যক্তিগত আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি বড় সাধের সবরমতী আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে গ্রন্থাগার, আসবাবপত্র সকলই হরিজন সেবক সঙ্ঘকে দান করলেন। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরে এসে আহ্‌মদাবাদের উপকণ্ঠে নর্ম্মদাতীরস্থিত সবরমতীতে এই আশ্রমটি গড়েছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের ভিতর নির্ভীকতার বাণী প্রচারের জন্য বারডোলী তালুকের অন্তর্গত রাসগ্রাম অভিমুখে ১লা আগষ্ট রওনা হন। শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ ও বত্রিশ জন আশ্রমিক তাঁর সঙ্গী হলেন। মহাত্মাজী ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ধৃত হয়ে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৭ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজে ষোল জন সঙ্গীসহ রাজাগোপালাচার্য্য ব্যক্তিগত আইন অমান্যের দায়ে ধৃত হয়ে প্রত্যেকে ছ' বছর কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন। বন আইন ভঙ্গ করতে গিয়ে অস্থায়ী সভাপতি আনে মহাশয় তের জন সঙ্গী সহ কারাবরণ করেন। এবারে পঞ্জাবের সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হন। তাঁর পরে আর কেউ অস্থায়ী সভাপতি বা সর্ব্বাধ্যক্ষ হন নি। ব্যক্তিগত আইন অমান্য সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড়েরও হিড়িক পড়ে গেল।

কারাগারের ভিতর থেকে 'হরিজন' কার্য্য চালাবার জন্য গান্ধীজীকে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যেরূপ সুবিধা দিয়েছিলেন এবারে তা দিতে অস্বীকার করেন। গান্ধীজী এর প্রতিবাদে পুনরায় ২০শে আগষ্ট অনশন আরম্ভ করলেন। সরকার বেগতিক দেখে ২৩শে তারিখে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। গান্ধীজী অতঃপর সঙ্কল্প করলেন যে, এই মুক্ত অবস্থায় এক বছরকাল তিনি 'হরিজন' কার্য্যেই ব্যয়িত করবেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুকেও ৩০শে আগষ্ট তারিখে মুক্তি দেওয়া হয়। জবাহরলাল অতঃপর গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দীর্ঘ তিন বছর পরে তাঁদের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। গান্ধীজী হরিজন কার্য্যের জন্য ৭ই নবেম্বর ভারত-সফর সুরু করেন। ইতিপূর্ব্বে ১২ই অক্টোবর পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করেন, কারণ এ কমিটি তখনও বে-আইনী ঘোষিত হয় নি। ওদিকে মাদ্রাজে আবার নূতন করে স্বরাজ্য-দল গঠনের কথা উঠ্ল।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবর্গ ইতিকর্ত্তব্য স্থির করবার পূর্ব্বেই বিহারে ১৯৩৪, ১৫ই জানুয়ারী প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীতে এ যাবৎ যত বড় বড় ভূমিকম্প হয়েছে, বিহার ভূমিকম্প তার মধ্যে একটি। এ ভূমিকম্পে বিশ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। আর্থিক ক্ষতিও হ'ল অফুরন্ত। ভূমিকম্পের সময় মহাত্মা গান্ধী ছিলেন দক্ষিণ ভারতে। ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই তিনি বিহারের বিধ্বস্ত অঞ্চলে গমন করেন। পণ্ডিত জবাহরলালও এখানে এসে অবিলম্বে উপস্থিত হন। বিহারের জননেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সত্বর কারামুক্ত হয়ে বিপন্ন দেশবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ সম্মিলিত ভাবে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে বোর্ড সাতাশ লক্ষ টাকা তুলেন ও পর্য্যুদস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সেবায় ব্যয়

করতে থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রমুখ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্গতদের দুঃখ বিদূরণের জন্য বিশেষ তৎপর হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কল্‌কাতা করপোরেশনের মেয়র অন্যতম কংগ্রেস-সেবী সন্তোষকুমার বসু মহাশয় অন্যান্য কর্ম্মীদের সহযোগে 'মেয়রস্‌ ফাণ্ড' খুলে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা তুলেন ও সব টাকাই বিপন্নদের সাহায্যার্থে ব্যয় করেন। বড়লাটের ভূমিকম্প ফণ্ডেও এক কোটি টাকার মত সংগৃহীত হয় ও বিহারবাসীদের জন্য ব্যয় করা হয়।

বিহার ভূমিকম্পের কিছুপূর্ব্বে পণ্ডিত জবাহরলাল একবার কল্‌কাতায় আসেন ও কয়েকটি বক্তৃতা করেন। দুটি বক্তৃতায় তিনি মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের ব্যাপার সমূহের উপর মন্তব্য করলেন। তিনি বক্তৃতায় সন্ত্রাসনবাদের নিন্দা করেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারী নীতিরও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। বাংলা সরকার বক্তৃতা দুটি রাজদ্রোহকর বলে গণ্য করে তাঁকে আদালতে অভিযুক্ত করেন। বিচারে তাঁর দু'বছর কারাদণ্ড হ'ল। জবাহরলাল আবার কারাগারে আশ্রয় নিলেন।

মাদ্রাজে যখন স্বরাজ্য দল পুনরুজ্জীবিত করার কথা উঠে, তার কিছু পরে অন্যান্য প্রদেশেও এ সম্পর্কে আলোচনা সুরু হয়। কাতপয় বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কর্ম্মী পরবর্ত্তী ৩১শে মার্চ্চ দিল্লীতে একটি বৈঠকে সমবেত হন। বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মহম্মদ আলী আন্সারী। এখানে স্মরণীয় যে, ডাঃ আন্সারী পূর্ব্বে 'নো-চেঞ্জার' বা পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের অন্যতম নেতা ছিলেন ও পরিষদে সদস্য প্রেরণের বিরোধী ছেলেন। বৈঠক প্রথমেই এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে, যে সকল কংগ্রেসসেবী ব্যক্তিগত আইন-লঙ্ঘনে অপারগ তাঁরা যাতে নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে প্রচারকার্য্য চালাতে সক্ষম হন ও গঠনমূলক কার্য্যে সাহায্য করতে পারেন এজন্য নিখিল-ভারত স্বরাজ্য দল পুনরুজ্জীবিত

করা হোক্। বৈঠকে আরও স্থির হ'ল, ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ভাবী নির্ব্বাচনে সদস্য পদ প্রার্থী হওয়া তাঁদের কর্ত্তব্য ও দুটি বিষয় নির্ব্বাচনের অন্যতম উদ্দেশ্য রূপে গণ্য হওয়া বিধেয়—(১) সকল প্রকার দমন-নীতি মূলক আইন প্রত্যাহার ও (২) হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তথাকথিত গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যে জাতীয় দাবি উত্থাপন করেছেন তা গ্রহণ। দিল্লী-বৈঠকের তরফে অবিলম্বে ডাঃ আন্সারী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই বিহারে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁকে সিদ্ধান্তগুলি জানান। মহাত্মা গান্ধীও আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই আলোচনা করেছিলেন। দিল্লী বৈঠকের সিদ্ধান্ত জেনে ৭ই এপ্রিল তারিখে তিনি এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করলেন। এর ভিতরে তিনি এই মর্ম্মে লিখলেন, 'স্বরাজ লাভের জন্য (কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগের প্রতিকারের জন্য নয়) আরব্ধ আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখাই এখন কর্ত্তব্য। কংগ্রেসসেবিগণ যেন শুধু আমার উপরই এর ভার ছেড়ে দেন।' গান্ধীজী বিবৃতিতে জাতিগঠনমূলক কর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণের উপর বিশেষ জোর দেন।

পরবর্ত্তী ২রা ও ৩রা মে রাঁচিতে কংগ্রেসসেবীদের একটি বড় বৈঠক হয়। বৈঠকে দিল্লীর প্রস্তাবগুলি গৃহীত হ'ল ও ভারতীয় শাসন-তন্ত্র রচনার জন্য কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লী বা গণপরিষদ আহ্বানের কথা হ'ল। গণপষিদের সভ্যগণ পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে সাবালক নর-নারীর ভোটে নির্ব্বাচিত হবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় স্বতন্ত্র স্বরাজ্য দল গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন, কংগ্রেসই উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য পরিচালনা করলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাবে।

পাটনায় পরবর্ত্তী ১৮ই ও ১৯শে মে মালবীয়জীর সভাপতিত্বে নিখিল-

ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা সম্পর্কে মহাত্মাজীর অনুরোধ সমর্থন করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজী স্বয়ং প্রস্তাব করেন যে, যাঁরা কৌন্সিল প্রবেশে বিশ্বাসী তাঁদের বিষয় বিবেচনা করে, আপাততঃ কৌন্সিল প্রোগ্রাম (নির্ব্বাচন ব্যবস্থা, পরিষদে অবলম্বনীয় নীতি নির্ণয় প্রভৃতি) পরিচালনার জন্য পঁচিশ জন সদস্য নিয়ে ডাঃ আন্সারীর সভাপতিত্বে একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করা হোক্। তিনি ও পণ্ডিত মালবীয়জী মিলে এই বোর্ড গঠন করবেন। আনে মহাশয়ের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল। পৃথক্ স্বরাজ্য দলের পরিবর্ত্তে, কংগ্রেস পক্ষ থেকে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হ'ল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একদল কংগ্রেসসেবী—যাঁদের ভিতর যুবকেরাই সংখ্যাধিক্য—গান্ধীবাদের বা গান্ধীজী পরিচালিত কার্য্যে ক্রমে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেন। তাঁদের মুখপাত্রগণ কমিটিতে আইন-অমান্য স্থগিত রাখার ও কৌন্সিল প্রবেশ-নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। গান্ধীবাদ বিরোধীরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই একটি নিজস্ব দল বা সঙ্ঘ গঠনের জন্য ১৭ই মে পাটনায় একটি বৈঠকে সম্মিলিত হন। প্রসিদ্ধ কংগ্রেসসেবী আচার্য্য নরেন্দ্র দেব বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে এ দল নিজেদের সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রী বলে আখ্যা দিলেন। দলের নিয়মতন্ত্র গঠনের ভার একটি কমিটির উপর দেওয়া হ'ল। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে বোম্বাই কংগ্রেসের সময় সমাজতন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয় ও সমাজতন্ত্রমূলক একটি কর্ম্মনীতি তাঁরা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁরা এই নীতি অনুসারেই কার্য্য পরিচালনা করছেন।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যখন আইন-অমান্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল তখন সরকারের পক্ষে দমন-নীতি অনুসরণের বিশেষ

কোন হেতু রইল না। তাঁরা ১২ই জুন তারিখে অধিকাংশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর থেকেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা ও গুজরাটেরও বহু প্রতিষ্ঠান এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ল। হিন্দুস্থানী সেবাদলের উপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হ'ল না। যে সব ব্রিটিশ প্রজা আইন-অমান্যের সময় মিত্ররাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের অনেককে নিজ বাসস্থানে ফিরে আসতেও দেওয়া হ'ল না। তবে রাজবন্দীদের অধিকাংশই মুক্ত হলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল মুক্তিলাভ করেন ১৪ই জুলাই তারিখে। আবদুল গফ্ফর খাঁ আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে কারামুক্ত হন।

বিভিন্ন প্রদেশে নূতন করে কংগ্রেস কমিটী গঠিত হতে লাগ্‌ল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনও আবার সুরু হ'ল। ১২ই, ১৩ই জুন ওয়ার্ধায় ও ১৭ই, ১৮ই জুন বোম্বাইয়ে কমিটির অধিবেশন হয়। কমিটি জাতিগঠন-মূলক কার্য্যে মন দিলেন বেশী করে। শেষোক্ত অধিবেশনে হোয়াইট পেপার ও কম্যুন্যাল এওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। কর্ত্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত ভাবী শাসন-রীতির বিরুদ্ধে সকলেই একমত। তাঁরা এর পরিবর্ত্তে গণপরিষদের দ্বারাই শাসনতন্ত্র রচনা করিয়ে নিতে চান, কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে একদিকে মালবীয়জী ও আনে মহাশয় ও অন্যদিকে ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে মতান্তর দেখা দিল। পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে রচিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (অবশ্য পুণা চুক্তিতে আংশিক সংশোধিত) জাতির সংহতির পক্ষে নিতান্তই ক্ষতিকর। ওয়ার্কিং কমিটি একথা স্বীকার করলেও যেহেতু বিভিন্ন সম্প্রদায় একে বর্ত্তমানে মেনে নিয়েছে সেজন্য 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' ("neither accept nor reject")

নীতি অনুসরণ করাই সমীচীন—এরূপ মত ব্যক্ত করলেন। মালবীয়জী ও আনে মহাশয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে চিরতরে বর্জ্জনেরই পক্ষপাতী। পরবর্ত্তী অধিবেশনে (২৭শে জুলাই) মত-বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা হ'ল, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। আনে মহাশয় ওয়ার্কিং কমিটি ও মালবীয়জী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য পদ ত্যাগ করলেন। তাঁরা অতঃপর ১৮ই ও ১৯শে আগষ্ট তাঁদের মতানুবর্ত্তীদের নিয়ে কল্‌কাতায় একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করেন। বৈঠক কংগ্রেসকে ঐ মত বর্জ্জনের জন্য অনুরোধ জানান। তবে ইতিমধ্যেই উক্ত মত প্রচারের জন্য ও ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচন কল্পে কংগ্রেস নেশনালিষ্ট পার্টি বা কংগ্রেস জাতীয় দল নামে এক সঙ্ঘ গঠিত হ'ল। তাঁরা দেশময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকেন। ওয়ার্ধায় ২৫শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির আর এক অধিবেশন হয়। কমিটি বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এই অনুরোধ জানান, তাঁরা যেন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের মনোনীত প্রার্থীদেরই সমর্থন করেন। তাঁরা এরূপ মতও ব্যক্ত করেন যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও মাধব শ্রীহরি আনে যে যে কেন্দ্রে সদস্য প্রার্থী হবেন সেখানে প্রতিযোগী সদস্য দাঁড় করাতে তাঁরা অনিচ্ছুক।

কংগ্রেস এখন আর বে-আইনী নয়। কাজেই এবারে নির্ব্বিঘ্নে ২৬শে —২৮শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হ'ল। বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় নেতা পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত কে এফ্‌ নরীম্যান অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মূল সভাপতি হলেন। এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল—কর্ত্তৃপক্ষের শাসন-সংস্কারমূলক প্রস্তাব ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে। মালবীয়জী, আনে প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিপক্ষতা সত্ত্বেও ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ব্ব ধরণের

প্রস্তাবই কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল। এবারকার অধিবেশনে আরও কয়েকটি প্রধান প্রস্তাব গৃহীত হয়। পল্লীর কুটীর শিল্প মৃত বা মরণোন্মুখ। এর উন্নতির জন্য ও রক্ষা কল্পে কংগ্রেস 'নিখিল-ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ' গঠনের প্রস্তাব করেন। আর একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত হয়। গান্ধীজী যে বিবৃতিতে আইন-অমান্য স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন তাতে কংগ্রেসের দুর্নীতি দূর করারও কতকগুলি নির্দ্দেশ দেন। তিনি এই নূতন নিয়মতন্ত্র রচনা করে প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বয়ং তা উত্থাপন করেন। এই নিয়মতন্ত্রে কংগ্রেসের প্রতিনিধি সংখ্যা গ্রাম পক্ষে ১, ৪৮৯ ও শহর পক্ষে ৫১১, একুনে ২,০০০ নির্দ্ধারিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হবে, তারা নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে পাঠাবে। কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ অধিবেশনের পূর্ব্বেই ভোট দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি নির্ব্বাচন করবেন। ওয়ার্কিং কমিটি, নিখিল-ভারত ও প্রাদেশিক কমিটিগুলির আয়ুষ্কাল এক বছর। সভাপতি স্বয়ং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশে আইন-কানুন পরিবর্ত্তিত হ'ল বটে, কিন্তু এ সময় হতে তিনি স্বয়ং কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করলেন। তিনি অতঃপর কংগ্রেসের সাধারণ চার আনার সদস্যও রইলেন না!

অধিবেশনের পরেই সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনী প্রচার কার্য্য আরম্ভ হ'ল। বলা বাহুল্য, নির্ব্বাচনে কংগ্রেসই অধিকাংশ কেন্দ্রে জয়লাভ করলেন ও পরিষদে সংখ্যাধিক্য দল বলে পরিগণিত হলেন। কংগ্রেস জাতীয় দলেরও কয়েকজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় বাংলা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, পুণা চুক্তিতেও স-বর্ণ হিন্দুদের প্রতি সুবিচার করা

হয় নি। এজন্য এখানে কংগ্রেস বোর্ডের বিরুদ্ধে জনমত খুবই তীব্র হয়ে উঠে। সুতরাং বাংলা থেকে নেশন্যালিষ্ট বা জাতীয় দলের মনোনীত প্রার্থীরা সকলেই কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার অন্তরীণ শরৎচন্দ্র বসু কলকাতা কেন্দ্র থেকে বিনাবাধায় নির্ব্বাচিত হন। দুঃখের বিষয়, একনিষ্ঠ দেশসেবক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয় নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই মারা যান। তিনিও কংগ্রেস জাতীয় দলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ও বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। কংগ্রেস পক্ষে মনোনীত যুক্তপ্রদেশের সেরওয়ানী ও মধ্যপ্রদেশের অভয়ঙ্করও নির্ব্বাচনের অল্পকাল পরে দেহান্তরিত হন।

পূর্ব্বেকার স্বরাজ্য দলের মত এবারেও কংগ্রেস দল অন্যান্য প্রগতিশীল দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা প্রস্তাবে সরকারকে হারিয়ে দেন। শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তিদান, সীমান্তের খোদাই খিদমতগার বাহিনীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নাকচ প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেস ও অন্যান্য বেসরকারী দলগুলি জয়লাভ করেন। ইতিমধ্যে আর একটি প্রস্তাবেও কংগ্রেসের জিত না হলেও গবর্ণমেণ্টের হার হ'ল। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য হাউস্ অফ্ লর্ডস্ ও হাউস্ অফ্ কমন্সের যুগ্ম কমিটি বসে। এই কমিটির রিপোর্ট জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই সময় কমিটির রিপোর্ট বের হয়। মিঃ জিন্না রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমর্থনে, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় (ফেডার‍্যাল) শাসন-সংস্কার ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিন অংশে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কংগ্রেস ও জাতীয় দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্টের সমর্থন লাভে প্রথম অংশ এবং উক্ত উভয় দলের সমর্থনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ পরিষদে গৃহীত হ'ল।

কংগ্রেস সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা স্থগিত রাখ্‌লেন, ব্যবস্থা-পরিষদেও দমন-নীতির নিন্দামূলক একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, জনমতও এর ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু সরকার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। বাংলা ও সীমান্তের বহু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনীই রয়ে গেল, নেতৃবর্গও স্থানে স্থানে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে লাগ্‌লেন। খাঁ আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ বোম্বাই শহরে একটি খ্রীষ্টান সভায় সীমান্তের কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করায় দু' বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পঞ্জাবেও ডাঃ সত্যপালের এক বছরের কারাদণ্ড হ'ল। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু তখন জেলে। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৪, ডিসেম্বর মাসে পিতার অসুখ দেখ্‌তে এসে তাঁর শ্রাদ্ধ কাল পর্য্যন্তই মাত্র ভারতবর্ষে থাকবার অনুমতি পান। অতঃপর তাঁকে আবার ইউরোপে যেতে হয়। ১৯৩৫, ২১শে মে কোয়েটায় ভীষণ ভূমিকম্প হ'ল ও বিস্তর ধন-প্রাণ বিনষ্ট হ'ল। তখনও কংগ্রেসকে সেবার সুযোগ দেওয়া হ'ল না। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এমন কি মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত, কোয়েটা গমনের অনুমতি পান নি। তাঁরা কংগ্রেস তরফে দূরে থেকেই দুর্গতদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করতে লাগ্‌লেন। ব্যাপক আইন অমান্য স্থগিতের এক বছর পরেও কংগ্রেসের উপর গবর্ণমেণ্টের মনোভাব যে মোটেই অনুকূল হয় নি এসব ব্যাপারে তাই সকলে বুঝলে।

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি রিপোর্টের কথা আগে উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এর বিরুদ্ধে ৭ই ফেব্রুয়ারী নিখিল-ভারত প্রতিবাদ দিবসের অনুষ্ঠান করেন। বিরুদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনের খসড়া রচিত হয় ও পার্লামেণ্টে যথারীতি আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়ে পরবর্ত্তী ২রা আগষ্ট রাজ স্বাক্ষর লাভ করে। এ আইনটি 'গবর্ণমেণ্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া এক্ট, ১৯৩৫' বা 'ভারত-শাসন আইন, ১৯৩৫'

নামে পরিচিত। এ আইন অনুসারেই ১৯৩৭, ১লা এপ্রিল প্রদেশসমূহে নূতন শাসন-বিধি প্রবর্ত্তিত হয়।

ভারত-শাসন আইন স্থূলতঃ দু' ভাগে বিভক্ত—(১) নিখিল-ভারতীয় বা ফেডার‍্যাল, (২) প্রাদেশিক। প্রথম অংশে এই সর্ব্বপ্রথম ব্রিটীশ ভারত ও রাজন্য ভারত এই দু' খণ্ড জোড়া দিয়ে একটি ফেডারেশন বা অখণ্ড সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন হয়। এই অংশ সম্বন্ধে বিস্তর বাদানুবাদ হয়েছে ও অদ্যাবধি ভারতবর্ষে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ভারতবাসী জনসাধারণ ও ভারতীয় নেতৃবর্গ একটি অখণ্ড ভারত-গবর্ণমেণ্ট গঠনের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু যে ভাবে ফেডারেশন গঠনের ব্যবস্থা হয়েছে তাতে প্রায় সকলেরই ঘোরতর আপত্তি। আপত্তির একটি প্রধান কারণ—ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসীদের মত রাজন্য-ভারতের অধিবাসীদের মৌলিক রাষ্ট্রীয় অধিকার ও দেশ শাসনে দায়িত্ব এখনও স্বীকৃত হয় নি। কংগ্রেস প্রথমে রাজন্য ভারতের প্রতি বিশেষ কোন দৃষ্টি দেন নি। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রাজন্য-ভারতে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত না হ'লে ও দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না হ'লে তাদের আন্দোলন চালান আবশ্যক এরূপ মন্তব্য করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তদবধি বিভিন্ন মিত্ররাজ্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনলাভের জন্য আন্দোলন চালাতে তৎপর। বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদে রাজন্যবর্গ বা তাঁদের প্রতিনিধিরাই সভ্য হতে পারবেন, জনগণের প্রতিনিধিরা সভ্য হতে পারবেন না! অধিকন্তু, রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি সংখ্যাও হ'ল অতিরিক্ত। এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় কংগ্রেস কোন মতেই সায় দিতে পারেন না বলে মত প্রকাশ করেন।

ফেডারেশন অংশে পার্লামেণ্ট দু' ভাগে বিভক্ত—কৌন্সিল অফ্

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
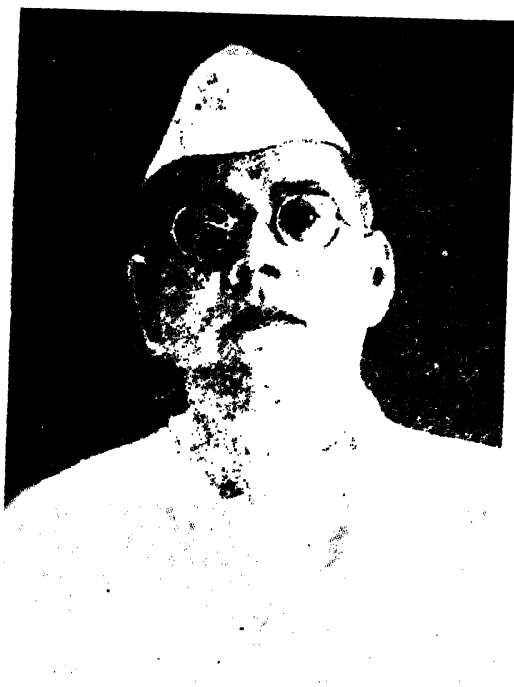
শরৎচন্দ্র বসু

ষ্টেট বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ফেডারাল এসেম্‌্লী বা সম্মিলিত ব্যবস্থা-পরিষদ। প্রথমটিতে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সদস্য ১৫৬, রাজন্য ভারতের পক্ষে ১০৪। কৌন্সিল স্থায়ী সভা, তবে প্রতি তিন বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সভ্য নূতন করে নির্ব্বাচিত হবেন। দ্বিতীয়টিতে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সদস্য থাকবেন ২৫০ জন ও রাজন্য ভারতের পক্ষে ১২৫ জন। এর আয়ুষ্কাল হবে পাঁচ বছর। পৃথক্ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন, আর মোটের উপর এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান। রাজস্বের আশীভাগ সংরক্ষিত থাক্‌বে। বড়লাট তাঁর পরামর্শদাতাদের মত নিয়ে নিজ দায়িত্বে এই অংশ ব্যয় করবেন। দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি, খ্রীষ্টান যাজকবিভাগ প্রভৃতি তিনি নিজ হস্তে রাখ্‌বেন। এ সবের ব্যয়, সিবিল সার্বিসের বেতন, রেলওয়ের ব্যয় সবই সংরক্ষিত বিষয়সমূহের অঙ্গীভূত। স্বতন্ত্র রেলওয়ে বোর্ডের উপর রেলওয়ে সংক্রান্ত সব বিষয় ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এর উপর ব্যবস্থা-পরিষদের কোন হাত থাক্‌বে না। বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানেরও বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হয়। কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে 'ইণ্ডিয়া লিমিটেড' নামক বহুসংখ্যক ব্যবসায় ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ভারত-শাসন আইনে এসব নিরঙ্কুশ। কেন্দ্রীয় রাজস্বের বাকী কুড়ী ভাগ মাত্র মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত।

প্রাদেশিক অংশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে এগারটি গভর্ণর শাসিত প্রদেশে বিভক্ত করা হয়—মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, সিন্ধু। এডেন ও ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে স্বতন্ত্র করা হ'ল। উক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামে

ছুটি করে ব্যবস্থাপক সভা। প্রাদেশিক লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্‌লী বা ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর; লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সিল বা ব্যবস্থাপক সভা স্থায়ী সভা, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি তিন বছর অন্তর নূতন করে নির্ব্বাচিত হবেন। এবারে নিম্ন পরিষদে গবর্ণমেণ্টের সদস্য মনোনয়ন প্রথা রহিত হ'ল। গণতন্ত্র রীতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে মন্ত্রীসভা গঠনের কথা হয়। মন্ত্রীসভা প্রাদেশিক রাজস্বের অধিকাংশই ব্যয় করার ক্ষমতা পান। ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট মন্ত্রীসভাকে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করা হ'ল। আয়-ব্যয়, কর-স্থাপন ও কর-বিলোপ এ সবের ক্ষমতা ব্যবস্থা-পরিষদ লাভ করলেন। তবে সকল বিষয়েই গবর্ণরের ক্ষমতা হ'ল অপরিসীম। আপৎকালে মন্ত্রীসভা ব্যতিরেকেও তিনি শাসন কার্য্য পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করলেন। বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের পূর্ব্বের ন্যায় অর্ডিন্যান্স জারী করারও সুবিধা দেওয়া হ'ল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য প্রাবলিক সার্বিস কমিশন স্থাপনেরও ব্যবস্থা হয়। ডায়ার্কির আমলের অর্থ নৈতিক স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা এবারেও স্বীকৃত হ'ল। বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পৃথক্ নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পার্শ্বের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাবে।

উচ্চতন পরিষদে সদস্য সংখ্যা ধার্য্য হ'ল—মাদ্রাজে অন্যূন ৫৪ ও অনধিক ৫৬, বোম্বাইয়ে—অন্যূন ২৯ ও অনধিক ৩০, বাংলায়—অন্যূন ৬৩ ও অনধিক ৬৫, যুক্তপ্রদেশে—অন্যূন ৫৮ ও অনধিক ৬০, বিহারে—অন্যূন ২৯ ও অনধিক ৩০, আসামে—অন্যূন ২১ ও অনধিক ২২। প্রত্যেক প্রদেশে গবর্ণরগণের হস্তে কয়েকটি সদস্য পদ পূরণের ক্ষমতা রইল। এবার নির্ব্বাচক সংখ্যা হ'ল প্রায় তিন কোটি বা মোট লোকসংখ্যার শতকরা চৌদ্দ জন। ছ' আনা চৌকীদারী টেক্স দিলেই ভোটাধিকারের ক্ষমতা জন্মে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি মাত্রেই ভোটাধিকার লাভ করলে।

১। প্রদেশ	২। মোট	৩। মোট— (সাধারণ)	৪। সংরক্ষিত— (সাধারণ)	৫। পার্ব্বত্য	৬। শিখ	৭। মুসলমান	৮। এংলো-ইণ্ডিয়ান	৯। ইউরোপীয়	১০। ভাঃ খ্রীষ্টান	১১। ব্যবসা, শিল্প ইত্যাদি	১২। জমিদার	১৩। বিশ্ব-বিদ্যালয়	১৪। শ্রমিক	১৫। সাধারণ— (নারী)	১৬। শিখ (নারী)	১৭। মুসলমান (নারী)	১৮। এংলো-ইণ্ডিয়ান (নারী)	১৯। ভারতীয় খ্রীষ্টান— (নারী)
মাদ্রাজ	২১৫	১৪৬	৩০	১	—	২৮	২	৩	৮	৬	৬	১	৬	৬	—	১	—	১
বোম্বাই	১৭৫	১১৪	১৫	১	—	২৯	২	৩	৩	৭	২	১	৭	৫	—	১	—	—
বাংলা	২৫০	৭৮	৩০	—	—	১১৭	৩	১১	২	১৯	৫	২	৮	২	—	২	১	—
যুক্ত প্রদেশ	২২৮	১৪০	২০	—	—	৬৪	১	২	২	৩	৬	১	৩	৪	—	২	—	—
পঞ্জাব	১৭৫	৪২	৮	—	৩১	৮৪	১	১	২	১	৫	১	৩	১	১	২	—	—
বিহার	১৫২	৮৬	১৫	৭	—	৩৯	১	২	১	৪	৪	১	৩	৩	—	১	—	—
মধ্যপ্রদেশ বেরার	১১২	৮৪	২০	১	—	১৪	১	১	—	২	৩	১	২	৩	—	—	—	—
আসাম	১০৮	৪৭	৭	৯	—	৩৪	—	১	১	১১	—	—	৪	১	—	—	—	—
উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ	৫০	৯	—	—	৩	৩৬	—	—	—	—	২	—	—	—	—	—	—	—
উড়িষ্যা	৬০	৪৪	৬	৫	—	৪	—	—	১	১	২	—	১	২	—	—	—	—
সিন্ধু	৬০	১৮	—	—	—	৩৩	—	২	—	২	২	—	১	১	—	১	—	—

নূতন পথে

(১৯৩৬ — ১৯৩৯)

সরকারী দমন-নীতি, বিশ্বব্যাপী মন্দা, কৃষি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও সাধারণের অর্থকষ্ট প্রভৃতি নানা কারণে দেশবাসীর মনে অবসাদের ছায়া এসে পড়ে। এ সময় নূতন কিছু অবলম্বন জাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শাসন-তন্ত্রের সমালোচনা ও নিন্দায় ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুখর। কংগ্রেস, মোস্‌লেম লীগ, উদারনৈতিক সঙ্ঘ প্রভৃতি সকলেই এর উপর বিরূপ। তথাপি এ দ্বারা জাতির ভাগ্য বদল হতে পারে কি না তার পরীক্ষার জন্য সকলেই যেন খানিকটা উদ্‌গ্রীব। এই অবস্থার মধ্যে আমরা এখন ১৯৩৬ সালে উপনীত হলাম।

কিন্তু আর একটি বিষয়ও এসময় ভারতবাসীকে অতি মাত্রায় সজাগ করে তোলে। ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযান তখনও শেষ হয় নি। দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতিগুলি ডিক্টেটর মুসোলিনীর সাম্রাজ্য স্পৃহা দেখে হতভম্ব হ'ল। ইটালীর এই অভিযান ইউরোপীয় রাজনীতিরও পট পরিবর্ত্তন করে দেয় সম্পূর্ণ ভাবে। ভের্সাই সন্ধির পর ফ্রান্স ইটালীর প্রতি ও ব্রিটেন জার্ম্মাণীর প্রতি সুপ্রসন্ন হয়। মুসোলিনীর ফাসিষ্ট নীতি ইটালীতে সুপ্রতিষ্ঠ হবার পরই এরই অনুকরণে হিটলার জার্ম্মানীতে নাৎসীবাদ চালু করেন ও নিজ ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থের খাতিরে জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব এতকাল জীইয়ে রাখা হয়। মুসোলিনীর সাম্রাজ্য-স্পৃহা যখন প্রকাশ পেল তার পর থেকে ব্রিটেন ফ্রান্স উভয়ই তার বিরোধিতা করতে সুরু করে। তারা মুসোলিনীকে রাষ্ট্রসংঘ মারফত আর্থিক অবরোধের হুমকি

দেখায়, কিন্তু কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু করে নি ; মুসোলিনী আবিসিনিয়া অধিকারই করলেন শেষ পর্য্যন্ত। তবে এতে ফল হ'ল এই যে, মুসোলিনী অতঃপর এদের উপরে আর নির্ভর না করে হিটলারের দিকেই মুখ ফেরালেন। হিটলারেরও উদ্দেশ্য মুসোলিনীর মত, তাই নূতন অবস্থার সুযোগ নিয়ে তিনি কালবিলম্ব না করে মুসোলিনীর সঙ্গে সন্ধি করলেন। নূতন রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে পূর্ব্বে মনান্তর ঘটে। এবার মুসোলিনীরই আগ্রহাতিশয়ে অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সন্ধি নিষ্পন্ন হ'ল। অষ্ট্রিয়ার পক্ষে এই সন্ধি কিরূপ কাল হয়েছে তা সকলেই জানেন। অতঃপর মুসোলিনী ও হিটলারের মধ্যে আঁতাত ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। সুতরাং বলা যায়, বর্ত্তমান ইউরোপীয় প্রলয় কাণ্ডের সূত্রপাত প্রকৃত প্রস্তাবে ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযানের মধ্যেই আরম্ভ হয়।

মুসোলিনীর আবিসিনিয়া অভিযানে ভারতবাসীর উপরও তার প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতির দিক দিয়ে ভারতবাসীর পক্ষে এর প্রতিবাদ করা ত নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু ইটালীর আবিসিনিয়া বিজয়ের ফলে তাকে ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়। আবিসিনিয়ায় যেসব ভারতবাসী ব্যবসা ও শিল্প কর্ম্মে লিপ্ত ছিল অতঃপর তাদের অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটল। যুদ্ধ শেষে তাদের আবিসিনিয়া থেকে একরূপ রিক্ত হস্তেই স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। কংগ্রেস তাই জনমতের প্রতিভূ স্বরূপ উচ্চ আদর্শ এবং স্বার্থ উভয় দিক দিয়েই ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযানের প্রতিবাদ করতে বাধ্য হন।

১৯৩৫ সালে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হয় নি। ১৯৩৬, ১২ই থেকে ১৪ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হলেন ডক্টর ভগবান দাসের পুত্র শ্রীপ্রকাশ। সভাপতি

নির্ব্বাচনের মধ্যে কিঞ্চিৎ নূতনত্ব ছিল। এপর্য্যন্ত যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত, সে প্রদেশ থেকে কাউকে সভাপতি পদে বরণ করা হ'ত না। এবারেই প্রথম এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রুকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়।

জবাহরলাল স্বভাবতঃই তাঁর অভিভাষণে সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করলেন। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও পরাধীনতা, অন্যান্য দরিদ্র ও পরাধীন দেশের মতই, সাম্রাজ্যবাদেরই কুফল। 'সোশ্যালিজ্‌ম্' বা সমাজতন্ত্রবাদই এর একমাত্র প্রতিষেধক বলে জবাহরলাল মত প্রকাশ করেন। তবে কংগ্রেস সর্ব্বসাধারণের—বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, একারণ কারও ক্ষতির কারণ না হয়ে দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি বিধানই এর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতি কল্পে কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের যোগ সাধনের কতকগুলি উপায়ও বাৎলে দিলেন। সমসাময়িক বৈদেশিক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তেও তিনি ভারতবাসীকে অনুরোধ জানালেন। কংগ্রেস মঞ্চ থেকে ভারত-বাসীর তরফে ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র-নীতি নির্দ্ধারণের তাগিদ এল এই প্রথম। ভারতবর্ষ কোন সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে যোগ দিতে পারে না—পণ্ডিত জবাহরলাল সর্ব্বপ্রথম এই ঘোষণা করলেন। তিনি শাসন-সংস্কার আইনেরও তীব্র নিন্দা করলেন।

এবারকার প্রধান প্রস্তাব শাসন-সংস্কার সম্পর্কে। শাসন-সংস্কারের বদলে ভারতবাসীদের ভিতর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত গণ-পরিষদ বা কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলী গণতন্ত্রমূলক শাসন-কাঠামো রচনা করবে—মূল প্রস্তাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করা হ'ল। তবে নূতন শাসন-সংস্কার আইনানুসারে শীঘ্রই যে সাধারণ নির্ব্বাচন হবে তাতেও যোগদানের ব্যবস্থা হ'ল। এইজন্য একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ডও গঠন করা হয়।

নূতন আইনের আমলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে মতদ্বৈধতা প্রকাশ পাওয়ায় এ বিষয়ের মীমাংসা স্থগিত থাকে। সাধারণ দেশবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন হেতু গণ-সংযোগকমিটি এবারে প্রথম গঠিত হ'ল। বিভিন্ন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য একটি পররাষ্ট্র বিভাগও এবারে খোলা হয়। পণ্ডিত জবাহরলালের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় এ বিভাগগুলি সুষ্ঠু রূপে পরিচালিত হতে থাকে। কংগ্রেস আবিসিনিয়ার বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সুভাষচন্দ্র বসু দীর্ঘকাল প্রবাস জীবনের পর ৮ই এপ্রিল স্বদেশে ফিরে আসেন, কিন্তু বোম্বাইয়ে পদার্পণ করা মাত্রই ১৮১৮ সালের তিন আইনে আবার বন্দী হন। এর প্রতিবাদেও প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

ভারতবাসীরা 'সিবিল লিবার্টিজ্' বা 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' কথার সঙ্গে তেমন পরিচিত নন্। জবাহরলাল তাঁর অভিভাষণে এ সম্প্রর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ও বলেন যে, নানা আইনের বেড়াজালে, বিশেষতঃ গত কয় বছরের অর্ডিন্যান্সী শাসনের ফলে সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার, সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ প্রভৃতি আধুনিক সভ্য মানুষের অত্যাবশ্যক কর্ম্মে ভীষণ বিঘ্ন ঘটান হয়েছে। এ অধিকারগুলি ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি 'সিবিল লিবার্টিজ্ ইউনিয়ন' বা ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর চেষ্টায় পরে এ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিভিন্ন প্রদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এতে যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সঙ্ঘের সম্মানিত সভাপতি ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কর্ম্মী-সভানেত্রী হন।

এই সময়, অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে, দিল্লীতে নিখিল ভারত মোস্লেম সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হয় ২৯শে মার্চ্চ তারিখে, আর বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত মোস্লেম লীগের চতুর্বিংশ অধিবেশন হয় ১১ই ও ১২ই

এপ্রিল তারিখে। কংগ্রেসের মত উভয় সম্মেলনেই কৃষক সমাজের দুর্দ্দশার কথা বর্ণিত হয় ও তাদের দুর্গতি দূর করার জন্য আবেদন জানান হয়। উভয় সম্মেলনই কিন্তু শাসন-সংস্কারের সুযোগ নিতে বদ্ধপরিকর। এদের ভিতরে মোস্লেম লীগ চরমপন্থী, কাজেই এখানে শাসনতন্ত্রের তীব্র নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। মোস্লেম লীগের সভাপতিত্ব করেন লক্ষ্ণৌ চীফকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সার্ ওয়াজির হাসান। তিনি একজন প্রগতিশীল রাজনীতিক। অভিভাষণে তিনি বলেন যে, লীগের কর্ম্মাদর্শ হবে (১) সাবালক ভোটদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত সদস্যদের নিয়ে খাঁটি গণতন্ত্রমূলক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা, (২) দমন-নীতিমূলক আইনসমূহ প্রত্যাহার ও সভাসমিতি প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র পরিচালন ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দান, (৩) সত্বর কৃষক সমাজকে আর্থিক সাহায্য প্রদান, শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ও নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরীতে শ্রমিকদের প্রত্যহ আট ঘণ্টা কার্য্য কাল নির্দ্ধারণ এবং (৪) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান। এবারে লীগের আদর্শ স্থিরীকৃত হয়—ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কর্ম্মাদর্শে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এ সময়েও বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

ভারতের অন্যতম জবরদস্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডনের কার্য্যকাল এপ্রিল মাসে শেষ হয়। লর্ড লিন্লিথগো তাঁর স্থলে অভিষিক্ত হন। লর্ড লিন্লিথগো ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নন্। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে রয়্যাল কৃষি কমিশনের সভাপতি রূপে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। নূতন শাসনতন্ত্র আইন রচনায়ও তাঁর হাত অনেকখানি, কারণ যে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনের খসড়া রচিত, তিনি ছিলেন তার সভাপতি। নূতন আইন চালু করবার পক্ষে তিনিই

যোগ্য ব্যক্তি—এই বিবেচনায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠান। উপযুক্ত পাত্রেই যে এ দায়িত্ব ভার অর্পিত হয়েছিল তা লর্ড লিন্‌লিথগোর পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে বুঝা যায়। ভারতবর্ষে পদার্পণ করেই তিনি তাঁর কর্ম্মপ্রণালী সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রদান করেন।

এর পরেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে নির্ব্বাচনের জন্য তোড়জোড় সুরু হয়। ২২শে ও ২৩শে আগষ্ট বোম্বাই শহরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। এ অধিবেশনের প্রধান কার্য্য হ'ল নির্ব্বাচন-পত্র রচনা। যে-সব উদ্দেশ্য সাধনে কংগ্রেস এযাবৎ সর্ব্বস্ব পণ করেছেন তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই নির্ব্বাচন-পত্র রচিত হ'ল। দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন, কৃষকদের ভূমিস্বত্ব নির্ণয়, শ্রমিকদের মজুরীর নিম্নতম হার নির্দ্ধারণ, মাদক দ্রব্য নিবারণ, হরিজনদের সর্ব্ব-প্রকার অসুবিধার বিলোপ সাধন প্রভৃতি কর্ম্মতালিকার অন্তর্নিহিত বিষয়। এ অধিবেশনেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ প্রস্তাবের আলোচনা স্থগিত রইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও জবাহরলাল নেহ্‌রুর চেষ্টায় কংগ্রেস ও কংগ্রেস জাতীয় দলের মধ্যে আপোষ-রফা হ'ল ও উভয় দলই একযোগে নির্ব্বাচন কার্য্য চালাতে অঙ্গীকৃত হলেন। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন করে নির্ব্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। মোস্‌লেম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তরফেও একই ধরণের ব্যবস্থা হ'ল।

মহাত্মা গান্ধী অতঃপর কংগ্রেসের একজন প্রধান পরামর্শদাতা রূপে কাজ করতে থাকেন। তাঁরই নির্দ্দেশে কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শহরে না করে গ্রাম অঞ্চলে করা সাব্যস্ত হয়। সাধারণ দেশবাসীদের সঙ্গে কংগ্রেসের আঙ্গিক যোগসাধনই তাঁর এরূপ নির্দ্দেশের মূল কারণ।

প্রথমবার এই কংগ্রেস হ'ল ১৯৩৬, ২৭শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ফৈজপুর নামক গ্রামে। লক্ষাধিক গ্রামবাসী মাটিতে বসে নীরবে কংগ্রেসের কর্ম্মপ্রণালী অনুধাবন করছেন,—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেতাদের বিতর্ক ও বক্তৃতা মন দিয়ে শুনছেন—এ দৃশ্য কংগ্রেসের ইতিহাসেও সত্যসত্যই অভিনব! এবারেও কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করলেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্রু। ইতিপূর্ব্বে পর পর দু'বছর কেউ কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হন নি।

পণ্ডিত জবাহরলাল পূর্ব্ববারের মত এবারেও জগতে দুই বিপরীত শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনিকবাদ এবং গণতান্ত্রিকতা ও সমাজতান্ত্রিকতার সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেন ও বলেন যে, ভারতবর্ষেও এই দুই বিপরীত শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। ভারতবর্ষের দুঃখ-দারিদ্র্যের সমাধানের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্র গঠন আবশ্যক। কিন্তু স্বাধীনতা বা দেশ শাসনে পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে এ দু-ই অসম্ভব। কাজেই প্রথমে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দিকেই অবহিত হতে তিনি সকলকে অনুরোধ জানান। বৈদেশিক রাজনীতি তাঁর অভিভাষণের একটি প্রধান অঙ্গ। মে মাসের আরম্ভে আবিসিনিয়া ইটালীর নিকট স্বাধীন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। এর কিছু পরে জুলাই মাসে স্পেনে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং ফাসিষ্ট ও সমাজতান্ত্রিক দু' দলে গলা কাটাকাটি সুরু করে। জবাহরলাল এসব বিষয় উল্লেখ করে সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। সীমান্ত সমস্যা, সমর আশঙ্কা, গণ-সংযোগ, কৃষকদের দুরবস্থার প্রতিকার, নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বহু প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হ'ল। নির্ব্বাচনের পর সদস্যদের নিয়ে দিল্লীতে একটি কন্ভেনশন বা সম্মেলন আহ্বানেরও প্রস্তাব হয়। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবারেও স্থগিত থাকে।

১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই এগারটি প্রদেশে নূতন নিয়মে নির্ব্বাচন সম্পন্ন হয়। সাধারণ লোকের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। দীর্ঘকাল পরে আবার তারা নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজে পেলে। কংগ্রেস নির্ব্বাচনে যোগ দেওয়ায় তাদের উৎসাহ যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল। নির্ব্বাচনর শেষে সকলেই বুঝ্‌লে, জনগণের চিত্তে কংগ্রেসের আসন অটল। নির্ব্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস তরফে হ'ল—মাদ্রাজে ১৫৯, শতকরা ৭৪; বিহারে ৯৮, শতকরা ৬৫; বঙ্গে ৫৬, শতকরা ২২; মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ৭০, শতকরা ৬২.৫; বোম্বাইয়ে ৮৬, শতকরা ৪৯; যুক্তপ্রদেশে ১৩৪, শতকরা ৫৯; পঞ্জাবে ১৮, শতকরা ১০.৫; উপ-সীমান্ত প্রদেশে ১৯, শতকরা ৩৮; সিন্ধুতে ৭, শতকরা ১১.৫; আসামে ৩৩, শতকরা ৩১; উড়িস্যায় ৩৬, শতকরা ৬০। এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছ'টি প্রদেশেই কংগ্রেসী সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন।

পরবর্ত্তী ১৭ই ও ১৮ই মার্চ্চ দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে এবারে নির্দ্দেশ দেওয়া হ'ল যে, প্রাদেশিক লাটগণ যদি এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা আইনানুগ শাসন সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না তা হলে কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্ভব। প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেসী দলের নেতাকে লাট সাহেবের প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

ইতিমধ্যে প্রাদেশিক লাটগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করলেন। কংগ্রেসী দলের শর্ত্ত পূরণে লাট সাহেবরা অসম্মত হওয়ায় ছ'টি প্রদেশে সংখ্যালঘু দল থেকে 'ঠিকা' মন্ত্রীসভা ১লা এপ্রিল তারিখেই গঠন করা হ'ল। আইন অনুযায়ী প্রথম ছ'মাসের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থার ভার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁরা আইন অনুসারে

সব ব্যবস্থা করলেন। এখানে বাংলার কথা একটু বিশেষ ভাবে বলি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় আড়াই শ’ সদস্য পদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে হিন্দুদের দেওয়া হ’ল মাত্র আশীটি। আবার পুণা চুক্তি দ্বারা এই আশীটির মধ্যে ত্রিশটিই অনুন্নতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল! কাজেই বঙ্গের স-বর্ণ হিন্দুরা—যাঁরা এতকাল ভারতবর্ষে রাজনীতি চর্চ্চা অবিরাম ভাবে চালিয়েছেন ও যাঁদের ঐকান্তিক দুঃখভোগ ভারতের উন্নতির মূলে — এইরূপ কোণঠাসা হয়ে রইলেন। তথাপি কংগ্রেসী সদস্যরা (অধিকাংশই স-বর্ণ হিন্দু) নির্ব্বাচনে দল হিসাবে প্রত্যেক দলের চেয়েই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করলেন। অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গেও মুসলমানদের মধ্যে একাধিক দল। এখানে মোসলেম লীগ ও কৃষক-প্রজা দলই মুসলমানের পক্ষে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শেষোক্ত দলের নেতা মিঃ ফজলুল হক দরিদ্র কৃষক সমাজের প্রতিভূরূপে বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। নানা বাধা সত্ত্বেও কৃষক-প্রজা দলের প্রায় পঞ্চাশ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হতে সমর্থ হন। নির্ব্বাচনের পর মোসলেম লীগ ও কৃষক-প্রজা দলে আপোষ হয় ও পরিষদে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলে গণ্য হন। মিঃ ফজলুল হকের নেতৃত্বে অতঃপর মন্ত্রী-সভাও গঠিত হয়। পরে কৃষক-প্রজা দলের কতিপয় সদস্য আলাদা হয়ে এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন। পঞ্জাবে মুসলমান, শিখ ও হিন্দু সদস্য নিয়ে ইউনিয়নিষ্ট বা সম্মিলিত দল গঠিত হয়। কিন্তু এ দলের প্রায় সবই মুসলমান, এজন্য একে মুসলমান দলও বলা চলে। পঞ্জাবেও এই দল থেকেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। আসাম, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশেও যথারীতি মন্ত্রীসভা গঠিত হ’ল।

এগারটি প্রদেশের ভিতরে ছ’টিতেই কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট উপস্থিত হ’ল। এ নিয়ে কিছুকাল

আলোচনা ও বিতর্ক চল্‌ল খুব। আর এতে যোগ দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী, লর্ড লোথিয়ান, ভারত-সচিব লর্ড রোনাল্‌ড্‌সে, বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো ও প্রাদেশিক লাটগণ। বড়লাট ২১শে জুন তারিখের শেষ বিবৃতিতে এই মর্ম্মে বলেন যে, শাসন-ব্যাপারে প্রাদেশিক লাটগণ মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে আইনতঃ বাধ্য। বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কেও মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। লাটসাহেবরা যদি একান্তই কোন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ না করে কার্য্য করেন তা হ'লে সে দায়িত্ব তাঁদেরই। মন্ত্রীসভা যে এজন্য দায়ী নন্‌ তা তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারবেন। ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে ৭ই জুলাই তারিখে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং উড়িষ্যায় কংগ্রেসী দল মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে পরবর্ত্তী ৩রা সেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেখানেও খাঁ আবদুল গফ্‌ফর খাঁর ভ্রাতা ডাক্তার খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। কংগ্রেস দীর্ঘকাল গবর্ণমেণ্টের বিরোধী বা বিপক্ষ দল হিসাবে কার্য্য করেছেন। এবারে দেশ-সেবায় নূতন পথ গ্রহণ করলেন।

মুক্তিলাভের পরও আবদুল গফ্‌ফর খাঁর পঞ্জাবে ও সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। নির্ব্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর উপরকার সকল রকম বিধি নিষেধ তুলে নেওয়া হ'ল। বঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুও ১৭ই মার্চ্চ কারামুক্ত হলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাগুলির প্রথম কার্য্য হ'ল নির্যাতিত দেশকর্ম্মীদের মুক্তিদান। তাঁরা অহিংস ও হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত অপরাধীদের মধ্যে তারতম্য না করে, নূতন ব্যবস্থার অনুকূল আব্‌হাওয়া সৃষ্টির জন্য, একে একে সকলকে মুক্তি দিতে লাগ্‌লেন। যুক্তপ্রদেশে

কাকোরী বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হ'ল। কিন্তু এর পরেই এক সঙ্কট উপস্থিত হয়। নানাস্থানে মুক্তিপ্রাপ্ত কাকোরী বন্দীরা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হওয়ায় আমলাতন্ত্র মন্ত্রীসভার উপর বিরূপ হয়ে উঠল এবং হিংসাত্মক কর্ম্মে লিপ্ত অবশিষ্ট বন্দীদের মুক্তি দানে সম্মতি দিতে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের লাটগণ অস্বীকার করলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)। উভয় প্রদেশের মন্ত্রীসভাই এজন্য পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রাদেশিক লাটদ্বয় ও মন্ত্রীসভার মধ্যে আপোষ-রফা হয় ও বন্দীগণ একে একে কারামুক্ত হন। অন্যান্য কংগ্রেসী প্রদেশেও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ে ও গুজরাটে অসহযোগ ও আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টার সময় যে-সব জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল প্রথমে আপোষে পূর্ব্ব মালিকদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। যে-সব জমি আপোষে ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি আইন করে তা প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা হ'ল। বঙ্গে কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হ'ল। কিন্তু এখানকার অবস্থা অন্যান্য প্রদেশ হতে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। বঙ্গে তখন অন্যূন দু' হাজার রাজবন্দী ও বহুশত রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন। এখানে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের সত্বর মুক্তিদান আশা করা যায় না। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং তাদের সম্পর্কে অনুকূল ব্যবস্থা করার ভার গ্রহণ করলেন। তিনি এ বছর অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে, অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিন সপ্তাহ বঙ্গে অবস্থিতি করেন ও হক-মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সকল রাজবন্দী ও অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির পথ সহজ করে দেন। রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে বিলম্ব হওয়ায় বঙ্গে খুবই বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছিল।

কংগ্রেসীদলের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রথম অধিবেশন হ'ল কলকাতায় ২৯-৩১শে অক্টোবর। কমিটি মন্ত্রিত্ব

গ্রহণ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলেন। ইউরোপে যেমন জার্ম্মানী ও ইটালী, এশিয়ায় তেমনি জাপান খুবই সাম্রাজ্যলোভী হয়ে উঠে। এ বছর জুলাই মাসে জাপান চীন অভিযান সুরু করে, এবং ভবিষ্যতে এ কিরূপ নৃশংস ও মারাত্মক হয়ে উঠ্‌বে, আরম্ভেই তা সূচিত হয়। কমিটি জাপানের এই আত্মঘাতী সাম্রাজ্য-বিস্তার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। একটি কারণে এই অধিবেশন বাঙালীর পক্ষে বিশেষ মর্ম্মান্তিক হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'-এর অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হ'ল এ সময়। প্রকাশ, মুসলমান সমাজের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কংগ্রেস এরূপ করতে বাধ্য হন।

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের কয়েক দিন পূর্ব্বে লক্ষ্মৌয়ে ১৫-১৮ই অক্টোবর তারিখে মোস্‌লেম লীগের পঞ্চবিংশ অধিবেশন হয়। লীগের স্থায়ী সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না এবারে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস-সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলালের সঙ্গে মিঃ জিন্নার হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্পর্কে আলোচনা হয়। কিন্তু মিঃ জিন্নার তরফে কোন সদুত্তর নাপাওয়ায় আলোচনা পরিত্যক্ত হয়। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় লীগ নেতৃবর্গ ভীষণ অশ্বস্তি অনুভব করেন, ও বিভিন্ন প্রস্তাবে ও বক্তৃতায় তা ব্যক্ত হয়। মুসলমান নেতাদের মনোভাব পরে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে এখানেই কিছু বলে রাখি।

দীর্ঘকালের সাধনায় ও সকল ধর্ম্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর লোকের আন্তরিক সহযোগিতায় কংগ্রেস ভারতবর্ষে একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হয়েছে। মিঃ জিন্না এ মতবাদ গ্রহণে রাজী নন্। তিনি কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলেই গণ্য করেন ও অহরহ এই দাবি জানান যে, মোস্‌লেম লীগই সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র মুখপাত্র ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস লীগকে এরূপ সম্মান দিতে অসম্মত

হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সমস্ত আপোষ-রফা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠায় লীগ বদ্ধপরিকর। যে-সব অঞ্চলে মুসলমানেরা জনসংখ্যায় অধিক সে-সব অঞ্চলে স্থায়ী প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা লীগের লক্ষ্য। লীগের উদ্দেশ্য কতটা কার্য্যকরী হবে বলা যায় না। সদ্য গত মহাসমরে লীগও অসহযোগের মনোভাব অবলম্বন করে। তবে তাঁর ছিল উদ্দেশ্য অন্যবিধ। তার মতে ভারতবর্ষে কংগ্রেস তথা হিন্দু প্রাধান্য নিরাকৃত না হলে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা অসম্ভব। তাঁদের প্রধান অভিযোগ—কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি নাকি মুসলমানদের উপর অযথা অত্যাচার করেছেন! কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ ও প্রাদেশিক লাটগণ একযোগে ও বিভিন্ন ভাবে এর প্রতিবাদ করলেও লীগ নেতারা অভিযোগ করা থেকে নিরস্ত হন নি।

নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভা কয়েক বছর যাবৎ হিন্দু স্বার্থ রক্ষা কল্পে আন্দোলন চালিয়েছেন। এবারে এর বার্ষিক অধিবেশন হ'ল ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৩৭) থেকে ১লা জানুয়ারী (১৯৩৮) তারিখে আহ্মদাবাদ শহরে। বিনায়ক দামোদর সভারকর হলেন এবারকার সভাপতি। সভারকর মহাশয়ের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে কিছু জেনেছি। তিনি আটাশ বছর নির্ব্বাসন ও অন্তরীণ জীবন যাপন করে নূতন শাসন-তন্ত্রের আমলে সদ্য মুক্তিলাভ করেছেন। অখণ্ড স্বাধীন-ভারত প্রতিষ্ঠা তাঁর আদর্শ। ভারত-মাতার সেবায় জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার —তিনি অভিভাষণে এই মত ব্যক্ত করেন। মোস্লেম লীগের মত হিন্দু মহাসভাও বর্ত্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন হ'ল ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গুজরাটের প্রসিদ্ধ বারডোলী তালুকের অন্তর্গত হরিপুরা গ্রামে। এতে সভাপতিত্ব করলেন সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়। সুভাষচন্দ্র দীর্ঘকাল

ইউরোপে প্রবাস জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। কাজেই ইউরোপীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। ইউরোপের সঙ্কটের কথা তিনি অভিভাষণে বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। ফেডারেশন বা সম্মিলিত রাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি প্রগতিশীল ভারতীয়দের মনোভাব এতটা বিরূপ কেন সে সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেন, "বাণিজ্য ও অর্থবিষয়ক রক্ষাকবচ-গুলিই এই পরিকল্পনার প্রতি আমাদের বেশী করে বিদ্বিষ্ট করেছে। কেবলমাত্র দেশরক্ষা বিভাগে ও পররাষ্ট্র-নীতিতেই যে জনগণের অধিকার থাক্‌বে না তা নয়, রাজস্বের অধিকাংশ ব্যয়ের উপর জনপ্রতিনিধির বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব থাক্‌বে না! যুক্তরাষ্ট্রের আমলে বড়লাট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত অংশের জন্য রাজস্বের শতকরা আশী ভাগই ব্যয়িত হবে! এ ছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে বোর্ড আগেই গঠিত হয়েছে। এগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নামমাত্র অধীনে নিয়ন্ত্রিত হবে। রেল বিভাগের উপর আইন-সভার কোন কর্ত্তৃত্ব থাক্‌বে না। দেশের আর্থিক উন্নতির মূলকথা যে মুদ্রানীতি ও বাট্টার হার সে-সব নিয়ন্ত্রণেও আইন-সভার হাত নেই। অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করার স্বাধীনতাটুকুও ভারতীয় আইন-সভাকে দেওয়া হয়নি। ভারত-শাসন আইনে বাণিজ্য সংক্রান্ত যে-সব রক্ষাকবচ আছে তাতে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য যখন ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল হবে তখন কোনরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ঐ গুলিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। যদি কখন কোন ব্রিটিশ পণ্যের উপর অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধার্য্য করার বা আমদানী সম্পর্কে কড়াকড়ি ব্যবস্থা করার প্রস্তাব হয় তা হলে বড়লাট তা অগ্রাহ্য করতে পারবেন!"

কংগ্রেসে ফেডারেশন বা ভাবী যুক্তরাষ্ট্র বর্জ্জন সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাষ্ট্রপতি পরে স্বয়ং এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান।

সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতি থাকা কালে একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ে কার্য্য

আরম্ভ হয়। আধুনিকতম বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু ও সুভাষচন্দ্র বসু সম্পূর্ণ একমত। তাঁরা মনে করেন, গান্ধীজী পরিকল্পিত কুটীর শিল্প দ্বারা সমাজের উপকার হলেও সমগ্র জাতির ধনসম্পদ, শক্তি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদন একান্ত আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে ভারতের অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা এই বিষয়ে আলোচনা সুরু করেন। জবাহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এ বিষয়ের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করে ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের আনুকূল্যে একটি নেশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি স্থাপন করেন। নেশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়সমূহে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ ও কয়েকটি মিত্ররাজ্যের প্রতিনিধিও কমিটিতে যোগদান করেন। কমিটির প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৩৮, ডিসেম্বর মাসে। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ১৯৩৯ সালের ৪ঠা থেকে ১৭ই জুলাই। পরিকল্পনা কমিটির কার্য্য সাতটি প্রধান ভাগে বিভক্ত—(১) কৃষি, (২) শিল্প, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ও কার্য্যক্ষমতা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, (৪) রাস্তাঘাট ও জিনিষপত্র চলাচলের ব্যবস্থা, (৫) বাণিজ্য ও রাজস্ব, (৬) জনকল্যাণ, (৭) শিক্ষা। সাতাশটি সব-কমিটির উপর এসব বিষয়ের কার্য্য-ভার ন্যস্ত। জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধেই অনুসন্ধান ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও অধ্যাপক কে টি শা পরিকল্পনা কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু সভাপতি। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও কমিটি কোন দল বিশেষের প্রতিষ্ঠান নয়। সর্ব্ব শ্রেণীর ও সর্ব্ব দলের বিশেষজ্ঞগণ নিয়েই এ গঠিত।

প্রদেশসমূহে আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিবেশী করদ ও মিত্র রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উন্মেষ হয়। তালচর, ঢেনকানাল, রাজকোট, মহীশূর, হিন্দোল, জয়পুর, রণপুর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যসমূহে জনগণ স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করে ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বরণের জন্য প্রস্তুত হয়। দেশীয় প্রজা-সম্মেলনের অধিবেশনে সমষ্টিগত ভাবে স্বায়ত্ত-শাসন ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি হতে থাকে।

সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব একই সময় প্রবর্ত্তিত না হওয়ায় এর একটি কুফল অবিলম্বে সকলের দৃষ্টিগোচর হ'ল। আমরা সমগ্র ভারতের অধিবাসী—এ বোধের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিকতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিহারে বিহারী ও প্রবাসী বাঙালীদের এই সমস্যা এসময় প্রবল হয়ে উঠে। কংগ্রেস এ বছর এ সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করেন—(১) ভারতের যে-কোন প্রদেশে যে-কোন ভারতীয় চাকুরী পাওয়ার অধিকারী, (২) বিহারী ও বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্য করা হবে না, (৩) ডোমিসাইল্‌ড্‌ সার্টিফিকেট্‌ (বিহার-প্রবাসী প্রমাণ করার জন্য নেওয়া হত) প্রথা লোপ, (৪) চাকুরি প্রার্থীকে আবেদনে বিহারী বা ডোমিসাইল্‌ড্‌ উল্লেখ, (৫) কোন প্রদেশে কোন ব্যক্তি দশ বছর বাস করলেই ঐ প্রদেশে ডোমিসাইল্‌ড্‌ বলে গণ্য।

বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সুকৃতি দেখে আসামেও জনমত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার অনুকূল হয় ও এ বছর কংগ্রেস দলের নেতা গোপীনাথ বরদলুই অন্যান্য দলের সহযোগে কংগ্রেস কোয়ালিশন বা সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কংগ্রেসের কার্য্যতালিকা এক ও অভিন্ন। কাজেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহের কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বত্র প্রায় একই ধাঁচের হ'ল। তবে তাঁরা প্রধানতঃ এই চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে

কার্য্য আরম্ভ করেন—(১) ভূমিকর ও রাজস্ব হ্রাস, (২) প্রজাকে ভূমি স্বত্ব দান, (৩) ঋণ ও বাকী খাজনার দায় থেকে প্রজাদের মুক্তি, (৪) কলকারখানার শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কার্য্যকাল ও মজুরির নিম্নতম মান নির্দ্ধারণ। কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে, এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নানা আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। মাদক দ্রব্য নিবারণ কংগ্রেসের একটি প্রধান কার্য্য। এ বছর মাদ্রাজের সালেম জেলায় মাদক-দ্রব্য বিক্রয় ও সেবন নিষিদ্ধ হয়। স-বর্ণ অ-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দানের জন্য মাদ্রাজ মন্ত্রীসভা বিশেষ অবহিত হন। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রীসভার আনুকূল্যে প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর লোকদের শিক্ষা দান প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এই উপলক্ষ্যে বিহারের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সৈয়দ মাহ্‌মুদের কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবর্ণমেণ্ট ও শিক্ষিত সাধারণ উভয়েই এ বিষয়ে অবহিত হন ও নানা স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে নিরক্ষরদের অক্ষর জ্ঞান দানের চেষ্টা চলে। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং অবৈতনিক ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তনের জন্য 'ওয়ার্ধা স্কীম' নামে একটী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে বিস্তর আলোচনা ও বিতর্ক হয়। শেষে ভারত-গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পনার মূলনীতি গ্রহণ করে এ সম্বন্ধে ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বালগঙ্গাধর খেরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীসভা গ্রাম উন্নয়ন কার্য্যে বিশেষ ভাবে মন দেন ও একটি বিভাগ খুলেন। এই বিভাগের অধীন প্রচারকগণ দূর দূরান্তের গ্রামে ও পল্লীতে জনসেবায় নিয়োজিত হন।

এ বছর হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মান অংশ দাবি করায় সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে মহাসমর আসন্ন হয়ে পড়ে। সোভিয়েট রুশিয়াকে বাদ দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জার্ম্মানী এই চতুঃশক্তির

প্রতিনিধিবর্গ মিউনিকে এক বৈঠকে সম্মিলিত হন ও একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে হিটলার কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুরক্ষিত সীমান্ত এইরূপে অবিলম্বে হিটলারের করতলগত হয়। তখনই অনেকে অনুমান করেছিলেন, মিউনিক চুক্তি অদূর ভবিষ্যতে শুধু চেকোশ্লোভাকিয়া বিনাশেরই কারণ হবে না, যে মহাসমরকে ঠেকিয়ে রাখ্‌বার জন্য এরূপ করা হ'ল তাও অতি শীঘ্র আরম্ভ হবে! আর এর ঠিক এক বছর পরেই ইউরোপে দ্বিতীয় মহাসমর বেধে যায়।

কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে ভারতবর্ষে ফেডারেশন প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টিত হন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এ উদ্দেশ্য প্রচার কার্য্যও আরম্ভ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা আন্দোলন সুরু করলেন। তিনি এ কার্য্যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের পূর্ণ সমর্থন পেলেন। সুভাষচন্দ্রের সহযোগী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণও প্রস্তাবিত ফেডারেশনের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে তাঁরা প্রদেশসমূহের মত কেন্দ্রেও যে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে সীমা নির্দ্দেশের আশ্বাস পেলে একে একেবারে অগ্রাহ্য করবেন না, এমনও কিন্তু বুঝা যায় নি। তাই সুভাষচন্দ্র নিজ মত চালু করবার জন্য সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই পর বছরের সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচনপ্রার্থী হলেন। পরে তিনি ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাদ হয় তাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, সুভাষচন্দ্র ঐরূপ সন্দেহ বশেই স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচন প্রার্থী হন!' প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল। সুতরাং সুভাষচন্দ্র বসু ও ডাঃ পট্টভি সীতারামায়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্রেরই জয় হ'ল মহাত্মা গান্ধী নির্ব্বাচনের পরে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি বলেন যে, নির্ব্বাচনে সুভাষচন্দ্রের জয় তাঁরই পরাজয়!

অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য পদত্যাগ করেন। কংগ্রেসের যাবতীয় কার্য্যভার সুভাষচন্দ্রের উপর পড়ে। এবারে ১৯৩৯ সালে মধ্যপ্রদেশের ত্রিপুরী গ্রামে কংগ্রেস হওয়ার কথা। কংগ্রেস অধিবেশনের অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধী কাথিয়াবাড়ের রাজকোট নামক একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যে অনশনব্রত আরম্ভ করেন। রাজকোটে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন কল্পে সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল ও রাজা ঠাকুর সাহেবের মধ্যে যে চুক্তি হয়, ঠাকুর সাহেবের তরফে তা ভঙ্গ করাই গান্ধীজীর অনশনের কারণ। আবার ভারতময় বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো সফর বাতিল করে দিল্লীতে ফিরে এলেন ও এ বিষয়ের মীমাংসার জন্য নিজে হস্তক্ষেপ করলেন। তাঁরই চেষ্টায় ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ মরিস্ গাওয়ার মধ্যস্থ হতে স্বীকৃত হন। কয়েক দিনের মধ্যেই কাগজপত্র পরীক্ষা করে তিনি ঠাকুর সাহেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করে রায় দেন।

এরই মধ্যে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল, ১০ই--১২ই মার্চ্চ। তখন মহাত্মাজী অনশনব্রত ভঙ্গ করলেও কংগ্রেসে যোগদান সমীচীন বিবেচনা করলেন না। কংগ্রেসের উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ, মায় সমাজ-তন্ত্রীরা, গান্ধীজীর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর ইচ্ছা মত ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য মনোনয়ন করার নির্দ্দেশ দিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীতে উপস্থিত হলেও অসুস্থতা নিবন্ধন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করতে পারেন নি, তাঁর স্থলে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ সভাপতির কার্য্য করেন।

কংগ্রেস যখন উক্তরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন তখন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গান্ধীজীর পরামর্শ ব্যতিরেকে কার্য্য করা অসম্ভব হ'ল। উভয়ের মধ্যে মত সাম্য ঘটাবার চেষ্টা হ'ল। কিন্তু এ চেষ্টা ফলবতী হ'ল না। কাজেই,

পরবর্ত্তী ৩০শে এপ্রিল ও ১লা মে তারিখে কল্‌কাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে, শেষ চেষ্টা হবার পর, সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। তখন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত হন। এ ব্যাপার নিয়ে বঙ্গদেশে তীব্র বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' বা 'অগ্রগামী দল' গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য কংগ্রেসের ভিতরে থেকে বামপন্থীদের সংহত করা ও ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন চালান। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে জন আন্দোলন উপস্থিত করায় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে সুভাষচন্দ্র তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন।

কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি কংগ্রেসের আদর্শ সম্মুখে রেখে কাজ করে চললেন। বোম্বাই শহরে মাদক দ্রব্য ১৯৩৯,১লা আগষ্ট বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। এখানে বলা আবশ্যক যে, সিন্ধু মন্ত্রীসভা কংগ্রেসী না হয়েও খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্সের নেতৃত্বে কংগ্রেসের কর্ম্ম-ধারা অনেকক্ষেত্রে অনুসরণ করেন। জনসাধারণের কল্যাণার্থ বাংলার অকংগ্রেসী হক-মন্ত্রীমণ্ডলও প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করান ও প্রজাকে ভূমিস্বত্ব দান করেন। ওদিকে ফেডারেশন প্রতিষ্ঠারও নানা আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি বিপদ এসে শাসনতান্ত্রিক কার্য্যে ভীষণ বিঘ্ন ঘটাল।

কিছু আগে মিউনিক চুক্তির কথা বলেছি। এর পর ছ' মাস যেতে না যেতেই হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া ছত্রভঙ্গ করেন ও অধিকাংশই নিজ করায়ত্ত করেন। হিটলারের প্রধান সহায় মুসোলিনী। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এঁদের উদ্দেশ্য ব্যাহত করবার জন্য অগত্যা সোভিয়েট রুশিয়ার শরণাপন্ন হ'ল। দীর্ঘ তিন মাসকাল কথাবার্ত্তা ও আলোচনা চালিয়েও পরস্পরের মধ্যে সাহায্যমূলক কোন চুক্তি নিষ্পন্ন হ'ল না। ওদিকে হিটলারের

দাবি খুবই বেড়ে যায়। তিনি তখন পোলণ্ডেরও খানিকটা দাবি করে বসলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোলণ্ড রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিল। পরে অকস্মাৎ ২৩শে আগষ্ট (১৯৩৯) তারিখে জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে বিধিবদ্ধ অনাক্রমণাত্মক চুক্তির কথা প্রকাশিত হ'ল। পরবর্ত্তী ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোলণ্ড আক্রমণ করেন। এর দু'দিন পরেই ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে।

এইরূপে ব্রিটেন যুদ্ধরত হওয়ায় সাম্রাজ্যের উপর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। বিভিন্ন ডোমিনিয়ন একে একে ব্রিটেনের পক্ষে লড়বার প্রতিশ্রুতি দিলে।

গ্রেট ব্রিটেন মহাসমরে লিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষকেও সমর-রত দেশ বা রাষ্ট্র বলে ভারত-সরকার ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের মতামত গ্রহণ আবশ্যক বিবেচনা করলেন না, উপরন্তু সামরিক অবস্থা বিবেচনা করে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ও এ উদ্দেশ্যে অর্ডিন্যান্স জারী হয়। ফেডারেশন প্রতিষ্ঠাও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। কংগ্রেস বরাবরই ফাসিষ্ট ও নাৎসী নীতির বিরোধী। হিটলার মুসোলিনী যখনই বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হয়েছেন তখনই তাঁরা এ কার্য্যের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিপন্ন রাষ্ট্রদের সাহায্য দানেও তৎপর হয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি তাঁদের কার্য্যে এ যাবৎ তেমন প্রতিবন্ধকতা করেন নি। বর্ত্তমানে তাঁরা গণতন্ত্রনীতির দোহাই দিয়েই সমরে অবতীর্ণ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ সময় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, কংগ্রেস গণতন্ত্রনীতির পক্ষপাতী ও নাৎসী-তন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও গণতন্ত্র বজায় রাখার জন্য যুদ্ধরত। কাজেই ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা ব্রিটেনের অবশ্য কর্ত্তব্য। তা হলেই কংগ্রেস তাকে স্বচ্ছন্দচিত্তে সাহায্য করতে

পারবেন। কমিটি ব্রিটেনের নিকট থেকে এ উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বিবৃতি দাবি করেন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো কংগ্রেস, মোস্‌লেম লীগ, হিন্দু মহাসভা, উদারনৈতিক সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তরফে ও স্বতন্ত্রভাবে অন্যূন বায়ান্ন জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি অতঃপর একটি বিবৃতি দান করে বলেন যে, বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরামর্শ সভা গঠন করবেন। আসল উদ্দেশ্যের বিষয় কিন্তু তাতে বিশেষ পরিস্ফুট হয় নি। তিনি পরে অবশ্য তাঁর শাসন-পরিষদ বর্দ্ধিত করে জন-প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করেন, কিন্তু এর সঙ্গে এই শর্ত্ত জুড়ে দেন যে, কংগ্রেসকে এই সদস্য-সংখ্যা ও প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নেই মিঃ জিন্নার সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২২শে অক্টোবর কর্তৃপক্ষকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য জানিয়ে মন্ত্রীসভা-গুলিকে পদত্যাগ করতে নির্দ্দেশ দেন। নবেম্বর মাসের মধ্যেই একে একে তাঁরা পদত্যাগ করেন। অতঃপর মাত্র আসামেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। অন্য সাতটি প্রদেশে গবর্ণরগণ বিশেষ ক্ষমতা বলে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী পোলণ্ডের এই আকস্মিক বিপদে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে এই বিবৃতি দেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্স গণতন্ত্র নীতির প্রতিষ্ঠা কল্পে যে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে তাতেও তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তবে তিনি একথাও সঙ্গে সঙ্গে জানান যে, জগতে হিংসার পথ মুক্তির পথ নয়, হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসাই প্রযুক্ত হয়ে থাকে, অহিংসাই জগতকে আসন্ন ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করতে পারে। গান্ধীজী অবশ্য স্বীকার করেন, জগতে এরকম অবস্থা এখনও উপনীত হয় নি। সুতরাং প্রত্যেককেই দেশ-রক্ষার দিকে অবহিত হতে হবে।

আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে পোলণ্ড জয় করতে হিটলারের

পক্ষকালও লাগে নি। বর্ত্তমান যন্ত্র-চালিত বাহিনী ও বিমানপোত কিরূপ সর্ব্বধ্বংসী ও স্বল্পকালে বিজয়ী হতে পারে আবিসিনিয়া যুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে। চীন এবং স্পেনেও তার মহড়া দেখা গিয়েছে। জার্ম্মানীর অগ্রগতির মধ্যেই রুশিয়া পোলণ্ডের সীমা অতিক্রম ক'রে এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ব্রেষ্টলিটভ্স্ক্ শহরে জার্ম্মানী ও রুশিয়ার মধ্যে পোলণ্ড ভাগবাঁটোয়ারা মূলক একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হয়। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মান-সোভিয়েট সন্ধির মধ্যে পোলণ্ডের ভাগবাঁটোয়ারার কথাও ছিল। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে ব্রিটিশ প্রাধান্য বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে হিটলার ওখানে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পক্ষপাতী হয়। রুশিয়াও উভয়ের মধ্যবর্ত্তী লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় নিজ প্রভাব বিস্তার করে ফিন্ল্যাণ্ডের দিকে দৃষ্টি-ক্ষেপ করে। ফিন্ল্যাণ্ড কয়েকমাস যাবৎ রুশিয়াকে প্রতিরোধ করলেও শেষ পর্য্যন্ত তাকে রুশ প্রভাব স্বীকার করে নিতে হয়। এ রকম অবস্থায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে হিটলারের বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় পন্থা অবলম্বন আবশ্যক হয়ে পড়ে। জার্ম্মানী ম্যাগ্নেটিক মাইন বসিয়ে বহু ব্রিটিশ ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাণিজ্যপোত বিনষ্ট করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়েই আথিক অবরোধ দ্বারা জার্ম্মানীকে বাগ মানাতে ব্যস্ত থাকে। ইউরোপের প্রতিটি ঘটনায়ই ভারতবর্ষের উপর প্রতিক্রিয়া হতে লাগল।

জীবন-আহবে

(১৯৪০-১৯৪৫)

ইউরোপে সংগ্রাম ক্রমশঃ ব্যাপক হয়ে পড়ল। ভারতবর্ষে প্রাদেশিক লাটগণ কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগের পর শাসনভার নিজ নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যে বিবৃতি দান করেন তার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এর পর পুনরায় ১৯৪০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বড়লাটের সাক্ষাৎকার ঘটে, কিন্তু এতেও কোন ফলোদয় হয় নি। গান্ধীজী এর পর একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, কংগ্রেসের দাবি এবং বড়লাটের প্রস্তাব উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। কংগ্রেস চান—বাইরের কারো অপেক্ষা না রেখে সমগ্র জাতির প্রতিভূ-স্বরূপ নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে, আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চান—ভারতের শাসন-তন্ত্র নিয়ন্ত্রণে তাঁদের চরম অধিকার। কাজেই উভয়ের মধ্যে যখন এতই মূলগত বা নীতিগত মতানৈক্য বিদ্যমান তখন আর আপোষ-রফার সম্ভাবনাই রইল না। এই ব্যর্থতার মধ্যে বিহারের রামগড়ে ১৯শে ও ২০শে মার্চ্চ তারিখে মৌলানা আবুলকালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ত্রিপঞ্চাশৎ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অভিভাষণে বিহার তথা রামগড়ের ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রিক গুরুত্ব বর্ণনা করেন। ভারতবর্ষের অন্যতম আদিম অধিবাসী বা আদিবাসী অধ্যুষিত এই রামগড় আর্য্য ও আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির মিলন-ক্ষেত্র।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বাঙালীদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। গত শতাব্দীর প্রথম পাদে জেলার প্রধান শহর ছিল রামগড়। এখানে কিছুকাল রাজা রামমোহন রায় মেজিষ্ট্রেট জন ডিগবির দেওয়ানের কার্য্য করেছিলেন।

মূল সভাপতি মৌলানা আবুলকালাম আজাদ অভিভাষণে ভারতের রাষ্ট্রীয় দাবির কথা উল্লেখ করেন। মহাসমরে কংগ্রেসের যোগদানে বিরতির কারণসমূহ বিশদভাবে ব্যক্ত করে বলেন যে, ভারতীয় মহাজাতির আত্মকর্তৃত্ব লাভ হলে তাঁরা জগৎ থেকে সাম্রাজ্যবাদী তথা নাৎসী অত্যাচার ও সংঘর্ষের বিলোপসাধনে ধন জন দিয়ে প্রাণপণে সানন্দে যোগদান করবে। ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনরূপ নির্যাতন বা অপমানের আশঙ্কা আদবে নেই, তাঁর স্বসম্প্রদায় মুসলমানদের ত নেই-ই। তিনি অভিভাষণের উপসংহারে যা বলেন তা সত্যসত্যই প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে

"গত এগার শ' বৎসরের ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের (হিন্দু ও মুসলমান) উভয়েরই কীর্ত্তিগৌরবে সমুজ্জ্বল। আমাদের ভাষা, কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ঘটনা—এর সপক্ষে উভয়েরই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। জাতীয় জীবনের এমন কোন দিকই নাই যার উপর এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ছাপ না পড়েছে। আমাদের ভাষা পৃথক্ ছিল, কিন্তু কালে আমরা এক ভাষাতেই কথা বলতে শিখেছি; আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু পরস্পরের উপরে পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হওয়ায় শেষে উভয়ের সংমিশ্রণে এ-সবই অভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের আগেকার পোষাক পুরাতন চিত্রে দৃষ্ট হয়, আজকাল কাউকে আর এরূপ পোষাকে দেখা যায় না। এই সম্মিলিত সম্পদ আমাদের এক-

জাতীয়তারই প্রতীক। আমরা এটি পরিত্যাগ করে সে যুগে ফিরে যাব না যেখানে আমরা স্বতন্ত্র ছিলাম। যদি কোন হিন্দু মনে করেন যে, হাজার বছর পূর্ব্বেকার হিন্দুর জীবন-যাপন প্রণালী আবার ফিরিয়ে আনবেন তবে বল্‌তে হবে এ তাঁর দিবাস্বপ্ন। আবার যদি কোন মুসলমান মনে করেন যে, হাজার বছর পূর্ব্বে ইরাণ ও মধ্য-এশিয়ার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সঙ্গে করে এনেছিলেন তা সবই তিনি জাগিয়ে তুলবেন তবে তিনিও সমান ভ্রান্ত, তাঁর এই ভ্রান্তি যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। এই দুইটি চিন্তাই অস্বাভাবিক, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। আমার দৃঢ় মত এই, ধর্ম্মে এরূপ পুনরুজ্জীবনের অবকাশ আছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এর কোনই স্থান নেই।"

এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব থেকেই শুধু ধর্ম্মে নহে, আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে, ভাষায়-সাহিত্যে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং মুসলমান দুই স্বতন্ত্র জাতি বলে যে প্রচারকার্য্য চলেছে, আর মিঃ জিন্নার মত একজন প্রগতি-অভিমানী নেতা যে এর সমধিক প্রশ্রয় দিচ্ছেন, সভাপতির মঞ্চ থেকে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ তার সমুচিত জবাব দিলেন। কংগ্রেস অধিবেশন কালে রামগড়ে ভীষণ বারিপাত হয়, কিন্তু উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলী অবিচলিত চিত্তে নিষ্ঠার সঙ্গে এক হাঁটু জলের ভিতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধিবেশনের কার্য্য সমাধা করলেন। এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল "ভারতবর্ষ এবং যুদ্ধ-সমস্যা"। এই সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার আলোচনায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু, বল্লভভাই পটেল, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। প্রস্তাবটি দীর্ঘ হলেও এর মূল অংশের মর্ম্ম এখানে দিলাম:

"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ না করে ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা এবং সমরকালে ভারতবর্ষের ধন জন

ব্যবহার করায় জাতির প্রতি ভীষণ অবমাননা প্রদর্শন করেছেন বলে কংগ্রেস মনে করেন। কোন আত্মসম্মানবিশিষ্ট স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি এরূপ অবমাননা সহ্য করতে পারে না। সম্প্রতি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পক্ষে যে-সব ঘোষণা করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় গ্রেট ব্রিটেন আদতে তার সাম্রাজ্যবাদী মতলব হাসিল করবার জন্য এবং তার সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ শক্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করবার জন্যই এ যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের সম্পদ-শোষণের উপরই এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

"এরূপ ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন না; কারণ যুদ্ধের সাহায্য মানে যখন শোষণকার্য্যেরই অপ্রতিহত স্থায়িত্ব রক্ষা। সুতরাং কংগ্রেস ভারতীয় সৈন্যদের দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করানো এবং ভারত হতে যুদ্ধের জন্য ধন জন নেওয়া সমর্থন করেন না। এখানে যে-সব সৈন্য সংগৃহীত হবে বা টাকাকড়ি সংগ্রহের ব্যবস্থা হবে তা ভারতের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য বলে গণ্য হবে না; কংগ্রেস সমর্থিত কোন প্রতিষ্ঠানই ধন জন বা জিনিষপত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারেন না।

"কংগ্রেস ঘোষণা করছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন ভারতবাসীর নিকট কিছুই গ্রাহ্য হবে না। সাম্রাজ্যবাদের কক্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অসম্ভব। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে ডোমিনিয়ম ষ্টেটস বা অনুরূপ শাসন-তন্ত্র ভারতবর্ষের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য, একটি বিরাট্ জাতির পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর। অনুরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কর্ম্মপদ্ধতি ও আর্থিক সংস্থার সঙ্গে বেঁধে রাখতে চাইবে। ভারতের অধিবাসীরাই ভারতবর্ষের শাসন-তন্ত্র নিরূপণ এবং জগতের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। সাবালক মাত্রেরই ভোটে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদ দ্বারা একার্য্য সম্ভবে।

"কংগ্রেসের আরও অভিমত এই যে, সাম্প্রদায়িক মিলনের সব রকম চেষ্টা করতে প্রস্তুত থাকলেও তাঁরা মনে করেন গণ-পরিষদের মারফতই সত্যকার মিলন স্থাপন সহজসাধ্য। কারণ এই গণ-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বা সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিরা পরস্পর সম্মত হয়েই সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হবেন। আর যদি কোন বিষয়ে তাঁরা একমত না হতে পারেন তবে 'ট্রাইব্যুনাল' বা সালিশী দ্বারা যথাযোগ্য মীমাংসা করা চলবে। গণ-পরিষদ ব্যতিরেকে কোন ব্যবস্থাই চরম বলে গণ্য হবে না। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় ঐক্যই হ'ল ভারতবর্ষের শাসন-তন্ত্রের ভিত্তি। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করা এবং জাতি হিসাবে ভাগ করার সম্পূর্ণ বিরোধী। কংগ্রেসের এমন শাসন-তন্ত্রই সর্ব্বদা লক্ষ্য যেখানে ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয়েরই পূর্ণ স্বাধীনতা এবং উন্নতির সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হবে এবং যা দ্বারা সামাজিক অন্যায় দূরীভূত হয়ে ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ গঠিত হবে।

"ভারতের স্বাধীনতার পথে ভারতীয় রাজন্যবর্গের বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশীর বিঘ্ন ঘটাবার কোনরূপ অধিকার আছে বলে কংগ্রেস স্বীকার করেন না। সামন্ত রাজ্যেই হোক বা প্রদেশেই হোক, ভারত-শাসনের কর্তৃত্ব জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত থাক্‌বে এবং তাদের স্বার্থের নিকট অন্য সব স্বার্থ অবনমিত থাক্‌বে। কংগ্রেস বিশ্বাস করেন, সামন্ত রাজাদের নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তা ব্রিটিশেরই সৃষ্টি এবং এর কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হতে পারে না যত দিন ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ বিদেশী শাসনমুক্ত বলে ঘোষিত না হবে। ভারতবাসীর স্বার্থের সঙ্গে বিদেশী স্বার্থের সংঘাত না ঘটলেই এ সমস্যার শীঘ্র মীমাংসা হবে।

"কংগ্রেস প্রদেশসমূহ হতে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা সরিয়ে এনেছেন। যুদ্ধে

কোনরূপ সহযোগিতা না করা আর বিদেশীর শাসন-বিমুক্ত হবার জন্য কংগ্রেসের সঙ্কল্প কার্য্যকরী করার জন্যই তাঁরা এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। এই প্রারম্ভিক কার্য্যের স্বাভাবিক পরিণতি হ'ল আইন অমান্য; সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে এ কার্য্যের উপযুক্ত করে তোলা হলেই বা কোন সঙ্কট সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেই কংগ্রেস নিঃসন্দেহচিত্তে এ কার্য্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কংগ্রেস গান্ধীজীর ঘোষণার প্রতি কংগ্রেস-সেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, তিনি যদি নিয়ম শৃঙ্খলা ঠিকঠিক অনুবর্ত্তিত হচ্ছে এবং স্বাধীনতা সঙ্কল্পের গঠনমূলক কার্য্যাবলী অনুসৃত হচ্ছে বলে বুঝতে পারেন তবেই আইন অমান্য পরিচালনার গুরুভার গ্রহণ করবেন।

"কংগ্রেস জাতি বর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়েরই সেবা ও প্রতিনিধিত্বের অভিলাষী, কেননা কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমগ্র জাতিরই জন্য। সুতরাং কংগ্রেস এই আশা পোষণ করেন যে, এই আন্দোলনে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ই যোগদান করবে। আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য সমগ্র জাতির মধ্যেই ত্যাগের ভাব উদ্রিক্ত করা।"

রামগড় অধিবেশন দ্বিতীয় দিনেই পরিসমাপ্ত হ'ল। এখানে আর একটি সভার কথাও উল্লেখযোগ্য। সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লকে'র পক্ষে কংগ্রেস-নিরপেক্ষ ভাবে রামগড়েই একটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। সর্ব্বপ্রকারে যুদ্ধকার্য্যে বাধাদানই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

প্রতিনিধিবর্গ নূতন সঙ্কল্প নিয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরে গেলেন। সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হ'ল। বিভিন্ন প্রদেশে এসব বিতরিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী নাৎসী-অত্যাচার বিরোধী, অথচ এই সময়কার যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করতে পারলেন না। কারণ সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের শাসন-কর্ত্তৃত্ব ভারতবাসীর হাতে অর্পণ করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ নারাজ। গান্ধীজী এবারে কংগ্রেস-প্রস্তাব অনুযায়ী আইন অমান্য আরম্ভ

সুভাষচন্দ্র বসু

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

করলেন বটে, কিন্তু এবারকার আন্দোলন নিবদ্ধ রাখ্‌লেন নির্দ্দিষ্ট লোকের মধ্যে। তবে এতে করেও বিস্তর লোক কারারুদ্ধ হ'লেন। বিভিন্ন স্থলে বিস্তর কংগ্রেস-সেবী কারাবরণ করলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ এবং প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার মন্ত্রীগণও এ থেকে বাদ পড়েন নি। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও আদেশে সর্ব্বত্রই শান্তিপূর্ণ ভাবে এই ব্যক্তিগত আইন অমান্য চল্‌তে লাগ্‌ল। বর্ষশেষে দেখা গেল, একত্রিশ জন প্রাক্তন মন্ত্রী, তিন শত কুড়ি জন আইন-সভার সদস্য, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এগার জন সদস্য ও নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির একশত চুয়াত্তর জন সভ্য কারাবদ্ধ হয়েছেন। কংগ্রেস ১৯৪১ সালের প্রথমে আন্দোলন স্থগিত করলেন। কিন্তু কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদ ৩রা জানুয়ারী গ্রেপ্তার হন এবং আঠার মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই বৎসরের নবেম্বর মাসে সত্যাগ্রহ বন্দী-সংখ্যা দাঁড়াল সাত হাজার।

ওদিকে ইউরোপে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক একদিকে ব্রিটেনের উপর যেমন বোমা বর্ষিত হতে লাগল, অন্যদিকে ফ্রান্স জার্ম্মানীর কবলিত হ'ল। ব্রিটেন কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন নূতন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করলে না। এই সময় ভারতবর্ষে উদারনৈতিক মতাবলম্বী একদল নেতা সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রুর নেতৃত্বে ১৯৪১ সালের ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ বোম্বাইয়ে একটি অ-দলীয় সম্মেলন আহ্বান করে গবর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে আবেদন জানালেন যে, ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন উভয়ের স্বার্থের জন্যই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটস দিবার কথা ঘোষণা করা হোক্ এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শাসনভার সম্পূর্ণ দেশীয় সদস্যের উপর অর্পণ করা হোক্। তাঁরা এই উদ্দেশ্যে সরকারে এক স্মারকলিপিও প্রেরণ করেন। এতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। তবে এই বৎসর ২১শে জুলাই বড়লাট এই মর্ম্মে ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রীয় শাসন

পরিষদে পাঁচ জন নূতন সদস্য গৃহীত হবেন এবং সার্থকভাবে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ত্রিশ জন সদস্য নিয়ে একটি সমর-পরিষদ গঠিত করা হবে। বিশ্বব্যাপী মারাত্মক সংগ্রামের মধ্যেও ব্রিটেন ভারতবাসীকে এতটুকু ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতই চেপে বসল। এ ব্যাপার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে যে কতখানি পীড়াদায়ক হয়েছিল তা তাঁর একাশীতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে প্রদত্ত 'সভ্যতার সঙ্কট' বক্তৃতায় (বৈশাখ ১৩৪৮) সম্যক প্রকটিত হয়েছে। এই বিখ্যাত বক্তৃতাটির শেষে তিনি বলেন:

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা এক দিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে, ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে।

"একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্ব্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্ত্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব্ব দিগন্ত থেকে। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্ন স্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত

আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে।···

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বেজে ওঠে ডঙ্ক,
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে॥"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনের গুরুভারে ভারতবাসীদের অবিরাম নিষ্পেষণে যে মর্ম্মপীড়া অনুভব করছিলেন তারই শেষ অভিব্যক্তি পাই 'সভ্যতার সঙ্কটে'। এই বৎসরই ২২শে শ্রাবণ তারিখে (৭ই আগষ্ট ১৯৪১) তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। বঙ্গ-সন্তানদের মনে তাঁর স্থান কত দৃঢ় ও গভীর তা প্রকাশ পেল কবি-প্রয়াণকালে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শোকোচ্ছ্বাসে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের নব জাতীয়তার অন্যতম প্রধান উদ্গাতা, কাব্যলক্ষ্মীর আরাধনায় তদ্গতপ্রাণ। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত, বিশ্বসভায় সম্মানিত তিনি। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করে

জগতের সভ্যতা সংস্কৃতির সার সংগ্রহে পণ্ডিতগণকে নিয়োজিত করেছেন। ভারত-গৌরব-রবি বিশ্বসভ্যতার সঙ্কট-মুহূর্ত্তে অস্তমিত হলেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি যে আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন, অতি দুর্দ্দিনেও তা ভারতবাসীর পাথেয় হয়ে রইল।

এই বৎসরে দ্বিতীয় মহাসমরের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হ'ল। প্রাচ্যে প্রতীচ্যে উভয়ত্র সমরাঙ্গণ ছড়িয়ে পড়ল। জার্ম্মানী সোভিয়েট রুশিয়াকে আক্রমণ করলে। এদিকে পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপান ৭ই ডিসেম্বর (১৯৪১) তারিখে অকস্মাৎ আমেরিকার অধীনস্থ পার্ল বন্দর আক্রমণ করে ধ্বস্তবিধ্বস্ত করলে। ক্রমে ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর অধিকার করে জাপানীরা অপ্রতিহত গতিতে ব্রহ্মদেশের দিকে ধাবিত হ'ল। ভারতবর্ষের রাজনীতির উপর এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। কংগ্রেস নেতৃবর্গ তখন অনেকেই একে একে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁরা জাপানের নবতন কার্য্যকলাপের নিরিখে সমগ্র ব্যাপার নূতন করে পর্য্যালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। কংগ্রেসের অহিংস নীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই মতানৈক্য উপস্থিত হ'ল। গান্ধীজী চান ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যেমন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি সমানে অহিংস নীতির প্রয়োগ। কংগ্রেস-সভাপতি ও অন্যান্য নেতা তাঁর এ আদর্শ মেনে নিতে রাজি হলেন না। তাই ১৯৪১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের নেতৃত্ব-ভার হতে গান্ধীজীকে অব্যাহতি দিলেন। তাঁরা এই দিবসের অধিবেশনে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত না হলেও, যুদ্ধের তখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এ যেমন করে ভারতবর্ষের সীমায় এসে পৌছে গেছে তাতে তাঁরা এ বিষয়ে চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন।

ভারতবর্ষের সহানুভূতি স্বতঃই তাদের দিকে প্রধাবিত হচ্ছে যারা আক্রমণ-কারীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়েও প্রাণপণে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন। তবে নেতৃবর্গ সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, বিদেশীর শাসনমুক্ত একমাত্র স্বাধীন ভারতবর্ষই স্বদেশ রক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে উদ্যোগ আয়োজন করতে সক্ষম এবং সমর-ঝটিকা থেকে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তার সমাধানকল্পে সহায়তা করতে পারগ। ওয়ার্কিং কমিটি পরবর্ত্তী ১৪ই জানুয়ারীর (১৯৪২) বৈঠকে ধার্য্য করেন যে, এ বৎসর এইরূপ জটিল অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন সম্ভবপর হবে না।

এই সময়কার বাংলার অবস্থা একটু বিশেষ করে আলোচনা করা দরকার। নূতন শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তন অবধি বাংলার রাজনীতি অদ্ভুত রূপ ধারণ করে। বাংলার কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অমান্য করে আর একটি কমিটি গঠিত হয় এবং বঙ্গের আইন-সভায়ও এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবর্গ ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন পেলেন না। সুভাষচন্দ্র রামগড় সম্মেলনের পর কলিকাতাস্থ সন্দেহজনক অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম হতে যাতে সরিয়ে দেওয়া হয় সেজন্য আন্দোলন চালালেন। বহু স্বেচ্ছাসেবক এজন্য নির্যাতিত হয় এবং তিনিও স্বগৃহে অন্তরীণ হন। তবে সুখের বিষয় ঐ স্মৃতিস্তম্ভটি এর পরে প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। অন্তরীণ থাকা কালে ১৯৪১, ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সুভাষচন্দ্র স্বগৃহ থেকে নিখোঁজ হলেন। তাঁর অন্তর্দ্ধান উপলক্ষ্য করে অনেকে অনেক রকম জল্পনা করতে থাকেন; কিন্তু পরে সরকার ঘোষণা করেন যে, সুভাষচন্দ্র শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন ও জার্ম্মানীতে চলে গেছেন। এদিকে

মোসলেম লীগ শাসনাধীন বাংলার আকাশ-বাতাস সাম্প্রদায়িকতায় বিষিয়ে উঠল। ঢাকা শহরে ও মফস্বলে নিরীহ অধিবাসীদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন একেবারে চরমে উঠে। এতে হিন্দু সদস্যদের মত একদল মুসলমান সদস্যও তখনকার মন্ত্রীসভার বিরোধী হন এবং একে ভেঙ্গে দিয়ে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। এবারেও প্রধান মন্ত্রী হলেন মিঃ ফজলুল হক। এই মন্ত্রীসভা গঠনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর খুবই হাত ছিল। কিন্তু তাঁকে অকস্মাৎ ১১ই ডিসেম্বর ভারতরক্ষা আইনের বলে আটক করা হ'ল। সরকার পক্ষে কারণ দেখান হ'ল যে, সুভাষচন্দ্রের নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তথ্য গোপন করার অপরাধেই তাঁকে আটক করা হয়। একথা কিন্তু সাধারণে তখন বিশ্বাস করলে না। তাদের ধারণা হ'ল—পুরনো মন্ত্রীসভার বদলে নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্যই গবর্ণমেণ্টের এই চাল। শরৎচন্দ্রকে অল্পদিন পরেই দক্ষিণ-ভারতে ত্রিচিনপল্লীতে প্রেরণ করা হয়।

১৯৪২ সালের প্রথম হতেই জাপান ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময় ৯ই ফেব্রুয়ারি মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেক কয়েকজন পরামর্শদাতা সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে উপনীত হন। তিনি বড়লাট, জঙ্গীলাট প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলাপাদি করেন। ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গেও তাঁরা দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু তাঁদের পূর্ব্ববন্ধু। নিজের জীবন বিপন্ন করেও চীনের যুদ্ধকালীন রাজধানী চুংকিঙে গিয়ে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন এবং নির্যাতিত চীনাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তাঁর সঙ্গে মার্শাল ও মাদাম উভয়েরই বিশেষ প্রীতিপূর্ণ আলাপ আলোচনা হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর

সঙ্গে তাঁরা কল্‌কাতায় সাক্ষাৎ করেন। শান্তিনিকেতনেও তাঁরা যান ও সেখানকার কার্য্যপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হয়ে চীনাভবনের জন্য আশি হাজার টাকা দান করেন। তাঁরা ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, বিশেষ করে যুদ্ধে তারা কিরূপে সহায়তা করতে পারে তাও তাঁরা জেনে গেলেন।

মার্শাল ও মাদাম চিয়াং কাই-শেকের ভারতবর্ষ ত্যাগের মাত্র একমাস পরে ২৩শে মার্চ্চ সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারত-শাসনমূলক কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে নিউ দিল্লীতে উপস্থিত হন। চিয়াং কাই-শেকের ভারত আগমন ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতখানি সতর্ক বা সজাগ করেছিল প্রকাশ নেই। তবে মনে হয়, জাপানের অগ্রগতি যেমন এর জন্য দায়ী, চিয়াং দম্পতির নির্বন্ধাতিশয়তা তেমনি এর মূলে কম ছিল না। ক্রিপ্‌স সাহেব যে প্রস্তাবগুলি নিয়ে আসেন এক কথায় তার নাম দেওয়া হয় 'ক্রিপ্‌স প্রস্তাব'।

কিন্তু ক্রিপ্‌স প্রস্তাব আলোচনার পূর্ব্বে এর মূল কথাটি অনুধাবন করবার পক্ষে আরও কোন কোন বিষয় জেনে রাখা আবশ্যক। কংগ্রেস রামগড় অধিবেশনে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্ত্তী বৈঠকসমূহে স্বদেশের শাসন-তন্ত্র গঠন সম্পর্কে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন আর বলেছেন যুদ্ধকার্য্যে ব্রিটেন তথা মিত্রপক্ষকে সার্থকভাবে সাহায্য করতে হলে স্বদেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে নিখিল-ভারত মোসলেম লীগও ব্রিটেনকে সাহায্য করতে অসম্মত হন, কিন্তু তা অন্য কারণে। কিছুকাল পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদের অধ্যাপক আব্দুল লতিফ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে একটি ভাবী শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা করেন এবং মুসলমান-প্রধান অংশের নাম দেন

পাকিস্থান। জিন্না সাহেব অনবরত প্রচার করতে থাকেন যে, বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার অনাচার করেছেন, এজন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মুসলমান-প্রধান অংশকে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব দিতে হবে। এই ব্যাপারটিকেই মোটামুটি তাঁর অধীনস্থ লীগ পাকিস্থান বলে প্রচার করছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, পাকিস্থান কথাটির প্রবর্ত্তক অধ্যাপক আব্দুল লতিফ কিন্তু পরে লীগ-মার্কা পাকিস্থান ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান, লীগ একমাত্র মুসলমান প্রতিষ্ঠান, আর পাকিস্থানের ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে হবে, অগ্রে পাকিস্থান স্বীকার করে না নিলে হিন্দুদের সঙ্গে চরম আপোষ-রফা হতে পারে না—মিঃ জিন্না এই কথাই প্রচার করতে লাগলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদিন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসের কথায় কর্ণপাত করেন নি, বরং তাঁদের মুখপাত্র ভারত-সচিব লিওপোল্ড আমেরি কংগ্রেসী আন্দোলন ও প্রস্তাবকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নিন্দা করেই চলেছেন। এখন জাপানের আকস্মিক অভ্যুদয়ে এবং কতকটা চিয়াং কাই-শেকের মধ্যস্থতায়ই হয়ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উন্নত শির কতকটা অবনমিত হ'ল। এর ফলেই ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের উদ্ভব। কিন্তু এর ভিতরে কংগ্রেস এবং লীগ উভয় মতের সামঞ্জস্য করতে গিয়ে সবই বানচাল হয়ে গেল। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই ঃ

"প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে একটি নূতন 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন' বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সৃজন যা সম্রাটের নিকট বাধ্যতাহেতু গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা থাক্‌বে, কিন্তু যা হবে এদের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে সমান, আভ্যন্তরিক বা পররাষ্ট্রিক কোন ব্যাপারেই একে অন্যের অধীন থাকবে না। গ্রেট ব্রিটেন এই কার্য্য সংসাধন কল্পে ঘোষণা করেন,

(ক) যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষে নিম্নের বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ব্বাচিত একটি প্রতিনিধি সভা গঠিত হবে, তার উপরে ভারতবর্ষের জন্য একটি নূতন শাসন-তন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হবে।

(খ) শাসন-তন্ত্র রচনা পরিষদে ভারতীয় সামন্ত রাজ্যগুলিরও নিম্নবর্ণিত উপায়ে যোগদানের সুযোগ করে দেওয়া হবে।

(গ) নিম্নলিখিত বিষয় সাপক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপে রচিত শাসন-তন্ত্র সত্বর কার্য্যকরী করতে বাধ্য থাকবেন—

(১) ইচ্ছা করলে ব্রিটিশ ভারতের যে-কোন প্রদেশের এরূপ শাসন-তন্ত্রের অধীন না হওয়ার অধিকার থাকবে, তবে যদি কখন সে এর অধীনে আসতে চায় তারও ব্যবস্থা করা হবে।

এইরূপ অসম্মত প্রদেশসমূহকে যদি তারা ইচ্ছা করে তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম-মর্য্যাদাসম্পন্ন শাসন-তন্ত্র দানে প্রস্তুত থাকবেন।

(২) ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং শাসনতন্ত্র-রচনা পরিষদের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। ইংরেজের হস্ত হতে ভারতবাসীর হস্তে সব দায়িত্ব প্রত্যর্পণকালে যে-সব ব্যাপারের উদ্ভব হবে তাই নিয়েই এ সন্ধিপত্র। জাতিগত এবং ধর্ম্মগত সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা থাকবে। তবে ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি সম্পর্ক নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না।

কোন সামন্তরাষ্ট্র শাসন-তন্ত্রের আওতায় আসতে ইচ্ছুক হোক বা না হোক, নূতন অবস্থায় তাদের সঙ্গে পূর্ব্বে যে-সব সন্ধি করা হয়েছিল সবই পুনরায় নূতন ক'রে করে নিতে হবে।

(ঘ) যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব্বে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ অন্যরূপ

ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজী না হলে, নিম্ন প্রকারেই শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠিত হবে—

যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলেই প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির নিম্নতন পরিষদের সদস্যগণ এক একটি স্বতন্ত্র ইলেক্টর্যাল কলেজ বা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে পরিণত হবেন এবং আনুপাতিক প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠন করবেন। এই পরিষদ হবে ইলেক্টর্যাল কলেজের সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ।

সামন্তরাষ্ট্র থেকেও মোট জনসংখ্যার সমান অনুপাতে ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় প্রতিনিধি প্রেরিত হবেন। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যের মত তাদের সমান অধিকার থাকবে।

(ঙ) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ যে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তার ভিতরে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না নূতন শাসন-তন্ত্র রচিত হয় ততদিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমগ্র যুদ্ধ-প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষ রক্ষার সবরকম ব্যবস্থা ও দায়িত্ব নিজেদের হস্তেই রাখবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ধন জন ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ সম্পদ সংহত করে যুদ্ধে প্রয়োগ করবার দায়িত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সহযোগে ভারত-সরকার ষোল আনা গ্রহণ করবেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ স্বদেশ, কমনওয়েল্‌থ এবং মিত্রশক্তিবর্গের পরামর্শ সভায় যোগদান করবার বাসনা জ্ঞাপন করলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁদের এ-সব কার্য্যে আহ্বান করবেন। তাঁরা এরূপে এমন একটি বিষয়ে সার্থক ও সক্রিয় ভাবে সহায়তা করতে সক্ষম হবেন, ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক।”

ক্রিপ্‌স সাহেব বেতারে প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। কংগ্রেস, মোসলেম লীগ, হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও পূর্ব্ব ব্যবস্থামত স্বতন্ত্র-

ভাবে আলোচনা চল্‌ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এ প্রস্তাব কেউই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। কংগ্রেসের প্রধান আপত্তি হ'ল দুটি বিষয়ে—(১) ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করবার প্রচেষ্টা, এবং (২) সামরিক নীতির পরিচালনায় ভারতবাসীর কর্তৃত্ব অস্বীকার। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে তাঁরা একটি প্রস্তাবের মধ্যে এই মূল বিষয় দুটির কথা উল্লেখ করে ক্রিপ্‌স প্রস্তাব নাকচ করলেন। মোস্‌লেম লীগের নাকচ করার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। মিঃ জিন্না এর ভিতরে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার কোন স্পষ্ট উক্তি না পাওয়ায় লীগকে দিয়ে অগ্রাহ্য করিয়ে নিলেন। হিন্দু মহাসভা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারের নেতৃত্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বরাবর সাহায্য করতে রাজি, কিন্তু ক্রিপ্‌স প্রস্তাবের রকম দেখে তাঁরাও বিস্মিত হলেন। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করার প্রস্তাবে তাঁরা কোনমতেই রাজী হতে পারলেন না। মহাত্মা গান্ধী এ প্রস্তাবকে দেউলিয়া ব্যাঙ্কের উপরে চেক বলে উল্লেখ করেছেন! একটি পত্রিকা তখন বলেছিলেন—ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স এলেন ও চলে গেলেন। ভারতের আকাশে ক্ষণস্থায়ী ধূমকেতুর মত তাঁর আবির্ভাব। নীরবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়, কিন্তু যাবার বেলা সহস্র কণ্ঠ উচ্চরোলে তাঁকে বিদায় দিলে!

ক্রমে ক্রমে মালয় ও ব্রহ্মদেশ জাপানী বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হওয়ায় বহু ভারতবাসী দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত অরণ্যানীর ভিতর দিয়ে পদব্রজে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হ'ল। পথিমধ্যে তাদের দুঃখ-কষ্টের অবধি রইল না। বিস্তর লোক অসুখে মারা যায়, 'আর অনেকে অনাহারে অনিদ্রায় জীবন্মৃত অবস্থায় ফিরে আসে। গবর্ণমেণ্ট ভারত-বাসীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আন্‌বার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করেন নি, আর এই বিপদের মধ্যেও শ্বেতকায়দের জন্য ফিরবার সুবন্দোবস্ত করে বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। আইন অমান্যের চৌদ্দমাস পরে

নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রথম অধিবেশন হয় ওয়ার্ধায় ১৯৪২ সালের ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী। এর দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল এলাহাবাদে ৩০শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্য্যন্ত। এই অধিবেশনে কমিটি ক্রীপ্‌স প্রস্তাব সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ব্রহ্ম ও মালয় প্রত্যাগত ভারতবাসীদের দুঃখ-কষ্টের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তাদের দুঃখ লাঘবের জন্য জাতির নিকট প্রার্থনা জানালেন। ভারত-বাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অবহেলার নিন্দা করে গোবিন্দবল্লভ পন্থ আবার অহিংস অসহযোগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। এই প্রস্তাবই পরবর্ত্তী আগষ্ট প্রস্তাবের দ্যোতক। এই প্রস্তাবে বলা হ'ল যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আমাদের সাহায্য যাচ্ঞা করেন সত্য, কিন্তু তা ক্রীতদাসের সাহায্য—এ অবস্থা আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। এর পর বোম্বাইয়ে ৭ই ও ৮ই আগষ্ট তারিখে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পুনরায় অধিবেশন হ'ল। অহিংস অসহযোগের সূচনাকল্পে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ-আয়োজন চলে। মহাত্মা গান্ধী এবারে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে সম্মত হলেন। যে প্রস্তাবে এই সত্যাগ্রহের সঙ্কল্প গ্রথিত তাই পরে আগষ্ট প্রস্তাব নামে বিখ্যাত হয়েছে।. প্রস্তাবটির সারমর্ম্ম এখানে দিলাম :

"নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির ১৪ই জুলাই (১৯৪২) তারিখের প্রস্তাবে উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি এবং যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উক্তিতে আর ভারতবর্ষ ও তার বাইরে নানা মন্তব্য ও সমালোচনার সৃষ্টি হওয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার প্রতি গভীর মনঃসংযোগ করেছেন। কমিটির মতে প্রস্তাব গৃহীত হবার পর যে-সব ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে তাতে এর যুক্তিযুক্ততা প্রমাণিত হয়েছে। কমিটি এ কথাও পরিষ্কার বুঝিয়ে

দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের জন্য এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবিলম্বে প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব ভারতবর্ষকে পঙ্গু করছে ও তার অবনতি ঘটাচ্ছে। এর ফলে ভারতবর্ষ ক্রমশঃই আত্মরক্ষা করবার এবং বিশ্বের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দেবার ক্ষমতা হারাচ্ছে।

"এক দিকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য চীন এবং রুশিয়ার বীরত্ব প্রদর্শনে কমিটি যেমন বিস্মিত হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি কমিটি ঐ সকল দেশের অবস্থার ক্রমাবনতি হেতু উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করছেন। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে রত আর যারা এদের প্রতি সাহানুভূতিসম্পন্ন তারা এ দুটি দেশের বিপদে মিত্রপক্ষীয়দের অনুসৃত নীতির যুক্তিযুক্ততা যাচাই না করে পারে না। কারণ মিত্রপক্ষীয়দের কার্য্য বার বার সাংঘাতিক ব্যর্থতায়ই পর্য্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতা অপেক্ষা পরাধীন দেশগুলির উপর আধিপত্য স্থাপন এবং ধনতান্ত্রিক প্রথা কায়েম করার চেষ্টার উপরই ঐ সকল নীতি প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্য শাসক জাতিকে শক্তি দান করে নাই, পরন্তু উহা বোঝা এবং অভিশাপ স্বরূপ হয়েছে। ভারতবর্ষ সকল প্রশ্নের জটিল গ্রন্থিস্বরূপ, কারণ ভারতের স্বাধীনতার মাপকাঠিতেই ব্রিটেন এবং মিত্রজাতিগুলিকে পরিমাপ করতে হবে, ভারতের স্বাধীনতায়ই এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের মন আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হবে।

"এই দেশে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান একারণ সর্ব্বাপেক্ষা' প্রয়োজনীয়। ইহারই উপর যুদ্ধের ভবিষ্যৎ এবং স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে এই সাফল্য সুনিশ্চিত। কারণ সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ মুক্তিসংগ্রামে এবং নাৎসীবাদ, ফাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ কল্পে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করবে। এর দ্বারা

যে শুধু যুদ্ধের জয়পরাজয় প্রভাবিত হবে তা নয়, পরন্তু সমুদয় পরাধীন ও নিপীড়িত মানবসমাজকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে টেনে আনা সম্ভব হবে, এবং সেই সঙ্গে ভারতের বন্ধুরূপে এই জাতিপুঞ্জ তাদের নৈতিক ও আত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিদর্শন হিসাবে থেকে গেলে সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্ক সমস্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করবে।

"বর্ত্তমান বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ভারতের স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার বর্ত্তমান অবস্থা পরিবর্ত্তিত করতে অথবা বর্ত্তমান সঙ্কটের সম্মুখীন হতে পারে না। এই সকল অঙ্গীকার জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একমাত্র স্বাধীনতার আগুনই লক্ষ লক্ষ লোকের মনে সেই পরিমাণ শক্তি ও উৎসাহ উদ্দীপিত করতে পারে যাতে করে যুদ্ধের প্রকৃতি অবিলম্বে বদলে যাবে।

"সুতরাং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনর্ব্বার ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তির অপসারণের দাবী দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত এবং স্বাধীন ভারত মিত্র জাতিপুঞ্জের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হবে। এই স্বাধীন ভারতবর্ষ মুক্তিসংগ্রামের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকলরকম দুঃখ-কষ্টের ভাগ নেবে। এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট একমাত্র এ দেশেরই প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় গঠিত হতে পারে। সুতরাং এ হবে ভারতের প্রধান দল গুলির প্রতিনিধিদের একটি সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট। এর প্রাথমিক কর্ত্তব্য হবে ভারতকে রক্ষা করা আর এর অধীনস্থ সশস্ত্র ও অহিংস শক্তির দ্বারা মিত্র জাতিদের সহযোগিতায় আক্রমণ প্রতিরোধ করা। শ্রমরত কর্ম্মী—জমিতে, কারখানায় ও অন্যত্র যারা কাজ করে, তাদের সর্ব্বপ্রকার

সুবিধা করে দিতে হবে, কারণ বাস্তবপক্ষে তাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপরই দেশরক্ষা নির্ভর করে। এই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট একটি গণ-পরিষদের খসড়া প্রস্তুত করবে। এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষের জন্য একটি শাসন-তন্ত্র রচনা করবে। শাসন-তন্ত্র সকল শ্রেণীর লোকের গ্রাহ্য হওয়া চাই। কংগ্রেসের মত এই যে, এই শাসন-তন্ত্র ফেডার‍্যাল বা সংযুক্ত গবর্ণমেণ্টের রীত্যনুযায়ী হবে। এই শাসন-তন্ত্রের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের যতদূর সম্ভব স্বায়ত্ত শাসনাধিকার থাকবে এবং সংযুক্ত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতীত ঐ সব অঞ্চলের অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা থাকবে। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য; তাতে সহযোগিতাকারী ভারতবর্ষ ও মিত্র জাতিপুঞ্জের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ঐ সকল জাতির প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচিত হবে। স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতবর্ষ জনগণের একতাবদ্ধ চেষ্টা ও শক্তির সাহায্যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

"ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যই এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন জাতির মুক্তির প্রতীক। ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোচীন, ঈষ্ট ইণ্ডিজ, ইরাণ এবং ইরাকও অবশ্যই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। যে সকল দেশ আজ জাপানের পদানত তারা পরে অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী জাতির অধীনে অথবা শাসনে থাকবে না।

"বর্ত্তমান সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে কমিটি ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন ও রক্ষার আলোচনায় নিযুক্ত থাকলেও, এটাও তাঁদের অভিমত যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি সংরক্ষণ ও সুনিয়ন্ত্রিত উন্নতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ নিয়ে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হওয়া প্রয়োজন। অন্য কোনও ভিত্তিতে আধুনিক বিশ্ব-সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এরূপ একটি বিশ্বরাষ্ট্র তার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে, এবং এক জাতি কর্ত্তৃক অপর জাতির আক্রমণ ও শোষণ প্রতিরোধ করবে,

সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষা করবে, অনুন্নত জাতি ও অঞ্চলসমূহে উন্নতির ব্যবস্থা করবে এবং সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য আহরণ করবে। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সকল দেশেই নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হবে, জাতীয় সৈন্যবাহিনী, নৌ-বহর এবং বিমানবাহিনীর আর প্রয়োজন থাকবে না এবং একটি বিশ্বরাষ্ট্ররক্ষী-বাহিনী সৃষ্ট হবে। এই বাহিনী জগতের শান্তিরক্ষা এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। স্বাধীন ভারত আনন্দের সঙ্গেই এই বিশ্বরাষ্ট্রে যোগ দিবে এবং আন্তর্জ্জাতিক সমস্যার সমাধানে অন্যান্য জাতির সহিত সাম্যের ভিত্তিতে সহযোগিতা করবে।

"কমিটি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছেন যে, যুদ্ধের মর্ম্মান্তিক ও চরম শিক্ষা এবং পৃথিবীর সঙ্কট সত্ত্বেও অতি সল্পসংখ্যক দেশই এই বিশ্বরাষ্ট্রে যোগ দিতে রাজী। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সঙ্কটময় অবস্থার অবসানের জন্য কমিটি স্বাধীনতার দাবি করছেন যাতে সে স্বাধীন হয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং চীন ও রুশিয়াকে তাদের বর্ত্তমান বিপদের সময় সাহায্য করতে পারে। রুশিয়া কিংবা চীনের আত্মরক্ষায় অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আত্মরক্ষার শক্তিতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে কমিটি বিশেষ উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে চীন এবং রুশিয়ার স্বাধীনতা মূল্যবান, এ দুটিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। কিন্তু ভারতের এবং ঐ দুইটি জাতির বিপদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বিদেশী শাসনের আনুগত্য স্বীকারে ভারত যে কেবল অধঃপতিত হচ্ছে তা নয়, পরন্তু তার আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও খর্ব্ব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই ব্যবহার দ্বারা ব্রিটেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্রমবর্দ্ধমান বিপদের কিছুই প্রতিবিধান করতে পারছে না বরং তাদের প্রতি কর্ত্তব্য হতেই বিচ্যুত হচ্ছে। আজ পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট যে সকল

আবুল কালাম আজাদ

অনুরোধ জানিয়েছেন তার কোন উত্তর পান নি, বরং তাদের বিভিন্ন উক্তিতে ভারত এবং বিশ্বের প্রয়োজন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এমন কি তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা-বিরোধী এমন সব ভাব ব্যক্ত করছেন যাতে প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং জাতীয় শ্রেষ্ঠতার হীন মনোবৃত্তিই প্রকট। যে জাতি নিজ শক্তি সম্বন্ধে সজাগ ও গর্ব্বিত সে কখনই এরূপ মনোভাব সহ্য করবে না।

"বিশ্বের মুক্তির জন্য কমিটি পুনরায় ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তিবর্গের নিকট তাঁদের মনোভাব জানাচ্ছেন। কমিটি মনে করেন যে, যে সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রভুত্বপ্রিয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রেখেছে এবং তাকে স্বীয় স্বার্থ এবং মানবতার আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করতে বাধা দিচ্ছে সে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জাতি যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহ'লে কমিটি তা থেকে জাতিকে বিরত করা সমীচীন মনে করেন না। সেই কারণে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য দাবি প্রতিষ্ঠার এবং অহিংস উপায়ে যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে জাতি যাতে দীর্ঘ বাইশ বৎসরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জিত অহিংস শক্তি নিয়োজিত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কমিটি গণ-আন্দোলনের অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত করছেন। এইরূপ একটি সংগ্রামের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপরই ন্যস্ত থাক্‌বে। কমিটি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছেন তিনি যেন জাতিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করেন।

"কমিটি জনসাধারণের নিকট এই আবেদন জানাচ্ছেন যে, তারা যেন ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত সকল বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে অনুগত সৈন্য হিসাবে তাঁর আদেশ মেনে চলে। তারা যেন মনে রাখে যে, অহিংসাই এ আন্দোলনের ভিত্তি। এমন সময় আস্‌বে যখন হয়ত বিভিন্ন আদেশ জনসাধারণের নিকট গিয়ে

পৌঁছবে না, কোন কংগ্রেস কমিটিরই অস্তিত্ব থাকবে না। যখন এরূপ ঘটবে তখন প্রত্যেক নর নারী প্রচারিত আদেশের সীমা লঙ্ঘন না করে নিজেরাই কার্য্য করবেন। মুক্তিকামী প্রত্যেক ভারতবাসী যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হবেন তখন নিজেই নিজের পথ প্রদর্শক হবেন এবং নিজেকে সেই বন্ধুর পথে চালিত করবেন যে পথে বিশ্রামের স্থান নেই, কিন্তু যে পথ শেষে স্বাধীনতা এবং ভারতের মুক্তিতে মিশে গেছে।"

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু এবং সমর্থন করেন সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল। সভাপতি মৌলানা আবুল-কালাম আজাদ এবং মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবের গুরুত্ব সকল সভ্যকে বুঝিয়ে দিলেন। গান্ধীজী ক্রিপ্‌স প্রস্তাব বর্জ্জনের পর থেকেই 'হরিজন' পত্রিকায় ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে পর্য্যন্ত ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ না করবে ততদিন দেশের মঙ্গল নেই। তাই তিনি "Quit India" বা 'ভারত ত্যাগ কর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

"ইংরেজদের যেমন সিঙ্গাপুর ছেড়ে দিতে হয়েছে তেমনি করে তারা যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যায় তা হলে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের কোন ক্ষতিই হবে না। হয়ত বা তেমন অবস্থায় জাপানীরা ভারতভূমি স্পর্শও করবে না। ভারতের বিভিন্ন দল পরস্পরের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারলে ভারতবর্ষ শান্তি স্থাপনে চীনকেও সার্থক ভাবে সাহায্য করতে সক্ষম হবে এবং ভবিষ্যতে জগতের শান্তি স্থাপনে নিজ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে।...পশ্চিমে যুদ্ধরত থেকে প্রাচ্যকে নিজের অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের সুযোগ দিলে ব্রিটেনের পক্ষে তা কতই না গৌরবের এবং সাহসের কাজ হ'ত।"

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং বিপন্ন রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যের জন্যও ভারতবাসী বিশেষ উৎসুক ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ নীতি তার প্রতিবন্ধক হওয়ায় ভারতবাসী জনসাধারণ অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধীর উক্তি এবং কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব তারই প্রতিধ্বনি মাত্র। ভারত-সরকার যুদ্ধের মধ্যে এই ওজুহাতে কোন ব্যাপক আন্দোলন ঘট্‌তে দিতে রাজি নন। ৮ই আগষ্ট এই প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, ৯ই প্রাতঃকালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সরকার কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হলেন। এবার সরকার আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সুতরাং নারী পুরুষ নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে যত নেতৃস্থানীয় বা প্রতিপত্তিশালী কংগ্রেস-সেবী ছিলেন সকলকেই আটক করা হ'ল। ওয়ার্কিং কমিটি, বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটি এবং কংগ্রেস-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রতিষ্ঠান একে একে বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। জনসাধারণ সরকারের এরূপ সরাসরি দমন-নীতির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তারা গত কয়েক মাস যাবৎ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য শুনে আস্‌ছে, যুদ্ধে আত্মসম্মান রক্ষা করে সাহায্য করতে পারছে না বলে নিজের মধ্যে নিজে গুম্‌রে মরছে। অকস্মাৎ মহাত্মা গান্ধী ও পত্নী কস্তুরবাঈ গান্ধী সমেত সমুদয় কংগ্রেস-সেবী ধৃত হওয়ায় জনতা যেন একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌ল। কেউ কেউ স্থানে স্থানে মাত্রা ছাড়িয়ে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করলে। অধুনা বিখ্যাত অস্তি ও চিমুর থানাদ্বয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপরে অত্যাচার করা হয়। অন্যান্য স্থানেও নানারকম অনাচার ঘটে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও জনগণের মনের মধ্যে কংগ্রেস কতখানি গভীর ও সুদৃঢ় স্থান লাভ করেছিল তা তাদের নেতৃবিহীন হয়েও অহিংসভাবে ব্যাপক আন্দোলন পরিচালনার সার্থক প্রচেষ্টা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। তাদের প্রতিটি কার্য্যে সর্ব্বত্র একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ পরিদৃষ্ট হ'ল।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক অঞ্চলে সরকারেরই মতে স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল! জামসেদপুরের বিখ্যাত টাটার কারখানায়, বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলে জোর ধর্ম্মঘট সুরু হয়। বিহার, যুক্ত প্রদেশ, অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও কাঁথির মত স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছিল। স্বার্থপর বিদেশীরা, বিশেষতঃ ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্র প্রতিনিধিরা অধিকাংশই এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত করার একটা ছল বলেই চিত্রিত করতে প্রয়াস পান। এই সময় ভারত-বন্ধু লুই ফিশার ভারতবর্ষে এবং আমেরিকায় এই আন্দোলনের প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এ আন্দোলন মিত্রপক্ষের যুদ্ধকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত ও জয়লাভ সুনিশ্চিত করার জন্যই যে আরব্ধ হয় তাও তিনি প্রকাশ করেন। দেশের নেতৃবৃন্দ যখন কারারুদ্ধ, সরকারী মুখপাত্রগণ এবং বিদেশী সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ যখন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে লিপ্ত তখন লুই ফিশার আগষ্ট আন্দোলনের মূলগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধুর কার্য্যই করেছিলেন।

বিরুদ্ধবাদীরা যাই বলুন, এই আন্দোলন সম্পর্কে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহ্‌রু কারামুক্ত হয়ে যা বলেছেন তা সত্যই প্রণিধান করার মত। তিনি বলেন, "১৯৪২ সালের বিরাট্ ঘটনাবলীর সঙ্গে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিরাট্ জাতীয় অভ্যুত্থানেরই তুলনা চলে। ১৯৪২ সালের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি গর্ব্ব অনুভব করি। জনসাধারণ যদি বিনা প্রতিবাদে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট নতি স্বীকার করত তা হলে সত্যই আমি দুঃখিত হতাম। কেননা তা দ্বারা কাপুরুষতারই পরিচয় দেওয়া হ'ত এবং আমাদের যুগ-যুগান্তের সাধনা ব্যর্থ হয়ে যেত। নেতা নেই, সংগঠন নেই, উদ্যোগ-আয়োজন নেই, নেই কোন মন্ত্রবল—অথচ একটা অসহায় জাতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার

অন্য কোন পন্থা না দেখে বিদ্রোহ করলে—এ দৃশ্য প্রকৃতই বিপুল বিস্ময়ের বস্তু। তারা বীরের মত দুর্গতি বরণ করেছে, নির্যাতন সহ্য করেছে এবং বিপুল আত্মত্যাগে মহীয়ান্ হয়েছে। রাজশক্তি তাদের শিরোপরি যে অবমাননা ও হীনতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল তা তাদের অসহ্য হয়ে উঠে।”

সরকার যেরূপ তৎপরতার সহিত নেতৃবৃন্দকে কারাবদ্ধ করেন সেইরূপ তৎপরতার সহিতই মেদিনাপুরে, বিহারে, যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে দমনকার্য্য চালান। নানাবিধ অত্যাচার, গৃহদাহ, জিনিষপত্র নষ্ট করা প্রভৃতি এই দমন-নীতির অতি সামান্য অংশ। বঙ্গের তৎকালীন অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরে পুলিশের অত্যাচারের প্রতিবাদে এই বৎসর নবেম্বর মাসে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। এখানে বলা আবশ্যক, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য নলিনীরঞ্জন সরকার, মাধমশ্রীহরি আনে এবং সার্ হরমাশজী ফিরোজশা মোদী পদত্যাগ করেন। তাঁরা এর কয়েক মাস পূর্ব্বে মাত্র শাসন-পরিষদের সদস্য নিয়োজিত হয়েছিলেন। নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, চারদিকে আন্দোলন দমনের জন্য যখন সরকার ব্যস্ত সেই সময়ে দেশের কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস-সেবীদের নামে অযথা অপবাদ দিয়ে সরকারের সাহায্য করতে থাকেন! শিবহীন যজ্ঞের মত গান্ধীবিহীন আন্দোলনে স্থানে স্থানে যে-সব অনাচার অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য সরকার কংগ্রেস্-নেতৃবৃন্দ মায় মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত দোষারোপ করে প্রচার কার্য্য সুরু করলেন। অহিংসার মুখোস নিয়ে নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহের সূচনা করতে চেয়েছিলেন এরূপ অভিযোগও সরকার পক্ষে করা হ’ল। এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি অসুস্থ অবস্থাতেই একুশ দিনের উপবাস

আরম্ভ করেন। পরদিন গবর্ণমেণ্ট একটি প্রচার পত্র দ্বারা এবিষয় সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন। গান্ধীজী ও বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগোর মধ্যে আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে-সব পত্রের আদান-প্রদান হয় তাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী সঙ্কল্পে অটল, তাঁর উপবাস আরম্ভে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। ভারত-সরকার উপবাসের মধ্যেও তাঁকে মুক্তি দিতে নারাজ। দেশের নেতৃবৃন্দ নিউ দিল্লীতে সমবেত হয়ে গান্ধীজীর মুক্তিদানের অনুকূলে প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল, বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো এবং নিউ দিল্লীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ ফিলিপ্‌সকে তা প্রেরণ করেন। কিন্তু এতে কোন ফল হ'ল না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ফিলিপ্‌সের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার হতে ভারত-সরকার দেন নি।

মহাত্মা গান্ধী অসুস্থতা এবং বার্দ্ধক্য সত্বেও ব্রত উদ্‌যাপন করতে সমর্থ হলেন। গান্ধীজীর এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ভারত-সরকারের পক্ষে এবং স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী সার্ রিচার্ড টোটেনহামের ভূমিকা-সম্বলিত ছিয়াশী পৃষ্ঠাব্যাপী একখানা পুস্তিকা প্রচারিত হ'ল! আগষ্ট আন্দোলনে জনগণের পক্ষ থেকে যে-সব অনাচার অনুষ্ঠিত হয় তারই একটা ফিরিস্তি এতে বেশী করে দেওয়া হয়, অবশ্য এর ভিতরে কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবাবলিও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল। এই পুস্তিকাখানাকে ভিত্তি করে হাউস অফ কমন্সে ৩০শে মার্চ্চ (১৯৪৩) তারিখে একখানি শ্বেতপত্রও প্রচারিত হ'ল! এর উপরে আলোচনায় ভারত-সচিব আমেরি সাহেব ভারতবাসীদের নিন্দায় আবার পঞ্চমুখ হলেন।

অ-দল সম্মেলনের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু প্রমুখ এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কংগ্রেস ও ভারত-সরকারের মধ্যে

আপোষ-রফার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তেজবাহাদুর বড়লাটের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করেন। কিন্তু কোন মতেই অনুমতি মিল্‌ল না। মহাযুদ্ধের ওজুহাতে ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করাও নীতি-বিগর্হিত—স্থানীয় ও বিলাতী কর্ত্তৃপক্ষের বিভিন্ন ভাষণে এ-ই বেশী করে প্রকাশ পেতে লাগল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে ভারত-সরকার শত্রু বিতাড়নে যথোপযুক্ত শক্তি অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে নিজ খেয়াল খুশী মত পন্থা অবলম্বন করতে লাগলেন, ভারতীয় জনমত তাতে সায় দিলে কিনা সেদিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করলেন না। এর ফল কি ভীষণ হ'ল তাই এখন বল্‌ব।

শত্রু যাতে জয়লাভ ক'রে রাজ্য মধ্যে আশ্রয় নিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কোন কোন দেশে বিজিত লোকসমূহ পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ঘরবাড়ী, কলকারখানা, খাদ্য-শস্য প্রভৃতি পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে যায়। এই পদ্ধতিকে 'scorched earth policy' বা পোড়া-নীতি বলা হয়। রাণা প্রতাপ সিংহ এই নীতি অনুসরণ করেন, রুশিয়াবাসী এই পদ্ধতি অবলম্বন করে নেপোলিয়নকে বিষম বিপাকে ফেলে। সদ্য গত মহাসমরেও রুশিয়া ও চীন এই নীতি অনুসরণ করেছে। জাপান যখন খাস ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম করে তখন এখানেও এই নীতি অনুসরণের কথা উঠে। ভারতবর্ষে এর খুবই প্রতিবাদ হয়। সুচতুর সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স এখানে এই পদ্ধতির প্রতি লোকের গভীর বিরাগ দেখে আর একটি নীতি বাৎলে দিয়ে যান। ইংরেজীতে কিঞ্চিৎ মোলায়েম করে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'denial policy'! এও কিন্তু প্রায় ঐ পোড়া-নীতিরই সামিল। তবে এ নীতির এইটুকু বিশেষত্ব যে, অদূর ভবিষ্যতে বিজিত হতে পারি এই আশঙ্কায় সরকার কর্ত্তৃক শত্রুর ব্যবহারযোগ্য যানবাহন থেকে আরম্ভ করে

মায় খাদ্যশস্য, আক্রান্ত অঞ্চল থেকে পূর্ব্বাহ্নেই সরিয়ে নেওয়া হয়, কখনও কখনও বা ধ্বংসও করা হয়। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে অল্প সময়ের ব্যবধানে সামরিক কার্য্যের সুবিধার জন্য লোকজনকে ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়; এতে তাদের কষ্টের অবধি ছিল না। এখন এই পদ্ধতি অবলম্বনে তাদের চরম দুঃখের দিকে অতিদ্রুত টেনে আন্‌লে। ১৯৪২ সালের ১৬ই অক্টোবরের নিদারুণ ঘূর্ণীবাত্যায় মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার বিস্তর ক্ষতি সাধিত হয়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর উপর যে দমন-নীতি প্রযুক্ত হতে আরম্ভ হয়েছিল তার এতটুকুও হ্রাস পায় নি! প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার লোক এই ঘূর্ণীবাত্যায় মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয় এবং শস্যাদি নষ্ট হয়ে অন্নাভাবে কষ্ট পায়। এর উপরে উক্ত সরকারী নীতি বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে জাপানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অতিমাত্রায় অনুসৃত হতে থাকে। রেল ষ্টীমার নৌকা গরুর গাড়ী প্রভৃতি যানবাহনের নিরতিশয় সঙ্কোচ সাধিত হ'ল। শস্যপূর্ণ জেলাগুলি থেকে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ দর দিয়ে চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য ক্রয়ের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে ক্রমে খাদ্যশস্যের দর চড়তে থাকে। ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে বঙ্গে ফজলুল হক মন্ত্রীসভা মেদিনীপুরে সরকারী অনাচারের রাশ টান্‌তে গিয়ে লাট সাহেবের তথা ইংরেজ বণিক ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হন। নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ে এবং সরকারী নীতির ফলে জনগণের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির ভীষণ অভাব অনুভূত হতে লাগল। সে সময়ে ঐরূপ একটি জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার হস্তে কর্ত্তৃত্বভার থাক্‌লে দেশবাসীর হয়ত কতকটা সুবিধা হতে পারত, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের চক্রান্তের ফলে তারও পতন ঘটে (২৯শে মার্চ্চ)। এর এক মাস পরে

সার্ নাজিমুদ্দীনের প্রধান মন্ত্রীত্বে বঙ্গে পুনরায় মন্ত্রীসভা গঠিত হ'ল। এঁরা মুস্‌লিম লীগপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী; জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি এঁদের তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। এঁদের কার্য্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জনসেবার চেয়ে নিজের সেবাতেই এঁরা অধিকতর তৎপর।

এই সব ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হ'ল বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তর। কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এবার আত্মাহুতি দিয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ব্যাপকতা ও তীব্রতায় এ বোধ হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও হার মানিয়েছে! অজন্মা সত্ত্বেও সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করে রাখার ফলে সাধারণের খাদ্যাভাব ঘটে ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়। এবারে কিন্তু প্রাচুর্য্যের মধ্যেই অন্নাভাব ঘটল! সরকারী নীতিই এজন্য ষোল আনা দায়ী। এ কারণ এবারকার দুর্ভিক্ষকে যে বলা হয়েছে মনুষ্যকৃত দুভিক্ষ তা এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। কর্ত্তৃপক্ষ লোকজনের খাদ্যাভাবের কথা জেনেও তা নিরাকরণ করেন নি, অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহে সময়ে তৎপর হন নি। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' খাদ্যসম্পর্কে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করে সরকারের কু-নজরে পতিত হন। সরকারী আদেশ মেনে নিতে না পেরে প্রায় দু'মাস কাল সম্পাদকীয় মন্তব্য ব্যতিরেকেই পত্রিকা বের হয়। দুর্ভিক্ষের সময় 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা এবং নগ্ন বুভুক্ষু কঙ্কালসার নর-নারী-শিশুর চিত্র প্রথম প্রকাশ করে এর তীব্রতা ও ব্যাপকতা সাধারণের গোচরে আনেন। দুর্গতদের মর্ম্মব্যথা ভাষায় রূপ দেবার জন্য এই দুখানি সংবাদপত্র বিশেষ ভাবে বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। এর কিছুকাল পূর্ব্বে 'যুগান্তর' পত্রিকাও মেদিনীপুরের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ ক'রে এক দিকে যেমন সাধারণের উপকার করেন অন্য

দিকে তেমনি সরকারেরও কোপে পড়ে নিজেদের প্রকাশ কিছুকাল বন্ধ রাখ্‌তে বাধ্য হন। দুর্ভিক্ষকালে বিপন্ন দুর্গত বাঙালীর সাহায্যার্থে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীগণ অগ্রসর হন। ডক্টর বি এস্ মুঞ্জে, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ঢাকা, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ কালে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোকদের চরম দুর্গতি লক্ষ্য করে দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ও ব্যাপকতা প্রকাশ করেন। ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাঙালীর মুখপাত্র রূপে দুর্গতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। সরকার স্থানে স্থানে দাতব্য কেন্দ্র খুল্‌লেন বটে, কিন্তু তা অতি বিলম্বে ও প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। কলকাতার রাস্তা বুভুক্ষু কঙ্কালসার লোকে ভর্ত্তি হয়ে গেল। শহরের অতি প্রাচুর্য্যের মধ্যেও রাস্তায় ফুটপাথে কত শিশু ও নারী মারা গেল তার ইয়ত্তা নেই। শহরে ও মফস্বলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী নীরবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে আত্মাহুতি দিলে।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ *Famines in Bengal* ('বঙ্গে দুর্ভিক্ষ') নামক পুস্তকে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কার্য্যকারণ সম্বলিত একটি বিশদ চিত্র প্রদান করেছেন। পুস্তকে সন্নিবেশিত বিষয়গুলির অধিকাংশই বিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরেজী 'মডার্ণ রিভিউ' মাসিকে দুর্ভিক্ষের মধ্যেই প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের প্রথম যুগে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে কার্য্যকর ভাবে যুক্ত না থাকলেও এর আদর্শ প্রচারে কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। যখন ডোমিনিয়ন ষ্টেটসের আদর্শে স্বায়ত্তশাসন মাত্র ছিল কংগ্রেসের দাবি তখন থেকেই তিনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ব-সম্পাদিত 'মডার্ণ রিভিয়ু' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রতিমাসে তা ব্যক্ত করতে থাকেন। তাঁর মত নির্ভীক মননশীল

সদাজাগ্রত সাংবাদিক বিরল। এই দুর্ভিক্ষের মধ্যে ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

ইংরেজী ১৯৪৩ ও বাংলা ১৩৫০ সাল ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের ন্যায় কুখ্যাতই হয়ে থাকবে। এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও সরকারী নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হ'ল না। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো দুর্ভিক্ষকালে বঙ্গদেশে একটি বারও আগমন করেন নি, কারণ সময়াভাব। লক্ষ লক্ষ লোকের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে অক্টোবর মাসে তিনি স্বদেশে চলে গেলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ২০শে অক্টোবর তারিখে তাঁর সময়েই জঙ্গীলাট আর্চিবল্ড পার্সিভ্যাল ওয়াভেল। তিনি এর পূর্ব্বে বিলাতে গমন করেছিলেন। সেখানে থেকে তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে ভারতবর্ষের রাজনীতিক অচল অবস্থা এবং অন্ন সমস্যা দুয়েরই সমাধানের আভাস ছিল। তিনি দিল্লীতে কার্য্যভার গ্রহণ করার অল্পদিন পরেই বঙ্গদেশে আসেন এবং কলকাতায় ও উপকণ্ঠে যে-সব অবস্থা দেখেন ও দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে-সব তথ্য আহরণ করেন তার ফলেই বঙ্গবাসীর খাদ্যসমস্যা সমাধানের ভার নিজেই গ্রহণ করে স্বতন্ত্র দপ্তরের উপর অর্পণ করেন। এর কিছুকাল পরে বর্ষ শেষের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষেরও কতকটা অবসান হ'ল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের শেষ পর্ব্বে এর চির-সহচর আধিব্যাধি মার মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। বঙ্গের দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চলসমূহে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। বাখরগঞ্জ জেলায় ম্যালেরিয়ার নাম মাত্রও ছিল না। এই সময় এ জেলাটিও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'ল। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণীয়। বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হতেই শুধু সাহায্য আসে নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাহিত্যিক নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তা শ্রীমতী পার্ল বাকের নেতৃত্বে দুর্গত বঙ্গবাসীদের সাহায্য কল্পে একটি ধনভাণ্ডার

খোলা হয়। আয়ার্ল্যাণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে ডি ভ্যালেরা এই দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ পাউণ্ড বা তের লক্ষ টাকা দান করেন! বাঙালীরা সকলের কথাই আজ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে।

এ বৎসর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ থাকায় রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কোন কার্য্যেই যোগদান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাঁদের অনুপস্থিতির সুযোগে মোস্‌লেম লীগ বিভিন্ন প্রদেশে নিজ প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করে এবং আসাম, বাংলা, পঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অন্যান্য দলের সাহায্যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠনে সক্ষম হয়। বাংলাদেশে লীগ-প্রধান মন্ত্রীসভা কিরূপ দুর্গতির কারণ হয়েছে তা এইমাত্র বলা হ'ল। লাগ-সভাপতি মিঃ জিন্না লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে এবং বক্তিগত ভাবে অন্যত্রও জাতির এই দুর্দ্দিনেও কংগ্রেস এবং কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উপরে গালিবর্ষণ করতে ক্ষান্ত হন নি। কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান আর ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য—একদিকে যেমন এইরূপ মিথ্যা প্রচার সুরু হ'ল, অন্যদিকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলমানদের গত্যন্তর নাই এ কথাও নিরীহ মুসলমান জনগণের কর্ণকুহরে অবিরত প্রচার করা হ'ল।

এই সময় হিন্দু মহাসভা কিন্তু তার কর্ম্মপন্থা অনেকটা কংগ্রেসের অনুগ করে নিলে। ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট বিনায়ক দামোদর সাবারকর মহাসভার সভাপতিত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর সভাপতি হলেন। অমৃতসহর অধিবেশনে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের আদর্শ সম্মুখে রেখে তিনি মহাসভার যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালনা করলেন। পাকিস্থানের বিরোধিতা যেমন দৃঢ়ভাবে করা হ'ল তেমনি বলা হ'ল যে, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতেই ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় পক্ষ সরে দাঁড়ালেই তারা

নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সঙ্গত আপোষ-রফা করে নিয়ে এক অখণ্ড ভারতে ভ্রাতৃভাবে বাস করতে পারবে। কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদই প্রগতিশীল ভারতবাসীর মর্ম্মকথা ব্যক্ত করলেন।

এই বৎসরের শেষ দিকে ইউরোপে যুদ্ধের গতিও অনেকটা মোড় ফিরল। ইটালীর পতন ঘটে; জার্ম্মানীও আক্রমণের পরিবর্ত্তে আত্মরক্ষায়েই অধিকতর মনোনিবেশ করে। প্রাচ্যে জাপানের প্রভাব প্রতিপত্তি কিন্তু অটুটই থাকে। যুদ্ধের মধ্যে চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট অতলান্তিক মহাসাগরের কোন স্থলে জাহাজে বসে 'আটলান্টিক চার্টার' নামে একটি স্বাধীনতার সনন্দ রচনা করেন। এর মধ্যে যুদ্ধশেষে নিপীড়িত জাতিদের স্বাধীনতা দানের কথা ছিল। পরাধীন নিপীড়িত জাতিরা স্বভাবতঃই এতে আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু অল্পকাল পরেই প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এর ব্যাখ্যা এইরূপ করলেন যে, অতলান্তিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী নির্যাতিত রাষ্ট্রসমূহের বেলায়ই এই সনন্দ প্রযোজ্য হবে। এরূপ ব্যাখ্যায় ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই মর্ম্মাহত হয়। ওদিকে ভারত-সচিব মিঃ আমেরি অহরহ ঘোষণা করতে থাকেন যে, ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে মিলন না হলে তাদের কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না। কংগ্রেসের কথা বল্‌তে গিয়ে তিনি এবং তাঁর অধস্তন অন্য অনেকেই এই কথাই বলেন যে, আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হলে বন্দী-নেতাদের মুক্তির বিষয় কিছুই বিবেচনা করা হবে না! তবে লর্ড ওয়াভেল বড়লাট হয়ে আগমন করায় লোকের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হ'ল।

যাহোক, এই অবস্থার মধ্যে আমরা ১৯৪৪ সালে উপনীত হলাম। এই বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈ গান্ধী কারাগারেই হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করলেন। তাঁকে মুক্তিদানের কথা উঠ্‌লে এই সাধ্বী রমণী বলেছিলেন—কারাগারে পতি-পার্শ্বে থেকেই তিনি

মৃত্যু অত্যধিক শ্রেয় জ্ঞান করেন। পতির ক্রোড়ে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হ'ল। এর পর ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে কিছুকাল পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট ওয়াভেলের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়। ওয়াভেলও পত্রে উক্ত আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহারেরই কথা বললেন। মহাত্মা গান্ধী এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হতে না পারায় কোন ফল হয় নি বটে, কিন্তু পত্রাবলী প্রকাশিত হলে বুঝা গেল লর্ড ওয়াভেল নেতৃবৃন্দের বা কংগ্রেসের বিষয় সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করছেন। পরে প্রকাশ পেয়েছে, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের সহধর্ম্মিণী অসুস্থ হলে তিনি (ওয়াভেল) বিমানযোগে মৌলানা সাহেবকে তাঁর নিকট নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর আদেশও কার্য্যকরী হয় নি! আজাদও কারাগারে অবস্থান কালে তাঁর পত্নীকে হারালেন। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইও মহাত্মার সঙ্গে ধৃত হয়েছিলেন, কিন্তু সপ্তাহকাল কারাবাসের পরই ১৫ই আগষ্ট (১৯৪১) তাঁর দেহান্ত ঘটে।

জ্বর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় মহাত্মা গান্ধা ৬ই মে তারিখে কারামুক্ত হলেন। অসুস্থতার জন্য ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ অন্য কোন কোন নেতাও মুক্তি পেয়েছিলেন। মহাত্মাজী কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েই আবার কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠ্‌লেন। জেলে থেকেই তিনি মিঃ জিন্নাকে পত্র লিখেছিলেন, কিন্তু তা তাঁকে দেওয়া হয় নি। এই সময় রাজা-গোপালাচার্য্য জিন্নার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার সূত্র অনুসন্ধান করা ছিল এই আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য। বোম্বাইয়ে জিন্না-ভবনে ৯ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত জিন্না ও গান্ধীর মধ্যে আলোচনা চলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মীমাংসার কোনই সূত্র পাওয়া গেল না।

এই সময় মহাত্মা গান্ধী দুইটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। কস্তুরবাঈ স্মৃতি-ভাণ্ডার স্থাপনের কথা উঠলে দেশবাসীর নিকট থেকে আশ্চর্য্য সাড়া পাওয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সওয়া কোটি টাকা চাঁদা সংগৃহীত হ'ল। মহাত্মা গান্ধী এই টাকা একটি ট্রাষ্টী বা ন্যাসরক্ষক কমিটির উপরে অর্পণ করেন। এই অর্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন পল্লীগ্রামে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হবে। আর একটি কার্য্য—যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা। 'গান্ধী প্ল্যান' নামে এ এখন পরিচিত। গ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর কৃষি, শিল্প, শিক্ষা যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি সাধনই এর লক্ষ্য। বিশেষ বিশেষ শিল্প—যার সঙ্গে আপামর সাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগ তা নিয়ন্ত্রণ করবে রাষ্ট্র। বোম্বাইয়ের শিল্পপতিরা আর একটি পরিকল্পনা প্রচার করেছেন। গান্ধী প্ল্যানের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য রয়েছে, কারণ এ প্ল্যান বা পরিকল্পনা নগরকেন্দ্রিক, আর এতে সর্ব্বসাধারণের উপকারের চেয়ে ধনিক গোষ্ঠীরই বেশী উপকার হবে। এই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফে শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য সার্ আর্দেশীর দালাল একটি তৃতীয় পরিকল্পনাও প্রচার করেন। বলা বাহুল্য, তাতে সরকারেরই সুযোগ-সুবিধা বেশী করে দেখা হয়েছে। ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতিমূলক পরিকল্পনার কথা আলোচনা কালে স্বতঃই একজনের কথা মনে হয়। তিনি হলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি আজীবন ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশবাসী জনগণের দুঃখদৈন্য তাঁর মর্ম্মে বড়ই আঘাত দিত। তিনি বৈজ্ঞানিক হয়েও বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্য বিবিধ শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি এই বৎসর ১৬ই জুন ইহধাম ত্যাগ করেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় আন্দোলন

পরিচালনার ভার মোস্লেম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার উপরেই পতিত হয়। কিন্তু এরা পরস্পর-বিরোধী প্রতিষ্ঠান। একে অন্যকে বরাবর সন্দেহের চক্ষেই দেখেন। ১৯৪৪ সালে মোস্লেম লীগের প্রতিপত্তি যেন লীগ-প্রভাবিত অঞ্চলেও কতকটা হ্রাস পেতে থাকে। পঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট দল লীগের সঙ্গ ছেড়ে স্বয়ংপূর্ণ ভাবেই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই বৎসর কংগ্রেস সদস্যগণ পুনরায় কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য ব্যবস্থা-পরিষদে যোগদান করতে আরম্ভ করলেন। কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন প্রদেশে এর প্রতিক্রিয়া হ'ল খুব। আসাম ও সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসীদের প্রভাব অনুভূত হ'ল এবং মন্ত্রীসভা অনেকটা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-রফা করেই জীইয়ে রাখা হ'ল। কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা ভুলাভাই দেশাই এবং মোসলেম লীগ দলের সহ-নেতা নবাবজাদা লিয়াকত আলী একযোগে কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ জাতীয় ভাবে গঠন করার ভিত্তিতে একটি প্রস্তাব রচনা করেন। একথা প্রকাশিত হলে এর অনুকূলে ও প্রতিকূলে নানারূপ আলোচনা হয়। তবে মূল প্রস্তাবটি সাধারণের নিকট থেকে গোপন রেখেই বড়লাটের হস্তে প্রদান করা হ'ল। বড়লাট এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই শাসন-পরিষদ সংস্কার করার জন্য উদ্যোগী হলেন।

বর্ত্তমান ১৯৪৫ সালের আরম্ভাবধি আন্তর্জ্জাতিক এবং ভারতের আভ্যন্তরিক দুই দিকেই আশার আলো দেখা যাচ্ছিল। জার্ম্মান বাহিনী সকল রণক্ষেত্র থেকেই ক্রমে ক্রমে হটে গিয়ে এ বৎসরের প্রথম দিকে নিজ দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রাচ্যে জাপান নিজ শক্তি কতকটা অব্যাহত রাখ্লেও মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক নানা দিক্ থেকেই আক্রান্ত হবার উপক্রম হয়। মিত্রবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে জার্ম্মানীকে ঘায়েল করা, আর এইজন্য তারা সেখানে সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করলে। তবে এক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়ার কৃতিত্বই সকলের চেয়ে বেশী। দীর্ঘ আঠার শ মাইল ব্যাপী

রণাঙ্গণে জার্ম্মানীর সঙ্গে লড়াই করে যাকে অতি দ্রুত পেছিয়ে যেতে হয়েছিল, প্রায় দেড় বৎসরের মধ্যে সে এত শক্তি অর্জ্জন করলে যে, অপরাজেয় জার্ম্মান বাহিনীকে শুধু রুশভূমি থেকে বিতাড়িত নয়, একেবারে জার্ম্মানীর সীমান্তে হটিয়ে নিয়ে গেল। এ মোটেই সামান্য কথা নয়। রুশিয়া নিজ কৃতি গুণেই বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করলে।

অন্তর্জ্জাতিক অবস্থা যখন এইরূপ, তার মধ্যে লর্ড ওয়াভেল দেশাই-লিয়াকত আলি প্রস্তাব নিয়ে এই বৎসরের মার্চ্চ মাসে লণ্ডন যাত্রা করলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পক্ষকালের মধ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু তাঁকে সেখানে প্রায় আড়াই মাস এইজন্য অবস্থান করতে হয়। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা এই সময় খুবই জটিল হয়ে উঠে, তবে এপ্রিল মাসের শেষে জার্ম্মানীর পতন ঘটায় এ অবস্থার শীঘ্রই রেখাপাত হ'ল। বড়লাট মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরি প্রমুখ মন্ত্রীসভার সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করে একটি সর্ব্বসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে ১২ই জুন তারিখে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। এর দু'দিন পরে ১৪ই জুন তিনি বেতারে ঘোষণা করলেন যে, কেন্দ্রীয় আইন-সভাদ্বয়ের দলপতিগণ, প্রাক্তন ও বর্ত্তমান প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ, মহাত্মা গান্ধী ও মোহম্মদ আলী জিন্না এই ক'জন সদস্য নিয়ে পরবর্ত্তী ২৫শে মে শিমলায় একটি বৈঠক আহূত হবে, উদ্দেশ্য বড়লাট ও জঙ্গীলাট বাদে বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সমানসংখ্যক সদস্যের (৫ : ৫) ভিত্তিতে আরও তের জন—মোট পনর জন সদস্য নিয়ে একটি সাময়িক শাসন-পরিষদ গঠন। এই পরিষদের কাজ হবে প্রধানতঃ দুটি —(১) জাপানী বিতাড়নে ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা এবং (২) ভাবী শাসন-তন্ত্র রচনার জন্য ব্যবস্থা। মহাত্মা গান্ধী বৈঠকে উপস্থিত হতে অসম্মত হওয়ায় তাঁর স্থলে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা

আবুলকালাম আজাদ আহূত হলেন। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, ইতিপূর্ব্বে কোন কোন নেতা অসুস্থতা নিবন্ধন কারামুক্ত হলেও, ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকেই এই সময় মুক্তি দেওয়া হয়। দেশের তখনকার অবস্থা বিবেচনায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বড়লাটের কোন কোন কথা পরিষ্কার বুঝে নিয়ে বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। বৈঠক ২৫শে জুন আরম্ভ এবং পরবর্ত্তী ১৪ই জুলাই পরিসমাপ্ত হয়। বৈঠকের প্রারম্ভিক আলোচনায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আশার সঞ্চার হয়েছিল, কারণ ওয়াভেল বলেছিলেন কোন একটি সম্প্রদায়ের বিরোধিতায়ই বৈঠক ভেঙ্গে দেওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কথা টিক্‌ল না। কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের সকল মুসলমান সদস্যই মোস্‌লেম লীগের মনোনীত সদস্য হওয়া চাই—জিন্না এই জিদ ধরলেন। বড়লাট স্বতঃই এই জিদ মেনে নিতে পারলেন না। এ কারণ শেষ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়েই শিমলা সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। লর্ড ওয়াভেল ব্যর্থতার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে নেতৃবৃন্দকে এই আশ্বাস দিলেন যে, তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করেছেন তা থেকে আপাততঃ বিরত হলেও পুনরায় আলাপ-আলোচনা সুরু করা হবে।

মহাসমরের মধ্যে কংগ্রেসকে দাবিয়ে রেখে ভারতবর্ষের ধন জন নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছামত ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবহার করতে থাকেন। বাইরে, বিশেষতঃ আমেরিকায় কিন্তু প্রচারিত হ'ল যে, এসবই ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত দান! তাদের এ কথা স্পষ্ট করে বুঝাবার জন্যই বোধ হয় সেখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে বেসরকারী প্রতিনিধি প্রেরিত হলেন। এই সব প্রতিনিধির মধ্যে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, গগনবিহারীলাল মেহ্‌টা ও আবদুর রহমান সিদ্দিকী কিন্তু সেখানে গিয়ে ভারতবাসীর দুঃখ দৈন্য ও শাসনতান্ত্রিক বিষম

অবস্থার কথাও প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত পাঁচ বৎসরব্যাপী যে প্রচারকার্য্য চলেছিল তার ব্যাপকতা ও কার্য্যকারিতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়ে যান। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে ভারতবর্ষ থেকে এক বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী বিলাতের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরশিল্প-কেন্দ্রসমূহে কিরূপে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবার জন্য উভয় দেশেই বিমানযোগে গমন করেন। এই মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সার্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, সার্ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর প্রভৃতি। তাঁরা উভয় দেশেরই কার্য্য-কলাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও বুঝেছেন যে, দেশের শাসনভার দেশবাসীর হস্তে না এলে কোনরূপ উন্নতিরই আশা নেই। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বঙ্গের দুর্দ্দশা ও মন্বন্তরের কথাও ব্রিটিশ সুধীমণ্ডলীর নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান কালেও তাঁরা অনুরূপ কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু সেখানে গমন ও প্রস্থান ব্যতীত তাঁদের সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। তাঁদের কোন বক্তৃতা যাতে সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয় সে সম্বন্ধে ভারতের প্রাক্তন বড়লাট ও যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান ব্রিটিশ রাজদূত লর্ড হালিফাক্সের (আগেকার লর্ড আরুইন) নির্দ্দেশ ছিল! বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরে ভারতবর্ষের কয়েকজন শিল্পপতি ও অর্থনীতিবিদ্‌ও উভয় স্থলে গমন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সার্ আর্দেশীর দালাল, ঘনশ্যামদাস বিরলা ও নলিনীরঞ্জন সরকার। যুদ্ধোত্তর ভারতের পুনর্গঠনে ঐ দুটি দেশ থেকে বিশেষ কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই—ফিরে এসে তাঁরা এই কথাই ব্যক্ত করেছেন।

এখানে আর একটি কথা বলে নি’। ইতিপূর্ব্বে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা সম্মেলনে চার্চ্চিল রুজভেল্ট ষ্টালিন ত্রয়ী সম্মিলিত হয়ে জার্ম্মানীর আশু পতনের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ও স্থির করেন যে, ক্যালিফর্ণিয়ার প্রধান শহর সান ফ্রান্সিস্কোতে ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনমূলক সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মহাসমারোহে বৈঠক আরম্ভ হয়। পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এতে যোগ দান করেন। ভারত-সরকার প্রতিনিধি পাঠালেন সার্ রামস্বামী মুদোলিয়ার ও সার্ ফিরোজা খাঁ নূনকে। উভয়েই সরকারের পরম ভক্ত, অগণিত ভারতবাসীদের মুখপাত্র রূপে তাঁদের মুখ থেকে কোন কথা বের হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে এই ভার নিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মহোদয়া। তিনি ইতিপূর্ব্বেই আমেরিকায় গমন করেন। বৈঠক-গৃহে তাঁর স্থান হয় নি বটে, কিন্তু বৈঠকের বাইরে সাধারণ সভায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট ভারতবাসীর মর্ম্মবাণী অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করলেন। ভারতবাসী স্বাধীনতাকামী হয়েও ফাসিষ্ট-নাৎসী-বিরোধী গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রেরই পক্ষপাতী—এই কথা তিনি ভারতবাসীর হয়ে সকলকে জানিয়ে দিলেন। বৈঠকের মধ্যেও পরাধীন ভারতবাসীদের বিষয় রুশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মলোটোভ পোলণ্ড প্রসঙ্গে উত্থাপন করেছিলেন !

সান্ ফ্রান্সিস্কো বৈঠক আরম্ভ হতেই জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটে। এর পর ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃবৃন্দ বার্লিনের পটস্ডামে বসে তার বিধিলিপি রচনা করেন। জার্ম্মানীকে চার ভাগে ভাগ করে ফ্রান্স, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়া এই চারটি রাষ্ট্র তাদের উপর খবরদারি করার ভার গ্রহণ করে।

এই চারটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মিলে সর্ব্বোপরি একটি কমিশন গঠিত হ'ল। এই কমিশন পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা ও সমগ্র জার্ম্মানী সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সবই করবেন। সামরিক শক্তি ও শিল্প বাণিজ্য বিনষ্ট করে জার্ম্মানদের একটি কৃষিজীবী জাতিতে পরিণত করারই চেষ্টা চল্‌ছে সেখানে।

জার্ম্মানীর এই বিধিলিপি রচনায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু এতে তিনি স্বাক্ষর করতে পারেন নি; এ অধিকার লাভ করেন মিঃ ক্লেমেণ্ট এট্‌লি। কারণ ইতিমধ্যেই গত জুলাই মাসে (১৯৪৫) ব্রিটেনে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হয় তাতে শ্রমিক দলের সম্পূর্ণ জয়লাভ ঘটে এবং মিঃ এট্‌লির নেতৃত্বে শ্রমিক মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুদ্ধকালে মিঃ চার্চ্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিপদ থেকে বাঁচালেও তাঁর হঠকারিতায় এবং রক্ষণশীল দলের ধনিক মনোবৃত্তি-সুলভ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ জনসাধারণ বিদ্বিষ্ট হয়েই ছিল। আর এর ফল সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁরা হাতে হাতেই পেলেন। মিঃ চার্চ্চিল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করলেন বটে, কিন্তু রক্ষণশীল দলের বহু সদস্য হেরে গেলেন। এর ফলে পার্লামেণ্টে তাঁদের সংখ্যাধিক্য আর রইল না। ভারত-সচিব কুখ্যাত আমেরিও নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হ'লেন। বর্ত্তমানে ভারত-সচিব হয়েছেন প্রায় পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ লর্ড পেথিক লরেঞ্চ।

জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর শীঘ্র শীঘ্র জাপানের পতন ঘটাবার জন্যই ভারতবাসীর সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কার্য্য অন্য উপায়ে অতি দ্রুত সংসাধিত হ'ল। ব্রিটেন ও আমেরিকার তুষ্টি সাধনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক নীতি পরিহার করে ৮ই আগষ্ট সোভিয়েট রুশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও ক্রমে মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর এই দিনেই যুক্তরাষ্ট্র বিমানবাহিনী নবাবিষ্কৃত

এটম বম্ব্ বা আণবিক বোমা বর্ষণ করে হিরোশিমা শহরটি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়! এর দু'দিন পরে নাগাসাকির উপরেও তারা এইরূপ একটি বোমা ফেলে। এই দুই স্থানে বোমা বর্ষণে দুই লক্ষ লোক নিহত হয়েছে! ঘর-বাড়ী পশুপক্ষী তো নেই-ই। জাপান-কর্তৃপক্ষ আণবিক বোমার ধ্বংসকারিতা দেখে জাতিকে নিছক প্রাণে বাঁচাবার জন্যই ১৫ই আগষ্ট তারিখে আত্মসমর্পণ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের জাপান-বাহিনীও অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মিত্র শক্তির পক্ষে মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থার যথোপযুক্ত নৌবাহিনী স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনী সঙ্গে নিয়ে জাপানে উপস্থিত হন। গত ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের পরাজয়-স্বীকার মূলক শর্তাবলী স্বাক্ষরিত হয়। জাপান নিরস্ত্র ও শিল্প বাণিজ্যাদি বিচ্যুত হয়ে একটি তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে!

'ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল আর্মি' নামে একটি বাহিনী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে জাপানীর সপক্ষে যুদ্ধ করেছিল। সুভাষচন্দ্র ব্যাঙ্কক থেকে বিমান যোগে জাপান যাবার পথে বিমান-সংঘর্ষে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং হাসপাতালে মারা যান, জাপানী পক্ষে এইরূপ ঘোষণা করা হয়েছে। অনেকেই এ সংবাদে আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। তবে সুভাষচন্দ্রের যদি সত্যই মৃত্যু ঘটে থাকে তা হলে ভারতমাতা তাঁর একজন বীর সন্তান অকালে হারালেন বলে সকলেরই যথেষ্ট আক্ষেপের কারণ হবে। জাপানের পতনের পর, ভারত-সরকার সুভাষচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে ১৪ই সেপ্টেম্বর মুক্তি দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্রের নিখোঁজ হওয়ার পর বসু-পরিবারের উপর অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়ন হয়েছে। তাঁরা এ সকল নীরবে সহ্য করে অদ্ভুত ধৈর্য্য ও মহত্তেরই পরিচয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কংগ্রেস-নীতিরই পূর্ণ সমর্থক।

শ্রমিক দল পার্লামেণ্টে অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করায় অনেকের মনে কতকটা আশার সঞ্চার হয়। শ্রমিক মন্ত্রীমণ্ডলের আহ্বানে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল আগষ্ট মাসের শেষে পুনরায় বিলাত গমন করেন। সেখানে তিন সপ্তাহ থেকে কর্ত্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ভারত-শাসন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা সেরে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর একটি বেতার বক্তৃতায় তিনি শ্রমিক মন্ত্রী-সভার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থানুসারে আগামী শীতকালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভার নির্ব্বাচন হয়ে গেলে তিনি নির্ব্বাচিত সদস্যদের প্রতিনিধিবর্গকে নিয়ে একটি বৈঠক আহ্বান করবেন। এই বৈঠকে ধার্য্য হবে – ক্রিপ্‌স প্রস্তাব অনুসারে বা অন্য কোন উপায়ে শাসন-তন্ত্র-রচনা পরিষদ গঠিত হয়ে শাসন-তন্ত্র রচনা করা হবে কিনা। তবে ইতিমধ্যে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা কল্পে প্রধান দলগুলির সম্মতি নিয়ে একটি প্রতিনিধিমূলক শাসন-পরিষদ গঠনের জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। এই সময়ে আবার অনেক কারারুদ্ধ রাজ-নৈতিক বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়।

লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় ভারতবাসীদের মধ্যে আবার নানারূপ আলোচনা সুরু হয়েছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর পুণায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে এবং পরবর্ত্তী কয়েকদিন পর্য্যন্ত অধিবেশন চলে। আলোচনাদির পর নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২১শে, ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে দীর্ঘ তিন বৎসর পরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। পুণায় যে-সব প্রস্তাব কমিটির বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়, কমিটি তা সবই গ্রহণ করেন। একটি প্রস্তাবে বিখ্যাত আগষ্ট প্রস্তাবের প্রতি জাতির পূর্ণ আস্থা বিঘোষিত হয়। লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণায় নূতন কিছু পাওয়া না গেলেও নেতৃবর্গ আলাপ-

আলোচনায় যোগ দিতে সম্মত হয়েছেন। আসন্ন নির্ব্বাচনে যোগদানের অনুকূলেও তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সুভাষচন্দ্র পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল আর্মি'র লোকেদের প্রতি দুর্ব্যবহারে এবং ভারত-সরকার কর্ত্তৃক তাদের 'কোর্ট মার্শাল' বা সরাসরি সামরিক বিচারে যে ভারতময় বিক্ষোভ উপস্থিত হবে সে সম্বন্ধেও একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভ্রান্তপথে চালিত হলেও এই বাহিনীরও লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এই পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনে কংগ্রেস তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছেন। বোম্বাইয়ের নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতে হ'লে সমগ্র এশিয়া থেকেই সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছিন্ন হওয়া প্রয়োজন। এ দুর্দ্দিনেও ভারতবাসীর প্রাণে আজ এই কথাই ধ্বনিত হচ্ছে :

"চলরে চলরে চলরে ও ভাই জীবন আহবে চল,
বাজবে সেথা রণভেরী আসবে প্রাণে বল।"

পরিশিষ্ট

যে-সব পুস্তক থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি তার তালিকা—

বাংলা

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত

২। বাংলা সাময়িক পত্র (১৮১৮-১৮৬৭)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত

৫। হিন্দু মেলার কার্য্যবিবরণ ও বক্তৃতা

৬। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ—শ্রীঅনাথনাথ বসু

৭। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার —শরৎকুমার রায়

৮। কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত

৯। তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী—সখারাম গণেশ দেউস্কর

১০। কংগ্রেস—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১১। ভাণ্ডার (১৩১২, ১৩১৩)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত

১২। জাতীয় উচ্ছ্বাস—রায় বাহাদুর জলধর সেন সঙ্কলিত

১৩। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী

১৪। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

১৫। বঙ্গদর্শন (১২৭৯-১২৮৩)

১৬। আনন্দমঠ—সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ

১৭। দেশবন্ধু স্মৃতি—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৮। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক—বসুমতী সাহিত্য-মন্দির

১৯। লালা লজপৎ রায়—শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী

২০। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র—শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস

২১। বন্দেমাতরম্—যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত

২২। আনন্দমোহন বসু

২৩। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২৪। ভারতে জাতীয় আন্দোলন—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

২৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

২৬। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত

২৭। হরিশ্চন্দ্র—রামগোপাল সান্যাল

২৮। আমার বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯। আনন্দবাজার পত্রিকা—কংগ্রেস জয়ন্তী সংখ্যা

৩০। কংগ্রেস ও বাংলা—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৩১। জীবন-স্মৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩২। চরিত কথা—বিপিনচন্দ্র পাল

৩৩। প্যারীচরণ সরকার—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

৩৪। ভোলানাথ চন্দ্র—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

৩৫। সেকালের লোক—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

৩৬। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আত্মচরিত

৩৭। অরবিন্দ প্রসঙ্গ—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ইংরেজী

1. **Bengal Under Lieutenant-Governors**—Vols. I & II by *C. E. Buckland.*
2. **History of Political Thought from Rammohan to Dayanand.** 1821-84—by *Biman Behari Majumder.*
3. **Rise and Fulfilment of British Rule in India**—by *Thompson & Garrat.*
4. **The Life and Work of Sir Sayed Ahmed Khan**—by *Lt. Col. Graham.*
5. **Landmarks in Indian Constitutional History and National Development**—by *Gurmukh Nihal Singh.*
6. **A Nation in Making**—by *Surendra Nath Banerjee.*
7. **New India** (1st. & 2nd. Edition)—by *Henry Cotton.*
8. **Life and Times of Lokamanya Tilak**—Vol. I by *N. C. Kelkar.*
9. **How India Wrought for her Freedom**—by *Annie Bessant.*
10. **Indian National Evolution**—by *Ambika Charan Majumder.*
11. **The History of Congress**—by *Dr. Pattabhi Sitaramaya.*
12. **Congress in Evolution.** Compiled by *D. Chakravarty & C. Bhattacharya.*
13. **Congress Presidential Speeches**—Vols. I & II by *G. A. Natesan & Co.*
14. **Young India**—Vol. I.—*S. Ganeshan & Co.*
15. **The Life of C. R. Das**—by *Prithwis Chandra Ray.*
16. **Memories of My Life and Times**—by *Bepin Chandra Pal.*
17. **Rise of the British Power in India**—by *B. D. Basu.*
18. **India Under the British Crown**—by *B. D. Basu.*

19. **Jawaharlal Nehru an Autobiography.**
20. **Indian Civil Service**—by *Naresh Chandra Roy.*
21. **The Separation of Excutive and Judicial Powers in British India**—by *Naresh Chandra Roy.*
22. **Rural Self-Government in Bengal**—by *Naresh Chandra Roy.*
23. **Life and Works of R. C. Dutt**—by *J. N. Gupta,* I.C.S.
24' **The Rise and Growth of the Congress in India**—by *C. F. Andrews & Girija Mukherjee.*
25. **Independence—The Immediate Need**—by *C. F. Andrews.*
26. **India and the Simon Commission**—by *C.F. Andrews.*
27. **Defence of India**—by *Nirad C. Chaudhuri*
28. **The Congress and the National Movement**—*Published by the Reception Committee, Calcutta Congress, 1928.*
29. **History of British India**—by *Roberts.*
30. **My Experiments with Truth**—Vols. I & II by *M. K. Gandhi.*
31. **The Indian National Congress and the Revival of India**—by *Nanda Lal Sarkar.*
32. **Allan Octavian Hume,** C B. **"Father of Indian National Congress**—by *Sir William Wedderburn.*
33. **Mukherjee's Magazine, 1874.**
34. **Indian Annual Register, 1936-1942.**
35. **Brahmo Samaj and the Battle of Swaraj in India—**—by *Bepin Chandra Pal.*
36. **Recollections**—Vol. II *by John Morley.*
37. **History and Constitution of Courts etc.,**—by *Herbert Cowell.*
38. **An Indian Journalist**—by *F. H. B. Skrine.*